

প্রাণায়বহি

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়



রাবিকাকাকে উদ্ধার করতে এসে অসহায়
জানতে পারল, ওরা পড়েছে এক অতি
রহস্যময় ও ভয়ংকর ঘাতকের হাতে,
যার হাতের মধ্যে জ্বলজ্বল করে
শক্তিশালী বজ্রমাণিক, আর যার মুখ
সর্বদা মুখোশে ঢাকা, কারণ একবার যদি
কেউ তার মুখ দেখে ফেলে, তাহলে সেই
হতভাগ্যের মৃত্যু কেউ আটকাতে পারবে
না। বন্ধুদের সঙ্গে সমরোত্তম মেঘবর্ণকে
নিয়ে অভী যাত্রা করল রাক্ষসদের দেশ
মাল্যপর্বতে— সেখানে বৃষ্টি হয় বছরে
মাত্র দু'বার, আর সারা প্রাসাদজুড়ে ঘুরে
বেড়ায় এমন একটা বাচ্চা ছেলে, যাকে
ভয় পায় না এমন কোনো রাক্ষস নেই।
এখানেরই পাহাড়ের কোলে এক দুর্গম
গুহায় লুকিয়ে আছে রবিকাকার হারানো
অতীত-উদ্ধারের চাবিকাঠি, কিন্তু সে-গুহা
পাহারা দেয় মায়াজগতের হিংস্রতম প্রাণি
— মহাসর্পিণী। তাকে এড়িয়ে সে-গুহায়
টোকাই এক অসম্ভব কাজ।

‘প্রলয়যোদ্ধা’তেই শেষ হয়নি অভীর
দুঃসাহসিক অভিযান; এবার তার সামনে
এসে দাঁড়িয়েছে আরও মারাত্মক শত্রু—
যে জানে তার প্রত্যেকটি দুর্বলতার
কথা। কিন্তু অভী নিজেই এখনও জানে
না, কে চায় তাকে দিয়ে ডাক পাঠাতে
প্রলয়ের আগুনকে, যে আগুন ধ্বংস
করে দিতে চলেছে সমরগরিমা-সহ সমগ্র
মানবসভ্যতা।

প্রণয়বহি

প্রলয়বহি

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়

অরুণ

অরুণ্যমন প্রকাশনী

উৎসর্গ

জানালার বাইরের সেই রোদমাখা কলকেগাছটিকে,
এক নিঃসঙ্গ কিশোরের দুপুরগুলোকে অপরূপ মায়ায় ভরিয়ে রাখত যে।

ভূমিকা

ফ্যান্টাসি বলতে আমরা বুঝি এক বিশেষ ধরনের কল্পকাহিনিকে। তাতে চরিত্র ও ঘটনাবলিকে চালিত করে ‘জাদু’ বা এমন কোনো ভাবনা— যার সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্ক নেই। এর বেশ কিছু ধারা ও উপধারা আছে।

তেমন একটি প্রধান ধারায় আমরা পাই সম্পূর্ণ কাল্পনিক এক জগতে কাল্পনিক চরিত্রদের কীর্তিকলাপ। তাকে ‘হাই ফ্যান্টাসি’ বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই কাহিনির যাবতীয় ঘটনা ও অঘটনের কেন্দ্রে থাকে এক বা একাধিক চরিত্র— যাদের বিবর্তন তথা উদ্ভর্তনই কাহিনিকে চালিত করে। তাদেরই মাধ্যমে হয় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। এদের ‘হিরোইক ফ্যান্টাসি’-ও বলা হয়। কিংবদন্তি গল্পকার এল. স্প্রাগ ডে ক্যাম্প ১৯৬৭ সালে একটি বইয়ের ‘ভূমিকা’-য় এই ধারা নিয়ে বেশ কিছু কথা লিখেছিলেন। এর চেয়ে ভালোভাবে প্রথাগত হিরোইক ফ্যান্টাসি নিয়ে কিছু বলা যায় না বলে সেই কথাগুলোই তুলে দিলাম~

“ফ্যান্টাসির একটি বিশেষ ধারা হল ‘সোর্ড অ্যান্ড সরসারি’— যাকে আমি ‘হিরোইক ফ্যান্টাসি’ নামে ডাকি। এতে একটি কাল্পনিক, বা প্রায় পুরোপুরি কাল্পনিক দুনিয়ায় অ্যাকশন আর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলা হয়। এই দুনিয়ায় যাদু জিনিসটা কাজ করে; অথচ আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বলতে যা বুঝি তা এই জগতে অনাবিষ্কৃত। ফলে একে আমাদের চেনা পৃথিবীর অত্যন্ত প্রাচীন বা সুদূর ভবিষ্যতের কোনো রূপ বলে ভাবা যায়। অন্য কোনো মাত্রায় বা সমান্তরাল মহাবিশ্বের কোথাও এটি ঘটছে— এমনও ভাবা যায়।

এমন কাহিনিতে ঐতিহাসিক রোমাঞ্চ বা ‘পিরিয়ড পিস’-এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় অলৌকিক আতঙ্ক। যদি ভালোভাবে জিনিসটাকে দাঁড় করানো যায়, তাহলে এর চেয়ে আনন্দদায়ক লেখা কমই হয়। এ-সব পড়তে গেলেই চেনাজানা জগত থেকে পালিয়ে ‘অন্য কোথা’ চলে যাওয়া যায়— যেখানে সব পুরুষ শক্তিশালী, প্রত্যেক নারী সুন্দরী, জীবন মানেই একটা অ্যাডভেঞ্চার, যেকোনো সমস্যার সমাধান হয় সরল উপায়ে, আর যেখানে ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে কেউ একটা কথাও বলে না।”

তবে এও সত্যি যে বিনোদনের আড়ালে গতানুগতিক কাহিনি বলার ধারাটিকে মোটামুটি তখন থেকেই ভাঙা হচ্ছিল। তাই ‘হিরোইক ফ্যান্টাসি’-র ছকেও আমরা পাচ্ছিলাম ধূসর চরিত্রদের। এমন সব সমস্যা দেখা দিচ্ছিল সেই অ্যাডভেঞ্চারে— যাদের স্রেফ তলোয়ার বা জাদুর সাহায্যে সমাধান করা যায় না। সবচেয়ে বড়ো কথা, গোটা উপন্যাসেই ভালো আর মন্দ, আলো আর কালো— এমন আপাত বৈপরীত্যের সমন্বয় ঘটছিল নানা স্তরে। তারই সঙ্গে বদলে যাচ্ছিল চরিত্রদের গড়ন। নারী, শ্রেণি ও বর্ণের বিচারে ‘দুর্বল’ বা ‘অপাংক্তেয়’ হিসেবে গণ্য সম্প্রদায়, এমনকি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা এমন কাহিনিতে দেখা দিচ্ছিলেন

সচেতন, সক্ষম, ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ামক-রূপে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, বাংলায় ফ্যান্টাসি আর রূপকথার প্রভেদটা দীর্ঘদিন ধরে, হয়তো সচেতনভাবেই, গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল। এ-কথা সত্যি যে মহাকাব্য ও মিথের গড়ন অনুসরণ করেই পাশ্চাত্য ফ্যান্টাসির ধারাটি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বাংলায় রূপকথা বলে যে বিশেষ ধারাটি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে প্রভাব-বিস্তার করেছিল, সেটির সঙ্গে মহাকাব্য বা মিথের সম্পর্ক ছিল অতি ক্ষীণ। বরং লোকাযত নানা কাহিনিকে শাসক শ্রেণির সুবিধামাফিক নীতিকথার মোড়কে পেশ করার যে একদেশদর্শী ধারাটি বরাবর রাজন্যতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে, সেটিই নতুন করে জাঁকিয়ে বসেছিল বাংলা ও বাঙালির মনে। সত্যিকারের লোকাযত কাহিনি— যা নারীমনের সন্ধান দেয় এবং জাতি ও শ্রেণির সীমা অতিক্রম করে জীবনের কথা বলে— সেই ‘ইতিহাসমালা’ উপেক্ষিত হয়েছিল। তার পরিবর্তে রেভারেন্ড লালবিহারী দে থেকে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার— এমন মহারথী সংগ্রাহকদের হাত ঘুরে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছিল ভিক্টোরীয় মানসিকতায় ক্লিষ্ট, ভয়ানকভাবে নারীদ্বেষী, পশুঘাতক এবং রাজা-সাজার খোয়াবে পূর্ণ বেশ কিছু কিসসা। কায়েমি স্বার্থ দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই ধারাটিকেই ‘খাঁটি বাংলা’ লোককাহিনি হিসেবে চালিয়েছিল এবং এখনও চালানোর চেষ্টা করে। লীলা মজুমদার, নবনীতা দেবসেন, দীপান্বিতা রায় প্রমুখের মাধ্যমে এই ধারাতেও বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের রোমহর্ষক কাঠামোতে চরিত্রের উত্তরণ তথা ক্যাম্পবেলীয় ‘হিরো’জ জার্নি’ বাংলায় ছিল স্রেফ কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এ!

তারপর এল হ্যারি পটার। ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ নামক পিটুলিগোলার বদলে ফ্যান্টাসি-র খাঁটি দুধের সন্ধান পেল বাঙালি! খুব অল্প করে হলেও দক্ষ গল্পকারেরা নির্মাণ করতে চাইলেন এক জাদু-শাসিত দুনিয়াকে— যেখানে ধূসর চরিত্র এবং ষড়রিপুর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ক’টি চরিত্র এগিয়ে যায় কালো থেকে আলোর উদ্দেশে।

সেই ধারাতেই এর আগে লেখা হয়েছিল প্রলয়যোদ্ধা।

এবার লেখক নিয়ে এলেন সেই আখ্যানের দ্বিতীয় অধ্যায়— প্রলয়বহ্নি।

তবে অভী’র পথ-চলা এখনও ফুরোয়নি। অনেক আগুন, অনেক অশ্রু, অনেক রক্ত পেরিয়ে তাকে যেতে হবে আরও অনেক দূর। সঙ্গে তো থাকবে আমরাও। তাই চলুন, দেরি না করে এবার এগিয়ে যাই।

ধন্যবাদ ও নমস্কারসহ,
ঝুঁ গাঙ্গুলী



॥ প্রথম অধ্যায় ॥ রবিকাকা

অপরাজিতার ডানা ছড়িয়ে পড়েছে দু-দিকে; এখন আর ডানা ঝাপটাচ্ছে না সে; মাথা নীচু করে নেমে আসছে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে। তার পিঠে বসে অভী দেখতে পাচ্ছে নীচে শুধু সবুজ আর সবুজ। দ্রুত নামছে ওরা। যত নীচে নামছে, বৈকালির জঙ্গলের গাছগুলোর মাথা তত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অপরাজিতার ডানার পালকে, অভীর চুলের ফাঁক দিয়ে হুহু করে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা বাতাস। সকাল গড়িয়ে বেলা যাচ্ছে দুপুরের দিকে; গাছের মাথাগুলো রোদে ঝলমল করছে। এই উঁচু থেকে নেমে আসার সময় অসংখ্য গাছের সারি দেখে মনে হচ্ছে যেন সবুজের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে সে।

পূর্বদিকে নদীটাকে দেখা যাচ্ছে, নজরে পড়ছে ছোটো ছোটো বাড়িগুলো। ওই যে দেখা পাওয়া গেছে ডালপালা-ছড়ানো বুড়ো বটগাছটার। কে জানে, হয়তো বদমাশ রণিতের দলবল বসে আছে ওর ছায়ায়— বসে বসে গল্প করছে। এই এত উপর থেকে অবশ্য সেটা বোঝা অসম্ভব।

নিজেদের বাড়িটাও দেখতে পেল অভী, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার বুক দূরদূর করতে লাগল। ওই লোকটা কে, যে রবিকাকাকে বেঁধে ভয় দেখাচ্ছিল?

একটু আগে পর্বতের আনা স্বপ্ন-উপলে এই অজ্ঞাতপরিচয় লোকটার গলা শুনেছে সে। কী ঠান্ডা একটা খুণীর মতো সে কণ্ঠস্বর— শুনলে ভয়ে ভেতরটা যেন শুকিয়ে যেতে চায়। লোকটা চাইছিল তার সঙ্গে দেখা করতে।

“সাত দিন সময়। হয় অভী, নয়তো তোমার মাথা— যে-কোনো একটা আমরা নেবই। আমাদের থামাতে পারে, এমন কোনো শক্তি দুনিয়ায় নেই।”

রবিকাকাকে বন্দি করেছিল যে, তার বলা কথাগুলো মনে পড়তেই ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল অভী। লোকটা যদি ইতিমধ্যেই রবিকাকাকে মারধোর করে থাকে? বা, আরও খারাপ, যদি সে রবিকাকাকে...!

নাঃ, এরকম উলটোপালটা কথা সে ভাববে না। কিছু হয়নি কাকার। সাত দিন সময় দিয়েছিল তো লোকটা। সেই সময় পূর্ণ হওয়ার আগে নিশ্চয়ই কিছু করবে না ও। নয়তো হুমকি দিয়ে সময় বেঁধে দেওয়ার মানে কী?

অপরাজিতা নেমে আসছে তাদের বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গাটায়। এইখান থেকেই গতবার মেঘবর্ণের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে গিয়েছিল সে রবিকাকাকে রেখে।

অপরাজিতার ডানার ঝাপটে কাছের গাছগুলোর ডাল কাঁপছে, ঝরে পড়ছে পাতা। অভী সাবধানে নেমে এল মাটিতে। তারপর তাকাল ঘরের দরজাটার দিকে।

দরজা প্রত্যাশামতোই খোলা। রবিকাকা দিনের বেলা দরজা খুলেই রাখত। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্যরকম। আজ ভেতরে ঢুকে কে বা কারা তাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে হুমকি দিয়ে গেছে। রবিকাকা তো বেশ ভালো লড়াই করতে পারত। সে যখন বন্দি হয়েছে, তাহলে বলতে হবে, শত্রু নেহাত হেলাফেলার নয়।

অভী ভাবল, অবশ্য রবিকাকার সম্বল বলতে তো ওই একটি বাঁশের লাঠি। শত্রুর কাছে তরবারি বা তির-ধনুক থাকলে ওই লাঠি দিয়ে আর কতক্ষণই বা লড়া যায়?

কোমরে তার ঝুলছে সমরোত্তম মেঘবর্ণের দেওয়া ময়ূরবজ্র তরবারি। কোষ থেকে অস্ত্রটা বার করে হাতে নিল অভী। বলা যায় না— শত্রু যদি এখনও ভেতরে থাকে?

এদিক-ওদিকে দৃষ্টি হেনে সে দেখতে চেষ্টা করল কাছেপিঠে কেউ আছে কিনা। নেই বলেই তো মনে হচ্ছে। বহু দূরে মাঠের ওপারে সেই বটগাছটা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু রণিতদের দলের কেউ সম্ভবত ওখানে নেই— গাছতলাটা খালি।

ঘরের দরজাটা বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ঢুকবে কি ঢুকবে না, ভাবতে লাগল সে। এ ঘর তার কতদিনের পরিচিত। কিন্তু আজ খালি মনে হচ্ছে, ভেতরটাতে কেউ যেন আছে।

কে? কে থাকতে পারে? সেই ভয়ংকর লোকটা?

কত ভয়ংকর হতে পারে এই অদেখা শত্রু? শর্বরের থেকেও?

একবার কাকাকে চাঁচিয়ে ডাকবে ভেবেও নিজেকে সামলে নিল অভী। শত্রু যদি এখনও ভেতরে থাকে, তাহলে তাকে আগাম নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করে জানানোর কোনো দরকার নেই। অতর্কিতে ভেতরে ঢুকে পড়াই ভাল। যদি কেউ এখনও থাকে, তাকে চমকে দেওয়া যাবে।

তরবারি উঁচিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল সে। কই, কেউ নেই তো!

ঘরের ভেতরটা ফাঁকা। কিন্তু দেখে বোঝা যায়, কিছু একটা গুণগোল হয়ে গেছে এখানে। একটা চেয়ার উলটে পড়ে আছে মেঝেতে। বেশ কিছুটা দড়ি পড়ে আছে চেয়ারের পায়ের কাছে। একটু ঝুঁকে সেটা হাতে তুলে নিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখল অভী। না, কাটা নেই এর মধ্যে। তার মানে, রবিকাকা নিজেই সম্ভবত দড়িটা খুলে ফেলেছিল বদমাশগুলো চলে যাওয়ার পরে।

অভী এবার জোরে ডাকল, “রবিকাকা! রবিকাকা!”

কোনো উত্তর নেই। কাকা নেই এখানে।

অভী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যে লোকগুলো রবিকাকাকে বেঁধেছিল, তারাও কেউ নেই। গেল কোথায় সব?

ঘরের মধ্যে এটা ওটা নড়িয়ে সরিয়ে দেখছিল অভী। না, অস্বাভাবিক কিছু তো চোখে পড়ছে না।

হঠাৎ বিছানার পাশে একটা পাশবালিশের মতো জিনিস পড়ে থাকতে দেখে অভীর দৃষ্টি আপনা থেকেই স্থির হয়ে গেল।

খাটের এক কোণে চাদরে ঢাকা ওই লম্বা পাশবালিশটা একবার যেন নড়ে উঠল না?

আস্তে আস্তে সেইদিকে এগিয়ে গেল অভী, হাতে তার উদ্যত তরবারি। শত্রু যদি এখানে এসে লুকিয়ে থাকে, তাহলে তার আজ আর রক্ষা নেই।

বেশ কিছুক্ষণ জিনিসটাকে খুঁটিয়ে দেখল সে। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই— এই চাদরের আড়ালে কেউ একটা লুকিয়ে আছেই। শ্বাসের সঙ্গে খুব মৃদু নড়ছে জিনিসটা, খেয়াল করে দেখলে বোঝা যাচ্ছে।

ব্যাপারটা কী? আর শত্রুপক্ষের কেউ তার ঘরে ঢুকে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করতে যাবেই বা কেন? তাও এমন আনাড়ির মতো?

অস্ত্রটা বাড়িয়ে আলতো করে খোঁচা দিল অভী চাদরজড়ানো জিনিসটার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ওই চাদরের স্তূপে তুফান উঠল। “মেরোনা, মেরোনা” বলতে বলতে যে বেরিয়ে এল পাশবালিশের ব্যর্থ ছদ্মবেশ ভেদ করে, তাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য অভী অবাক হয়ে গেল।

রণিত!

চাদরের বন্ধন থেকে কোনোরকমে বেরিয়ে এসে রণিত হাউমাউ করে উঠল, “ওঃ অভী, তুমি এসেছ! আমি কিছু করিনি, আমি কিছু জানি না! আমাকে মেরো না!”

অভীর মনে পড়ল, এই রণিত-ই এই কিছুদিন আগেই তাদের কেমন অকারণে মারধোর করতে চেয়েছিল। কিন্তু বেচারার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে আর পুরোনো রাগ পুষে রাখতে পারল না সে।

তবুও তরবারিটা ওর মুখের উপর থেকে না সরিয়েই সে একটু কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, “তুমি এখানে কী করছ?”

এতদিন তার সঙ্গে তুই-তোকাকারি ছাড়া কথা বলত না রণিত, কিন্তু আজ অভীর হাতে খোলা তরবারি দেখে সে কেঁচো হয়ে গেছে। “বলছি, বলছি। তুমি অস্ত্রটা একটু সরেও আগে।”

অভী এক পা পিছিয়ে গিয়ে তরবারিটা একটু সরিয়ে নিল। রণিত ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল। অভী বলল, “এবার বলো তো, কী করছিলে তুমি এখানে? রবিকাকা কোথায়? কারা এসেছিল এখানে?”

রণিত বলল, “ওরা কারা, আমি জানি না। কিন্তু ওরা যে খুব ভয়ংকর লোক ছিল, সে কথা ওদের একবার দেখলেই আর বলে দিতে হয় না।”

অভী বুঝতে পারল, রণিতের গলা শুকিয়ে গেছে। ঘরের যে কোণে কুঁজোটা রাখা থাকত, সেদিকে তাকাল সে; বলল, “চাইলে জল খেতে পারো। ওখানে আছে।”

রণিত গিয়ে বেশ কিছুটা জল খেল; তারপর বলল, “অভী, ওরা আমার কাছে তোমার নাম করে তোমার বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইছিল। আমি বসে ছিলাম ওই বুড়ো বটতলায়। হঠাৎ দেখি কী, জন চারেক লম্বা-চওড়া লোক নেমে এল বিকট দেখতে দুটো বিশাল শকুনের পিঠে চেপে। আমি তো চমকে টমকে একাকার।”

“তারপর?” অভীর ভ্রু কুঁচকে গেল।

“তোমার বাড়ি যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিতে লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গে সেইদিকে চলে গেল। তারপর আমি ভাবলাম, এই অদ্ভুত দেখতে লোকগুলো তোমার বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইছে কেন। লোকগুলোর ভাবসাবও ভালো ঠেকছিল না মোটেই।”

“কিন্তু তুমি এখানে এলে কী করে?”

“বলছি। ওরা চলে যাওয়ার পর আমার মনটা খচখচ করছিল। কৌতূহলও হচ্ছিল খুব। আমিও তাই চুপিচুপি ওদের পেছনে পেছনে এসে পড়লাম এখানে। এই জানালার বাইরে ওই আমগাছটা দেখতে পাচ্ছ?”

অভী তাকাল জানালা দিয়ে। এই আমগাছটা সে বহুকাল ধরেই দেখে আসছে। ডালপালা মেলে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে সকালের রোদে।

রণিত কী বলতে চাইছে, বুঝে ফেলল সে। “ওই গাছে উঠে লুকিয়ে ছিলে তুমি? তাহলে তো ঘরের ভেতরে কী ঘটছে না ঘটছে, সবই চোখে পড়েছে তোমার?”

রণিত মাথা নাড়ল। “তা পড়েছে। আমি যখন এলাম, ততক্ষণে ওরা তোমার কাকাকে একটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে।”

অভী বলল, “তারপর?”

রণিত বলল, “ওরা যে কথাগুলো বলছিল, আমি তার সবগুলো ভালো করে শুনতে পাইনি। কিন্তু দেখলাম, ওরা একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাচ্ছে তাকে। একটা নেতাগোছের লোক ছিল, তার মুখটা ঢাকা ছিল একটা সাদা মুখোশে – তার হাতের তালুর মধ্যে ওই জিনিসটা ছিল, অভী। একটা জ্বলজ্বলে বেগুনি পাথর।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “সে আবার কী? হাতের তালুর মধ্যে মানে? হাতে ধরে ছিল সে জিনিসটা?”

রণিত মাথা নেড়ে বলল, “না না। তার হাতটা সে মেলে ধরেছিল তোমার রবিকাকার সামনে। আমি গাছে লুকিয়ে থেকে স্পষ্ট দেখেছি। দেখলাম কী, ওর হাতের তালুর মধ্যে ওই নীলচে বেগুনি রঙের পাথরটা এই দিনের বেলাতেও কেমন জ্বলজ্বল করছে। দেখলে মনে হবে, ওর হাতের ভেতর থেকে পাথরটা উঠে এসেছে চামড়ার উপর। সে কী অদ্ভুত দৃশ্য, না দেখলে বুঝতে পারবে না তুমি।”

অভী ভাবতে লাগল, জিনিসটা কী হতে পারে। পাথরটা আর যাই হোক, স্বপ্ন-উপল নয়, সে নিশ্চিত। রণিত-ও যে বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছে না, বুঝতে পারছে সে। এতখানি কল্পনাশক্তি তার নেই, অভী জানে ভালো করেই।

রণিত বলল, “আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। সাদা মুখোশ পরা লোকটার হাতের ওই জিনিসটার মধ্যে বিদ্যুতের মতো সাদাটে আলো ঝিলিক দিচ্ছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর সেই দেখে তোমার কাকা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল, সেটাও দেখেছি। মনে হল, তোমার কাকা জানে ওটা আসলে কী জিনিস।”

অভীর মনে পড়ল, রবিকাকা বলত, অনেক অদ্ভুত পুরোনো কথা তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। এই পাথরটাও কি তাহলে সেরকম কোনো জিনিস? মেঘবর্ণও তো বলেছিল, তার কাকার পুরোনো ঘটনা সব কিছু মনে নেই। এর সঙ্গে কি তাহলে রবিকাকার ভুলে যাওয়া অতীতের কোনো যোগাযোগ আছে? তাই কি সে জিনিসটা দেখে ভয় পেয়েছিল?

ব্যাপারটা রীতিমতো গোলমালে ঠেকছে। অভী খুব ভালো করেই জানে, সহজে ভয় পাওয়ার মতো লোক রবিকাকা কোনোদিন ছিল না।

অভী বলল, “ওদের কথাবার্তা কিছু শুনতে পেয়েছিলে?”

রণিত বলল, “ওরা তোমাকে খুঁজছিল, এইটুকু বুঝতে পেরেছিলাম। রবিকাকা বারবার বলছিল, ‘আমরা খুব সাধারণ লোক; আমার এক ভাই মারা গেছে, অভী তার ছেলে; আমাদের ছেড়ে দিন।’ তখন ওই সাদা মুখোশ পরা লোকটা— ও-ই সম্ভবত ওদের নেতা হবে— বলছিল, “তুমি আসলে কে, আমরা ভালোই জানি, রবি। তুমি একটি দারুণ প্রতিভাবান লোক।”

অভীর মনে পড়ল, পর্বতের দেওয়া স্বপ্ন-উপলে সে এই কথাগুলোই বলতে শুনেছিল সেই নির্মম, শীতল কণ্ঠস্বরটাকে। সেই গলার আওয়াজ মনে পড়তেই নিজেরই অজান্তে একবার বুক কেঁপে উঠল তার।

রণিত আবার বলল, “ওরা বলে গেল, কোনো মানুষ বা রাক্ষসের ক্ষমতা হবে না ওদের থামানোর। ... অভী, মানুষ তো বুঝলাম; ওরা রাক্ষসের কথা বলল কেন? রাক্ষস বলতে কী বোঝাতে চাইল ওরা?”

অভী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “সে আর তোমার শুনে কাজ নেই। তারপর কী হল, বলো।”

রণিত বলল, “আর একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল ওই সাদা মুখোশ পরা লোকটা। হাতের সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল মণিটা রবিকাকার মুখের সামনে নাচিয়ে ও বলছিল, ‘অভীকে যদি আমরা না পাই, সবকটা মানুষকে নরকবিষে পুড়িয়ে মারব।’ এই ‘নরকবিষ’টাই বা কী জিনিস, অভী? আর কোন্ মানুষদের পুড়িয়ে মারার কথা বলছে ওরা? তোমার রবিকাকা ভয়ানক চমকে উঠেছিল ওই বিষটার নাম শুনে।”

অভী নিজেও জানে না ‘নরকবিষ’ কী জিনিস। তবে কাদের পুড়িয়ে মারার কথা বলা হচ্ছিল, সে আন্দাজ করতে পারছে। এ লোকগুলো সম্ভবত মাল্যপর্বতের রাক্ষস, সম্ভবত বিমোহক রাক্ষস। মানুষদের চরম শত্রু মনে করে এরা।

রণিত চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, “ওই লোকটা ঠান্ডা গলায় বলল, ‘অভীকে যদি সাতদিনের মধ্যে আমরা হাতে না পাই, তাহলে তৈরি থেকে মৃত্যুর জন্য। আর নরকবিষে পুড়ে সে মৃত্যু যে কী ভয়াবহ হবে, তা তুমি বুঝতে পারছ, আশা করি।’ তারপর বিরাট সব শকুনের পিঠে চেপে ওরা হুশ করে আকাশে উঠে কোথায় চলে গেল। আর তারপরেই দেখলাম, তোমার রবিকাকাও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তাকে তো ওরা চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু কী করে যে সে ওই বাঁধন খুলল, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।”

অভী দ্রুত ভাবছিল। রবিকাকা নেই। যে দড়িটা দিয়ে ওরা তাকে বেঁধেছিল, সেটা পড়ে আছে মাটিতে। গেল কোথায় মানুষটা?

সে বলল, “তারপর কী হল?”

রণিত মাথা নীচু করে বলল, “তারপর রবিকাকা ওই আমগাছের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘রণিত, এক্ষুনি ভেতরে এসো।’”

অভী চমকে উঠল। “আঁ?”

রণিত বলল, “হঁ। আমিও চমকে গিয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারলাম, তোমার কাকা জানত আমি এই গাছে উঠে সব দেখছি, কিন্তু একবারও ওই লোকগুলোকে বুঝতে দেয়নি যে সে আমার কথা জানতে পেরে গেছে— একবারও এদিকে তাকায়নি পর্যন্ত। ওরা যদি জানতে পারত, আমাকে ওখানেই কেটে রেখে দিয়ে যেত। তোমার কাকা কিন্তু খুব সাংঘাতিক লোক, অভী।”

অভীও এখন বুঝতে পারছে, রবিকাকা বড়ো সাধারণ মানুষ ছিল না। তার মনে পড়ছে, প্রত্যেক সমরোত্তম তাকে এর আগে তার কাকার কথা কখনও না কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন। কাকাকে বোধহয় ওঁরা ভালোভাবেই চিনতেন। সে জানতে চাইল, “তারপর?”

“তারপর আমি গাছ থেকে নেমে ভেতরে এলাম। ততক্ষণে দেখি, তোমার কাকা একটা কাগজে কীসব লিখেছে। আমাকে দেখে ওটাকে পকেটে গুঁজে নিয়ে সে বলল, ‘রণিত, ওরা অভীকে খবর পাঠাবে, আমি জানি। আর আমার কিছু হয়েছে শুনলে অভীও না এসে পারবে না। তুমি একটু এখানে থাকো, অভী আসছে। ও এলে ওকে শুধু এইটা দিয়ে দিয়ো। যারা এসেছিল, তারা যে খুব একটা সুবিধের লোক নয়, বুঝতেই পেরেছ নিশ্চয়। তোমাকে হাতে পেলে ওরা ছেড়ে দিত না— ওরা কোনো সাক্ষী রাখে না কখনও। এইটুকু উপকার আমাদের করো, তাতে সবারই মঙ্গল হবে।’ – এই বলে তোমার কাকা এই ছোট চিরকুটটা লিখে আমার হাতে ধরিয়ে দিল। ... ইয়ে, অভী, কিছু মনে কোরো না, আমিও পড়েছি লেখাটা।”

তার বাড়িয়ে দেওয়া কাগজের টুকরোটা চোখের সামনে মেলে ধরল অভী। রবিকাকা লিখেছে ভীষণ দ্রুত; লেখার মধ্যে জড়িয়ে গেছে একটার সঙ্গে আরেকটা অক্ষর।

“অভী, আমার বাঁশের লাঠিটা নিয়ে মারীচের কাছে যা। তারপর ওখান থেকে জিনিসটা নিয়ে চলে যাবি সোজা আয়তনে। একটুও দেরি না করে যা বললাম, কর। নয়তো ভয়ংকর বিপদ হয়ে যাবে।”

লাঠিটা পড়ে ছিল ঘরের এক কোণে। অভী গিয়ে সেটা কুড়িয়ে এনে ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে দেখল। না, ওটার মধ্যে নজরে পড়ার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বলে তো মনে হল না তার। লাঠির গায়ে গোপন লিপিতে কিছু লেখাটেখা নেই। একটু মাটিতে ঠুকে অভী দেখতে চাইল, ভেতরে এর কোনো ধাতব অস্ত্র-টন্ত্র লুকানো আছে কি না। নাঃ, সেরকম কিছুও নেই।

তাহলে এটাকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কী আছে?

তবে এইটুকু অন্তত বোঝা যাচ্ছে, পর্বতকে স্বপ্ন-উপলটা পাঠিয়েছিল এই খুনে লোকগুলোই। অভীর কাছে বার্তাটা পৌঁছে দিতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু ওরা কারা? কীই বা চায় ওরা?

রণিত বলল, “আমি এখানে তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় দেখি আকাশ থেকে আরেকটা বিরাট শকুন নেমে আসছে। আমি ভাবলাম, ওরাই আবার ফিরে আসছে বুঝি। তাই তাড়াতাড়ি এসে এখানে লুকিয়ে ছিলাম। ওটাতে যে তুমি আসছ, আমি বুঝতে পারিনি। ...কিন্তু অভী, এসব কী হচ্ছে?”

অভী একটু চুপ করে রইল; তারপর বলল, “রণিত, বাড়ি যাও। এখানে যা দেখলে, সেসব কথা কারও কাছে বোলো না।”

রণিত তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। অভী বলল, “তুমি আজ আমাদের অনেক উপকার করেছ। সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এখানে আজ যা কিছু হয়েছে, সে বিষয়ে আমি তোমাকে কিছু বলতে পারব না। তুমি বাড়ি যাও; মুখ বন্ধ রাখো। যারা আজ এসেছিল, তারা কোনো সাক্ষী রাখে না, এটা মনে রেখো। তাই তুমি যে আজ এখানে ওদেরকে দেখেছ, এ কথা প্রকাশ না পেলেই তোমার ভালো। বুঝতে পেরেছ?”

মাথা নাড়ল রণিত; তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

অভী কিছুক্ষণ ভাবল। রবিকাকার ফেরার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। সে ঠিক করে নিল, রবিকাকা তাকে মারীচের কাছে যেতে বলেছে; তার কাছেই যাবে সে। চিঠিটা নিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াল অভী। যাওয়ার আগে তার তরবারিটা রেখে গেল বিছানার তলায় লুকিয়ে। এই এতটা রাস্তা গ্রামের পথে যেতে হবে তাকে; মারীচের দোকানেও লোকজনের ভিড় থাকা অসম্ভব নয়। এত বড়ো অস্ত্রটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

এ তো আর সমরগরিমা নয়।

সকাল ফুরিয়ে বেলা যাচ্ছে দুপুরের দিকে। রোদের তেজটা বেশ বেড়েছে। কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। বৈকালির জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গতবার সে যখন মারীচের দোকানে গিয়েছিল, তখন ছিল রাত্রিবেলা, সঙ্গে ছিল খাঁচায় ভরা স্বর্ণখেচর, পাশে ছিল রবিকাকা নিজে। এবার নিতান্ত খালি হাতে যেতে তার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। অবশ্য পুরোপুরি ‘খালি হাত’ বলা যায় না; তার হাতে আছে রবিকাকার পুরোনো বাঁশের লাঠিটা। জামার হাতায় মুখের ঘাম মুছে নিল অভী।

আরও অনেকটা হাঁটতে হবে জংলা পথে— সেই পাহাড়টা পর্যন্ত। একটু জল পেলে ভালো হত। অভী বুঝতে পারছিল, উত্তেজনায় তার গলা শুকিয়ে আসছে।

কে ওই মুখোশপরা লোকটা? তার হাতে ওই মণিটা দেখে রবিকাকা ভয় পেয়ে গিয়েছিল কেন? আর এখন সে পালিয়ে গেলই বা কোথায়?

পালিয়েছে তো নিশ্চিত; নয়তো এভাবে হঠাৎ সব কিছু ছেড়েছুড়ে মানুষ উধাও হয় কেন? কিন্তু সে যতদূর মানুষটাকে চিনেছে, তাতে সে ভালই জানে, সামান্য কিছুতে ভয় পেয়ে পালানোর পাত্র রবিকাকা নয়। তাহলে?

ওই যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের তলায় মারীচের ছোটো পাথরের বাড়িটা। আরেকটু এগোতে বোঝা গেল, দরজা বন্ধ থাকলেও জানালা খোলা আছে। সেই জানালায় কে একজন দাঁড়িয়েও আছে। আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আরও জনা দুই তিন লোক।

অভী এগিয়ে গেল। মারীচ ছিল জানালার ভেতরে। বাইরের লোকগুলো খদ্দের। মারীচ তার দোকানটাতে নুন, তেল, চিনি, চাল, ডাল এইসব বিক্রি করলেও ভেতরে ভেতরে সে যোগাযোগ রেখে চলে রান্ধসদের সঙ্গে, আর গুপ্তচরগিরি করে সমরগরিমা আয়তনের হয়ে— বিশেষ করে সমরোত্তম মেঘবর্ণের হয়ে— এটা অভী জানত। এই মারীচের কাছেই রবিকাকা ওকে গতবার নিয়ে এসেছিল স্বর্ণখেচরের পালক বিক্রি করতে— এই তো মাত্র ক’দিন আগেকার ঘটনা।

কিছু না বলে বাকি খদ্দেরদের সঙ্গে ভিড়ে সে এসে দাঁড়াল দোকানের জানালায়। গ্রাম্য ভূষিমালা দোকানের একটা বিশেষ গন্ধ থাকে— সেই গন্ধটা এখানে দাঁড়াতেই নাকে এল অভীর। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মারীচের চোখ পড়ল তার উপর। চোখদুটো তার বিস্ফারিত হয়ে উঠল এক পলকের জন্য, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে; মুখটা আবার নির্বিকার হয়ে গেল, যেন কিছুই হয়নি। শান্তভাবে সে অভীর পাশের লোকটাকে বলল, “এই নাও ভাই পাঁচশো আটা। পয়সাটা দাও।”

অভী অপেক্ষা করতে লাগল। এতগুলো বাইরের লোকের সামনে মারীচ কিছুটা বলবে না, সে বুঝতে পেরেছে। বলা যায় না, এদের মধ্যে রান্ধসদের কোনো চর থাকতে পারে।

লোকগুলোকে বিদায় করে মারীচ নিচুগলায় বলল, “দরজা খুলে দিচ্ছি। চট করে ভেতরে ঢোকো আগে।”

জানালা থেকে সরে গিয়ে মারীচ দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করতেই অভী ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। গতবার যেমন দেখেছিল, তেমনই দোকানঘরের একপাশে জড়ো করা আছে বস্তাভর্তি মালপত্র। মারীচ ওকে ইশারা করল পাশের ঘরটাতে আসবার জন্য।

অভী এসে বসল পাশের ঘরে— সেই বিশাল টেবিল, দেয়ালে পটের ছবি, ঝোলানো ঢাল-তলোয়ার। এই ঘরেই গতবার ভয়ংকর রান্ধস বৈদ্যুর-র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল ওদের।

মারীচ এসে বসল ওর পাশে; বলল, “কী ব্যাপার, অভী? হঠাৎ এখানে? কাকা কই?”

অভী বলল, “কাকার খোঁজ নিতেই আসা।”

এখানে আসবার পর যা যা ঘটেছিল, অভী সংক্ষেপে বলে গেল। মারীচ চুপ করে সব শুনল। বাঁশের লাঠিটা নিয়ে এখানে আসবার নির্দেশ দিয়েছিল তাকে রবিকাকা, এই পর্যন্ত বলে অভী লাঠিটা মারীচের হাতে ধরিয়ে দিল। “এইবার তুমি আমাকে বলো, এসব কী হচ্ছে।”

শুনতে শুনতে মারীচের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সে বলল, “অভী, তোমার রবিকাকা যে খুব সাধারণ কোনো মানুষ ছিল না, আশা করি এতদিনে বুঝতে পেরেছ। সে যে আসলে কী ছিল, আমিও জানি না। হতে পারে, হয়তো সে ছদ্মবেশী রাক্ষস ছিল, বা অন্য কোনো শক্তিশালী মায়াধর। তার মতো লড়াই করতে আমি আজ পর্যন্ত কাউকে দেখিনি – এক ওই সমরোত্তম মেঘবর্ণ ছাড়া। কিন্তু মানুষটা নিজের এই প্রতিভাগুলোকে খুব সাবধানে ঢেকে রাখত। আমাকে দু-দিন আগেই বলেছিল, সমরগরিমা আয়তনের নামটা নাকি তার চেনা চেনা লাগে, কিন্তু সব কথা মনে পড়ে না।”

অভী বলল, “কিন্তু তাহলে এখন সে কোথায় গেল? তোমার কাছে লাঠিটা নিয়ে আসতে বলে গেলই বা কেন আমাকে?”

মারীচ বলল, “প্রথমটা জানি না, কিন্তু তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। প্রকাশমায়া জানো?”

অভী মাথা নেড়ে ‘না’ বলল।

মারীচ বলল, “জানো না? ‘প্রকাশমায়া’ একটা ছোট রাক্ষসমায়া – খুব কঠিন কিছু নয়, কিন্তু খুব কাজের। লুকানো কোনো জিনিসকে খুঁজে বার করতে সাহায্য করে। রাক্ষসমায়া হলেও এটা প্রয়োগ করা মানুষদের পক্ষেও কঠিন নয়। তোমার কাকা কিছুদিন আগে আমাকে বলে রেখেছিল, ‘আমি যদি হঠাৎ একদিন হাওয়া হয়ে যাই তাহলে এটার মধ্যে ওর জন্য কয়েকটা কথা লিখে রেখে যাব। তুমি ওকে সেটা বার করে দিও।’

একটা মন্ত্র বিড়বিড় করে বলতে বলতে বাঁশের লাঠিটার গায়ে হাত বুলানো শুরু করল মারীচ। অভী হাঁ করে দেখতে লাগল।

কাজ করতে করতেই মারীচ আবার বলল, “অভী, তুমি সমরগরিমায় কী কাণ্ড করেছ, আমাদের কানেও পৌঁছে গেছে। স্বয়ং ঐশিকশ্রেষ্ঠকে পরাস্ত করা— কী সমরগরিমায়, কী মাল্যপর্বতে— এ ঘটনা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।”

তার চোখের প্রশংসার দৃষ্টি দেখে অভী একটু লজ্জা পেল। সে বলল, “না না, আমি বিশেষ কিছুই করিনি। সব কেমন কোথা দিয়ে হয়ে গেল।”

মারীচ হাত বুলিয়ে চলেছে লাঠিটার গায়ে— খুঁজছে ওটার মধ্যে কিছু লুকানো আছে কিনা। পাকা বাঁশের লাঠির গা সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। লাঠির উপর মায়া প্রয়োগ করতে করতেই সে বলল, “অভী, আমি একজন রাক্ষস হয়েই বলছি, তুমি মানুষ-রাক্ষস-অর্ধরাক্ষসের মধ্যে যে সেতুবন্ধনের কাজটা নিজের অজান্তেই করেছ, তার জন্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।”

অভী বলল, “ধ্যাৎ, কীসব বলছ?”

মারীচ বলল, “বিশেষ করে অর্ধরাক্ষসরা। ওই জাতটাকে কেউ কোনোদিন মন থেকে ভালোবাসেনি। সবাই কাজের সময় ওদের ব্যবহার করেছে, আর

তারপর ঘেন্না করেছে। তোমার মতো বন্ধু ওদের দরকার – আমাদের সবার দরকার।”

অভীর ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য সে বলল, “একটু আগে তোমাকে যে লোকটার কথা বললাম – রবিকাকাকে বন্দি করেছিল যে মুখোশপরা লোকটা – তার হাতের তালুর মধ্যে যে মণিটা জ্বলজ্বল করছিল, সেটা কী, তোমার কোনো ধারণা আছে?”

মারীচ বলল, “আছে। শুনেই বুঝেছি জিনিসটা কী। আর লোকটা যে আসলে কে, সেটাও আন্দাজ করতে পারছি।”

অভী উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল। “লোকটা কে, বুঝতে পেরে গেছ? বলো, বলো।”

মারীচ বলল, “মুখে সাদা মুখোশ আর বেগুনি রঙের পাথর হাতের মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল তো? ওরকম মানুষ আমার জানা একজনই আছে। তার নাম ‘শেষমুখ’।”

“অদ্ভুত নাম তো!”

“ওটা তার আসল নাম নয়। তার আসল নাম যে কী, কেউ জানে না। লোকে বলে, সে যদি মুখোশ খোলে, তাহলে সামনের মানুষটার শেষ দেখা দৃশ্য সেটাই হয়; তার মুখ একবার দেখলে আর কেউ বেঁচে থাকে না। তাকে ভয় পায় না, গোটা মাল্যপর্বতে এমন কেউ নেই। ওখানকার সবচেয়ে ভয়ংকর ভাড়াটে খুনি সে। তাকে কাজে লাগানো মানে বিরাট টাকাপয়সার খেলা আছে এর পেছনে। আমি ভাবছি, তোমাদের পেছনে ওই সাংঘাতিক লোকটাকে কে লাগাল। তোমাদের দু’জনকেই সরিয়ে দিলে কার সুবিধা হবে?”

অভীও বুঝে উঠতে পারছে না এই রকম একজন পেশাদার খুনি রাক্ষসকে তার জীবন নেওয়ার জন্য লাগিয়ে কার কী লাভ হবে? ঐশিকশ্রেষ্ঠ তো মারা গেছেন। আর কে আছে, যে তার ক্ষতি চাইতে পারে?

সে বলল, “ওই উজ্জ্বল পাথরটা কী জিনিস, মারীচ?”

মারীচ সভয়ে বলল, “ও বাবা! ওর নাম বজ্রমানিক। এই পৃথিবীতে ওর চেয়ে ভয়ংকর জিনিস আর একটিও নেই। রাক্ষসদের কেউ কেউ জন্মের সময়েই নানা রকমের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। বজ্রমানিক নিয়ে জন্মানো বাচ্চারা সাধারণত বাঁচে না— ওই মণির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা এত বেশি যে ওটা নিয়ে জন্মানো রাক্ষসশিশুরা দু-তিন দিনের মধ্যেই মারা যায়। লোকে বলে, এই শেষমুখ লোকটার এত ক্ষমতা হয়েছে ও নিজের শরীরের বজ্রমানিককে বশে আনতে পেরেছে বলেই।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “বজ্রমানিক জিনিসটা কী?”

মারীচ চোখ সরু করে বলল, “নরক থেকে তুমি ফিরে এসেছ— তুমি দেখে এসেছ ও বস্তু— তবে অন্য রূপে। আগুনের নদী দেখেছিলে না ওখানে?”

অভী মাথা নাড়ল। দেখেছে সে। যতদিন বাঁচবে, সে দৃশ্য ভুলবে না।

“ওই তরল আগুনের মায়াকঠিন রূপ হল বজ্রমানিক। মারাত্মক ক্ষমতামণ্ডলী মায়াজগতের মণি। তবে কী জানো অভী, ও মণি দিয়ে কারও ভালো হয় না। ও বড়ো অশুভ জিনিস – সবকিছুকে ধ্বংস করে দিতে চায়। তাই ওকে যে ধারণ

করে, তারও কখনও ভালো হয় না। ও হল নিয়তির অভিশাপ। সৌভাগ্যের বিষয়, ওই অভিশাপ নিয়ে খুব বেশি শিশু জন্মায় না, আর যারা জন্মায় তারা বেশিদিন বাঁচেনা। এই হতভাগাই কী করে যেন ব্যতিক্রম হয়ে গেছে।”

অভী বলল, “কিন্তু এই শেষমুখ লোকটা রবিকাকার পেছনে পড়ল কেন?”

মারীচ বলল, “সেটা আমিও বুঝতে পারছি না। লোকে বলে, শেষমুখ নাকি মাল্যপর্বতের কুখ্যাত ঘটোৎকচ বাহিনীতে একসময় যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিল। তবে সে কথা সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু রবির সঙ্গে...। আহা, এই যে এতক্ষণে পাওয়া গেছে।”

অভী দেখল, রবিকাকার বাঁশের লাঠিটার গায়ে একটা জায়গায় একটা গোপন খোপ খুলে গেছে মারীচের মায়াপ্রয়োগের ফলে। ভেতরে একটা ছোট চিরকুট রাখা আছে। সেটা বার করে এনে মারীচ তুলে দিল তার হাতে।

চিঠিটা পড়তে শুরু করল অভী। নিঃসন্দেহে রবিকাকারই হাতের লেখা। তবে দ্রুত লেখার জন্য এটারও লেখাগুলো বেশ জড়ানো।

অভী, আমাকে খোঁজার চেষ্টা করিস না। পুরোনো জীবনের অনেক কথা মনে পড়ছে আমার। জানি না, এর পেছনে নিয়তির উদ্দেশ্য কী, তবে এটুকু বুঝতে পারছি ওই সমরগরিমা আয়তনের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের একটা কোনো যোগ আছে। আর এই স্মৃতিভ্রংশ সারাতে পারে যে দুর্লভ মায়ামণি, তার নাম রক্তপদ্মরাগ। তোদের আয়তনে রক্ষোবৈদ্য নামে একজন আছেন না? ওঁকে জিজ্ঞাসা করিস; যতদূর মনে পড়ছে, উনি চিকিৎসাবিদ্যায় অসম্ভব দক্ষ একজন রাক্ষস ছিলেন। উনি বলতে পারবেন, এই মণিতে সারে না, হেন রোগ নেই। আর এ জিনিস যেখানে আছে, সেখানে আমি তোকে নিয়ে যেতে মোটেই চাই না। তার দুটো কারণ।

এক, জিনিসটা আছে মাল্যপর্বতে মহাসর্পিণীর গুহায়। সে অতি বিপজ্জনক জায়গা; ওখানে তোর মতো বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। আর দুই, শেষমুখের মতো মারাত্মক খুনে লোক আমাদের পেছনে লেগেছে; বিশেষত তোর পেছনে। আমি জানি না এর কারণ কী। কিছু অনুমান করতেও পারছি না। ওই রাক্ষসটা আবার জন্মগতভাবে বজ্রমানিকের নিয়ন্ত্রক—শরীরের মধ্যে ওই সর্বনেশে জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বদমাশটা। এই অবস্থায় তোকে আমি কোনোভাবেই মাল্যপর্বতে রাক্ষসদের আড্ডায় নিয়ে যেতে পারি না।

রণিত নামে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে পাশেই। ওর হাতেও একটা ছোটো চিঠি লিখে দিতে হবে, কিন্তু দিলে ও সেটা পড়বেই, আমি জানি। এতসব গোপন কথা ও জানুক, আমি চাই না। তাই এই চিঠিটা লুকিয়ে রেখে যাচ্ছি লাঠির মধ্যে; রণিত বুঝতে পারবে না। মারীচ এটা তোকে বার করে দিতে পারবে, জানি। আমার কথা শোন। এখান থেকে সোজা চলে যাবি তোর আয়তনে। আমার অধিনায়ক বজ্রধরকে মনে পড়েছে। কেউ যদি এ ব্যাপারে তোকে সাহায্য করতে পারে তো সে ব্যক্তি উনিই। ওঁকে বলবি ভয়ংকর নরকবিষের কথা। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমি জানি, উনি বুঝবেন, আর কেউ বুঝবে না। এসব কথা অন্য কাউকে একদম বলার দরকার নেই। একমাত্র বজ্রধরই পারবেন এ ব্যাপারে কিছু করতে।

আবার বলছি, আমাকে খোঁজার চেষ্টা একদম করবি না। আর হ্যাঁ, আমার বাঁশের এই লাঠিটা নিয়ে যাবি আয়তনে। ওখানে একটা বিরাট সংগ্রহশালা আছে না? রেখে দিবি ওখানে জিনিসটা। এটা সঙ্গে রাখছি না, কারণ খুব শক্তিশালী মায়াঅস্ত্র এই লাঠি— সঙ্গে থাকলে বড়োমাপের মায়াধর রাক্ষসরা সংকেত পেয়ে বুঝে যেতে পারে আমি কোথায় আছি।

চললাম। ভালো থাকবি, সাবধানে থাকবি।

রবিকাকা।

চিঠি পড়ে অভী বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইল। এসব কী? মহাসর্পিণীর গুহা? রক্তপদ্মরাগ মণি? নরকবিষ?

মারীচকে চিঠিটা দেখাতে গিয়েও খেমে গেল সে। রবিকাকা বলেছে, এসব কথা অন্য কাউকে না বলতে। কিন্তু অধিনায়ক বজ্রধর? তাঁকে আর কোথায় পাবে সে?

অন্য সমরোত্তমদের বলতে হবে বিষয়টা। কিন্তু এখন সে কী করবে? রবিকাকা উধাও। এবার কী? মারীচকে কি একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবে মহাসর্পিণীর গুহাটা কোথায়? রক্তপদ্মরাগের ব্যাপারটা না হয় রক্ষোবৈদ্যর কাছে জেনে নেওয়া যাবে সময় করে, কিন্তু এই নরকবিষটা কী বস্তু? এই মুহূর্তে তার যে করণীয় কী, অভী ঠিক করে উঠতে পারল না।

মারীচের বন্ধ দরজায় ঠকঠক করে শব্দ হল হঠাৎ। কে যেন ডাকছে বাইরে থেকে। চমকে উঠে অভী আর মারীচ পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর মারীচ উঠে গেল।

দরজা তো খুলতেই হবে।

পরক্ষণেই ভেতরে যে এসে ঢুকল, তাকে দেখে অভী বিরাট একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। সমরোত্তম মেঘবর্ণ।

মেঘবর্ণের চোখে এতক্ষণ একটা দারুণ জ্রকুটি ছিল, কিন্তু তাকে দেখামাত্র তার মুখ হাসিতে ভরে গেল।

“এই যে তুমি এখানে। আর আমি ওদিকে তোমাকে খুঁজে মরছি তোমার বাড়িতে। ওখানে তোমাকে না পেয়ে মনে হল, একবার এদিকটায় টুঁ মেরে যাই।”

অভী কিছু বলার আগেই মারীচ ঢুকে পড়ল। অভীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, “আমি দরজায় সমরোত্তম মেঘবর্ণকে দেখেই বুঝেছি, উনি তোমার খোঁজে এসেছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে বলেছি, প্রলয়যোদ্ধা আমার দোকানে সুরক্ষিতই আছেন। হে হে হে।”

মেঘবর্ণ একটু গম্ভীরভাবে বলল, “মারীচ, প্রলয়যোদ্ধার ব্যাপারে এত গদগদ হয়ে যখন তখন মন্তব্য করার অভ্যাসটা ছাড়তে হবে তোমাকে। তুমি যখন কথাটা বলছ, তখন দোকানের জানালায় দুটো লোক দাঁড়িয়ে ছিল। কে কোথায় কাকে কোন্ খবর দিচ্ছে, কেউ বলতে পারে? অভীই সেই ভবিষ্যৎবাণীর যোদ্ধা কিনা, এখনও আমরা কেউ নিশ্চিত নই। তাই তুমিও তোমার উচ্ছ্বাসটা একটু কমাও।”

তার কণ্ঠস্বরের বিরক্তিটা বুঝতে পেরে মারীচ মাথা নীচু করে বলল, “আমি দুঃখিত, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। আপনারা কথা বলুন, আমি দোকানের দিকে একবার যাই।”

মারীচ চলে যাওয়ার পরে মেঘবর্ণ ফিরল অভীর দিকে। “এবার বলো দেখি খুলে, ব্যাপারটা কী। তুমি তোমার রবিকাকার খোঁজে এসেছ এখানে, সে খবর পেয়েছি। কিন্তু তোমার কাকা তো বাড়িতে নেই, আর চেয়ার-টেয়ার উলটে পড়ে আছে, দেখে এলাম। গুগুগোল একটা কিছু হয়েছে, এটা তো স্পষ্ট। তোমার কাকা গৃহত্যাগী হয়েছে, এটাও ধরতে পেরেছি। কিন্তু তাকে আমি খুব ভালো করে চিনতাম— অসমসাহসী লোক ছিল সে। তাই আমার প্রশ্ন, তার মতো মানুষ এতটা ভয় পেল কেন?”

অভী তার হাতে চিঠিটা তুলে দিল। পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মেঘবর্ণ; তারপর বলল, “আচ্ছা, আয়তনে ফিরে চলো। সবার সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে হবে ব্যাপারটা। কিন্তু অভী, এভাবে হঠাৎ এখানে চলে এসে একেবারেই ঠিক করো নি তুমি। স্বপ্ন-উপলে তুমি কী দেখেছিলে, আমরা লীনা আর নিধির কাছে শুনেছি। ওই দৃশ্য ফাঁদ হতেও তো পারত।”

অভী বলল, “আমাকে ফাঁদে ফেলে কার কী লাভ?”

মেঘবর্ণ বলল, “দেখো, তবে খোলাখুলিই বলি। আমরা এখনও নিশ্চিত জানি না, তুমিই সেই ভবিষ্যৎবাণীর প্রলয়যোদ্ধা কিনা। কিন্তু মারীচকে দেখে বুঝতেই পারছ, এর মধ্যেই বেশ কিছু লোকের স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে, তুমিই সেই ব্যক্তি। সেই বেশ কিছু লোকের মধ্যে প্রলয়যোদ্ধার ক্ষতি করতে চাইবে, এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়, জেনে রেখো। ফিরে চলো এবার; তোমার বাবা-মা চিন্তা করছে।”

অভী বলল, “এত চিন্তা করার কিছু নেই; আমি নিজে নিজের দায়িত্বটুকু ভালোই সামলাতে পারি। কিন্তু মেঘবর্ণ, ওই মুখোশপরা রাক্ষসটা কেন বলছিল, কাকা নাকি দারুণ একজন প্রতিভাবান লোক? তুমিও তো তাকে চিনতে বলছ। কীভাবে চিনলে তাকে তুমি?”

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মেঘবর্ণ; তারপর বলল, “সমরগরিমার সংগ্রহশালায় রাখা সেই পাঁচটা আঙুলওয়ালা হাতের ভাস্কর্যটার কথা মনে আছে? বলেছিলাম না, পাঁচজন সমরোত্তম ওই হাতের পাঁচ আঙুল?”

অভী মাথা নাড়ল। “মনে আছে।”

মেঘবর্ণ বলল, “রবিকে ছাড়া ওই হাত অসম্পূর্ণ, অভী। সে ছিল সমরগরিমা আয়তনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা – সমরোত্তম স্বর্ণশেখর।”



।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।। সৌজন্য

অভী আর মেঘবর্ণ ফিরছিল অপরাজিতা আর আহুদির পিঠে চেপে। বিরাট শকুনদুটো আকাশপথের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে মৃত দেবতার হলুদ জলের নদী আর সুবিশাল পীতপত্রবন পেরিয়ে এসে নামল সমরগরিমার মাঠে। নামতেই অভী দেখতে পেল একজন অচেনা লোকের সঙ্গে সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রীকে কথা বলতে।

শ্যামশ্রী অভীকে দেখে একটা ছোট স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, সে দেখতে পেল। এমন হঠাৎ করে আয়তন ছেড়ে চলে যাওয়ায় মা যে মুখে বিশেষ কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে বেশ চিন্তা করছিল, অভী বুঝতে পারল।

শ্যামশ্রী ডাকলেন, “মেঘবর্ণ, ভালোই হয়েছে তুমি এসে পড়েছ। একবার এসো তো দেখি এদিকে। অভীও আয়।”

মেঘবর্ণ এগিয়ে এল, তার পেছন পেছন অভীও এল। তাদের বাহন শকুনদুটো উড়ে চলে গেল আকাশে। শ্যামশ্রী বললেন, “তোমরা কেউ এই ভদ্রলোককে চেনো?”

অভী আর মেঘবর্ণ দু’জনেই নতুন লোকটিকে ভালো করে দেখল। বয়স খুব বেশি নয় তার— চব্বিশ-পঁচিশ হবে বড়োজোর। চেহারাও মন্দ নয়— দেখলে মনে হয়, নিয়মিত ব্যায়াম করে সে। মুখশ্রী শান্ত, যদিও চোখদুটো দেখলে বোঝা যায় যে এ ছেলের মাথায় বুদ্ধির অভাব নেই। একটা সরু গোঁফ তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখটাকে আরও ধারালো করে তুলেছে। অভী অবশ্য চিনতে পারল না তাকে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মেঘবর্ণও চিনতে পারছে না।

শ্যামশ্রী আবার বললেন, “ইনি নতুন সহকারী নিয়ামক – সৌজন্য।”

অভী একটু অবাক হয়ে ছেলেটির মুখের দিকে তাকাল। এর আগের

সহকারী নিয়ামক নারদ তো বেশ বয়স্ক মানুষ ছিলেন। রাজ্যের অনেক কঠিন দায়িত্ব অবলীলাক্রমে পালন করেছেন তিনি। তাঁর অবর্তমানে ওই দুর্দ্ধর্ষ নিয়ামক বিনীতেশকে সামলাতে পারবে এই কমবয়সী ছেলেটা?

মেঘবর্ণ বলল, “সহকারী নিয়ামক? তোমার অনুমতি নিয়ে এ কাজ হয়েছে তো, শ্যামশ্রী?”

শ্যামশ্রী মাথা নাড়লেন। “না। আমি কিছুই জানতাম না। ইনি এইমাত্র এসে আমাকে নিয়ামক মহোদয়ের স্বাক্ষর করা নিয়োগপত্র দেখালেন। সেখানে স্পষ্ট লেখা, নিয়ামক বিনীতেশ এঁকে যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচনা করে নিয়োগ করছেন সহকারী নিয়ামক পদে।”

সৌজন্য বলল, “আপনারা আমার উপর ভরসা করে দেখুন, মাননীয় সমরোত্তমগণ। আমি নিতান্ত খারাপ কাজ করব না, আপনাদের কথা দিচ্ছি।”

মেঘবর্ণ বলল, “কিন্তু আপনাকে নিয়োগ করার আগে একবার অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে সহঅধিনায়িকাকে জানানো মাননীয় নিয়ামক মহোদয়ের কর্তব্য ছিল। তাই নয় কি?”

সৌজন্য সরু গোঁফের নীচে হাসল। “আমাকে ‘আপনি’ নয়, দয়া করে ‘তুমি’ বলুন, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো। আর আপনার প্রশ্নের ব্যাপারে মাননীয়া সহঅধিনায়িকাই ভালো উত্তর দিতে পারবেন।

মেঘবর্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল শ্যামশ্রীর দিকে। তিনি আক্ষেপের সুরে মাথা নেড়ে বললেন, “সৌজন্য সত্যিই ভালো কাজ করবে, বোঝা যাচ্ছে— অন্তত নিয়ামক মহোদয় খুশিই হবেন ওর কাজে। সমরগরিমার আইন কানুন এবং সেই আইনের ফাঁকফোকর ও ইতিমধ্যেই খুব ভালো করে আত্মস্থ করে ফেলেছে। হ্যাঁ মেঘবর্ণ, আমাদের আইনি বইতে এ কথা স্পষ্টই বলা আছে, সহকারী নিয়ামক পদটি যেহেতু নিয়ামকের অধীনস্থ প্রশাসনিক পদ, তাই নিয়ামক কারও সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই ওই পদে নতুন ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন।”

অভী একবার সৌজন্যকে দেখে নিল। মিটমিট করে হাসছে সে, যেন দু’জন সমরোত্তমকে একটু অপ্রস্তুতে ফেলতে পেরে সে বেশ খুশি হয়েছে।

শ্যামশ্রী আবার বললেন, “আরও সমস্যা হল, নতুন সহকারী নিয়ামক তাঁর আত্মপরিচয় আমাদের দিতে রাজি নন। তাঁর বংশপরিচয়, তাঁর অতীত নিবাস— এসবের কোনো কিছুই তিনি আমাদের জানাতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, এই সব তথ্য তিনি নিয়ামক মহোদয়কে একবার জানিয়েছেন। আইন অনুযায়ী আমরা সমরোত্তমরা সে বিষয়ে আর কিছু জানতে চাইতে পারি না। এবং দুঃখের ব্যাপার, আইনত তিনি আবার ঠিক কথাই বলছেন।”

মেঘবর্ণ ভ্রু কুঁচকে বলল, “এ আবার কী? তুমি সমরগরিমার লোক নও, তা তো আমরা বুঝতেই পারছি। কিন্তু নিজের জন্মস্থানের ঠিকানা, পিতৃমাতৃপরিচয় দিতে সমস্যা থাকার তো কথা নয়। এইটুকু আত্মপরিচয় দিতে অসুবিধা কোথায়, সৌজন্য?”

সৌজন্য বলল, “অসুবিধা নেই তো। আমি তো নিয়ামক মহোদয়কে সব খুলে জানিয়েছি।”

মেঘবর্ণ ঠোঁট কামড়াল। বোঝা যাচ্ছে, সৌজন্য এ বিষয়ে আর মুখ খুলবে না।

সৌজন্য বলল, “আমি আমার কাজ নিখুঁত ভাবে করব, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। সে ব্যাপারে ফাঁকি পাবেন না। নিয়ামক মহোদয় আমাকে বলছিলেন, এখানের অর্ধরাক্ষসগুলো নাকি বড়ো বাড়াবাড়ি করছে। আমি তাঁকে বলেছি, কোনো চিন্তা করার দরকার নেই; যখন যেখানে যতটুকু ওষুধ দরকার, আমি ঠিক দিয়ে দেব। আগাছা ওঁর ভারি অপছন্দ; আমারও।”

এক গাল হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে আয়তনের অভ্যন্তরে চলে গেল সৌজন্য। শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ প্রচণ্ড ভ্রুকুটি করে সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন।

নিয়ামক বিনীতেশ যে আবার অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে ঝামেলা পাকাতে চাইছেন, পরিষ্কার করে দিয়ে গেল সহনিয়ামক সৌজন্য।

অভী ভাবল, “ওঃ, এই লোকটা কি একটা দিনও অশান্তি ছাড়া থাকতে পারে না?”

শ্যামশ্রী বললেন, “ছাড়ো এখন এর কথা। সাবধানে পা ফেলতে হবে আমাদের, বুঝতেই পারছ নিশ্চয়। কিন্তু এবার আয়তনের ভেতরে চলো তোমরা। নীলাভ্র অপেক্ষা করছে তোমাদের ফেরার জন্য। রবির ব্যাপারটা কী হল, ওর কাছে গিয়েই শুনব। পর্বতও আসছে।”

অভীও চাইছিল আয়তনের মধ্যে গিয়ে একটু বসতে। লীনা আর নিধি কোথায়, কে জানে। মিত্রভবনে আছে হয়তো ওরা। হয়তো খবরই পায়নি যে ও ফিরে এসেছে।

তাই হবে। খবর পেলে ওদের আটকানো যেত না; এতক্ষণে ছুটে আসত ঠিক।

মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী হেঁটে চলেছিলেন সংগ্রহশালার দিকে; অভী সঙ্গ নিল তাঁদের। আয়তনের পাথুরে অলিন্দপথে জানালার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে পড়ন্ত বেলার রোদ। তাতে মেঝের জায়গায় জায়গায় তৈরি হয়েছে চৌকোণা আলোর আকৃতি। সমরোত্তমদের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে অভীর মনে হল, মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী ওই চৌকো আলোর বর্গক্ষেত্রগুলো পেরিয়ে যেতে যেতে যেন একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন, আবার পরমুহূর্তেই আঁধারে ঢুকে যাচ্ছেন— এই আলো, এই অন্ধকার।

সংগ্রহশালার দরজা খোলাই ছিল। শ্যামশ্রী অভীর দিকে ফিরে বললেন, “অভী, তুই আগে যা। তোর বাবা খুব চিন্তা করছিল।”

অভী দেরি না করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। সে দেখল, নীলাভ্র একটা তরবারি নিয়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে অস্ত্রচালনা অভ্যাস করছে। অভী কয়েক মুহূর্ত কিছু না বলে চুপ করে চেয়ে রইল; তার চোখে পড়ল, বাবার হাতগুলো একটু যেন কাঁপছে।

তারপর সে ডাকল, “বাবা।”

নীলাভ শূন্যের গায়ে তরবারি আক্রমণ থামিয়ে ফিরে তাকাল; তার মুখে ফুটে উঠল নির্মল হাসি। অস্ত্রটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে দিল সে। অভী এগিয়ে এল বটে, কিন্তু একটু যেন বাধো-বাধো ঠেকছিল তার। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে কোনোদিন আলিঙ্গন করেনি।

নীলাভ বুঝতে পেরেছিল ছেলের জড়তা। তাকে ভাবার অবকাশ না দিয়ে বুকে টেনে নিল সে; হাত বুলিয়ে দিতে লাগল অভীর চুলে, মাথায়। অভী একটু আড়ষ্টভাবে বাবাকে জড়িয়ে রাখল। সে বুঝতে পারছিল, নীলাভ পুরো ঘেমে গেছে। সে ভাবল, “কতক্ষণ তরবারি চালনা অভ্যাস করছিল বাবা? কেনই বা এত পরিশ্রম করছিল সে?”

শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ হাসিমুখে দৃশ্যটা দেখছিলেন দরজা থেকে। মেঘবর্ণ ডেকে বলল, “নীল, ঢের হয়েছে। ছেলেকে আদর আবার পরে হবে। কথা আছে তোর সঙ্গে।”

নীলাভ অভীর মাথায় আরেকবার হাত বুলিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার চোখমুখ মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে উঠল। সে বলল, “রবিকে পেলি না?”

মেঘবর্ণ মাথা নাড়ল। “ভুলিস না, ও আসলে কে। স্বর্ণশেখর যদি আত্মগোপন করতে চায়, তাহলে তাকে ধরা আমাদের পক্ষেও বড়ো সহজ নয়। এখন আবার এই ‘রবি’ রূপে লুকিয়ে থাকা ওর পক্ষে আরও সহজ। রূপান্তর মায়াটা ওর ক্ষেত্রে স্থায়ী, মনে আছে তো?”

শ্যামশ্রী বললেন, “হ্যাঁ, তাতে রাক্ষসরা ওর গায়ের বীরসুলভ ঝাঁঝালো গন্ধটা কম পায়, জানি আমি।”

অভীর মনে পড়ে গেল নিধির কথা। সেও এইরকমেরই একটা কথা বলেছিল বটে। সেবার সে আর লীনা খুব হাসাহাসি করেছিল কথাটা শুনে। আর তারপর তো সেই বগলে অর্ধরাক্ষস সুগন্ধী...! মনে পড়তেই হাসি পেল তার।

নীলাভ বলল, “কিন্তু রবির রূপেও যদি ও থাকে, ও তো ভেতরে ভেতরে স্বর্ণশেখরই আছে। ও যে কী ভয়ানক যোদ্ধা, আমরা তো জানি। ওকে নিয়ে চিন্তা করার খুব বেশি কিছু আছে কি?”

মেঘবর্ণ বলল, “কিন্তু শেষমুখ ওর পেছনে লেগেছে, নীল। একটু ভয়ের কারণ তো আছেই। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে স্বর্ণশেখর এখনও নিজেই জানে না; ওর ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।”

অভী মুখ দেখেই বুঝতে পারল, বাবা শেষমুখের নাম শোনেনি। নীলাভ বলল, “শেষমুখটা কে?”

শ্যামশ্রী বললেন, “তুমি অনেকদিন এখানে ছিলে না তো, তাই অনেক খবর তোমার জানা নেই। শেষমুখ মাল্যপর্বতের কুখ্যাত ভাড়াটে খুনি রাক্ষস; এখানে ওর নাম শোনেনি, এমন কেউ নেই। মোটা টাকার বিনিময়ে কাজ করে ও। আর ওর নাম শুনে ভয় পায় না, রাক্ষস-মানুষ নির্বিশেষে এমন লোক পাওয়া মুশকিল। এই লোক যদি অভী আর স্বর্ণশেখরের পেছনে লেগে থাকে, তাহলে কিন্তু বেশ চিন্তার ব্যাপার আছে।”

নীলাভ বলল, “কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে এদের দু’জনের পেছনে বদমাশটাকে লাগাল কে?”

“সেটাই তো বুঝতে পারছি না,” মেঘবর্ণ চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল। “রবির রাক্ষসদের সঙ্গে অল্পস্বল্প যোগাযোগ ছিল ঠিকই, কিন্তু তার জন্য ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইবে, এরকম শত্রু ওর কেউ ছিল না বলেই মারীচের কাছে খবর পেয়েছি।”

নীলাভ বলল, “আমার কী মনে হয় জানিস মেঘ, ওই শেষমুখ লোকটাকে যে-ই কাজে লাগিয়ে থাকুক, আসলে তার লক্ষ্য হচ্ছে অভী।”

অভী অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল। শ্যামশ্রী একটু চমকে উঠে বললেন, “কেন? তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন?”

নীলাভ বলল, “ঠান্ডা মাথায় ভালো করে ভেবে দেখো তো একবার। রবি যে আসলে একজন সমরোত্তম, এ খবর কিন্তু আমরা ক-জনের বাইরে এখনও কেউ জানে না। জানলে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু এখন তার বিরুদ্ধে শেষমুখের মতো ভয়ংকর রাক্ষসকে লাগানোর প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে বুঝতে হবে, আসল লক্ষ্য সে নয়। সেই স্বপ্ন-উপলের বার্তাটাতে আমরা তো পরিষ্কার শুনেছি, ওরা চাইছে অভীকে। অভীই যে সেই ভবিষ্যৎবাণীর প্রলয়যোদ্ধা, অনেকেই সেরকম ভাবতে শুরু করেছে, জানো নিশ্চয়ই তোমরা। প্রলয়যোদ্ধা যে-ই হোক না কেন, তার জন্য গোটা মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে, এরকম একটা বিশ্বাস অনেকের মধ্যেই আছে, তাও সবার জানা। এই অবস্থায় খোদ প্রলয়যোদ্ধাটিকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারলে প্রলয় আটকানো যাবে, এরকম ভাবতে শুরু করবে অনেকেই, এটা বুঝতে খুব বেশি কল্পনা লাগে কি? অকালে মরতে আর কে চায়, বলো?”

শ্যামশ্রী চুপ করে রইলেন। নীলাভর যুক্তিতে ফাঁক নেই।

মেঘবর্ণ বলল, “স্বর্ণশেখর অভীকে লাঠিটা নিয়ে বজ্রধরের কাছে যেতে বলেছিল কেন? লাঠির মধ্যে ওই বিশেষ মায়াটাকে সুরক্ষিত রাখতে?”

অভী অবাক হয়ে বলল, “লাঠিটায় কী আছে, আমি তো কখনও জানতে পারিনি!”

শ্যামশ্রী একটু হেসে বললেন, “খুব শক্তিশালী মায়াঅস্ত্র ছিল ওটা। শুধু স্বর্ণশেখরই পারত ওটাকে ব্যবহার করতে। ফিরে আসুক ও, দেখতে পারি ঠিক।”

সংগ্রহশালার দরজায় টোকা পড়ল। ওরা মুখ তুলে দেখল, পর্বত দাঁড়িয়ে আছে হাতে একটা বিশাল, ভয়ংকরদর্শন কুঠার নিয়ে, আর তার বিরাট চেহারার দু’দিক থেকে হাসিমুখে উঁকি মারছে লীনা আর নিধি।

পর্বত বলল, “এই দু’জনকে আমি ডেকে নিয়ে এলাম অভীর ফেরার খবর দিয়ে। বন্ধুর খবর জানার জন্য খুব অস্থির হচ্ছিল এরা।”

অভীর দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল দু’জন। অভীও হাসল। শ্যামশ্রী বললেন, “ভালো করেছে। পরশুরামের কুঠারটা নিয়ে এসেছ দেখছি।”

পর্বত বলল, “হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছিলে তুমি। গতবার ওরা অচলগুহাতেই লুকিয়ে রেখেছিল জিনিসটা। মেঘবর্ণ, এই নাও, তুলে রাখো এই মহামূল্যবান নিদর্শনটিকে।”

পর্বতের হাত থেকে কুঠারটা নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে মেঘবর্ণ তাকে নিয়ে গেল চন্দ্রহাসের পাশেই রাখা কাচের খালি বাস্‌টার দিকে। অভী বন্ধুদের সঙ্গে এসে দাঁড়াল অস্ত্রগুলোর সামনে।

সশ্রদ্ধভাবে কুঠারটাকে বাস্‌টের মধ্যে গুইয়ে দিল মেঘবর্ণ। পর্বতও এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। কুঠারটা রাখার পর সে মেঘবর্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল দেয়ালের একটা তৈলচিত্রের দিকে।

নীলাভ্র পড়ে যাচ্ছে অগ্নিময় নরকগহ্বরে; শর্বর তাকে ফেলে দিচ্ছে লাথি মেরে।

পর্বত বলল, “মেঘবর্ণ, শ্যামশ্রী, আমার মনে হয় এইবার এই অসম্মানজনক ছবিটাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। নীলাভ্র যা করেছে আমাদের সবার জন্য, তারপরে এটাকে এই ঘরে স্থান দেওয়া আর উচিত বলে মনে করো তোমরা?”

শ্যামশ্রী তাকালেন মেঘবর্ণের দিকে। সে বলল, “না পর্বত, এটা নিয়ে আমার আর সমরোত্তম সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রীর মধ্যে আলোচনা হয়েছে। আমরা দু’জনেই চাই, এটা এভাবেই থাকুক। লোকে দেখুক, যে বস্তুকে আমরা সবচেয়ে মূল্যবান মনে করি, অন্যের মঙ্গলের জন্য একজন সমরোত্তম কীভাবে তাকেও হেলায় ত্যাগ করতে পারেন।”

পর্বত হাসল, পিঠ চাপড়ে দিল নীলাভ্র-র। সে অস্বস্তিভরে একটু হেসে বলল, “আরে, ওসব পুরোনো কথা ছাড়ো না তোমরা। এখন সামনে যে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধান কীভাবে হবে, সে-কথা ভাবো।”

অভী তার দুই বন্ধুকে সংক্ষেপে বলছিল আজ সারাদিনের ঘটনা। পর্বত বলল, “আরেক বার গোড়া থেকে বলো, অভী। আমিও শুনি পুরোটা।”

তাই করল অভী। তার নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়া, রণিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ, রবিকাকার চিঠি, মারীচ, নরকবিষের কথা সবকিছু বলে সে থামল। তার কথা শুনতে শুনতে পর্বতের মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে উঠছিল; সে চুপ করার পর পর্বত বলল, “স্বর্ণশেখর কোথায় গেছে বললে?”

অভী বলল, “মহাসর্পিণীর গুহায়? কেন, তুমি চেনো জায়গাটা?”

উত্তর দিতে গিয়ে পর্বতের গলাটা যে কেঁপে গেল, সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারল অভী। “হ্যাঁ, ইয়ে, ওই একটু আধটু। জায়গাটা ভালো না।”

অবাক হয়ে অভী দেখল, পর্বতের মুখটা যেন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। পাছে আরও কিছু বলতে হয়, তাই ওখান থেকে একটু সরে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল দেওয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোর সামনে।

নিধি আর লীনাও খেয়াল করেছিল ব্যাপারটা। লীনা ফিশফিশ করে অভী আর নিধিকে বলল, “পর্বতদা তো স্বয়ং মৃত্যুকেও ডরায় না, জানতাম এতদিন। হঠাৎ এত গুঁকিয়ে গেল কেন ওর মুখটা?”

নীলাভ্র দাঁড়িয়ে ছিল পাশেই। সে ডেকে বলল, “কী হল, পর্বত?”

পর্বত মুখ না ফিরিয়েই বলল, “কিছু না।”

সমরোত্তমরা একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিলেন। তারপর শ্যামশ্রী বললেন, “এবার আমাদের ভাবতে হবে স্বর্ণশেখরকে কীভাবে সমরগরিমাতে

ফিরিয়ে আনা যায়। মহাসর্পিণীর গুহাতে সে গেছে, শুনলাম। জায়গাটা সম্পর্কে আমার খুব একটা স্পষ্ট ধারণা নেই, কিন্তু এটুকু জানি, ওই অঞ্চল মাল্যপর্বতের রাক্ষসদের অধীনে। ওখানে যাওয়া সোজা নয় মোটেই।”

মেঘবর্ণ বলল, “সদ্য সদ্য শর্বরকে হারিয়েছি আমরা যুদ্ধে। মাল্যপর্বতের পত্রতিলক রাক্ষসরাজা পুনর্বসু সে যুদ্ধে অংশ নেননি ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে রাক্ষসরা যে সমরগরিমার উপর খুব একটা প্রসন্ন নেই, এ কথা নিশ্চিত। শর্বরের বেশ ভালোই জনসমর্থন ছিল ওদের মধ্যে- বিশেষ করে ওদের বিমোহক জাতির মধ্যে। এখন আমরা যদি এখান থেকে ওদের কাছে সরকারি ভাবে যাই, কতটা উষ্ণ অভ্যর্থনা পাওয়া যাবে, আমার সন্দেহ আছে। বিশেষত অধিনায়ক বজ্রধরের মৃত্যুর পর থেকে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছে, আমরা দুর্বল হয়ে গেছি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “উষ্ণ অভ্যর্থনা আমাদের দরকার নেই তো। আমরা যাব, রাজা পুনর্বসুর অনুমতি নিয়ে মহাসর্পিণীর গুহায় আমাদের বন্ধুর জন্য অনুসন্ধান চালাব, আর তারপর রাজাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফিরে আসব। শর্বরকে ওদের বিদ্রোহী বিমোহক জাতির ‘রাজপুত্র’ বলা হত, মনে আছে নিশ্চয়ই তোমাদের। আমরা তাকে না মারলে সমরগরিমা দখল করার পর শর্বর রাজা পুনর্বসুর সিংহাসনের দিকেই হাত বাড়াত। কাজেই রাজা চট করে সমরগরিমার সমরোত্তমদের চটাতে চাইবেন বলে আমার মনে হয় না। অধিনায়ক বজ্রধর নেই ঠিকই, কিন্তু আমাদের তরবারিগুলো এখনও ভোঁতা হয়ে যায়নি, মেঘবর্ণ।”

অভী দেখছিল, মায়ের মুখটা যেন ভেতরের তেজে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ভালো লাগল তার। তার বন্ধুদের কেউ বিপদে পড়লে সে নিজেও এরকম ভাবেই সাহায্য করার আশ্রয় চেষ্টা করত, সে জানে।

শ্যামশ্রী আবার বললেন, “আমার ছেলেটাকে সব রকম বিপদের হাত থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে এতদিন রক্ষা করেছে স্বর্ণশেখর। যাতে কেউ বুঝতে না পারে, যাতে ঐশিকশ্রেষ্ঠ সন্দেহ না করতে পারেন, তাই নিজের সমরোত্তমত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে নিজের উপর চিরস্থায়ী রূপান্তরমায়া প্রয়োগ করতে দু’বার ভাবেনি ওই মানুষটা। নিজেই নিজের অতীতের স্মৃতি পর্যন্ত প্রায় পুরোটা নষ্ট করে দিয়েছিল ও শুধু অভীকে এইসব অশান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য, ওকে ভালোভাবে মানুষ করার জন্য। আমার ছেলেটাকে কাছে রেখেছিল বলেই এই খুনে শেষমুখ আজ ওর পিছু নিয়েছে। আজ ওর বিপদে যদি আমি পাশে না থাকি, তাহলে আমার মতো অকৃতজ্ঞ বেইমান আর দুটো হবে না। মহাসর্পিণীর গুহার খোঁজ আমাকে নিতেই হবে, আর তার জন্য দরকার হলে রাক্ষসরাজার গলায় যদি তরবারি ঠেকাতে হয়, তাতেও আমি দু’বার ভাবব না।”

নীলাদ্র চুপ করে শুনছিল। এবার সে বলল, “স্বর্ণশেখরকে এখানে আনতে আমিও চাই। কিন্তু আমাদের এখানকার একটা সমস্যার কথা তোমরা কেউ উল্লেখ করলে না দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।”

অভী বুঝতে পারছিল না এখানে কী সমস্যা থাকতে পারে। শ্যামশ্রী বললেন, “কী বলতে চাইছ তুমি? কীসের সমস্যা এখানে?”

নীলাভ্র দাঁড়িয়ে ছিল একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে; সে এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। “বলছি আমাদের মাননীয় নিয়ামক মহোদয়ের কথা। সমরগরিমা থেকে মাল্যপর্বতে রাজার কাছে যেতে নিয়ামকের লিখিত অনুমতি লাগবে, শ্যামশ্রী। তুমি কি ভাবছ, সে বস্তু উনি সহজে আমাদের দেবেন?”

অভী, লীনা আর নিধি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ওরা খুব ভালো করেই জানে, নিয়ামক অনুমতি দেবেন না।

মেঘবর্ণ বলল, “আরে, ওটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি, নীল। অনুমতি উনি সহজে দেবেন না, আমিও নিশ্চিত। আর ওঁর যে সহকারীটি জুটেছে দেখলাম, সেও ওঁর একদম উপযুক্ত শিষ্য হয়েছে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “মেঘবর্ণ, নীলাভ্র, আমরা সমরোত্তম। ওই লোকটাকে এত সমীহ করার তো কিছু নেই।”

পর্বত এতক্ষণে মুখ ফেরাল, এসে দাঁড়াল ওদের মাঝখানে। “আমি যদি নিয়ামক লোকটাকে এতটুকু চিনে থাকি, তাহলে বলছি, ও কোনোমতেই অনুমতি দেবে না। স্বর্ণশেখর ওর কোনো কাজে লাগবে কি এই মুহূর্তে? লাগবে না। তাহলে অনুমতির পাওয়ার আশা ছেড়ে দাও। তবে তোমরা সমরোত্তমরা যদি ভদ্রতাবশে সোজা আঙুলে না পারো, তাহলে আমাকে বোলো – আমি দুষ্ট রাক্ষস; আঙুল বাঁকিয়ে ঘি তুলতে আমি ভালোই পারি।”

নিধি বলল, “আমরা কি আপনাদের সঙ্গে মাননীয় নিয়ামকের কাছে যেতে পারি, সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রী?”

শ্যামশ্রী বললেন, “না নিধি। এসব সরকারি ব্যাপারে তোমাদের শিক্ষার্থীদের না জড়ানোই ভাল। আমরা তিনজন সমরোত্তম যাব ওঁর কাছে। পর্বত, যদি আমরা ভালো কথায় না পারি, তখন তোমার শরণাপন্ন হব। ওঁর দেওয়া অনুমতিপত্র না নিয়েও মাল্যপর্বতে যাওয়াই যায়, কিন্তু ওখানে রাজসভায় সরকারি কাগজ ছাড়া ওদের সহযোগিতা পাওয়া মুশকিল হবে।”

অভীরও ইচ্ছা ছিল ওঁদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু শ্যামশ্রীর কথা শুনে সে আর কিছু বলল না।

তাঁর চোখের ইঙ্গিতে নীলাভ্র আর মেঘবর্ণ এগিয়ে চলল দরজার দিকে। লীনা ফিসফিস করে বলল, “তোমার মাথায় আবার নিয়ামকের কাছে যাওয়ার ভূত চাপল কেন, নিধি?”

নিধি ফিকফিক করে হাসল। “শ্যামশ্রী কেমন খেপে আছেন, দেখছ তো। ও ব্যাটার উপর ভালো রকমের ওষুধ পড়বে, বোঝাই যাচ্ছে। আমাদের অর্ধরাক্ষসদের পেছনে লেগে এসেছে লোকটা সবসময়। আজ ওর কী হয়, দেখার ইচ্ছা হচ্ছিল খুব।”

অভী আর লীনাও হাসল হি হি করে। তাদের সঙ্গে যোগ দিল পর্বত; বলল, “আমাকে বোধহয় লাগবে না, বুঝলে নিধি? সমরোত্তম শ্যামশ্রী যদি একটু চোখ রাঙান, তাহলেই কাজ হবে। নীলাভ্র কিছু বলবে না, আমি জানি – খুব ঠান্ডা মাথার লোক; ও খালি চুপ করে সবকিছু দেখবে। মেঘবর্ণ অবশ্য মুখ খুলবে মনে হয়। শান্ত গলাতেও ভয় দেখাতে ও ভালোই পারে।”

সমরোত্তমরা বেরিয়ে গিয়েছিলেন সংগ্রহশালার দরজা দিয়ে, এমন সময় কয়েক পা পিছিয়ে এসে মুখ বাড়াল মেঘবর্ণ। “অভী, একটু এসো তো আমাদের সঙ্গে।”

বন্ধুদের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে অভী এগিয়ে গেল দরজার দিকে। নিধি ফিসফিস করে লীনাকে বলল, “ও যাচ্ছে, ভালই হল। ভেতরের খবর পুরোটা পাওয়া যাবে।”

অভী কাছে আসতে মেঘবর্ণ ফিশফিশ করে বলল, “সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছিল তো? আমি তোমার মা-কে বোঝালাম, প্রলয়যোদ্ধা স্বয়ং সঙ্গে থাকলে নিয়ামক রাজি হলেও হতে পারেন। সে আর আপত্তি করেনি।”

অলিন্দপথে এগিয়ে চললেন ওঁরা; সামনে নীলাভ আর শ্যামশ্রী, পেছনে অভী আর মেঘবর্ণ। একবার মাথা ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে নিল নীলাভ; তাতে অভীর মনে হল, মেঘবর্ণের এই ছোট চালাকিটা সে বুঝতে পেরে গেছে।

অভীর মনে পড়ল, তার বাবা আর মেঘবর্ণ হরিহর-আত্মা বন্ধু ছিল; পরস্পরকে ওরা খুব ভালো করেই চেনে।

নিয়ামক বিনীতেশের কার্যালয়টাতে যাওয়ার জন্য ওদের নামতে হল সমরগরিমার উন্মুক্ত প্রান্তরে। লাল রঙের পাথর দিয়ে বাঁধানো একটা পথ সোজা চলে গেছে কার্যালয়ে। হাঁটতে হাঁটতে অভী দেখছিল, বিকেল শেষ হয়ে আসছে। পশ্চিমের আকাশে লালচে রঙের আভা ছড়িয়ে আছে, আর পূর্বদিকের আকাশে স্নেটপাথরের রঙ। মৃদুমন্দ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে মাঝেমাঝে – এই গুমোট গরমের মধ্যে সেটা বেশ ভালই লাগল তার।

বিনীতেশের কার্যালয়েই তাঁর বাসস্থান। দ্বিতল ভবনের উপরতলায় থাকেন সমরগরিমার অসীমপ্রতাপ নিয়ামক বিনীতেশ; একতলার একটি কক্ষ তাঁর কার্যালয়। অভী আগে কখনও আসেনি এখানে।

প্রথমবার নিয়ামকের ভবনে আসার অভিজ্ঞতা তার খুব একটা ভালো হল না। সামনের ঘরে একটি লম্বা লোক বসেছিল; সে আটকাল ওঁদের।

“এখন ভেতরে যাওয়া যাবে না।”

রুম্ফগলায় বলা কথাটা শুনে সমরোত্তমরা একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। অভী একটু অবাক হয়ে লোকটার স্পর্ধা দেখছিল। সমরগরিমায় দাঁড়িয়ে সমরোত্তমদের সঙ্গে কেউ এইভাবে কথা বলতে পারে, তার ধারণা ছিল না।

মেঘবর্ণ এক পা এগিয়ে এসে বলল, “নিয়ামক মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।”

উত্তর এল, “আগে থেকে বলা না থাকলে উনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না।”

শ্যামশ্রীর গলা খুব গম্ভীর। “ও, তাই? এত ব্যস্ত মানুষ হয়ে উঠেছেন উনি কবে থেকে? শরীরের তাড়া খেয়ে কুয়োর মধ্যে লুকোনোর পর থেকে নাকি?”

অভী বুঝতে পারছিল, মা রেগে যাচ্ছে। মেঘবর্ণের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সেও খুব একটা প্রসন্ন হয়নি কথাগুলো শুনে। গরম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার আগেই নীলাভ তার কাঁধে একটু চাপ দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল;

বলল, “দয়া করে একটু দেখুন না, যদি সাক্ষাৎ করার কোনো ব্যবস্থা করা যায়।”

লোকটা বেজার মুখ করে বলল, “বসতে হবে তাহলে।”

নীলাভ বলল, “আচ্ছা, বসছি আমরা।”

লোকটা উঠে গেল ভেতরের কক্ষে। পেছন থেকে ডেকে নীলাভ বলল, “বলবেন, মাল্যপর্বতের রাক্ষসদের ব্যাপারে জরুরি কথা বলতে এসেছি আমরা। উনি ঠিক রাজি হবেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।”

লোকটা মাথা নাড়ল। বাকিদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল নীলাভ। অভী বুঝতে পারছে, বাবা যে ছোট খবরটা পাঠাল, ওতেই কাজ হবে; রাক্ষসদের ব্যাপারে কথা আছে শুনলে নিয়ামক বিনীতেশ দেখা না করে পারবেন না।

ওরা বসে আছে তো আছেই। লোকটার আর ফেরার নাম নেই। বসে বসে অস্থির হয়ে উঠছিল অভী।

তার দিকে তাকিয়ে শ্যামশ্রী বললেন, “আগে নিয়ামকের এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না। গত যুদ্ধের পর থেকেই এগুলো শুরু হয়েছে।”

মেঘবর্ণ বলল, “সম্ভবত নারদের মৃত্যুর ধরন দেখে উনি ভয় পেয়েছেন। চট করে তাই কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না।”

নীলাভ বলল, “না রে মেঘ, শুধু তাই নয়। নিজেকে বিরাট বড়োমাপের রাজনীতিবিদ নেতা মনে করেন তো উনি। এত তাড়াতাড়ি আমাদের দর্শন দিলে গুরুত্ব থাকবে ওঁর? খেলো হয়ে যাবেন না?”

অনেকক্ষণ পর লোকটা নড়ে নড়ে ফিরে এল; বলল, “মাননীয় নিয়ামক মহোদয় অল্প সময়ের জন্য আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হয়েছেন।”

শ্যামশ্রীর মুখ ব্যঙ্গহাসিতে বঙ্কিম হয়ে উঠল। তিনি বললেন, “আমরা কৃতার্থ বোধ করছি। চলো, মহামান্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসা যাক।”

পাশের কক্ষে নিয়ামক বিনীতেশ বসে ছিলেন বিরাট বড়ো একটা শক্তপোক্ত কাঠের টেবিলের ওপারে। তাঁর পাশেই কিছু কাগজপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সহকারী নিয়ামক সৌজন্য। ওদের ঢুকতে দেখে ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে রইলেন নিয়ামক, কিন্তু অভিবাদন জানালেন না। সৌজন্য অবশ্য অভীর দিকে তাকিয়ে মাথা হেলিয়ে একটু হাসল।

অভী বুঝতে পারছিল, ওদের তিনি বসতে বলবেন না। দেখা গেল, সমরোত্তমরাও কেউ আর অনুমতির অপেক্ষা না করেই একটা একটা কাঠাসন টেনে নিয়ে বসে পড়েছেন।

শ্যামশ্রী বললেন, “মাননীয় নিয়ামক মহোদয়, বিশেষ প্রয়োজনে মাল্যপর্বতে যাওয়া একবার প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। আপনার কাছ থেকে একটি সরকারি লিপির প্রত্যাশা করি আমরা।”

বিনীতেশ গম্ভীরভাবে বললেন, “কী প্রয়োজন, বলুন আগে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “আমাদের পুরোনো সমরোত্তম স্বর্ণশেখর মাল্যপর্বতে মহাসর্পিণীর গুহায় গেছেন। সেখান থেকে ফিরে আসতে তাঁকে সাহায্য করার জন্যই আমাদের যেতে হবে। এর জন্য ওখানকার রাজা পুনর্বসুর সাহায্য তো লাগবেই। আপনার স্বাক্ষর করা সরকারি বার্তা নিয়ে সমরগরিমা থেকে গেলে রাজা আমাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করতে পারবেন না।”

বিনীতেশ কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন, যেন প্রস্তাবটার ভালো-মন্দ দিকগুলো মনে মনে বিচার করছেন। তারপর তিনি বললেন, “আবার একজন সমরোত্তম? যাঁরা আছেন, আমার মাথা খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে তাঁরাই তো যথেষ্ট!”

মেঘবর্ণ আর নীলাভ দু'জনেই মৃদু মৃদু হাসছে, দেখতে পেল অভী; কিন্তু শ্যামশ্রীর মুখ কঠোর। তিনি বললেন, “আপনার রসিকতা করা শেষ হয়েছে আশা করি। আমরা কিন্তু একজন সমরোত্তমকে নিয়ে কথা বলছি, নিয়ামক মহোদয়; এই আয়তনের কল্যাণের জন্য স্বর্ণশেখরের অবদান বিশাল, ভুলে যাবেন না। দয়া করে আরেকটু মর্যাদার সঙ্গে আপনি কথাগুলো বলবেন।”

বিনীতেশ বললেন, “মর্যাদা রাখতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ওই স্বাক্ষর করা কাগজ আপনারা পাবেন না।”

শ্যামশ্রী বললেন, “কেন?”

“আমার ইচ্ছা, তাই। আরেকজন সমরোত্তমকে আয়তনে আসতে দিয়ে আপনাদের দল ভারি করতে দেওয়ার বাসনা আমার একেবারেই নেই।”

“আমাদের দল?” শ্যামশ্রী তো রেগেছেনই, অভী বুঝতে পারল, সে নিজেও রেগে যাচ্ছে। “আমরা কোনো দলবাজি করিনা, মাননীয় নিয়ামক। আমরা সমরগরিমাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করি। যে প্রলয়যোদ্ধার জন্য আপনার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে, তাকে সুরক্ষা দিয়ে দীর্ঘদিন নিজের কাছে রেখেছিল স্বর্ণশেখর। আয়তনের জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছিল ওই লোকটা। আজ তার জন্য...”

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নিয়ামক বললেন, “আজ তার জন্য কিছুই করতে আমি আগ্রহী নই। আমার কোন্ কাজে আসবে সে?”

মেঘবর্ণ এগিয়ে এল। “মনে রাখবেন নিয়ামক মহোদয়, সে আপনার কেউ না হতে পারে, কিন্তু সে আমাদের বন্ধু। আপনাকে আমার পরামর্শ, স্বাক্ষর করা লিপিটি সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রীর হাতে তুলে দিন; আপনি যা কিছু অসম্মানজনক কথা বললেন, আমরাও ভুলে যাব।”

নিয়ামক মুখ বিকৃত করে বললেন, “আপনি বজ্রধর নন। যমদণ্ডের ধারক নন আপনি। আপনার কথার মূল্য আমার কাছে বেশি নয়, সমরোত্তম মেঘবর্ণ।”

মেঘবর্ণের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। আরেক পা এগিয়ে গেল সে নিয়ামকের দিকে; মুষ্টি ধরে তরবারি একটুখানি বার করে আনল সে কোমরের কোষ থেকে। শীতল কণ্ঠে সে বলল, “হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমি যমদণ্ডের ধারক নই। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে যা ধরে আছি, তা আপনার অঙ্গস্পর্শ করলে ফল একই হবে, মাননীয় নিয়ামক মহোদয়।”

বিনীতেশের মুখ শুকিয়ে গেছে, অভী স্পষ্ট দেখতে পেল। তিনি বলে উঠলেন, “আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, সমরোত্তম মেঘবর্ণ? সমরগরিমার রাজাকে হত্যা করার ভয় দেখাচ্ছেন?”

শ্যামশ্রীর চোখের ইঙ্গিতে মেঘবর্ণ পিছিয়ে এল। শ্যামশ্রী বললেন, “আপনি রাজা নন। এই কথাটা আপনাকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হয় কেন? আপনি আমাদের মতোই মানুষের সেবক – তার বেশি কিছু না। সমরগরিমার আইন এই কথাই বলে।”

“সে আপনারা যা খুশি ভাবতে পারেন,” নিয়ামকের গলায় অধৈর্যের সুর। “কিন্তু এই ভ্রমণের অনুমতি আমি দিচ্ছি না, আর রাক্ষসরাজ পুনর্বসুকে লিখিত বার্তা দেওয়ার তো প্রশ্নই নেই। এখন জরুরি অবস্থা চলছে না; যুদ্ধ-পরিস্থিতিও নেই। আপনাদের স্বর্ণশেখরকে রাক্ষসরা অপহরণ করে নিয়ে যায়নি; সে নিজের ইচ্ছাতেই গেছে রাক্ষসদের রাজত্বে। তাই তাকে যে উদ্ধার করে আনার দরকার আছে, এমনটা মোটেই মনে হচ্ছে না। এই কারণেই আপনাদের মাল্যপর্বতে যাওয়ার অনুমতি আমি দিচ্ছি না, আর আমার অনুমতি ছাড়া আপনারা কেউ ওখানে যেতেও পারবেন না। সমরগরিমার আইন এই কথাই বলে।”

অভী বুঝতে পারছিল, তার হাতগুলো আবার ঠান্ডা হতে শুরু হয়েছে।

মেঘবর্ণ বলল, “মনে রাখবেন মাননীয় নিয়ামক, আমি বজ্রধর নই। তাঁর মতো সব ব্যাপারে আইন মেনে আমি চলিনি কোনোদিন, তিনিও জানতেন। আর আমাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি আর নেই, এটাও মনে রাখবেন।”

নিয়ামক মুখবিকৃত করে বললেন, “ভালো কথা। যদি আপনি আমার বিনা অনুমতিতে মাল্যপর্বতে যান, তাহলে আপনাকে ‘পলাতক’ ঘোষণা করা হবে। সমরগরিমায় আর আপনার ঠাই হবে না, আপনিও এটা মনে রাখবেন।”

নিয়ামকের দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গেল অভী। একজন সমরোত্তমকে ‘পলাতক’ ঘোষণা করার হুমকি দেওয়ার সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে লোকটা? এ ব্যাপারটা যেন নিয়ামকের মতো দুষ্টলোকের পক্ষেও একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

অভী জানে, নিয়ামক মুখে যতই লম্বা-চওড়া কথা বলুন না কেন, ভেতরে ভেতরে তিনি বেশ ভীতু মানুষ। সমরোত্তমদের সঙ্গে এত গলা চড়িয়ে কথা তিনি আগে তো কখনও বলতেন না।

শ্যামশ্রীর মুখে আষাঢ়ের মেঘ জমছে। তিনি বললেন, “আপনি রাক্ষসদের পছন্দ করেন না, জানি। একজন রাক্ষস আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমরা গেলেই সে আসবে। তাকেও ব্যাপারটা দয়া করে বুঝিয়ে দেবেন। চললাম। নমস্কার।”

বাকিদের সঙ্গে অভীও বেরোতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার চোখ পড়ল সৌজন্যর দিকে। সে অবাক হয়ে দেখল, সৌজন্য তাকে চোখের ইশারা করে কী একটা বলতে চাইছে। অভী তাকিয়ে রইল। সৌজন্য নিঃশব্দে ঠোঁট নেড়ে বলল, “বাইরে দাঁড়াও।”

নীলাভ্রও দেখেছিল দৃশ্যটা। নিয়ামকের কার্যালয়ের বাইরে এসে সে বলল, “শ্যামশ্রী, মেঘবর্ণ, তোমরা যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি অভীকে নিয়ে। আর হ্যাঁ, পর্বতকে এক্ষুনি এখানে পাঠিও না। আমি যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।”

ওঁরা দু’জনে একটু অবাক হয়েই তার দিকে তাকালেন। নীলাভ্র আর কিছু বলল না; বাইরে বসা লোকটা তাকিয়ে আছে ওঁদের দিকে।

শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ বুঝে নিলেন নীলাভ্র এর সামনে আর কিছু বলতে চাইছে না। মেঘবর্ণ বলল, “তাই হবে। আমরা সংগ্রহশালায় আছি। তাদের জন্য অপেক্ষা করছি ওখানে।”

ওরা চলে যাওয়ার মিনিটখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে এল সৌজন্য। নীলাভ্রকে দেখে হাসল সে, হাতজোড় করে নমস্কার করল। নীলাভ্রও পালটা নমস্কার করল।

সৌজন্য বলল, “সমরোত্তম নীলাভ, অভীর সঙ্গে আমার দু’একটা কথা আছে। আপনি বরং অসিতের সঙ্গে একটু গল্প করুন ততক্ষণ।”

অভী ভাবল, “ও, এই গোমড়ামুখোটোর নাম তাহলে অসিত।”

লোকটা বিরসবদনে চেয়ে আছে ওদের দিকে, যেন দুনিয়ার কিছুই তার ভালো লাগছে না। নীলাভ একটু হেসে বলল, “থাক, অসিত বোধহয় এই মুহূর্তে গল্প করায় খুব একটা আগ্রহবোধ করছে না। তোমরা কথা বলো, আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।”

নীলাভ চলে যাওয়ার পর অভী বলল, “সহনিয়ামক সৌজন্য, আপনি আমাকে দাঁড়াতে বলছিলেন কেন?”

সৌজন্য বলল, “আরে, আমাকে ‘তুমি’ বলো, অভী। হ্যাঁ, দাঁড়াতে তো বলেইছিলাম। একটা বড়ো উপকার আমি তোমার করতে পারি, কিন্তু তার বদলে আমার একটা ছোট উপকার তোমাকে করতে হবে।”

অভী বলল, “বেশ তো। বলো, শুন।”

“আমি তোমার লিখিত অনুমতিপত্র জোগাড় করে দেব নিয়ামক মহোদয়ের স্বাক্ষরসহ। আমি যদি অনুরোধ করি, নিয়ামক বিনীতেশ সে-কথা ফেলতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, মাল্যপর্বতে আগাম চিঠি পাঠিয়ে ওখানের রাজপ্রাসাদে তোমাদের থাকার সুবন্দোবস্তও আমি করে দিতে পারব। এই হচ্ছে আমার দিকের উপকার।”

অভী যেন হাতে চাঁদ পেল। বিনীতেশের সঙ্গে এত কথা-কাটাকাটির পরেও এভাবে সবকিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে, সে তো ভাবতেই পারেনি। সে বলল, “বাঃ! এবার আমার দিক থেকে যে উপকারটা তোমার করতে হবে, সেটা একবার শুন।”

সৌজন্য বলল, “সেটা খুব সামান্য একটা ব্যাপার। আমাকে একবার তোমার চন্দ্রহাসটা দেখাতে হবে।”

অভী ভেতরে ভেতরে একটু অবাক হলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করল না। “চন্দ্রহাস দেখবে? সে তো তুমি চাইলেই দেখতে পারো। সংগ্রহশালাতেই তো রাখা আছে। আর হ্যাঁ, ওটা আমার জিনিস নয় কিন্তু, সৌজন্য। ও শিবের তরবারি; কিছুদিনের জন্য ও জিনিস রাক্ষসরাজ রাবণের কাছে ছিল। আমি বার কয়েক হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছি – আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক এইটুকুই।”

সৌজন্য বলল, “তা তো বটেই। কিন্তু চন্দ্রহাসকে আমি সংগ্রহশালায় দেখতে চাই না। তুমি ওটা ব্যবহার করছ, সেই অবস্থায় ওটাকে দেখতে চাই। বলো, রাজি আছ?”

অভী বলল, “তা কী করে সম্ভব? ওটা স্বয়ং শিবের দৈবাস্ত্র। ওই অস্ত্র কোনো নির্দোষের উপর ব্যবহার করা যায় না।”

“আমি কোনো নির্দোষের উপর ওটা ব্যবহার করতে তোমাকে বলছিই না। আমি কোনো জীবন্ত বস্তুর উপরেও ওটা ব্যবহার করতে বলছি না তোমায়।”

“তাহলে?”

“তোমাকে আমি একটা জিনিস দেব। যেকোনো একটা জড়পদার্থ। আমি দেখতে চাই, যেসব বস্তুর প্রাণ নেই, তাদের উপর ওই তরবারি কোনো কাজ করে কিনা।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “কী আশ্চর্য! এমন অদ্ভুত ইচ্ছা জাগল কেন তোমার?”

সৌজন্য বলল, “তুমি একে ‘অদ্ভুত ইচ্ছা’ বলতেই পারো, কিন্তু যদি আমার সঙ্গে চুক্তি করতে চাও, তাহলে এইটুকু তোমাকে করতে হবে। করলে নিয়ামকের সরকারি চিঠি আমি তোমার হাতে তুলে দেব, আমি কথা দিচ্ছি। একজন সমরোত্তম আর একজন শিক্ষার্থীর মাল্যপর্বত রাজসভায় যাওয়ার অনুমতিপত্র – স্বাক্ষর করবেন সমরগরিমার মহামান্য নিয়ামক বিনীতেশ স্বয়ং। রাজি?”

নিধি আর লীনার মুখদুটো সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অভীর। সে বলল, “না, আরেকটু করো। ওটাকে একজন সমরোত্তম আর তিনজন শিক্ষার্থী করে দাও।”

সৌজন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা ছদ্ম দীর্ঘশ্বাস ফেলল। “এটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? ...আচ্ছা, আচ্ছা, দেখছি কী করতে পারি।”

“আশা দিচ্ছ তো?”

“হ্যাঁ, আশা দিচ্ছি। তাহলে ওই কথাই রইল।”

সৌজন্য ভেতরে ঢুকে গেল। অভী একবার অসিতের দিকে তাকিয়ে নিল। সে হাঁ করে তাকিয়ে বসে আছে জানালার দিকে। কিছু শুনেছে বলে মনে হয় না। ওরা অবশ্য যথেষ্ট নীচুগলাতেই কথা বলছিল।

দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল অভী; দেখল নীলাভ আপনমনে নিজের তরবারি নিয়ে অভ্যাস করে চলেছে। অভীকে আসতে দেখে সে হাসল; বলল, “দীর্ঘ পনেরো বছরের অনভ্যাস রে, অভী। নিজের হাত-পায়ের পেশীগুলোই যেন আর নিজের কথা শুনতে চাইছে না। তার উপরে ওই ভয়ংকর নরক যেন শরীরের সব শক্তি গুমে নিয়েছে। তাই অভ্যাস করে করে নিজেকে নিজের বশে আনার চেষ্টা করছি। যাক, সৌজন্য কী বলল, বল।”

অভী সব কথাই বলল। শুনে নীলাভ ঝকুঝকু করল। “ব্যস? এত বড়ো কাজটা ও করে দেবে শুধু এইটুকুর বিনিময়ে? নাঃ অভী, আমি কিন্তু ব্যাপারটা ভালো বুঝছি না। সৌজন্য ছেলেটা মহা ধূর্ত; নিজের স্বার্থ ছাড়া ও এক পা চলার পাত্র নয়। কিন্তু এখানে ওর উদ্দেশ্যটা কী? শুধু চন্দ্রহাসকে দেখা? হতেই পারে না।”

ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলল সমরগরিমা আয়তনের মূল ভবনের দিকে। দূর থেকে রক্ষোবৈদ্যকে আসতে দেখল অভী; তাঁর সাদা দাড়ি উড়ছে মৃদুমন্দ হাওয়ায়।

তিনি কাছে আসতে ওরা অভিবাদন জানাল। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, “আরোগ্য।”

নীলাভ বলল, “আপনি আসুন না সংগ্রহশালায়। আমরা ওখানেই যাচ্ছি। আরও অনেকে আছে ওখানে। কথাবার্তা আছে কিছু। আপনার মতো পাকা মাথার কেউ থাকলে সুবিধাই হয়।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “হ্যাঁ, চলো। নীলাভ, আমি যা যা বলেছি, পালন করছ তো?”

নীলাভ বলল, “অক্ষরে অক্ষরে।”

অভী বুঝতে পারল না, রক্ষোবৈদ্য বাবাকে কী পালন করতে বলেছেন। কিন্তু ও প্রসঙ্গে আর কেউ কিছু বলল না দেখে সেও চুপ করে রইল।

সংগ্রহশালায় পর্বতের সঙ্গে লীনা আর নিধি তো ছিলই, একটু আগে মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রীও যোগ দিয়েছেন। সবাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

নীলাভ বলল, “অভী, যা কথাবার্তা হল সৌজন্যের সঙ্গে, সবাইকে বলো আরেক বার।”

অভী সৌজন্যের সঙ্গে তার আলোচনার বিষয়বস্তু শুনিয়ে দিল। শ্যামশ্রী একটু অবাক হয়ে বললেন, “সৌজন্য এই কথা বলল? নিয়ামক তো বেশ খেপে আছেন। ও কীভাবে তাঁকে দিয়ে চিঠি লেখাবে?”

পর্বত বলল, “তাই তো। আমারও মনে হচ্ছে, এ নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। নিয়ামক বিনীতেশ অতি বদ লোক। সে কোনোমতেই সমরোত্তমদের সুবিধা হয় এমন কিছু করবে না।”

মেঘবর্ণ বলল, “আমার কিন্তু মনে হয়, এই সৌজন্য ছেলেটা যখন বলছে, তখন কিছু একটা ভেবে নিশ্চয় বলছে। ফাঁকা আওয়াজ দেওয়ার মতো মানুষ ও নয়। কিন্তু চন্দ্রহাসের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না।”

নীলাভ বলল, “আমারও তাই মত। অভীর হাতে চন্দ্রহাস দেখতে চাইছে কেন ও, সেটা আমার কাছেও পরিষ্কার নয়। কিন্তু যেকোনো কৌশলে ও নিয়ামককে দিয়ে চিঠিটা লেখাবেই, এতে আমার সন্দেহ নেই, যদিও আমাদের সাহায্য করার পেছনে ওর কী স্বার্থ আছে, এখনও ধরতে পারছি না।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “যাই হোক, অনুমতিপত্র পেয়ে গেলে তোমরা মাল্যপর্বত যাবে তো? ওখানকার রাজকুমারী আমার সম্পর্কে নাতনি হয়। বড়ো ভালো মেয়ে উর্মি। মাল্যপর্বতে ওর মতো চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষ রাক্ষস আর একজনও নেই।”

নিধি একটু অবাক হয়ে বলল, “মাল্যপর্বতের রাজকন্যা আপনার নাতনি হয়?”

“হুম,” রক্ষোবৈদ্য মাথা নাড়লেন। “আমার ভাইপোর মেয়ে উর্মিমালা। ও জন্মানোর পরে পরেই দেশ ছেড়ে এসেছিলাম আমি, কিন্তু এখনও টুকটাক খবরাখবর রাখি। দেশের সব রাক্ষস যখন যুদ্ধবিদ্যা শিখে অন্যকে কীভাবে মারা যায়, সেই কৌশল আয়ত্ত্ব করতে ব্যস্ত, তখন ওই পুঁচকে মেয়েটা চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখেছে অন্তর দিয়ে। ও জন্মানোর পর একবার গিয়ে দেখা করে এসেছিলাম; বিশল্যকরণী চারা দিয়ে আশীর্বাদ করে এসেছিলাম। এখন এতকাল পরে খুব আনন্দের সঙ্গে আমি ভাবতে পারি, যাক, রাক্ষসের রাজত্বে আমার মতো করে ভাবে, এমন কেউ অন্তত আছে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “ঠিকই বলেছেন আপনি, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়। আমরা যেটুকু সংবাদ পাই ওদের, তাতেই জানি, রাজকন্যা উর্মি এখনও আপনার সমতুল্য না হলেও ওদের দেশের সেরা বৈদ্য হয়ে উঠেছে এখনই। মেয়েটি সত্যিই ভালো; বেশিরভাগ রাক্ষসের মতো ‘যুদ্ধ’, ‘যুদ্ধ’ করে মাথা খারাপ করে না। আমরা ওখানে গেলে সম্ভবত সে-ই আমাদের আতিথেয়তার দায়িত্ব নেবে।”

রক্ষোবৈদ্যের চোখে একটু জল চিকচিক করে উঠল। “আহা, কতদিন দেখিনি ওকে। দেখো শ্যামশ্রী, নিজের দেশের প্রতি যেটুকু টান এখনও অনুভব করি, তার প্রায় পুরোটাই ওই মেয়েটার জন্য। মাল্যপর্বত আমাকে কোনোদিন চায়নি; আমি যুদ্ধবিগ্রহ পছন্দ করি না বলে যতদিন ওখানে ছিলাম, রাজপরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও আমাকে অনেক কুকথা শুনতে হয়েছে। আমার যেটুকু সম্মান প্রাপ্তি হয়েছে, তা সমরগরিমায় আসার পর অধিনায়ক বজ্রধরের কাছ থেকে। তবু যখন মনে পড়ে যায়, আমার ছেড়ে আসা দেশে আমার মতোই একজন আছে যে বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সবাইকে ভালো রাখতে চায়, তখন বড্ড ভালো লাগে।”

অভীরা তিন বন্ধু চুপ করে দেখছিল রক্ষোবৈদ্যকে। এরকম আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে ওঁকে কখনও দেখেনি ওরা।

লীনা হঠাৎ বলে উঠল, “আমরা তো ওখানকার কিছুই চিনি না। পর্বতদা, তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?”

পর্বত স্পষ্টতই একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। অভী জানে, পর্বতকে অমরত্বের অভিশাপ দিয়ে তার নিজের দেশ থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছিল রাক্ষসরা, যদিও কারণ কী, সে জানে না।

শ্যামশ্রী তার অস্বস্তি বুঝতে পেরে বললেন, “না পর্বত, যদি তোমার অসুবিধা থাকে, তাহলে...”

পর্বত বলল, “না, আমি যাব। সঙ্গে একজন প্রকৃত রাক্ষস থাকলে তোমাদেরই সুবিধা হবে। আমি তো নিজের জাতকে ভালোই জানি। যতই নিয়ামকের চিঠি সঙ্গে থাকুক, দলে একজনও রাক্ষস না থাকলে ওরা আপনাদের সঙ্গে খুব একটা মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার নাও করতে পারে। আর আমি যদি যাই, এখনও আমার সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করবে, এত সাহস কারও হবে না ওখানে – ওই একজন ছাড়া।”

‘একজন’টা কে, অভী ভাবছিল জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু তার আগেই নীলাভ বলল, “স্বর্ণশেখর মহাসর্পিণীর গুহায় গেছে। জায়গাটা তুমি চেনো বলছিলে না, পর্বত? এই মহাসর্পিণীটা কী বস্তু? বিরাট কোনো সাপ-টাপ নাকি?”

অভী দেখল, মহাসর্পিণীর গুহার কথা উঠতেই পর্বতের মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, “পৃথিবীর বুকে যত ধরনের সাপ ঘুরে বেড়ায়, মহাসর্পিণী তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর। এর মতো হিংস্র প্রাণী দুনিয়ায় কম-ই আছে। কোনো সাধারণ অস্ত্র এর দেহে কোনো ক্ষতি করতে পারে না; তবে অনুমান করা যায়, খুব শক্তিশালী কোনো দৈবাস্ত্র দিয়ে আঘাত করা সম্ভব হলে তা হয়তো এর চামড়া কেটে ভেতরে ঢুকতে পারবে। তবে কাজটা সহজ নয় মোটেই, কারণ বিশালদেহী সাপটা চলাফেরা করে বিদ্যুৎগতিতে।”

অভীর মনে পড়ল, রবিকাকা তার চিঠিতে বলেছিল একটা মণির কথা রক্ষোবৈদ্যকে জিজ্ঞাসা করতে। সে বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়।”

তিনি ওর দিকে তাকালেন। অভী বলল, “রক্তপদ্মরাগ মণি জিনিসটা কী?”

রক্ষোবৈদ্য চমকে উঠলেন। “তুমি এর নাম শুনলে কোথা থেকে?”

“রবিকাকা বলেছিল। এই মণি উদ্ধার করতেই সে গেছে ওই সাপের গুহায়। আপনি জানেন এটা আসলে কী?”

রক্ষোবৈদ্য কক্ষে উপস্থিত সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন; তারপর বললেন, “ও ভারি দুর্লভ আরোগ্যমণি। ওর স্পর্শে সারে না, এমন রোগ দুনিয়ায় প্রায় নেই বললেই চলে। যেকোনো অভিশাপ দূর হয় ওর এক কণা রক্তে মিশলে। স্বর্ণশেখরের স্মৃতিভ্রংশ ও জিনিস সারিয়ে দেবে এক লহমাতে। খুব পবিত্র মহামণি রক্তপদ্মরাগ; ওকে ব্যবহার করার জন্যও অধিকারী হতে হয়। যে ব্যক্তি জীবনে একবারও মানুষ-মারার পাপ করেনি, কেবল সে-ই পারে ওই মণিকে ধারণ করে ওকে ব্যবহার করতে। বজ্রমাণিক হচ্ছে দুনিয়ার যত কালো, যত যন্ত্রণা, যত বিষ আছে, সবকিছুর জমাট রূপ, আর রক্তপদ্মরাগ তার ঠিক উলটো – পৃথিবীর সব শুভ শক্তির নির্যাস একজায়গায় জমাট হয়ে তৈরি হয় এই মণি। স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য হয়নি কখনও, কিন্তু মায়াচিকিৎসাশাস্ত্রে পড়েছি, বড়ো আকারের কোনো রক্তপদ্মরাগ যখন জেগে ওঠে, তখন তার জ্যোতি নাকি সহস্র সূর্যের সমান হয়।”

মেঘবর্ণ বলল, “তবে তো মুশকিল হল দেখছি। সারা জীবনে একটাও প্রাণ নেয়নি, এরকম বিশ্বস্ত লোক মাল্যপর্বত বা সমরগরিমায় কোথায় পাওয়া যাবে? যুদ্ধ করেছি এতকাল – অন্যের প্রাণ না নিয়ে আমাদের উপায় ছিল না তো।”

রক্ষোবৈদ্য হাসলেন। “আমার নাতনি উর্মিকে বোলো। ও-ই পারবে তোমাদের সাহায্য করতে। ও বৈদ্য – ও প্রাণ নেয় না, ও প্রাণ দেয়। মহাসর্পিণীর গুহা থেকে সাপটাকে মেরে যদি মণিটা উদ্ধার করতে পারো, তাহলে উর্মিই পারবে স্বর্ণশেখরকে সারিয়ে তুলতে।”

পর্বত অনেকক্ষণ শুকনো মুখে সব কথা শুনছিল, হঠাৎ সে শব্দ করে কেঁদে উঠল। অভী, লীনা, নিধি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। পর্বতের মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা রাক্ষস কাঁদছে, এ দৃশ্য ওরা কেউ কোনোদিন দেখবে, স্বপ্নেও ভাবেনি।

শ্যামশ্রী এগিয়ে এসে পর্বতের কাঁধে হাত রাখলেন; কোমল স্বরে বললেন, “কী হয়েছে? শান্ত হও পর্বত, শান্ত হও।”

পর্বত নিজেকে থামানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না; ভেতর থেকে অনেকক্ষণ চেপে রাখা আবেগ তার বেরিয়ে আসছে তীব্রবেগে।

নীলাভ, মেঘবর্ণ একসঙ্গে সামলাতে চেষ্টা করছে তাকে। বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করার পর সে একটু শান্ত হল। চোখের জল মুছে শুকনো মুখে হাসল সে।

নীলাভ বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে বলল, “কী হয়েছে, আমাদের বোলো। কেন এত কাঁদছে?”

থেমে থেমে পর্বত বলল, “মহাসর্পিণী আসলে কোনো সাপ নয়, তোমরা জানো?”

মেঘবর্ণ অবাক হয়ে বলল, “সাপ নয়? তাহলে কী?”

“অভিশপ্ত একটা মেয়ে,” পর্বত শুকনো মুখে বলল। “গোটা মাল্যপর্বতে একটিমাত্র রক্তপদ্মরাগের টুকরো ছিল। সেইটিকে ব্যবহার করার মতো লোক

কেউ ওখানে নেই, অন্তত তখন ছিল না। এ উর্মির জন্মের ঠিক পরের সময়ের কথা বলছি; রক্ষাবৈদ্য ততদিনে ওখান থেকে বিতাড়িত। সেই মণিটিকে ওরা রেখে এসেছে ওই গুহায়, আর গুহার পাহারাদার হিসাবে মায়াবলে বসিয়ে রেখেছে ওই সাপকে।”

তিনজন সমরোত্তম একসঙ্গে বলে উঠলেন, “সে কী?”

পর্বত আরেকবার চোখ মুছে নিল। “ওকে ওরা চিরস্থায়ী রূপান্তরমায়ার অভিশাপ দিয়েছিল আমার পাপের শাস্তি হিসাবে। ওকে ওরা বসিয়ে দিয়েছিল একমাত্র যে জিনিস ওর এই অভিশাপ দূর করতে পারে, তারই রক্ষক হিসাবে। আর কাউকে সত্যিটা বলতে পারিনি আমি, শুধু বজ্রধর সব জানতেন; আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি এখানে। ...ও সাপ নয়, মেঘবর্ণ; ও আমার স্ত্রী - উত্তরা।”



॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥ রক্ষোপুরী

সমরোত্তমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অভীদের সঙ্গে মেঘবর্ণই যাবে। পর্বতও যাবে বটে, তবে সে দলের সঙ্গে যাবে না। পর্বত বলেছে, “মাল্যপর্বত আমার জন্মস্থান। ওখানে যেতে হলে আমার যে অন্তত নিয়ামকের অনুমতি লাগবে না, এইটুকু আইন আমিও জানি।”

মেঘবর্ণের সঙ্গে অভীরা তিন বন্ধু চলেছিল মিত্রভবনের দিকে। জিনিসপত্র জলদি গুছিয়ে নিতে হবে। বেশ কয়েকদিন অন্তত মাল্যপর্বতে থাকতে হবে নিশ্চয়। হাতে সময় বলতে আজ রাতটুকু। কাল সকালে সৌজন্য অনুমতিপত্র জোগাড় করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা রওনা হবে।

দেরি করা ঠিক নয়। নিয়ামক বিনীতেশ যদি আবার মত পালটে ফেলেন!

মেঘবর্ণ বলল, “চলো, তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি একটু।”

তার মুখের ভাব দেখেই অভী সন্দেহ করেছিল, মেঘবর্ণ কিছু বলতে চায়, কিন্তু সংগ্রহশালায় সকলের সামনে বলতে চাইছে না। সমরগরিমার বিরাট মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। একটু দূরের অনুশীলন মঞ্চে মশাল জ্বলছে। তার আলো একটু একটু কাঁপছে সন্ধ্যার মৃদু ঠান্ডা হাওয়ায়।

লীনা আর নিধি হাঁটতে হাঁটতে একটু এগিয়ে গিয়েছিল, এমন সময় মেঘবর্ণ নীচু গলায় বলল, “অভী, শোনো, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।”

অভী বলল, “হ্যাঁ, বলো।”

মেঘবর্ণ বলল, “যা বলছি, লীনাকে বলতে পারো; তবে খবরদার, এসব কথা যেন নিধির কানে না যায়।”

অভী তাকিয়ে দেখল, মেঘবর্ণের মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। সে বলল, “ঠিক আছে। কী হয়েছে, বলো তো।”

মেঘবর্ণ বলল, “মনে আছে সকালে যখন তুমি, আমি আর নিধি বসেছিলাম, আর নিধি বলছিল তার ত্রিশূল ব্যবহার করার পদ্ধতি শিখতে ইচ্ছা করছে?”

অভীর মনে পড়ল কথাটা। তখন মেঘবর্ণ কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গিয়েছিল, সেটাও মনে পড়ল তার। উপরে নীচে মাথা নাড়ল সে।

মেঘবর্ণ বলল, “ব্যাপারটা কিন্তু আমার মোটেই ভালো ঠেকেনি, অভী।”

অভী বলল, “কেন? ত্রিশূল নিয়ে যুদ্ধ করা শেখার মধ্যে খারাপ কী আছে?”

মেঘবর্ণ বলল, “না, খারাপ কিছু নেই। কিন্তু ত্রিশূলধর মায়ার নাম শোনোনি নিশ্চয়?”

অভী বলল, “না। কী ধরনের মায়া এটা? আর এতে ভয়েরই বা আছেটা কী?”

“যেসব শিক্ষার্থী হঠাৎ একদিন কোনো কারণ ছাড়াই ত্রিশূলের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করতে শুরু করে, ভয় শুধু তাদের নিয়েই। ত্রিশূলধর মায়া তার ধারকের জন্য বড়ো খারাপ হয়। মনে রেখো, নিধি যখন সবার মতো অস্ত্রপরীক্ষা দিয়েছিল, তখন কিন্তু ওর স্বাভাবিক অস্ত্র হিসাবে ত্রিশূল বাছা হয়নি। এখন আমার মনে হচ্ছে, নিধি নিজের অজান্তেই এই মায়ার কবলে পড়েছে।”

“মানে?”

“মানে, যে সব যোদ্ধার সময় ফুরিয়ে এসেছে, তাদের অনেকেই মৃত্যুর কয়েক দিন আগে থেকে হঠাৎ ত্রিশূলের প্রতি টান অনুভব করতে থাকে। কেন এমন হয়, কেউ জানে না; কিন্তু এ জিনিস যে হয়, আমরা সমরোত্তমরা স্বচক্ষে বেশ কয়েক বার দেখেছি। আমরা তাই বলি, ত্রিশূলধর মায়া হল নিয়তির ডাক; একে খণ্ডন করার কোনো উপায় নেই। এখন আমার উপদেশ হল, সবরকমের যুদ্ধ থেকে আপাতত নিধিকে দূরে সরিয়ে রাখবে। যা বললাম, শুধু লীনাকে বলতে পারো, কিন্তু আর কাউকে নয়। ওকেও বলে দিও, ও যেন কাউকে না বলে। এসব কথা নিধি বা তার বাড়ির কারও কানে ঘুরপথে পৌঁছাক, তা আমরা মোটেই চাইছি না।”

অভীর বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন দুরুদুরু করতে শুরু করল। নিধির যদি সত্যিই কিছু হয়ে যায়... ওর বাবা, মা, নীপা...!

মেঘবর্ণ আবার বলল, “এ কথা লীনা ছাড়া কাউকে বলবে না, অভী। মনে থাকবে?”

অভী মাথা নাড়ল। “না, আর কাউকে বলব না।”

মিত্রভবনের দরজা পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিয়ে গেল মেঘবর্ণ। দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলল, “লীনা, তোমার মা তোমাকে যেতে দিতে চাইছিল না। আমি অনেক বুঝিয়ে তাকে রাজি করিয়েছি। ওখানে গিয়ে সাবধানে থাকবে।”

অভী আর নিধি ফিক ফিক করে হাসল। লীনার মা লতাদেবীর সঙ্গে মেঘবর্ণের একটা ঈষৎ মধুর সম্পর্ক ইদানীং তৈরি হয়েছে, ওরা জানে।

ওদের দিকে জ্রকুটি করে তাকাতে গিয়েও মেঘবর্ণ হেসে ফেলল। “হাসির কী হল? যাও, যাও, সুমিত্রাদেবী অপেক্ষা করে আছেন। হাঁ করে দেখছ কী?

ও, জানতে না বুঝি? তোমরা যাঁকে মিত্রমাসি বলো, তাঁর আসল নাম যে সুমিত্রা; সেই নামটাকেই শিক্ষার্থীরা আদর করে ‘মিত্রমাসি’ বানিয়েছে। ...আচ্ছা নিধি, ত্রিশূল নিয়ে কতটা অভ্যাস করলে?”

নিধি বলল, “আরে, সে এক অবাক ব্যাপার। বলছিলাম না, ওই অস্ত্রটা আমার হাতে দুর্দান্ত খেলছে। প্রায় বিনা অভ্যাসেই দারুণ ত্রিশূল চালাতে পারছি আমি।”

লীনা বলল, “হ্যাঁ, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। ওর অভ্যাসের সময় আমি সঙ্গে ছিলাম। এত ভালো করছিল, মনে হচ্ছিল, যেকোনো অভিজ্ঞ যোদ্ধাকেও হারিয়ে দেবে ও ত্রিশূল হাতে। অথচ এর আগে কোনোদিন ওটা নিয়ে ও অভ্যাসই করেনি।”

মেঘবর্ণ আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিল অভীর দিকে। “হুম। ভালো কথা। ...ঠিক আছে, তোমরা এবার ঢুকে পড়ো। আমি যাই। পর্বতের সঙ্গে কিছু কথা আছে।”

তাড়াহুড়ো করে যেন প্রায় পালিয়েই গেল সে। নিধি জ্রকুটি করে বলল, “হলটা কী এর? এমন করে হুড়মুড়িয়ে দৌড় লাগাল কেন?”

অভী নিজেকে সংযত রাখল। না, নিধির সামনে লীনাকে কিছু বলা যাবে না, এমনকি লুকিয়ে লুকিয়েও না। নিধি শুনে ফেললে বিপদ হয়ে যাবে।

লীনা বলল, “ছাড়ো। থিদে পাচ্ছে। আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে। তারপরে জিনিসপত্র গোছানো আছে।”

দরজা খোলাই ছিল মিত্রভবনের। ঢুকতেই মিত্রমাসি ওদের একটু বকলেন। “ছিলে কোথায় তোমরা? এদিকে আমি খাবার নিয়ে বসে আছি সেই কখন থেকে! সব ঠান্ডা হয়ে গেল।”

লীনা বলল, “মিত্রমাসি, আমাদের জরুরি দরকারে আয়তনে ডেকেছিলেন সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রী।”

আয়তনের “জরুরি দরকার” শুনে মিত্রমাসি আর বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। নিধি বলল, “আমরা কাল মাল্যপর্বত যাচ্ছি। সকাল সকাল বেরিয়ে যেতে হবে।”

মাল্যপর্বতের নাম শুনেই মিত্রমাসির চোখ কপালে উঠল। “সে কী! সে তো রাক্ষসদের রাজ্য। তোমরা তো বাচ্চা ছেলেমেয়ে সব। তোমরা ওখানে যাবে কী করতে?”

অভী জানে, ওরা যে এক একজন প্রশিক্ষিত যোদ্ধা, মিত্রমাসির সবসময় মনে থাকে না। ওঁর কাছে ওরা সত্যিই ‘বাচ্চা ছেলেমেয়ে’। সে বলল, “আমাদের সঙ্গে সমরোত্তম মেঘবর্ণ যাচ্ছেন, মিত্রমাসি। চিন্তা করার কিছু নেই।”

“ও, আচ্ছা। মেঘবর্ণ যাচ্ছেন!” এইবার মনে হল উনি একটু নিশ্চিত্ত বোধ করছেন। “হ্যাঁ, মেঘবর্ণ সঙ্গে থাকলে নিশ্চিত্ত। ওঁর মতো মহাবীরের সঙ্গে উলটোপালটা কিছু করার মতো সাহস রাক্ষসদের দেশেও কারও হবে না।”

নিজের কক্ষে ঢুকে অভী বুঝতে পারল, তার একটু ক্লান্ত লাগছে। সকাল থেকে কম পরিশ্রম তো হয়নি। শয্যায় শুয়ে চোখ বন্ধ করল সে।

নিধির সম্পর্কে বলা মেঘবর্ণের কথাটা মনে পড়ে গেল তার। ওই মায়ার

কী যেন নামটা? “ত্রিশূলধর মায়া”! সত্যিই কি নিধি...?

মনে হতেই প্রবল আতঙ্কে চোখ খুলে শয্যার উপর উঠে বসল সে। লীনা আর নিধিই তো তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু – এদের ভালো-মন্দ কিছু হয়ে গেলে ...! চিন্তাটা মাথায় আসতেই অভী একবার শিউরে উঠল।

আর শুয়ে থাকতে পারল না সে। বিছানা থেকে উঠে টুকিটাকি যা অত্যাবশ্যকীয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, সেগুলো একত্র করতে লাগল। এই মুহূর্তে প্রিয় বন্ধুর আসন্ন মৃত্যুসম্ভাবনার চিন্তাটুকুও করতে সে মোটেই চাইছে না।

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বসেও ভাবনাটাকে পুরোপুরি মন থেকে তাড়াতে পারছিল না অভী। নিধি আর লীনা খুব হাসি-গল্প করছে; রাক্ষসদের দেশ কেমন হবে, তাই নিয়ে জল্পনা করছে, কিন্তু অভী সব কথা মন দিয়ে শুনতে পারছিল না।

ঘুমোতে যাওয়ার আগে মাথার বালিশের তলা থেকে স্বপ্ন-উপলটাকে সরিয়ে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল সে। বলা যায় না, মাথার নীচে নিয়ে শুলে যদি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখায়!

পরের দিন সকাল সকাল উঠে পড়ল ওরা। আগে যেতে হবে সংগ্রহশালা, সেখান থেকে চন্দ্রহাস নিয়ে যেতে হবে সৌজন্যর কাছে। সত্যিই কি ও পারবে নিয়ামকের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি জোগাড় করতে?

অভী আর লীনা বসেছিল মিত্রমাসির কাছে; নিধি তখনও বেরোয়নি তার ঘর থেকে। ওরা পা ছুঁয়ে প্রণাম করল মিত্রমাসিকে; তিনি মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন ওদের। তারপর একবার নিধির ঘরের দরজার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে নীচুগলায় বললেন, “অভী, লীনা, ওখানে যাচ্ছ তোমরা, খুব সাবধানে থেকো কিন্তু। ওখানকার রাক্ষসরা খুব একটা সুবিধের নয় বলেই শুনেছি। আর অর্ধরাক্ষসও ওখানে প্রচুর। ওদের জাতের কিন্তু ‘বিশ্বাসযোগ্য’ বলে খুব একটা সুনাম নেই, মনে রেখো।”

অভী আর লীনা বিশেষ কিছু বলল না। রাক্ষস আর অর্ধরাক্ষস নিয়ে মিত্রমাসির এই দুর্বল জায়গাটার কথা ওরা জানে।

নিধি বেরিয়ে এল ঘর থেকে; তার কোমরে তরবারি, হাতে ত্রিশূল। দেখে নিজের অজান্তেই একবার অভীর বুক কেঁপে উঠল।

মিত্রমাসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমরগরিমার মাঠের উপর দিয়ে ওরা হেঁটে চলল আয়তনের মূল ভবনের দিকে। নরম ঘাসে এখনও লেগে আছে শিশির; সকালের মিঠে রোদ এসে পড়েছে পায়ের কাছে। লীনা বলল, “কী ব্যাপার অভী? কী ব্যাপার নিধি? দু’জনকেই এত গম্ভীর লাগছে কেন?”

অভী চমকে উঠে অস্বীকার করল। “কই, না তো! আমি তো ঠিকই আছি।”

“ঠিক আছ?” লীনা একটা ভ্রু তুলল। “তখন থেকে দেখছি, কীসের ভাবনায় যেন মশগুল! বলি, প্রেমে-টেমে পড়লে নাকি?”

অভী হাসল। “ধুর! কী যে বলো!”

“কেন? সমরগরিমায় মেয়ের অভাব? তুমি একবার ‘হ্যাঁ’ বলে দেখো, কত মেয়ে তোমাকে প্রেম নিবেদন করার জন্য হ্যাঁ করে আছে।” হাসতে লাগল লীনা।

হাসিটা দেখতে বড়ো ভালো লাগছিল অভীর। সে সাহস করে বলে ফেলল,
“তুমি থাকতে আর অন্য কাউকে...!”

মনের কথাটা যে এইরকম হঠাৎ করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, অভী নিজেও ভাবতে পারেনি। নিধি আর লীনা দু’জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মাঠের মধ্যে। লীনা অবাক হয়ে বলল, “এটা কী হল?”

অভী কোনোক্রমে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল, “আরে, মজা করছিলাম তো!”

নিধি ছাড়ার পাত্রী নয়। “উঁহু, মজা নয়। পেটের কথা ভুল করে বেরিয়ে গেছে। অভী, সত্যি কথা বলো, সত্যি কথা বলো। বন্ধুদের কাছে কিছু লুকোতে নেই।”

অভী লজ্জা পেয়ে বলল, “কী মুশকিল! তোমরা একটা সাধারণ কথাকে এত ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দিচ্ছ কেন বলো তো?”

নিধি বলল, “অ্যাই লীনা, তুমি কিছু বলবে না?”

লীনা একবার অভীর নাকটা ধরে সম্মেহে নেড়ে দিল। “কী আর বলি? প্রলয়যোদ্ধার নাসিকার ডগাটা দেখছ তো এরই মধ্যে কীরকম লাল হয়ে গেছে! এবার নাকের ফুটো দিয়ে নরকান্নি বেরিয়ে পড়বে মনে হচ্ছে। লজ্জাবতী লতা একেবারে!”

“হি হি” করে হাসতে লাগল নিধি; বলল, “দাঁড়াও, ফিরে এসেই নীপাকে খবরটা দিতে হবে। ওকে আর তরুণকে একসঙ্গে ধরেছিলে না তুমি, অভী? ওর সাধের অভীদাদাও প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়েছে গুনলে ও খুশিই হবে।”

অভী বলল, “তোমরা থামবে, না আমি দৌড় লাগাব?”

লীনা বলল, “আচ্ছা, আচ্ছা, থামছি। বুঝতে পেরেছি, আমাকে তোমার পছন্দ নয়।”

অভী তাড়াতাড়ি বলল, “যাঃ, তাই আবার কখন বললাম?”

মেয়েদুটো আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়ল। নিধি বলল, “আর বলতে হবে না কিছু। যা বোঝার আমরা বুঝে নিয়েছি। চলো, চলো। হি হি হি!”

তার মাথায় চাঁটি মেরে লীনা বলল, “অভী, তলোয়ারটা যত ভালো চলে তোমার হাতে, তার এক শতাংশ মুখটাও যদি চলত!”

এবার অভীও হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে ওরা চলল আয়তনের দিকে।

আয়তনে পৌঁছে ওরা সোজা চলে গেল সংগ্রহশালায়। অভী ভেবেছিল, ওখান থেকে চন্দ্রহাস নিয়ে তাকে যেতে হবে নিয়ামক বিনীতেশের কার্যালয়ে সৌজন্যর কাছে। কিন্তু এখানে এসে ওরা দেখল, সৌজন্য সংগ্রহশালাতেই বসে আছে সমরোত্তমদের সঙ্গে।

অভী কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়াতে সৌজন্যই প্রথম কথা বলল। “অভী, এই নাও অনুমতিপত্র। সহঅধিনায়িকার হাতেও দিতে পারতাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, তাই তোমার হাতেই দিলাম। একবার খুলে দেখে নাও ভালো করে।”

অভীর মনের মধ্যে একটা ভয় কাজ করছিল, সৌজন্য হয়তো শেষমেশ নিয়ামককে দিয়ে অনুমতিপত্র স্বাক্ষর করাতে পারবে না। কিন্তু এই তো তার

হাতে নিয়ামকের সইকরা চিঠি! নাঃ, ক্ষমতা আছে বলতে হবে লোকটার। বিনীতেশের মতো হাড়বজ্জাত লোকের কাছ থেকে এ জিনিস আদায় করা যে সহজ কাজ নয়, সে ওরা সবাই জানে।

অভী বলল, “কী করে এ অসাধ্যসাধন করলে, সৌজন্য?”

সৌজন্য হাসল। “সেইটি হল গিয়ে আমার গোপন কথা। ভালো করে দেখে নাও, সইটা আসলই বটে, নকল নয়। সমরোত্তমবৃন্দ, আপনারাও দেখে নিতে পারেন।”

অভী কাগজটা তুলে দিল শ্যামশ্রীর হাতে। তিনি খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলেন, জিনিসটা আসল। নীলাভ্র আর মেঘবর্ণ বসেছিল পাশাপাশি; তাদের দিকে অনুমতিপত্রটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

সৌজন্য বলল, “অভী, এবার তোমার দিকের কথা রাখার পালা।”

মাথা নাড়ল অভী। সে এসে দাঁড়াল চন্দ্রহাসের কাচের বাক্সের সামনে। সমরোত্তমরা তাকিয়ে রইলেন। অভী হাত বাড়তেই বাক্সের কাচ মিলিয়ে গেল শূন্যে; তার হাতে উঠে এল শিবের বক্ষিম তরবারি চন্দ্রহাস। তার স্পর্শে স্নিগ্ধ সাদা আলো জ্বলে উঠল বাঁকা চাঁদের মতো অস্ত্রটার গায়ে। ভক্তিভরে একবার তাকে কপালে ঠেকাল অভী। সমরোত্তমরা উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এই অদ্ভুত দৈবাস্ত্রের উদ্দেশ্যে। তাঁদের দেখাদেখি লীনা আর নিধিও মাথা নীচু করল।

অভী ধরে আছে অস্ত্রটা; তার হাতে বাঁকা চাঁদ জ্বলছে, তার আলো পড়ছে তার মুখে। সে বলল, “সৌজন্য, তুমি কোনো একটা জড়বস্তুর উপর এর ব্যবহার দেখতে চেয়েছিলে। কীসের উপর আঘাত করব, বলো।”

সৌজন্যের মুখে কোনো কথা নেই। কিছু না বলে পোশাকের মধ্যে থেকে একটি ছোট্ট শঙ্খ বার করে দিল সে। জিনিসটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সে অভীকে চোখের ইঙ্গিত করল।

চন্দ্রহাস দিয়ে সামান্য চাপ দিতেই শাঁখটা ভেঙে গেল কয়েক টুকরো হয়ে। কক্ষের সবাই তাকিয়ে আছে সৌজন্যের মুখের দিকে; বুঝতে চাইছে, এই অদ্ভুত কাজটা অভীকে দিয়ে করিয়ে তার কী লাভ হল। কিন্তু সৌজন্যের মুখ যেন হঠাৎ করেই ভাবলেশহীন হয়ে গেছে। সে মুখে কোনো আবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। অভী তার কথা রাখায় সে আদৌ খুশি হয়েছে কিনা, তাও বোঝার উপায় নেই। শাঁখের ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছে সে।

অভী বলল, “কী হল, সৌজন্য?”

চকিতের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, “না, কিছু হয়নি। আমি আমার কথা রেখেছি, তুমি তোমার কথা রেখেছ। ব্যস, শোধবোধ। এবার আমি চলি; নিয়ামক মহোদয় দেরি হলে আমাকে খুঁজবেন। তোমাদের যাত্রা শুভ হোক।”

সমরোত্তমদের দিকে ফিরে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে সংগ্রহশালা থেকে বেরিয়ে গেল সৌজন্য। নীলাভ্র জ্রকুটি করে বলল, “এতক্ষণ যা হল, তার মানে বুঝলে কেউ?”

শ্যামশ্রী বললেন, “না, আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি।”

মেঘবর্ণ বলল, “মানে এর একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে, পরে হয়তো বোঝা যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হল, আমরা নিয়ামকের লিখিত অনুমতি পেয়ে গেছি। স্বর্ণশেখরকে উদ্ধার করতে যেতে আর কোনো বাধা রইল না।”

বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অভীরা এসে দাঁড়াল আয়তনের খোলা মাঠে, অনুশীলন মঞ্চের পাশে। মেঘবর্ণ বলল, “অভী, তোমার গৃধ্রকে ডাকতে হবে আজ।”

জটায়ুবাহিনীতে নিজের গৃধ্র আত্মাদিকে ডাক পাঠাল মেঘবর্ণ শব্ধে ফুঁ দিয়ে। অভীও তার মহানীলগৃধ্র অপরাজিতাকে ডাক দিল তার নীলশব্ধে বাজিয়ে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিরাট পাখিদুটো ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে নেমে এল সমরগরিমার মাঠে।

অভী একটু আগে বলে ফেলা কথাগুলো মনে করে এখনও একটু সংকোচ বোধ করছিল। সে অনুনয়ের সুরে বলল, “নিধি, আমার সঙ্গে উঠবে তুমি?”

নিধি আর লীনা দু’জনেই হাসল। নিধি বলল, “আচ্ছা, লীনার সঙ্গে যেতে লজ্জা হচ্ছে? ঠিক আছে, চলো, আমিই যাচ্ছি। ওখানে নেমে তোমাকে ওর হাতে তুলে দেব কিন্তু।”

আর কথা না বাড়িয়ে অভী উঠে পড়ল অপরাজিতার পিঠে; তার কোমরে ঝুলছে চন্দ্রহাস। তার পেছনে উঠল নিধি। ওদিকে আত্মাদির পিঠে উঠেছে মেঘবর্ণ আর লীনা।

নীলাভ্র আর শ্যামশ্রী এসে দাঁড়িয়েছিলেন মাঠে। পাখিগুলোর বিরাট ডানার ঝাপটে চুল উড়ছে তাঁদের; কোনো কথা শুনতে পাওয়াই দায়। তারই মধ্যে নীলাভ্র চিৎকার করে বলল, “চিন্তা নেই। পর্বতও যাচ্ছে একটু পরেই।”

শূন্যে উঠে পড়েছে দুই মহাগৃধ্র, উড়ে যাচ্ছে তারা পীতপত্রবনের দিকে। নীচে রয়ে যাচ্ছেন শ্যামশ্রী আর নীলাভ্র; হাত নাড়ছেন ওঁরা তাদের উদ্দেশে।

ওরা যখন উড়ে যাচ্ছে মৃত দেবতার নদীর উপর দিয়ে, তখন পেছনে নিধির গলা একবার শুনতে পেল অভী। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল সে।

খুব গম্ভীর গলায় নিধি বলল, “একটা কথা, অভী। তখন সবাই মিলে হাসাহাসি হচ্ছিল, মজা হচ্ছিল বলে আর এই কথাটা তুলে রসভঙ্গ করিনি।”

অভী একটু অবাক হয়ে বলল, “কী হয়েছে, খুলে বলো তো।”

নিধি বলল, “মিত্রমাসি তোমাদের যা বলছিলেন, আমি আমার ঘর থেকে সবই শুনতে পেয়েছি।”

অভী কী বলবে, বুঝতে পারল না। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে বলল, “উনি যাই বলে থাকুন, আমি বা লীনা যে সেগুলো আদৌ মন থেকে বিশ্বাস করি না, এইটুকু ভরসা আছে তো আমাদের উপর?”

নিধি বলল, “আছে। শুধু...” বলতে বলতে একবার চোখ মুছল সে।

অভীর খুব অপ্রস্তুত লাগছে; কী বলবে, বুঝতে পারছে না। অপরাজিতার বিরাট ডানার শব্দে কথাগুলো যেন কানের পাশ দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে; মুখে এসে লাগছে সকালের প্রবল বাতাস। অর্ধরাক্ষস হিসাবে নিধির

অভিযোগের জায়গাটা তার অজানা নয়। অভী ভাবছে, কীভাবে নিধিকে বোঝাবে সে।

নিধি বলল, “শুধু কোন্ জিনিসটা খারাপ লাগে জানো? মিত্রমাসির মতো ধ্যানধারণা নিয়ে চলে, এমন মানুষের সংখ্যাই সমরগরিমায় বেশি। আমরা অর্ধরাক্ষসরা আমাদের দেশের জন্য লড়াই করি, প্রাণ দিই, তবু দিনের শেষে আমাদের পরিচয় – আমরা অর্ধরাক্ষস, আমাদের বিশ্বাস করা যায় না। শর্বর যখন এসেছিল, আমি আমার সবটুকু দিয়ে লড়াই করিনি? আমার নিরস্ত্র বোনটা ছুটে আসেনি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে? গোটা সুদক্ষিণসারির প্রায় সব অর্ধরাক্ষস সেদিন রাক্ষসদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি? আমরা সবাই বিশ্বাসঘাতক নই, আমরা সবাই অশান্তি চাই না – এ কথা মানুষদের কীভাবে বিশ্বাস করানো যায়, বলতে পারবে আমাকে?”

অভী চুপ করে রইল। তার পিঠে হাত রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল নিধি।

অপরাজিতা উড়ে চলল মৃত দেবতার নদী পেরিয়ে মাল্যপর্বতের দিকে। তার উঁচু উঁচু চূড়াগুলোর উপর এসে পড়েছে রোদ। বেশ কয়েক জায়গায় এখনও কুয়াশার চাদর জমা হয়ে আছে চূড়ার গায়ে; সেইসব জায়গায় রোদ ঢুকতে পারছে না ভেতর পর্যন্ত। পাহাড়ের গায়ে গায়ে লম্বা লম্বা, অদ্ভুতদর্শন গাছ চোখে পড়ছে ওদের।

অভী সান্ত্বনার সুরে বলল, “নিধি, কেঁদো না। আমরা বন্ধুরা তো আছি। আমরা তো জানি, তুমি আমাদেরই একজন। মিত্রমাসির মনে সবসময় অর্ধরাক্ষসদের নিয়ে একটা অকারণ ভয় কাজ করে। ওঁর কথায় এত দুঃখ পেয়ো না।”

নিধি গলার মধ্যে একটা ‘হুম’ শব্দ করল।

শর্বরকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল মাল্যপর্বতের যে বিশেষ অঞ্চলে, এই দূর থেকেও সেটা চিনতে পারল অভী। আজ অবশ্য সেদিকে যাওয়া হচ্ছে না; ওই অঞ্চলকে উত্তর-পূর্ব কোণে রেখে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে সোজা পূবমুখো। মেঘবর্ণের আছুদি যাচ্ছে ওদের সামনে; লীনা ভয়ে ভয়ে কোমরটা ধরে রেখেছে মেঘবর্ণের, দেখতে পাচ্ছে অভী।

মাল্যপর্বত যে এত বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে, অভী এতদিন বুঝতে পারেনি। রাক্ষসদের রাজত্বের সীমানা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে, সেই জায়গার পাহাড়গুলোর মাথা যেন কেমন খোঁচা খোঁচা রূপ ধারণ করেছে। পাহাড়ের গায়ের শ্যাওলামাথা সবুজ রূপটা যেন ধীরে ধীরে ন্যাড়া হয়ে আসছে; তাদের নিচের পাহাড়গুলোর মধ্যে কী ভীষণ একটা ধূসর, রুক্ষ ভাব! যেন এতটুকু কোমলতা, সরসতা কোথাও আর অবশিষ্ট নেই।

নিধি এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে বলল, “কী মনখারাপ হয়ে যাচ্ছে না জায়গাটাকে দেখে? নতুন দেশে আসছি বটে, কিন্তু একটুও যেন আনন্দ জাগছে না।”

অভী মাথা নাড়ল। তারও মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। নীচের দিকে তাকাতে সে দেখতে পেল, একটা সরু নদী বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। নদীর জলের হলুদ রংটা দেখে সে আন্দাজ করল, এটা সম্ভবত মৃত দেবতার

নদীর শাখানদী হবে।

এতক্ষণে ওরা এসে পড়েছে রাক্ষসদের বাসযোগ্য অঞ্চলের মধ্যে। ছোটো ছোটো বাড়ি দেখা যাচ্ছে উপর থেকে। সব বাড়িই পাথরের তৈরি; পাহাড়ের কোলে কোলে তাদের লাগছে বাচ্চাদের খেলনা বাড়ির মতো। অপরাজিতা আরেকটু নীচে নামতে অভী বুঝতে পারল, বাড়িগুলোর ছাদে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে।

যা শুকনো জায়গা! যেটুকু জল পায় এরা, সেইটুকুকেই কাজে লাগাতে চেষ্টা করে মনে হয়।

ওই যে দূরে বিরাট দুর্গের মতো জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, ওটাই কী...?

নিধি পেছন থেকে তার মনের কথাটারই প্রতিধ্বনি করল। “মনে হচ্ছে, ওটা রাজপুরী, অভী।”

অভীও তাই ভাবছিল। এইসব ছোটখাটো বাড়ির মাঝে ওই সুবিশাল জায়গাজুড়ে তৈরি হওয়া অটালিকাটা রাজপুরী হওয়াই সম্ভব।

আহুদি ওই দিকেই যাচ্ছে। মাটি থেকে এত উঁচুতে এতদূর থেকে মেঘবর্ণের সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব, কিন্তু সে হাত তুলে অভীদের ইশারা করে ওদিকে আসতে বলল। তার পেছনে লীনা বসে আছে; প্রবল হাওয়ায় চুল উড়ছে তার; মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে বেশ উত্তেজিত।

এগিয়ে চলল ওরা রাজপ্রাসাদের দিকে। উপর থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, বিশাল প্রাকারের কেন্দ্রস্থলে প্রাসাদটা আছে বটে, কিন্তু তার চারপাশের জায়গাও কম নয়। সুউচ্চ দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা আছে রক্ষোপুরী; সেই সীমাপ্রাকারের উপরে টহল দিচ্ছে প্রহরীরা। প্রাকারগাত্রের প্রচণ্ড ভারী দরজাটা তৈরি হয়েছে লোহার ফ্রেমে মোটা মোটা কাঠের তক্তা বসিয়ে। হাতি এনেও এ দরজা ভাঙা সহজ হবে না।

আহুদির পিঠ থেকে মেঘবর্ণ ওদের ইশারা করছে দুর্গের বাইরেই নামতে। অভী ভাবছিল, আকাশপথেই উড়ে গিয়ে প্রাসাদের সামনে নামবে, কিন্তু নিধি তাকে দেখিয়ে দিল, প্রাকারের উপরে কম করেও পঁচিশজন ধনুর্ধর রাক্ষস তাদের দিকেই লক্ষ্যস্থির করে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে; বিনা-অনুমতিতে আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ভেতরে ঢুকতে গেলেই মরতে হবে।

পাথুরে একটা গিরিপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘিরে রেখেছে দুর্গপ্রাকারের মুখের দু'পাশ। অভী বুঝতে পারছে, জায়গাটা ভৌগোলিকভাবে খুব সুবিধাজনক অবস্থানে আছে – শত্রুসৈন্য চাইলেও সহজে ভারী আক্রমণ করে উঠতে পারবে না দুর্গদ্বারে। রাক্ষসজাতির সামরিক বিদ্যাবুদ্ধির সুনাম সে অনেকবার শুনেছিল; এইবার স্বচক্ষে দেখে একটু একটু উপলব্ধি করতে পারছে যে এরা যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে ভালোই ভাবনাচিন্তা করেছে।

বিশাল দুই গৃধ্র নেমে এল প্রাকারের দ্বারের সামনে। নিধি আর লীনা প্রথমে নামল, তারপর নামল অভী আর মেঘবর্ণ। প্রাকারের উপর থেকে রাক্ষস প্রহরী হেঁকে বলল, “থামো। আর এগিও না। কে তোমরা? কী চাও? কোথা থেকে আসছ?”

মেঘবর্ণ দু'হাত শূন্যে তুলে হাসল। “মহারাজ পুনর্বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমরা আসছি সমরগরিমা আয়তন থেকে। আমি সমরোত্তম মেঘবর্ণ, এরা আয়তনের শিক্ষার্থী।”

রক্ষীদের মধ্যে যে একটা হালকা উত্তেজনার আভাস দেখা গেল, সেটা খেয়াল করল অভী। মহাবীর সমরোত্তম মেঘবর্ণের নাম এই রাক্ষসেরা শুনেছে, কিন্তু তাকে হঠাৎ এইরকম সামনাসামনি দেখতে পাবে, ওরা বোধহয় কোনোদিন ভাবেনি। ওদের এই কয়েক মুহূর্তের জন্য বোকার মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকাটা দেখে অভীর বেশ মজা লাগছিল।

তারপর একজন রক্ষী বলল, “মহারাজ আগন্তুকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। তার উপর আপনারা আসছেন সমরগরিমা থেকে। আপনারা আমাদের মিত্রপক্ষ নন, সমরোত্তম মহোদয়। মহারাজ কেনই বা আপনাদের দর্শন দেবেন?”

অভীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল লীনা আর নিধি। লীনা ফিশফিশ করে বলল, “অবস্থা তো সুবিধের ঠেকছে না। এতদূর এসে খালি হাতে ঘুরে যেতে হবে নাকি?”

নিধি বলল, “আরে না। ‘তুমি’ থেকে ‘আপনি’তে পৌঁছেছি তো আমরা। মেঘবর্ণের উপর ভরসা রাখো। ও ঠিক ব্যবস্থা করবে।”

সত্যিই তাই। মেঘবর্ণ বলল, “রক্ষী, আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। মহারাজ যদি শোনেন, স্বয়ং প্রলয়যোদ্ধা এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি বিষয়ে আলোচনা করতে, আর তুমি তাঁকে দুর্গদ্বার থেকে ফিরিয়ে দিয়েছ, তাহলে তোমার অবস্থা কী হবে, বুঝতে পারছ?”

এবার প্রাকারের উপরে দাঁড়ানো রক্ষীদের মধ্যে সত্যিই সাড়া পড়ে গেল। “প্রলয়যোদ্ধা?” “সত্যি প্রলয়যোদ্ধা?” “কই, কোনটা প্রলয়যোদ্ধা? ওই ছেলেটা?”

অভীর অস্বস্তি লাগছিল বটে, কিন্তু সে বুঝতে পারছিল, মেঘবর্ণ মোক্ষম চাল চলেছে। ‘প্রলয়যোদ্ধা’কে দরজা থেকে ফিরিয়ে দেবার সাহস এই সামান্য দুর্গরক্ষকদের হবে না।

উঁচু থেকে রক্ষীদের একজন বলল, “আমরা শুনেছি, প্রলয়যোদ্ধার দু'হাতেই নীল রঙের নিয়তিলাঞ্ছন আছে। সেই প্রমাণ আপনারা দেখাতে পারবেন?”

অভী তাকাল মেঘবর্ণের দিকে। সে একটু মাথা হেলিয়ে ‘হ্যাঁ’ বলল। এক পা এগিয়ে এসে অভী তার দু'হাত মেলে ধরল আকাশের দিকে। বিস্ময়সূচক শব্দগুলো ভেসে আসতে থাকল রক্ষোপুরীর প্রাকারের উপর থেকে।

অভী বুঝতে পারছে, অনেকগুলো বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি তার উপরে আটকে আছে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বিরাট ভারী দরজাটা আস্তে আস্তে কিছুটা ফাঁক হল। কয়েকজন রাক্ষস বেরিয়ে এল বাইরে। তাদের মধ্যে একটু আগে যে কথা বলছিল উপর থেকে, সেও ছিল।

সে বলল, “আপনাদের কাছে কোনো সরকারি লিপি আছে? মানে, আপনারা যে সমরগরিমা থেকেই আসছেন, তার কোনো প্রমাণ আছে?”

“আছে। সমরগরিমার মাননীয় নিয়ামক বিনীতেশ মহারাজ পুনর্বসুকে একটি লিখিত বার্তা দিয়েছেন। তবে সে বার্তা আমরা মহারাজের হাতেই দিতে চাই। আপনি চাইলে আপনাকে শিলমোহর করা চিঠিটা দেখাতে আমাদের আপত্তি নেই।”

পোশাকের মধ্য থেকে চিঠিটা বার করে দেখাল মেঘবর্ণ। রক্ষী রাক্ষস জিনিসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে ফেরত দিল। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে সন্তুষ্ট।

সে বলল, “আসুন আপনারা ভেতরে। মহারাজের কাছে ইতিমধ্যেই সংবাদ পাঠানো হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে অবিলম্বে ফিরতি সংবাদ নিয়ে আসবে দূত। সে এলেই আপনারদের নিয়ে যাওয়া হবে তাঁর কাছে।”

“অতি উত্তম,” মেঘবর্ণ বলল। “ভেতরে এসো তোমরা।”

বিরাট দরজার ফাঁক দিয়ে গলে ওরা ঢুকে পড়ল ওপারে। সুবিশাল মাঠ, তারপরে অনেকগুলো ছোটো ছোটো পাথরের ঘর, সেগুলো পেরিয়ে শুরু হচ্ছে চৌকো চৌকো পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। সে রাস্তা সোজা চলে যাচ্ছে যেদিকে, সেদিকে তাকাতে ওরা দেখতে পেল প্রাসাদটাকে।

পুরো সাদা রঙের পাথর দিয়ে তৈরি রাজপ্রাসাদটাকে দেখে যেন ওরা আর চোখ ফেরাতে পারে না। আকাশপথে আসার সময় দেখেছিল বটে, কিন্তু এই সামনাসামনি দেখে মনে হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের কোনো তুলনা হয় না। বিরাট সিংহদুয়ারের সামনে একসার সিঁড়ি, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বর্ষাহাতে দু’জন রাক্ষসপ্রহরী – সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছে তারা।

মাঠের একপ্রান্তে অন্তত পঞ্চাশজন রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রচালনা অভ্যাস করছে; তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে বিশালদেহী একজন বর্মপরা রাক্ষস। এতদূর থেকে মুখটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তার, কিন্তু দেখে এইটুকু অনুমান করা কঠিন নয় যে লোকটা ভয়ানক দক্ষ যোদ্ধা। অভী দেখল, তার দিকে চেয়ে মেঘবর্ণের মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল।

শক্তপোক্ত চেহারার সুদর্শন একটি লোক এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। বয়স খুব বেশি নয়; হয়তো অভীর চেয়ে বছর তিন-চারেক বেশি হবে। তার পোশাক রক্ষীদের মতো নয় একেবারেই; মুখটাও গোমড়া নয়, বরং চোখের মধ্যে বেশ একটু হাসির আভাস পাওয়া যায়। রক্ষীদের নেতার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঈষৎ নত করে অভিবাদন জানিয়ে সে বলল, “মহারাজ অতিথিদের নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন।”

রক্ষীনেতা বলল, “ভালো কথা। তুমিই এঁদের নিয়ে যাবে তো, প্রফুল্ল?”

লোকটি মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ, আমিই নিয়ে যাব। স্বয়ং প্রলয়যোদ্ধা এসেছেন শুনে রাজা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। আমাকে বলেছেন, বিশেষ যত্নসহকারে এঁদের নিয়ে যেতে।”

রক্ষীনেতা চোখ নাচিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলল, “কাল তাহলে হচ্ছে...?”

প্রফুল্ল বলল, “সে তো বটেই। সেনানায়িকা এ সুযোগ ছাড়বেন বলে মনে হয় না।”

ওরা কীসের কথা বলছে, অভীরা কেউই বুঝতে পারল না। প্রফুল্ল ওদের দিকে ফিরে বলল, “আপনারা দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।”

মাঠজোড়া সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে ওরা হেঁটে চলল। প্রাকারের মাথা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে মাল্যপর্বতের কয়েকটা চূড়া।

যে ধূসর শুষ্কতা ওরা এতক্ষণ বাইরে দেখে এসেছে, রক্ষপুরীর চত্বরে তার ছিটেফোঁটাও নেই। স্বাস্থ্যবান সবুজ ঘাস, সুন্দর করে ছাঁটা গুল্মের সারি – তাতে জল দিচ্ছে মালিরা। পাখির ডাকও মৃদুভাবে ভেসে আসছে দূরের গাছগুলো থেকে। বাইরের কঠোর করুণ দৃশ্যের বিপরীতে ভেতরের এই সুন্দর শ্যামলতা কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকল অভীর চোখে। মনটাকে সে সরিয়ে আনল প্রফুল্ল-র দিকে। কথা বলছে প্রফুল্ল মেঘবর্ণের সঙ্গে।

প্রফুল্ল বলছে, “অনেক অনেক দিন হয়ে গেল, সমরগরিমা থেকে কোনো দর্শনার্থী আমাদের দেশে আসেনি। আপনাদের সাহস আছে বলতেই হবে, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। রাক্ষসদেরই যুদ্ধে হারিয়ে খোদ রাক্ষসদের দেশে এসে হাজির হওয়ার সাহস পেলেন কী করে আপনারা, ভেবেই পাচ্ছি না আমি।”

মেঘবর্ণের মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, “ও তুমি বুঝবে না, সৈনিক। সেই জন্যই তো আমরা তোমার মহারাজের কাছে এসেছি, তোমার কাছে আসিনি।”

মুখের মতো জবাব পেয়ে প্রফুল্ল একটু থমকে গেল। কিন্তু সে পাকা লোক, অতিথিদের সঙ্গে অভদ্রতা করল না; একটু হেসে কথাটা হজম করে নিল।

একটু দূরে মাঠের উপর একটা জটলা দেখে লীনা জিজ্ঞাসা করল, “ওখানে কী হচ্ছে?”

সৈনিকের পোশাক পরা অনেক মানুষ গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মাঠের একটা অঞ্চলকে। ওই বৃত্তটার মধ্যে খুব উত্তেজনাকর কিছু একটা হচ্ছে নির্ঘাৎ, কারণ কিছুক্ষণ ছাড়া ছাড়াই লোকগুলো ভয়, বিস্ময় আর আনন্দ মেশা একটা চিৎকার করে উঠছে।

প্রফুল্ল বলল, “ওখানে? ওরে বাবা! ওখানে যে আছে, তার সঙ্গে ভুলেও ঝামেলায় জড়িও না, তাহলে মৃত্যু অবধারিত।”

অভী বলল, “ব্যাপারটা কী? কে আছে ওখানে?”

প্রফুল্ল বলল, “এমন একজন রাক্ষস, যার নাম শুনে রাক্ষসদেরও ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যায়।”

মেঘবর্ণের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল অভী, সেখানে অসম্মতির কোনো চিহ্ন নেই। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে গেল জটলাটার দিকে। দলের বাকিরাও হাঁটা দিল তার পেছন পেছন।

যে রাক্ষসকে সব রাক্ষস ভয় পায়, তাকে একবার না দেখলে চলে?

জমায়েত হওয়া রাক্ষসদের ভীড় ঠেলে ওরা ঢুকে এল কিছুটা ভেতরে। কিন্তু ভেতরে হাতে একটা সুদীর্ঘ তরবারি নিয়ে যে ঘুরছে, তাকে দেখে অভী চূড়ান্ত অবাক হল।

একটা বাচ্চা ছেলে – বড়োজোর নয় কি দশ বছর বয়স হবে। এই নাকি সেই ভয়ংকর রাক্ষস?

তার পাশ থেকে ফিশফিশ করে প্রফুল্ল বলল, “আমি তো বলি, যদি কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হয়, তাহলে তাকে শুধু এর সামনে ছেড়ে দেওয়া হোক। ক্ষুধার্ত পাহাড়ি সিংহের চেয়েও ভালো কাজ করবে এই ছোকরা।”

তার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মেঘবর্ণ। সে নীচু গলায় বলল, “অভী, এ ছেলেটা সাধারণ কেউ নয়, হতে পারে না। অনেকদিন অস্ত্রশস্ত্র আর যোদ্ধাদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি আমি। আমি আর তোমার বাবা – সমরগরিমায় এই দু’জনই এতকাল শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা বলে ভেতরে ভেতরে একটু গর্ব অনুভব করে এসেছি এতদিন। কিন্তু এই বয়সেই এইরকম দ্রুত নড়াচড়া আর তরবারি দিয়ে আঘাত করার এর যে ক্ষমতা, সে ক্ষমতা আমাদের আজও হয়নি। কী অনায়াসে প্রতিপক্ষের প্রত্যেকটা আঘাত আটকে দিয়ে তাকে নাজেহাল করে দিচ্ছে, দেখো শুধু একবার। আর এর আঘাত করার মধ্যে একটা অদ্ভুত হিংস্রতা আছে, সেটাও চোখে পড়ছে তোমার নিশ্চয়। এ শুধু অস্ত্র অভ্যাস করার জন্য লড়ছে না – প্রতিপক্ষের প্রাণ নেওয়ার জন্য লড়ছে। বাচ্চা ছেলে বলে একে ভুল কোরো না; এ একটা খুনে যন্ত্র, আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে।”

লীনা আর নিধিও হাঁ হয়ে গেছে ছেলেটাকে দেখে। যেকোনো ধরনের অস্ত্রেই সে সমান স্বচ্ছন্দ। যতই তার সামনে অনুশীলন করতে আসা প্রতিপক্ষ কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে, দর্শক রাক্ষসরা ততই হর্ষধ্বনি করে উঠছে।

প্রফুল্ল বলে যাচ্ছিল, “এ ছেলে আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে হারেনি, জানেন? মুখোমুখি লড়াইয়ে আজ পর্যন্ত ওর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনি। এইটুকু বয়সেই ওর মতো মায়াধর আমাদের গোটা দেশে একজনও নেই।”

মেঘবর্ণ বলল, “বটে? কী ধরনের মায়া জানে ও?”

প্রফুল্ল বলল, “জানে না কী, সেটাই জিজ্ঞাসা করুন। ধ্বংস করার, যুদ্ধ করার যত রকমের মায়া হয়, সব ওর হাতের মুঠোয়। দূর থেকে যেকোনো জিনিসকে টেনে আনতে পারে ও, আবার কাছের যেকোনো জিনিসকে বহুদূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে – এত ক্ষমতা ওর। কোনো যোদ্ধা ওকে আক্রমণ করার আগেই ও বুঝে ফেলে, কীভাবে আক্রমণ আসতে চলেছে। ওর সামনে বেশিক্ষণ বসে থাকলেই আমাদের মাথার যন্ত্রণা করে – এতখানি তীব্র মায়াবিচ্ছুরণ করে ও। আমাদের সেনানায়িকা বলেন, ও নাকি মনের কথাও পড়ে ফেলতে পারে।”

অভী সশংকচিত্তে ভাবছিল, এইরকম কোনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হলে জয়ের কোনো আশাই আর নেই। ঠিক তখনই ছেলেটা মুখ তুলে তাকাল তার দিকে – তার কাজলটানা বড়ো বড়ো চোখ দুটো কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে রইল অভীর মুখের উপর।

অভী হাসল। ছেলেটা হাসল না, মুখ ফিরিয়ে নিল।

একটু আগে যে বর্মপরা বিরাটদেহী রাক্ষসকে দেখে মেঘবর্ণের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল, সেই রাক্ষসটাই যে এই ছেলেটার প্রশিক্ষক, এইটুকু বোঝা যাচ্ছিল। এতক্ষণ তার পিঠের দিকটাই দেখতে পাচ্ছিল ওরা। যেইমাত্র সে ওদের দিকে মুখ ফেরাল, অমনি অভীর মনে হতে লাগল, একে সে আগে কোথাও দেখেছে।

নিধিও পেছন থেকে ফিশফিশ করে বলল, “আরে, একে এত চেনা চেনা লাগছে কেন?”

মেঘবর্ণ বলল, “চেনা চেনা লাগারই কথা। কিন্তু ওর পরিচয় পরে দেব, আপাতত চলো রাজার কাছে যাওয়া যাক। তবে জেনে রাখো, লোকটা আদৌ সুবিধের নয়। ওর নাম আলোকপর্ণ।”

প্রাসাদের সামনেই একটা বিরাট পাথরের সিংহের হাঁ-করা মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে জল, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কম করে একশো মেয়ে-পুরুষ। প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধাতুর বালতি আর হাঁড়ি। অতীকে অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রফুল্ল বলল, “আজ সোমবার; আজ জলদান দিবস কিনা।”

অতীরা তিন বন্ধু একসঙ্গে প্রশ্ন করল, “মানে?”

প্রফুল্ল বলল, “নতুন দেশে এসেছ; কিছু ব্যাপার তো নতুন লাগবেই। এখানে অভাব যদি কিছুর থাকে, তা হল জলের। অল্প কিছু ঝরনা ছাড়া সাধারণ মানুষের কাছে জল পাওয়ার কোনো উপায় নেই। শুকনো পাহাড়ি দেশ আমাদের; বৃষ্টিও খুব বেশি হয় না এখানে। তাই মহারাজ পুনর্বসু দয়া করে প্রতি সোমবার প্রাসাদের জলের উৎস খুলে দেন দেশবাসীর কাছে – পরিবারপিছু সপ্তাহে দুটি করে জলপাত্র ভরে নিয়ে যেতে পারে সবাই।”

সারা সপ্তাহে গোটা পরিবারের বরাদ্দ মাত্র দুটি জলপাত্রের জল! ভাবতেই অতী শিউরে উঠল। যেটুকু এখনও দেখা যাচ্ছে, তাতে আদৌ মনে হচ্ছে না, রাজপ্রাসাদে জলের অভাব আছে। এইটুকু জল দান করে রাজা পুনর্বসু যে কীরকম দয়া করছেন দেশবাসীকে, সে বুঝে উঠতে পারল না।

ওরা এগিয়ে গেল প্রাসাদের দিকে। দ্বারের প্রহরীরা প্রফুল্লকে দেখে মাথা ঝুঁকিয়ে দরজা খুলে দিল। প্রফুল্ল বলল, “আসুন আপনারা।”

বিরাট সভাকক্ষের শেষপ্রান্তে প্রশস্ত সোপানের পর উঁচু মঞ্চ। সেই মঞ্চের উপর স্বর্ণসিংহাসনে বসে আছেন রাক্ষসরাজ পুনর্বসু। এক ধাপ নীচে তাঁর দু’পাশে বসে আছেন দু’জন ব্যক্তি – একজন পুরুষ, একজন মহিলা। প্রফুল্ল ফিশফিশ করে বলল, “রাজার বামদিকে বসে আছেন মরুময় – খুব প্রভাবশালী রাক্ষস উনি; বিরাট বড়ো ব্যবসায়ী, পাকা মাথার লোক; রাজ্যচালনার ব্যাপারে রাজাকে অনেক পরামর্শ দেন। আর ডানদিকে আছেন সেনানায়িকা প্রজ্ঞা – দেশের সব সামরিক কাজকর্ম উনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। ভয়ংকর যোদ্ধা; যুদ্ধে জয়লাভের জন্য করতে পারেন না, এমন কাজ নেই।”

রাজার দু’পাশে উদ্যত বর্ষাহাতে পাহারা দিচ্ছে দুই রক্ষী। ওদের আসতে দেখে রাজা উঠে দাঁড়ালেন – নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নীচে। রাজা উঠতে মরুময় আর প্রজ্ঞাও উঠে দাঁড়ালেন। মেঘবর্ণের দিকে তাকিয়ে রাজা একটু হাসলেন, নমস্কার করলেন।

অতী একটু অবাক হল। শত্রুপুরীতে এসে স্বয়ং রাক্ষসদের রাজার কাছ থেকে এতখানি ভদ্রতা সে আশা করেনি। মেঘবর্ণ অবশ্য যদি অবাক হয়ে থাকে, তাকে দেখে বোঝা গেল না। সেও দিব্যি মাথা নত করে নমস্কার জানাল প্রথমে রাজার উদ্দেশে, তারপর বাকিদেরকে।

অভী, লীনা আর নিধিও নমস্কার জানাল হাত জোড় করে। মেঘবর্ণ বলল, “মহারাজ, আমরা সমরগরিমা থেকে আসছি। আমাদের মাননীয় নিয়ামক মহোদয় আপনার জন্য একটি লিপি পাঠিয়েছেন। একটি বিশেষ ব্যাপারে আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী।”

রাজার ইঙ্গিতে কয়েকজন রক্ষী চারটি উঁচু কাষ্ঠাসন এনে রাখল। রাজা বললেন, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আপনার বীরত্বের খ্যাতি আমাদের রাক্ষসসমাজে অনেকদিন ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিপূর্বেও আপনি একবার আমাদের দেশে পদধূলি দিয়েছিলেন; যদিও অনেক বছর হয়ে গেছে, কিন্তু সে কথা আমাদের স্মরণে আছে। আমরা রাক্ষসজাতি বীরদের সম্মান করি। প্রলয়যোদ্ধাও এসেছেন আপনার সঙ্গে। তাঁর অলৌকিক বীরত্বের সংবাদও আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারলে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করব।”

অভীর একটু অস্বস্তি লাগছিল, কিন্তু সে বুঝতে পারছিল, সে যে প্রলয়যোদ্ধা, এই ব্যাপারটা রাক্ষসপুরীতে একটু হলেও তাদের পক্ষে যাচ্ছে। ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক, এদের দেওয়া সাহায্যটা বড়ো দরকার এই মুহূর্তে – রবিকাকার জন্য, পর্বতের জন্য।

আসনগুলোতে বসল ওরা, রাজাও বসলেন সিংহাসনে; প্রফুল্ল একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দেখে মরুময় একবার তুড়ি বাজালেন। “অর্ধরাক্ষস, তুমি এখানে কেন? এ তোমার জায়গা নয়; বাইরে অপেক্ষা করো। অতিথিদের কথা বলা শেষ হলে ওঁদের নিয়ে যাবে।”

প্রফুল্ল শুকনো মুখে একবার মাথা নত করে দ্বারের বাইরে চলে গেল। অভী আড়চোখে চেয়ে দেখল, নিধির মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে।

মেঘবর্ণ অবশ্য এতকিছু খেয়াল করেনি। সে বলল, “মহারাজ, আপনার আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ। একটি ব্যাপারে আপনার সাহায্য পেলে কৃতার্থ বোধ করব।”

সেনানায়িকা প্রজ্ঞা এবার কথা বললেন। “সে ব্যাপারটি কি যুদ্ধবিদ্যা সংক্রান্ত, সমরোত্তম মেঘবর্ণ?”

“আজ্ঞে না। তবে যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ একজন সাহসী লোককে যদি দিতে পারেন, তাহলেও খুব সুবিধা হয় আমাদের। আমরা একবার মহাসর্পিণীর গুহায় যেতে চাই।”

স্পষ্টতই চমকে উঠলেন তিনজন। রাজা পুনর্বসু মাথা নাড়লেন। “সে কী? মায়াজগতে ওর মতো ভয়ংকর প্রাণি যে খুব কম আছে! ওই সাপের গুহায় আপনারা গিয়ে করবেন কী?”

মেঘবর্ণ বলল, “আমাদের এক বন্ধু স্মৃতিভ্রংশ রোগে ভুগছেন। চিরস্থায়ী রূপান্তরমায়া প্রয়োগ করা হয়েছিল তাঁর উপর। ওই সাপ যে রক্তপদ্মরাগ মণি পাহারা দিচ্ছে, সেটিকে হস্তগত করতে পারলে তাঁর এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব।”

অভী দেখল, রক্তপদ্মরাগ মণির নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সেনানায়িকা প্রজ্ঞার চোখদুটো যেন এক মুহূর্তের জন্য বিস্ফারিত হয়ে উঠল। রাজা বললেন, “আপনারা আমাদের সম্মানিত অতিথি। দেখুন, মানুষ আর রাক্ষসদের মধ্যে

খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কোনোদিনই ছিল না, আজও নেই। কিন্তু তাই বলে আমি তো আপনাদের আত্মহত্যা করার জন্য ওই গুহায় যেতে দিতে পারি না। আপনারা নিজেরা চেষ্টা করলে কোনোদিন পারবেন না ওখানে যেতে, যদি না...”

মেঘবর্ণ বলল, “যদি না...?”

সেনানায়িকা প্রজ্ঞা বললেন, “আপনি একটু আগে যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ একজন সাহসী লোক চাইছিলেন না? ওরকম লোক আপনাকে দিলেও কাজে আসবে না, কারণ মহাসর্পিণী অসম্ভব দ্রুতগতিসম্পন্ন দানবী। চোখের পলকে আক্রমণ করে সে; এক-দু’বার সেই আক্রমণ থেকে বাঁচা সম্ভব হলেও তাকে বোকা বানিয়ে রক্তপদ্মরাগ নিয়ে আসা একান্তই অসম্ভব। আর তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, রক্তপদ্মরাগ মণি যদি উদ্ধার করতেও পারেন, ও জিনিস আপনারা কেউই ব্যবহার করতে পারবেন না।”

“কেন?”

প্রজ্ঞা একটু হাসলেন। “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আজ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে কতগুলো প্রাণ নিয়েছেন আপনি?”

মেঘবর্ণ একটু থমকে গেল। “গুণিনি কখনও। কেন?”

“প্রলয়যোদ্ধা, তুমিও অনেক রাক্ষস মেরেছ, না? আর তোমরা দুটি মেয়ে – এত বড়ো বীরদের সঙ্গে এই শত্রুর দেশে এসেছ মানে অন্যের রক্তে তোমাদেরও হাত ভিজছে, তাই না? তোমরাও যে উত্তম যোদ্ধা, এ আর আমাকে বলে দিতে হবে না। তাহলে ওই রক্তপদ্মরাগ ব্যবহার করবে কে, সমরোত্তম মেঘবর্ণ?”

অভী জানে, মেঘবর্ণ পুরো ব্যাপারটা রক্ষোবৈদ্যর কাছে আগে শুনেছে, কিন্তু সে-কথা সে এদের বুঝতে দিল না। মেঘবর্ণ বলল, “আপনি সম্ভবত ওই মণির বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন, না? চিকিৎসাবিষয়ক মায়া সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব বেশি নয়, তবে এইটুকু ধরতে পারছি যে, উপযুক্ত অধিকারী ছাড়া ও মণি অন্য কারও হাতে কাজ করে না। বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলবেন, মাননীয় সেনানায়িকা?”

প্রজ্ঞা বললেন, “আপনি ব্যাপারটা প্রায় ঠিকই ধরেছেন। অস্ট্রাঘাতে অন্যের প্রাণ নিয়েছে যে ব্যক্তি, সে রক্তপদ্মরাগ ব্যবহারের অনধিকারী। আপনারা সবাই দুর্দান্ত যোদ্ধা – কিন্তু এই মণি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সেই জন্যই আপনারা সবাই অনুপযুক্ত। আশার কথা, এই রাজপুরীতেই একজন আছেন, যিনি আপনাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। রাজকন্যা উর্মিমালা।”

রাজা বললেন, “আপনারা নিশ্চিত থাকুন, উর্মি আপনাদের সাহায্য করবে। আমার কন্যার হৃদয়টি রাক্ষসজাতির তুলনায় একটু বেশিই কোমল। কিন্তু সমরোত্তম মেঘবর্ণ, মহাসর্পিণীর আসল পরিচয় আপনি জানেন তো?”

মেঘবর্ণ মাথা নাড়ল। “জানি।”

“মহাসর্পিণী-রূপান্তরশাপ ওই মেয়েটির উপর যখন প্রয়োগ করা হয়, তখন আপনাদের বন্ধু পর্বত খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তার এই শাস্তির পেছনে ন্যায়সংগত কারণও ছিল।”

মেঘবর্ণ বলল, “আপনাদের দেশের আইন অনুযায়ী তার এই শাস্তি প্রাপ্য ছিল তো?”

রাজা চুপ করে রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। সেনানায়িকা প্রজ্ঞা বললেন, “আইনের তত্ত্বকথা এখন থাক, আমরা বরং ভাবি, মহাসর্পিণীকে আহত করা যায় কীভাবে। কোনো সাধারণ অস্ত্র তার শত্রু আঁশওয়ালা চামড়া ভেদ করতে পারে না। একমাত্র কোনো যোদ্ধা যদি দৈবাস্ত্র ধারণ করার ক্ষমতা রাখেন, তিনি হয়তো কিছু করতে পারেন। কিন্তু দৈবাস্ত্রের সমস্যা হল, সে-জিনিস যুদ্ধে ব্যবহার করা যায় না। আর যে অস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহার করাই যায় না, যোদ্ধার কাছে তার মূল্য কিছুই নেই।”

মেঘবর্ণ একটু হাসল। “সৌভাগ্যবশত এ সমস্যার সমাধান আমরা করে ফেলেছি। অভী, এঁদের একবার দেখিয়ে দাও তো।”

উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের চন্দ্রহাস টেনে বার করল সে। সঙ্গে সঙ্গে দপ করে সাদা আলো জ্বলে উঠল তার বাঁকা চাঁদের মতো ফলায়। রাজার পাশে দাঁড়ানো দুই বর্শাধারী রক্ষী তাদের অস্ত্র উঁচিয়ে ধরল।

তিনজনের চোখেই গভীর বিস্ময়। না, শুধু বিস্ময় নয়, সেই দৃষ্টিগুলোতে লেগে আছে ভয় আর প্রশংসা। রাজা প্রায় ফিশফিশ করে বললেন, “চন্দ্রহাস! স্বয়ং শিবের তরবারি! উড়ো খবরগুলো তাহলে সত্যিই। আর কোনো সন্দেহ নেই, তুমিই তাহলে প্রলয়যোদ্ধা!”

তরবারিটাকে আবার কোমরে গুঁজে নিল অভী; তার আলো ধীরে ধীরে কমতে কমতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রজ্ঞা বললেন, “চন্দ্রহাসকে দেখার পর আমার মনে একটা প্রশ্ন আসছে। আপনারা তো রক্তপদ্মরাগ মণি দিয়ে আপনাদের বন্ধুর স্মৃতি ফেরাতে চাইছেন। আর মহাসর্পিণী যে আসলে পর্বতের স্ত্রী উত্তরা, সে কথাও আপনাদের জানা। কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রলয়যোদ্ধা অভীর হাতে ধরা অব্যর্থ চন্দ্রহাস যদি একবার ওই সাপের অঙ্গস্পর্শ করে, তাহলে কিন্তু তার মৃত্যু রোধ করতে কেউ পারবে না। এক বন্ধুর উপকার করতে গিয়ে আরেক বন্ধুর এই সর্বনাশটা করতে আপনারা তৈরি তো?”

মেঘবর্ণ গম্ভীর হয়ে গেল। “এ সমস্যার সমাধান আমরা এখনও করে উঠতে পারিনি।”

প্রজ্ঞার মুখে বাঁকা হাসি। “আরও একটা আশু সমস্যা আছে, সমরোত্তম মেঘবর্ণ; এর সমাধানটাও একটু ভাববেন।”

মেঘবর্ণ বলল, “বলুন, শুন।”

প্রজ্ঞা বললেন, “মহারাজ একটু আগেই উল্লেখ করেছেন যে মানুষ আর রাক্ষসদের মধ্যে খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কোনোদিনই নেই। তাও আপনারা এসেছেন আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে, এবং আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করব, এই প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি। কিন্তু সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আপনি তো আগেও এখানে এসেছেন; আমাদের আতিথ্যস্বীকার করার শর্ত আপনি জানেন, এ কথা আমরা অনুমান করে নিতেই পারি।”

অভীরা দেখল, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেঘবর্ণের মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সে বলল, “কী বলতে চাইছেন আপনি?”

প্রজ্ঞা বললেন, “যাঁদের আমরা ‘অতিথি’ বলে স্বীকার করে নিচ্ছি, তাঁদের মধ্যে আমাদের উপযুক্ত অতিথি হয়ে ওঠার গুণাবলি আছে কিনা, আমরা যাচাই করে নিই। এ কথা তো আপনার অজানা নয়, মাননীয় সমরোত্তম। আপনি গতবার যখন এসেছিলেন, তখন আপনি খুব সহজে এবং সসম্মানে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এই তিনজন? আমাদের মহান রাক্ষসরাজ পুনর্বসুর সাহায্যলাভের আশা যদি আপনারা করেন, তাহলে এদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে এরা সেই সাহায্য পাওয়ার যোগ্য।”

দাঁতে দাঁত চেপে মেঘবর্ণ বলল, “কী রকম প্রমাণ চাইছেন আপনারা? প্রলয়যোদ্ধার বীরত্বের প্রমাণ চাইছেন নাকি?”

অভী, নিধি আর লীনা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। আবহাওয়া যে হঠাৎ করেই উষ্ণ হয়ে উঠছে, টের পাচ্ছে ওরা।

প্রজ্ঞা বললেন, “আগামীকাল এদের হরিৎপ্রান্তরে নিয়ে যাওয়া হবে। হ্যাঁ, আপনারা যে সুবিশাল সবুজ মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে এলেন, তারই নাম হরিৎপ্রান্তর। এদের একজনের মুখোমুখি হবে আমাদের একজন যোদ্ধা। না, সে যুদ্ধ আমৃত্যু যুদ্ধ হবে না; তবে দু’জনের মধ্যে যে কোনো একজন যদি মারাও যায়, তাতে আমাদের পক্ষ থেকে অন্তত কোনো আপত্তি তোলা হবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক রক্তপাত, খুনোখুনি – এগুলো আমরা রাক্ষসরা পছন্দই করি।”

মেঘবর্ণের কপাল থেকে জ্রুকুটি যায়নি এখনও। সে বলল, “কাল আপনাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধে নামছে কে, জানতে পারি?”

“সুতসোম। আপনারা তাকে এখানে আসার পথে দেখেছেন অস্ত্রবিদ্যা অনুশীলন করতে।

“ওই বাচ্চা ছেলেটা? সে তো অপরাজেয় যোদ্ধা শুনলাম। সে নাকি প্রতিপক্ষের মন পড়ে কীরকম আঘাত আসতে চলেছে, আগে থেকেই বুঝতে পেরে যায়। কথাটা কি সত্যি?”

“খুবই সত্যি কথা। সারা পৃথিবীতে ওরকম শক্তিশালী মায়াধর যোদ্ধা আর দ্বিতীয়টি নেই।”

মেঘবর্ণ গম্ভীরস্বরে বলল, “আচ্ছা, তাহলে সাহায্যপ্রার্থী অতিথিদের আপনারা এইভাবে হত্যা করেন? এই আপনাদের আতিথেয়তার নমুনা?”

রাজা পুনর্বসু হাসলেন। “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, এই আতিথেয়তা আমাদের সব অতিথিই পেয়ে থাকেন, নতুবা তাঁদের আমরা ‘অতিথি’ বলে স্বীকার করি না। আপনারাই বা ব্যতিক্রম হবেন কেন?”

প্রজ্ঞা বললেন, “সুতসোম অপরাজেয় কিনা, তাতে কীই বা আসে যায়? আপনাদের পক্ষেও তো প্রলয়যোদ্ধা আছে – তার হাতে স্বয়ং শিবের চন্দ্রহাস আছে, নরক থেকে উঠে এসে দেবতাসম ঐশিকশ্রেষ্ঠকেও পরাস্ত করেছে সে যুদ্ধে। প্রলয়যোদ্ধা তো সুতসোমের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ হবে – কী বলেন আপনি?”

লীনা আর নিধি একসঙ্গে তার দিকে তাকাল। অভীও বুঝতে পারছে, সেনানায়িকা প্রজ্ঞা ধরেই নিয়েছেন, কাল সুতসোমের সঙ্গে লড়াই করতে সে-ই নামছে। রাক্ষসরা এইভাবে দেখে নিতে চাইছে তার ক্ষমতা কতখানি।

মেঘবর্ণ বলল, “কাল এদের কারও বড়ো রকমের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকছে না, এইটুকু আপনারা নিশ্চিত করছেন তো?”

প্রজ্ঞা বললেন, “বড়ো রকমের ক্ষতি বলতে মৃত্যু বোঝাতে চাইছেন তো? দেখুন, সে সম্ভাবনা তো আছেই। সুতসোমের সঙ্গে যারা লড়াই করতে যায়, তারা সাধারণত কেউই বেঁচে ফেরে না। (অভী টোঁক গিলল।) অভী যদি মারা যায়, তাতে আমরা এই ভেবে বেশ খুশি হব যে খুব শীঘ্র অন্তত প্রলয়-টলয় হচ্ছে না। আপনারা এতে কষ্ট পাবেন জানি, কিন্তু আমরা বাকিরা এটাকে শুভ ঘটনা হিসাবেই ধরব। আর যদি সুতসোম মারা যায়? যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রহাতে মৃত্যুবরণ করার মধ্যে যে কোনো অগৌরব নেই, সে কথা আশা করি সমরগরিমার লোকেদের নতুন করে বোঝাতে হবে না। সুতসোম যদি মারা যায়, সে কষ্ট ভোগ করব শুধু আমি একা। আর কাউকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।”

রাজসভায় আসার পর থেকে লীনা আর নিধি এই প্রথম মুখ খুলল – তাও একসঙ্গে। “কেন?”

“কারণ সুতসোম আমার ছেলে। আমার একমাত্র সন্তান। আর কোনো প্রশ্ন আছে?”

বিরাট সভাকক্ষটা কয়েক মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেল।

অভী ভাবতে লাগল, কী অদ্ভুত মহিলা এই সেনানায়িকা – কীভাবে নিজের ছেলেকে মরণপণ লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দিতেও দু'বার ভাবলেন না!

নীরবতা ভঙ্গ করলেন রাজা পুনর্বসু। “এই আমাদের প্রথা, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। আপনি এসেছেন আগে এখানে; আপনি তো এসব জানতেন।”

মেঘবর্ণ বলল, “আমি ভেবেছিলাম, আমি যখন একবার আপনাদের অস্ত্রপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, আর আমাদের কাউকে ও পরীক্ষা দিতে হবে না। আপনাদের আইনও তাই বলে জানতাম।”

“ভুল জানতেন। আইন সংশোধিত হয়েছে।”

“কবে থেকে?”

“ধরুন, আজ থেকে। রাজা চাইলে যখন ইচ্ছা আইন সংশোধন করতে পারেন বৈকি।”

মেঘবর্ণের চোখ জ্বলছে অসহায় রাগে, কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু সে বলতে পারছে না। রাজাও বোধহয় তার মুখ দেখে একটু ভয় পেলেন। নরম গলায় তিনি বললেন, “যদি প্রলয়যোদ্ধা জয়ী হন, তাহলে লাভ কিন্তু আপনাদেরই। আমি কথা দিচ্ছি, প্রলয়যোদ্ধা অভী যদি কাল সসম্মানে নিজের সমরগরিমা বজায় রেখে যুদ্ধ শেষ করেন, তাহলে আমার কন্যা উর্মি নিজে আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে দ্রষ্টাদেবীর অতিদুর্গম মন্দিরে। ওর সাহায্য ছাড়া আপনারা নিজেরা কোনোভাবেই যেতে পারবেন না ওখানে। সেই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা দেবী আপনাদের বলে দেবেন, কোথায় আপনাদের স্মৃতিভ্রষ্ট বন্ধু বর্তমানে আছেন, আর কীভাবে ওই ভয়ানক মহাসর্পিণীকে পরাস্ত করে রক্তপদ্মরাগ আপনারা

উদ্ধার করতে পারবেন।”

প্রজ্ঞা বললেন, “এই সাহায্যের বিনিময়ে আমাদেরও একটা জিনিস চাই, আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি আপনাদের।”

মেঘবর্ণ একটু শান্ত হয়েছে। সে বুঝতে পারছে, রাক্ষসদের দেশে এসে রাক্ষসদের কথা শুনে না চললে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সে বলল, “বলুন, কী চাই।”

“রক্তপদ্মরাগ মণিটি ব্যবহার করা হয়ে গেলে ওটি আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে।”

“কেন?”

প্রজ্ঞা বললেন, “এই ‘কেন’র উত্তর আপনাদের দেওয়া যাবে না। ধরে নিন, রাজকার্যে লাগবে ওই মণি। যদি এই শর্তে সম্মত হন, কেবলমাত্র তাহলেই আমাদের সাহায্য আপনারা আশা করতে পারেন। আমাদের রাজকুমারী উর্মিমালাকে ছাড়া দ্রষ্টাদেবীর ওই মন্দিরে আপনারা নিজেরা যেতে পারবেন না, কারণ ওই মন্দির হল জীবন্ত আঁধারের বাসস্থান।”

‘জীবন্ত আঁধার’ শুনে মেঘবর্ণ যে একটু চমকে উঠল, সেটা ওরা তিনজনই খেয়াল করেছিল। প্রজ্ঞা বললেন, “যদি মণিটি আপনাদের কাজ হয়ে গেলে আমাদের দান করেন, তাহলে আমরা আপনাদের সাহায্য করতে সম্মত। নতুবা...”

কয়েক মুহূর্ত ভাবল মেঘবর্ণ, ওদের দিকে একবার তাকাল। অভীদের মনের কথা বুঝতে তার অসুবিধা হল না। সে বলল, “তাই হোক। আমাদের কাজ হয়ে গেলে ও মণি দিয়ে আর কী করব আমরা? তারপর ওটা দিয়ে যদি আপনাদের প্রজাদের কোনো মঙ্গল হয়, তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই।”

“অতি উত্তম,” রাজা হাসলেন। “আর কোনো জিজ্ঞাস্য আছে আপনাদের?”

এই সময় লীনা এমন একটা প্রশ্ন করে বসল যে সভার সবাই একসঙ্গে চমকে উঠল। “‘শেষমুখ’ বলে কারও নাম শুনেছেন আপনারা?”

তিনজন রাক্ষসই অস্বস্তিভরে নড়াচড়া করে উঠলেন। তারপর রাজা বললেন, “কী নাম তোমার, যোদ্ধা?”

“লীনা।”

“লীনা, তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। এই কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন তুমি?”

“এখানে আসার পেছনে এই শেষমুখ নামের লোকটাও একটা কারণ। প্রলয়যোদ্ধার মাথা নিতে চায় বলে সে হুমকি দিয়েছে।”

রাজা আর প্রজ্ঞা পরস্পরের দিকে অবাক চোখে চাইলেন। এতক্ষণে কথা বললেন মরুময়। “আমি যতদূর জানি, শেষমুখ আসলে একটা কাল্পনিক চরিত্র – বাস্তবে ওর কোনো অস্তিত্ব নেই – ঠিক সেই গল্পকথার বিষয়নিয়ন্তার মতো। লোকে মনে করে, ও নাকি একটা সাংঘাতিক রহস্যময় খুনি – কোথা দিয়ে এসে একটা প্রাণ নিয়ে চলে যায়, কেউ বুঝতেই পারে না। আর ও যাকে মারতে চায়, তার উদ্দেশ্যে একটা করে সাদা রুমাল দিয়ে জানিয়ে যায়,

‘তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।’ কিন্তু আমি মনে করি না, এই ধরনের কোনো খুনি বাস্তবিক আছে বলে।”

অভী বলল, “আমরা তাকে স্বপ্ন-উপলে দেখেছি। একজন সমরোত্তম তার মুখোমুখি হয়েছিলেন। আরেকটি মানুষের ছেলে তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে সামনে থেকে। সে আছে – আমরা জানি, সে আছে।”

প্রজ্ঞা বললেন, “এই ব্যাপারে তোমাদের সত্যি কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। আমরা কেউ লোকটাকে কখনও দেখিনি। কিন্তু বহু রাক্ষসের কাছেই আমরা তার গল্প শুনেছি। মাননীয় মন্ত্রী মরুময় সম্ভবত ঠিকই বলেছেন। তবু লোকবিশ্বাস হল, সে যাকে মারতে চায়, অনেক সময় তার নাম লেখা রেশমি রুমাল দিয়ে আসে সেই ব্যক্তিকে – আবার অনেক সময় তার শিকারের গায়ে পঁচিয়ে দিয়ে আসে ওই ধরনের রুমাল। কিন্তু আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, এই রকম কোনো খুনি আসলে কেউই নেই – একাধিক দুষ্ট লোক মাঝে মধ্যে শেষমুখ সেজে অন্যের উপর ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা মেটায়, আর আমরা প্রশাসনের লোকেরা ভাবি, শেষমুখ আরেকটা খুন করে গেল।”

রাজা বললেন, “খুনিটাকে ধরতে পারলে মোটা পুরস্কার আছে, কিন্তু তার কোনো ঘোষণা দেওয়া যায় না। আমাদের সমস্যাটা বুঝতে পারছেন তো, সমরোত্তম মেঘবর্ণ? রাষ্ট্র অস্বীকার করে বলে, ওই নামের কোনো লোক নেই, কোনোদিন ছিল না। তাহলে রাষ্ট্র তার মাথার দাম আর ধার্য করে কী করে? কিন্তু প্রলয়যোদ্ধা, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এই খুনি যদি তোমার পেছনে লেগে থাকে, তাহলে কিন্তু খুব সতর্ক হতে হবে তোমাকে।”

রাজা তাকালেন মরুময়ের দিকে। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মরুময় জোর গলায় ডাক দিলেন, “প্রফুল্ল!”

প্রফুল্ল সম্ভবত দ্বারের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল সে। মরুময় প্রীতমুখে বললেন, “অর্ধরাক্ষস হলে কী হয়, রাজকুমারীর কাছে কাজ করে এ ব্যাটা একটু আধটু সভ্যতা ভদ্রতা শিখেছে এতদিনে। ... প্রফুল্ল, অতিথিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও রাজকুমারীর ভবনে। সেবায়ত্ন করো সম্মানের সঙ্গে। আগামীকাল উর্মিমলা ভবনের হয়ে যুদ্ধ করতে নামবেন প্রলয়যোদ্ধা।”

প্রফুল্লর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, মরুময়ের প্রথম কথাগুলো তার মোটেই ভালো লাগেনি – বিশেষত অতিথিদের সামনে এসব কথা তার অত্যন্ত অপছন্দ হয়েছে। কিন্তু সে জোর করে মুখে একটা হাসি টেনে এনে বলল, “যথ্যা আজ্ঞা। ...আপনারা দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।”

অভী বুঝতে পারছে, নিধিও বেশ রেগে রয়েছে, নেহাত অপরিচিত জায়গা বলে সে চুপ করে আছে। রাজাসহ সকলকে নমস্কার জানিয়ে ওরা সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে চলল রাজকুমারী উর্মিমালার ভবনের দিকে।

সাদা পাথর বসানো অলিন্দপথে ওরা হাঁটছিল – সামনে মেঘবর্ণ, নিধি আর প্রফুল্ল, পেছনে অভী আর লীনা। এই সুযোগে ওদের একটু এগিয়ে যেতে দিয়ে নিধির কান বাঁচিয়ে অভী লীনাকে সেই ত্রিশূলধর মায়ার কথাটা জানিয়ে রাখল। লীনা শুনে চক্ষু বিস্ফারিত করে রইল। অভী ফিশফিশ করে বলল, “নিধি যেন

কোনোমতেই জানতে না পারে।”

লীনা বলল, “সে আর বলে দিতে হবে না তোমায়। এমনিতেই নিধি মারামারির সুযোগ এলে ছাড়তে চায় না। আর এরা তো দেখি এখানে সবসময় ‘মার-মার কাট-কাট’ করতেই ব্যস্ত। দায়িত্ব নিয়ে আমাদেরকেই সামলে রাখতে হবে ওকে সবরকমের লড়াই-ঝগড়া থেকে।”

অভী মাথা নাড়ল। সামনে তখন প্রফুল্ল মেঘবর্ণকে বলছে, “রাজকুমারী উর্মিমালা অন্য সবার থেকে আলাদা – ওঁর সঙ্গে দেখা হলেই বুঝতে পারবেন। খুব ভালো মনের মানুষ – কখনও কাউকে অসম্মান করে কথা বলতে শুনি নি ওঁকে।”

কথা বলতে বলতেই যে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়ালেন, তার খুব সাধারণ, আড়ম্বরহীন পোশাকসত্ত্বেও অভী বুঝে ফেলল, ইনিই রাজকুমারী উর্মিমালা। বয়স অভীদের মতোই হবে তাঁর, কিন্তু চোখের আত্মবিশ্বাস আর মুখের প্রশান্তি দেখে বোঝা যায়, মানুষটি নিতান্ত সাধারণ নন তিনি। ওদের দেখে যুক্তকরে নমস্কার জানিয়ে তিনি বললেন, “প্রফুল্ল, অনেক ধন্যবাদ অতিথিদের এখানে নিয়ে আসার জন্য। অনেক উপকার করলে আমার তুমি। এবার এসো, দরকার পড়লে আমি আবার সংবাদ পাঠাব।”

তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ মিষ্টতা আছে। মেঘবর্ণ বলল, “রাজকুমারী, আমরা...”

“আমি জানি,” হাসলেন উর্মিমালা। “আমার সঙ্গে আসুন।”

নিধি আর লীনা একবার দু’জন দু’জনের দিকে তাকিয়ে নিল। আগে কখনও রাজকন্যা দেখেনি ওরা। প্রফুল্লও দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ; তার মনোগত ইচ্ছাটা ছিল সম্ভবত আরও কিছুক্ষণ রাজকন্যার সঙ্গে কাটানোর, কিন্তু রাজকন্যা বাকিদের নিয়ে চলতে শুরু করায় সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে গেল। দলটা এগিয়ে চলল ধীরগতিতে। উর্মি বললেন, “মহারাজের আদেশ আগেই আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের যথোচিত সম্মানের সঙ্গে সেবা করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। এদিকে আসুন, আমার অতিথি-কক্ষগুলি এইদিকে।”

অতিথি-কক্ষে ঢুকে অভীদের মাথা ঘুরে গেল। কক্ষের মধ্যে কী আছে আর কী নেই! এমন বিশাল পালঙ্ক, নিজস্ব ঝরনা, সোনার পাত্রে রাখা ফলমূল, জানালায় সোনার জরিবসানো পর্দা – অভী তার সারা জীবনে এত বৈভব দেখেনি।

নিধি আর লীনারও একই অবস্থা। তাদের দু’জনের জন্য একটি কক্ষ নির্ধারিত হয়েছে, আর অভী আর মেঘবর্ণের জন্য আরেকটি কক্ষ। রাজকুমারী একটু হেসে বলল, “আপনারা বসুন না।”

সুবিশাল সেই দুধসাদা বিছানায় খুব ভয়ে ভয়ে বসল অভী; হাত বুলিয়ে একবার দেখল শয্যার উপরে পাতা চাদরের উপরে। কী নরম!

ওরা বসার পর রাজকুমারী উর্মি একবার দ্বারের বাইরে উঁকি মেরে কী যেন দেখলেন। তারপর যখন তিনি ওদের দিকে ফিরলেন, তখন তাঁর মুখের ভাব পুরো বদলে গেছে। সেই বিনীত হাসি উধাও হয়ে গেছে, তার পরিবর্তে

তাঁর গম্ভীর মুখে জায়গা নিয়েছে জ্রকুটি।

ওদের সবাইকে একবার দেখে নিয়ে খুব নীচু গলায় তিনি বললেন, “আমি এখানকার রাজকন্যা হয়েও বলছি, আপনারা এখানে থাকবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাল্যপর্বত ছেড়ে সমরগরিমায় ফিরে যান। এখানে থাকলে আপনাদের মৃত্যু অনিবার্য।”

মেঘবর্ণ বলল, “কী হয়েছে, একটু খুলে বলুন, রাজকুমারী। এসব কী বলছেন আপনি? কে মারবে আমাদের?”

“কাউকে এই কথাগুলো বলতে সাহস পাইনি এখনও। আপনাদেরই প্রথম দেখাচ্ছি - এই জিনিসগুলো একটু আগে আমার কক্ষের দরজার সামনে দিয়ে গেছে এক অজানা জটায়ু,” শুকনো মুখে বললেন উর্মি। “এটুকু একদম পরিস্কার, কেউ একজন চায় না, আপনারা এখানে থাকুন।”

বিস্ফারিত চোখে ওরা তাকিয়ে রইল উর্মির হাতে ধরা চারটে সাদা রেশমি রুমালের দিকে। চারটে নাম লেখা তাদের উপরে - অভী, লীনা, নিধি আর মেঘবর্ণ।

নিধি বলে উঠল, “কিন্তু আমরা এই চারজনই যে এখানে আসব, সে কথা জানত কে? নইলে আমাদের এই ক’জনের নাম লেখা রুমাল এল কোথেকে?”

উর্মি বলল, “রাজসভার খুব উচ্চপদস্থ কোনো লোক ছাড়া তো কারও পক্ষেই এই খবর জানা সম্ভব নয়। তাহলে কি...?”

মেঘবর্ণের মুখ ভীষণ গম্ভীর। সে বলল, “ঠিকই ধরেছেন আপনি, রাজকুমারী। আপনাদের এই প্রাসাদে শেষমুখের হাতটা ইতিমধ্যেই অনেক দূর পৌঁছে গেছে।”



।। চতুর্থ অধ্যায় ।। গভীর জলের মৎস্য

অভীরা মাল্যপর্বতের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাওয়ার পর আয়তনে ফিরে আসছিল নীলাভ। সংগ্রহশালায় ঢুকে সে দেখল, রক্ষোবৈদ্য বসে আছেন সেখানে – ভীমের গদার দিকে তাকিয়ে আছেন আনমনে।

তাকে আসতে দেখে তিনি বললেন, “নীলাভ, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলব বলেই বসে আছি।”

নীলাভ এসে বসল তাঁর সামনে। “বলুন রক্ষোবৈদ্য। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কথাটা বেশ দরকারি। আর দরকারি কথা মানে, হয় আমাদের নিয়ামক নতুবা সহনিয়ামকের কথা বলতে চাইছেন আপনি। ঠিক ধরেছি?”

রক্ষোবৈদ্য হাসলেন। “বুদ্ধিটা তোমার সেই আগের মতোই তীক্ষ্ণ আছে দেখে ভালো লাগল। হ্যাঁ, আমাদের সহনিয়ামক মহোদয়ের কথাই বলতে চাইছি। এখানে আসবার পথে ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। অল্প কয়েকটা কথা বলে কী মনে হল, জানো?”

“কী মনে হল? এতদিনে নিয়ামক বিনীতেশ একটি মনের মতো সহকারী পেয়েছেন?”

“আবার একদম ঠিক ধরেছ – একেবারে এই কথাটাই মনে হচ্ছিল আমার। অর্ধরাক্ষসদের উপর এত রাগ কেন ওর, আমি তো বুঝতেই পারলাম না।”

“কী বললেন আমাদের সহনিয়ামক?”

“বললেন, উনি অর্ধরাক্ষসদের পছন্দ করেন না, তার কারণ ওদের একটুও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। সুযোগ পেলে ওরা নাকি পেছন থেকে আমাদের ছুরি মারতে দ্বিধা করবে না। বললেন, ওদের বিশ্বাস করেই নাকি অধিনায়ক বজ্রধরকে মরতে হল।”

নীলাভ্র একটু চুপ করে রইল। চঞ্চলের ঘটনাটাকে সৌজন্য এইভাবে সব অর্ধরাক্ষসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানোর অজুহাত বানিয়ে তুলবে, সে ভাবতে পারেনি।

রক্ষোবৈদ্য আবার বললেন, “তার মতে, অর্ধরাক্ষসরা নাকি যখন দেখে রাক্ষসদের দলে গেলে লাভ আছে, তখন ওরা রাক্ষসদের দলে যায়, আর যখন দেখে মানুষদের দিকে গেলে লাভের পাল্লা ভারী, তখন ওরা মানুষদের দিকে যায়। শুধু এই কারণেই ওদের একদম বিশ্বাস করা উচিত নয়। ছায়াভবনে গতবার অনেক অর্ধরাক্ষস শর্বরের সমর্থনে যাতায়াত করত, ওর কাছে খবর আছে।”

নীলাভ্র বলল, “কিন্তু তারা তো প্রায় সবাই মাল্যপর্বতের অর্ধরাক্ষস। আর যুদ্ধে তো একপক্ষকে সমর্থন করতেই হয়। সেজন্য ওদের সবাইকে দোষী করা যায় নাকি?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “ঠিক এই কথাগুলোই আমি বলেছিলাম। ও কী বলল, জানো? ও বলল, ‘আমি তাদের দোষ দিচ্ছি না; কিন্তু আমি তাদের ক্ষমাও করছি না’। এবার এই কথাটা কী মানে হতে পারে, ভেবে দেখো।”

সৌজন্য কী অদ্ভুতভাবে ওদের মাল্যপর্বতে যাওয়ার অনুমতিপত্র আদায় করে দিয়েছিল নিয়ামকের কাছ থেকে, মনে পড়ল নীলাভ্র। সে বলল, “আমার মনে হয় কী, বলব? সৌজন্য হয়তো নিয়ামকের কোনো ভয়ংকর গোপন কথা জানে, আর সেই কথাটি ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ও নিয়ামককে হাতের মুঠোয় রেখেছে। প্রশাসনিক যত সিদ্ধান্ত, সব আসলে নিচ্ছে ওই ছেলেটাই – শুধু সামনে নিয়ামককে রাখছে শিখন্ডি করে।”

একটু আক্ষেপের সুরে রক্ষোবৈদ্য বললেন, “অধিনায়ক বজ্রধর থাকলে ওদের পক্ষে এত সহজ হত না ব্যাপারটা। আমি সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রীর দোষ ধরছি না, নীলাভ্র; কিন্তু তিনি তো এসব ব্যাপারে এখনও অনভিজ্ঞ। বজ্রধর শুধু সশরীরে উপস্থিত থাকলেই নিয়ামক বিনীতেশ এত বেশি কথা বলতে সাহস পেতেন না।”

নীলাভ্র মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, অধিনায়ক বজ্রধরের অসীম প্রভাবের কথা সে ভালো করেই জানত।

অধিনায়কের কথা বলতে গিয়ে রক্ষোবৈদ্যের চোখের কোণ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। “এরকম মানুষ আর দ্বিতীয়টি দেখলাম না। একদিকে এমন দুর্দর্শ যোদ্ধা, আবার অন্যদিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ পিপড়েটির জন্যও প্রাণে এমন দরদ – আমার তো মনে হয়, অস্ত্রবিদ্যা না শিখে উনি যদি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতেন, তাহলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈদ্য হতে পারতেন।”

নীলাভ্র বলল, “হ্যাঁ, সবাইকে এমন করে কাছে টেনে ভালোবাসতে আর কাউকে দেখিনি। সেবার শ্যামশ্রীর সঞ্জীবন-বন্ধনীতে উনি রক্ত না দিলে ওকে বাঁচানো যেত না।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “শুধু শ্যামশ্রী নয় গো, পর্বতের কুকুর বক্রপুচ্ছকেও রক্ত দিয়েছিলেন উনি। তুমি যখন ছিলে না, সেই সময়ের ঘটনা। শর্বরের কিছু অনুগামী গরলাগ্নি ব্যবহার করে বেচারী কুকুরটাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল।

গরলাগ্নি জানো? মৃত দেবতার নদীর জলের সঙ্গে বজ্রমাণিকের আগুন মিশিয়ে তৈরি করা হয় এই আগুন-বিষ - অতি ভয়াবহ জিনিস। এক মুহূর্তেরি না করে উনি নিজের রক্ত দিয়েছিলেন বক্রপুচ্ছকে বাঁচানোর জন্য, যদিও ভালো করেই জানতেন, এই রক্ত দেওয়া মানে নিজেকে দুর্বল করে নিজের শক্তির একটা বড়ো অংশ উনি দান করে দিচ্ছেন। এমন মানুষকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায়?"

নীলাভ বলল, "আমার আক্ষেপ রয়ে গেল, ওঁকে বলা হল না, আমি বিশ্বাসঘাতক ছিলাম না। কিন্তু রক্ষোবৈদ্য, আরও একজন শ্রদ্ধার যোগ্য ব্যক্তির কথা আপনি বাদ দিয়ে গেলেন যে?"

"কে বলা তো?"

"আপনি নিজে। শ্যামশ্রীকে, বক্রপুচ্ছকে আদৌ বাঁচানো যেত কি, যদি আপনি না থাকতেন? আয়তনের প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রতি আপনার যে বিপুল স্নেহ, তা কি আমরা বুঝতে পারি না ভাবেন আপনি? আমরা হাতে তরবারি তুলে নিয়েছি অসহায়কে রক্ষা করার জন্য, কিন্তু কোনোদিনও একটিও অস্ত্রকে স্পর্শ না করেও আপনি যেভাবে আত্মের সেবা করছেন, তার জন্য আমাদের কোনো ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়। সমরগরিমার আসল নায়ক যদি কেউ থাকে, তাহলে সে তার সমরোত্তমরা নয়, সে আপনি, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়।"

সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু হাসলেন তিনি। "নীলাভ, আমি কোনোদিন নায়ক হতেই চাইনি। সমরগরিমা বলো বা মাল্যপর্বত, বীর যোদ্ধাদের অভাব কোনো জায়গাতেই কখনও হয়নি। কিন্তু আমি কোনোকালেই যোদ্ধা ছিলাম না। আমি শুধু দেখেছি মানুষের কষ্ট, মানুষের যন্ত্রণা - সেইসব যন্ত্রণাকে আমি আরোগ্য করতে চেয়েছি। তাই যুদ্ধক্ষেত্রের রাক্ষস-নায়কদের সঙ্গে আমার কোনোকালেই বেনিনি। আমার নিজের জাতের লোকেরা আমাকে দুর্বল ভেবেছে, রাক্ষসদের সমাজের কলঙ্ক ভেবেছে; নিজের দেশ থেকে আমাকে দূর করে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। আমাকে বুঝেছিলেন শুধু ওই একটা মানুষ। আমি যুদ্ধ করতে পারতাম না, আমি শুধু পারতাম সেবা করতে। বজ্রধর আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছিলেন সমরগরিমায়। উনি না থাকলে আমি আজ যেটুকু হতে পেরেছি, তার কিছুই পারতাম না।"

শ্যামশ্রী এসে দাঁড়িয়েছিলেন কক্ষের দরজায়। রক্ষোবৈদ্যের শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন তিনি; বললেন, "আপনার সেই নাতনি তো আপনার পথে চলছে, রক্ষোবৈদ্য মহোদয়। আমার কাছে যেটুকু সংবাদ আছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার দখল এই বয়সেই চমকে দেওয়ার মতো।"

তার দিকে ফিরে রক্ষোবৈদ্য হাসলেন। "আমিও শুনেছি। আর সে-জন্য আমার খুশির শেষ নেই। কিন্তু আপনার মুখ গম্ভীর কেন, সহঅধিনায়িকা?"

শ্যামশ্রী ভেতরে এসে নীলাভের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। "অধিনায়ক বজ্রধর নেই। তাই আমাদের আরও সাবধানে থাকতে হবে। এই নিয়ামক বিনীতেশ আর তার সহনিয়ামক ছোকরাকে আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের সবচেয়ে বড়ো চিন্তার জায়গা এখন এটাই, নীলাভ - অর্ধরাক্ষসদের যেভাবেই হোক রক্ষা করতে হবে এই দুই উন্মাদের হাত থেকে। আমি যদি ঠিক

বুঝে থাকি, খুব শীঘ্রই কোনো না কোনো ভাবে সুদক্ষিণসারির অর্ধরাক্ষসদের উপর একটা আঘাত হানতে চলেছে ওরা।”

নীলাভ বলল, “কিছু আঁচ পেলে?”

শ্যামশ্রী বললেন, “আমাদের এক শিক্ষার্থী যোদ্ধাশাস্ত্র মৃগেন্দ্রর সঙ্গে এইমাত্র কথা হচ্ছিল আমার। ছেলেটি খুবই ভালো যোদ্ধা, এবং নিঃসন্দেহে সমরগরিমার মঙ্গলের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোনো সমস্যা হলে ওর সঙ্গে আলোচনা করাই যায়। ওর কাছেই গুনলাম, আমাদের আয়তনের অনেক ছাত্রছাত্রীই নিয়ামক মহোদয়ের উপর ঘোর বিরক্ত। বিশেষ করে অর্ধরাক্ষস ছাত্ররা তো মনে করছে, নিয়ামক ইচ্ছাপূর্বক তাদের গোটা জাতির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন। শর্বর-যুদ্ধের পর থেকেই সুদক্ষিণসারিতে নিয়ামকের সৈন্যদলের আনাগোনা বেড়ে গেছে; তারা যখন তখন যাকে খুশি মারধোর করছে, জরিমানা করছে, অর্ধরাক্ষস মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করছে। এর পেছনে কার প্রশয় আছে, বুঝতে আদৌ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।”

নীলাভ বলল, “সে কী? এ তো পুরোপুরি আইনবিরুদ্ধ কাজ!”

শ্যামশ্রী বললেন, “সে তো আমিও জানি। কিন্তু নিয়ামককে বললে তিনি এগুলোকে সরাসরি অস্বীকার করবেন, তুমি তো জানোই। বলবেন, এগুলো সব এক-আধটা ‘বিচ্ছিন্ন’ ঘটনা, ‘সামান্য’ ঘটনা – আমরা নাকি এগুলো নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রাজনীতি করছি।”

নীলাভর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। “অবিলম্বে এসব থামাতে না পারলে অবস্থা কতটা খারাপ হবে, বুঝতে পারছ তুমি?”

“পারছি। পারছি বলেই তোমার সঙ্গে আলোচনা করছি। সুদক্ষিণসারিতে ইতিমধ্যেই নিয়ামক-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, খবর কানে আসছে। এই মৃগেন্দ্রর বাবা রথীন্দ্র অর্ধরাক্ষস আন্দোলনের একজন মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন। ওখানে নিয়ামকের কুশপুতলিকা পোড়ানো হচ্ছে। মিছিল বেরোচ্ছে, নিয়ামক-বিরোধী বক্তব্য রাখা হচ্ছে। এই দলে চেনা মুখের অভাব নেই। নিধির বাবাও আছেন ওই দলে।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “দিগ্‌নাগ এই বুড়ো বয়সেও যোগ দিয়েছে ওই বিদ্রোহীদের দলে? কেন জানি না, ওর মেয়ে দুটো যত ভালো, ওকে আমার ততটা ভালো কোনোদিন লাগে না। সবসময় কেমন যেন একচোখোমি করতে দেখি ওকে।”

নীলাভ শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, “এ জিনিস যেভাবেই হোক থামাতে হবে, শ্যামশ্রী। এই ক্ষোভকে প্রশমিত করতে না পারলে সমরগরিমা কিন্তু ভয়ানক গৃহযুদ্ধের দিকে এগোবে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “মৃগেন্দ্রর কাছে ওদের মিছিলের কয়েকটা লেখা দেখে এলাম। ওরা লিখেছে, ‘আমাদেরও মারলে রক্ত ঝরে – আপনারই মতো’, ‘আমরাও শ্বাস নিই এই বাতাসে – আপনারই মতো’, ‘আমরাও বেঁচে থাকতে চাই – আপনারই মতো’। আর এই আন্দোলন আরও কেন ভয়ংকর হয়ে উঠছে, জানো? আমাদের আয়তনের প্রায় সব মানুষ শিক্ষার্থী এই লড়াইয়ে তাদের অর্ধরাক্ষস বন্ধুদের পাশে দাঁড়িয়ে গেছে।”

নীলাদ্র বলল, “নিয়ামক মুখ বুজে এই অপমান মেনে নেবেন, এ হতেই পারে না। আর ও-পক্ষ থেকে একটা আঘাত এলে এ-পক্ষও মোটেই চুপ করে থাকবে না। আমাদের সমরোত্তমদের খুব দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে – পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।”

হঠাৎ রক্ষাবৈদ্যের ইঙ্গিতপূর্ণ গলাখাঁকারির শব্দে থেমে গিয়ে দ্বারের দিকে তাকাল নীলাদ্র। সৌজন্য কখন যেন এসে দিব্যি হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে।

বিস্ময় এবং বিরক্তি দুই-ই চেপে সে বলল, “এসো, এসো, সহনিয়ামক মহোদয়।”

শ্যামশ্রী বললেন, “কী মনে করে, সৌজন্য?”

সৌজন্যের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন খুব একটা হাসির কথা চেপে রেখেছে। সে বলল, “একটি কথা মাননীয় নিয়ামকের পক্ষ থেকে আপনাকে নিবেদন করতে এলাম, মাননীয়া সহঅধিনায়িকা। তবে গোড়াতেই বলে রাখি, আমি দূতমাত্র, এবং তাই অবধ্য। আমাকে অভয় দিন।”

তার বলার ভঙ্গিতে শ্যামশ্রী হেসে ফেললেন; বললেন, “প্রবল পরাক্রমশালী সহনিয়ামককে এত ছদ্মভয় না পেলেও চলে। কী বলার আছে, বলে ফেলো।”

সৌজন্য বলল, “নিয়ামকের অনেক চোখ আয়তনের সর্বত্র ঘোরাফেরা করে, এ কথা হয়তো আপনারা জানেন। উনি আমাকে বলতে বললেন, মৃগেন্দ্র ছেলেটা অর্ধরাক্ষস, ওর বাবা দুষ্ট অর্ধরাক্ষসদের নেতা; তাই ওর সঙ্গে আপনার দীর্ঘ বাক্যালাপ উনি পছন্দ করছেন না।”

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন ওঁরা তিনজন। এতটা ঔদ্ধত্য নিয়ামক বিনীতেশের পক্ষেও যেন বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!

সৌজন্য যেন বিনয়ের পরাকাষ্ঠা। সে বলল, “আমার দৌত্য শেষ হল। আপনার কী উত্তর নিয়ে যাব, সহঅধিনায়িকা?”

শ্যামশ্রী অটুহাস্য করে উঠলেন। “আমার উত্তর? তোমার নিয়ামক মহোদয়কে বোলো, আমরা শিক্ষক, তাই আয়তনের প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গেই আমরা কথা বলি এবং বলব; তার জন্য ওঁর অনুমতির অপেক্ষা আমরা করি না। উনি যেন ভুলে না যান, উনি সমরগরিমার নিয়ামক, আর আমি সমরোত্তম সহঅধিনায়ক। উনি সামান্য একটা সেনাদলকে নিয়ন্ত্রণ করেন, আর আমরা গোটা সমরগরিমাকে নিয়ন্ত্রণ করি।”

সৌজন্য বলল, “এই মৃগেন্দ্রের বাবা রথীন্দ্রই ছিল মাননীয় নিয়ামক মহোদয়ের কুশপুতুল পোড়ানোর দলের নেতা। নিয়ামক সব খবরই রাখেন, এটা জানেন তো? আমাকে একটু আগেই উনি বলছিলেন, ‘আমার কুশপুতুল পোড়াচ্ছে ওরা? এবার দেখো, নিজের আগুনে কীভাবে নিজেরাই ওরা পুড়ে মরে। এখানে ওখানে একটা দুটো অর্ধরাক্ষস পিটিয়ে আমাদের গা-গরম চলছে শুধু; আসল খেলা তো এখনও বাকি আছে।’”

নীলাদ্র বলল, “সৌজন্য, মনে হচ্ছে তুমিও ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে। তাই না?”

মিষ্টি হেসে মাথা নোয়াল সে। “আমি আমার প্রভুর আদেশ পালন করছি মাত্র, সমরোত্তম নীলাভ। সমরগরিমার মঙ্গলই আমার একমাত্র লক্ষ্য।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “অর্ধরাক্ষসদের উপর তোমার প্রভুর এত রাগ কেন বলো তো?”

সৌজন্য বলল, “রাগ হবে না তো কী? পাক্কা দেশদ্রোহী ব্যাটারা। গতবার ওরা শর্বরের দলে যোগ দেয়নি? কত সাহস ওদের – এখন স্বয়ং নিয়ামকের বিরুদ্ধে মিছিল করছে! কুশপুতুল পোড়াচ্ছে! দেশের রাজার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, তারা দেশদ্রোহী ছাড়া আবার কী?”

নীলাভ বলল, “ভুল বলছ, সৌজন্য। দেশের রাজা আর ‘দেশ’ এক নয়। যে রাজা দেশবাসীর ভালো করেন না, দেশবাসীরও তাঁকে ভালোবাসার দায় থাকে না।”

মুখের হাসিটা অটুট রইল বটে, কিন্তু প্রচ্ছন্ন একটা হুমকির সুর ফুটে উঠল সৌজন্যের কণ্ঠে। “নিয়ামক আপনার কথাগুলো শুনলে মোটেই খুশি হবেন না।”

এবার নীলাভও হাসল। “নিয়ামককে খুশি করার কাজটা তোমার, সৌজন্য; আমার নয়। তুমি ওঁর কর্মচারী, আমি নই। আমার যা সত্যি মনে হয়, আমি তাই বলি; আমার যা উচিত মনে হয়, আমি তাই করি, তাই করেছি, এবং তাই করব। তোমার প্রভুকে বলে দিও, এই যে মানুষ-অর্ধরাক্ষসে ভাগাভাগির খেলা উনি শুরু করেছেন, এর ফল ভোগ করতে হবে ওঁকেই। সবরকমের শত্রুর বিরুদ্ধে সমরগরিমা বরাবর একজোট হয়ে লড়েছে, আর ভবিষ্যতেও লড়বে। নিজেকে ‘রাজা’ ভাবতে ভালবাসেন না উনি? তাই এই কথাটাও বলে দিও ওঁকে – দেশকে ভালোবাসার জন্য দেশের রাজার সঙ্গে সহমত না হলেও চলে।”

সৌজন্য বলল, “দেশের রাজা হয়তো এ কথার সঙ্গে সহমত হবেন না। অর্ধরাক্ষসরা মাননীয় নিয়ামককে অপমান করেছে; আগুনে হাত দিয়েছে ওরা – এবার হাত পুড়লে তার দায়ও ওদেরই নিতে হবে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “এখানে আমি একটা কথা বলি। সৌজন্য, তোমাকে আমার বেশ বুদ্ধিমান ছেলে বলেই মনে হয়। কারও বিরুদ্ধে রাগ পুষে রাখার পাত্র তুমি নও, যদি না তাতে তোমার কোনো ব্যক্তিগত লাভ থাকে। আমি তাই কী ভাবছি, জানো? আমি ভাবছি, তোমার লাভ এতে কোথায়? নিয়ামক বিনীতেশকে অর্ধরাক্ষসদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে তোমার কোন্ স্বার্থসিদ্ধি হবে? ব্যাপারটা কী? কোনো পুরোনো প্রতিশোধের গল্প আছে নাকি এর মধ্যে? উঁহু, ব্যাপারটা তা নয় বলেই আমার মনে হচ্ছে। আমি তোমাকে যেটুকু বুঝেছি, মনের মধ্যে প্রতিশোধ-বাসনা পুষে রাখার মতো মোটাদাগের লোক তুমি নও; বরং তার চেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত।”

সৌজন্যের মুখের ক্রুদ্ধভাব মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; দন্ত বিকশিত করে হাসল সে। “আপনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী, মাননীয়া সহঅধিনায়িকা। সত্যিই আমার এর পেছনে স্বার্থ আছে। প্রতিশোধ-টতিশোধের মতো ফাঁকা জিনিসে বিশ্বাস আমার কোনোকালেই নেই। আমি যা চাইছি, তা ওসবের চেয়ে অনেক বাস্তব, অনেক লোভনীয়। কিন্তু আসল জিনিসটা হাতে

পাওয়ার আগে যা হোক কিছু একটা করে সময়টা তো কাটাতে হবে। চিন্তা করবেন না, যথাসময়ে সব জানতে পারবেন। চললাম। আমাকে দরকার হলে গ্রন্থাগারে পাবেন। নমস্কার।”

খুব বিনীতভাবে মাথা নীচু করে সে বেরিয়ে গেল সংগ্রহশালা থেকে। রক্ষাবৈদ্য এতক্ষণ মন দিয়ে সবকিছু শুনছিলেন। তিনি এইবার বললেন, “সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রী, এ ছেলে অতি গভীর জলের মৎস্য। এর অতীত ইতিহাস খুঁজে বার করুন যেভাবেই হোক। যতদিন না এ আসলে কে আমরা জানতে পারছি, ততদিন এর উদ্দেশ্য কী, আমরা কোনোভাবেই ধরতে পারব না।”

নীলাভ বলল, “আমার উপর ভরসা রাখুন, আমি খোঁজখবর নিচ্ছি। অতিবুদ্ধিমান সহনিয়ামক মহোদয়ের আসল পরিচয় আমি খুঁজে বার করবই।”

শ্যামশ্রী মাথা নাড়লেন। “করো, করো – যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়। আমি একবার গ্রন্থাগারে যাব; সমরগরিমার আইনগুলো আরেকবার ভালো করে পড়ে দেখতে হবে। তুমি আসবে, নীলাভ?”

নীলাভ বলল, “না, তুমি যাও। আমি একবার পীতপত্রবনের দিকে যাব।”

শ্যামশ্রী কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তার দিকে; বুঝতে পারলেন, নীলাভ কেন বনে যেতে চাইছে। ম্লান হাসলেন তিনি; বললেন, “যাও। ঘুরে এসো।”

রক্ষাবৈদ্য বললেন, “বনে যাচ্ছ? চলো, আমারও কিছু ঔষধি লতা আনতে যেতে হত ওখানে।” বলেই শ্যামশ্রীর দিকে চোখ পড়ল তাঁর। সহঅধিনায়িকার চোখে নিষেধের ইঙ্গিত দেখেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন, “ও আচ্ছা, নীলাভ, তুমি যাও। একটা কাজ মনে পড়ে গেছে। সেটা সেরে আমি একটু পরে আসছি।”

“আচ্ছা, আসুন” বলে নীলাভ বেরিয়ে এল সংগ্রহশালা থেকে। বাইরের মাঠে বেশ রোদ উঠেছে। ছেলেমেয়েরা অনুশীলন মঞ্চের চারপাশে অস্ত্রচালনা অভ্যাস করছে। পর্বত দেখভাল করছে ওদের। নীলাভকে দেখে সে হাসল; বলল, “এখনও বেরোতে পারিনি। আমার মহাগৃধ্রের শরীর অসুস্থ – এখনই আমার ভার নিতে পারবে না। মনে হচ্ছে, আজকের দিনটা যাওয়া হবে না। চিন্তা কোরো না, মেঘবর্ণ আছে ওদের সঙ্গে; ও ঠিক সামলে নেবে।”

নীলাভ বলল, “জানি। মেঘের উপর আমার ভরসা নিজের চেয়েও বেশি।”

হাঁটতে হাঁটতে সে চলল পীতপত্রবনের দিকে। সুদক্ষিণসারির দিকে বঁকে যাচ্ছে ডানদিকের পথটা, আর বামদিকেরটা যাচ্ছে বনের দিকে। চলতে চলতেই নীলাভ দেখতে পেল, দুটো ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে রাস্তার সংযোগস্থলে।

দু’জনকেই চিনতে পারল সে – তরুণ আর নীপা।

তাকে আসতে দেখে দু’জনেই সসম্মুখে মাথা নীচু করে নমস্কার করল। প্রতিনমস্কার জানিয়ে হাসল নীলাভ। তরুণকে সে চেনে, তবে নীপাকে চিনলেও আগে কখনও কথা হয়নি তার সঙ্গে।

নীপা তরুণকে বলল, “তুমি এঁর সঙ্গেই তো দেখা করতে চাইছিলে। কী বলার আছে, বলে ফেলো এই সুযোগে।”

তরুণ একটু ইতস্তত করছিল। নীলাভ বলল, “আমাকে কিছু বলার আছে তোমার, তরুণ? নিঃসংকোচে বলতে পারো।”

তরুণ মাথা নীচু করে বলল, “সমরোত্তম নীলাভ, আপনার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।”

নীলাভ অবাক হয়ে বলল, “সে কী? কেন?”

“আপনাকে নিয়ে আমি কিছু অনুচিত কটুবাক্য বলেছি একসময়। আমাকে ক্ষমা করুন।”

নীলাভ হাসল। “তাতে দোষ কিছু হয়নি, তরুণ। সবাই এতদিন যা সত্যি ভেবেছে, তাই বলেছে। তুমিও যদি তাই করে থাকো, তাতে আমি দোষের কিছু দেখছি না।”

নীপা বলল, “ও এই নিয়ে অভীদাদাকেও খারাপ কথা বলেছে।”

“অভীকে?” নীলাভ এক মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা ধরে ফেলল। “তাই নাকি? অভীর কী বক্তব্য?”

তরুণ মাথা নীচু করেই ছিল। সে বলল, “অভী আমাকে ক্ষমা করেছে। আপনি...”

নীলাভ তার কাঁধে হাত রাখল। “আমিও তোমাকে ক্ষমা করছি, তরুণ। তোমার বয়স কম, শরীরে গরম রক্ত। উত্তেজনার বশে যদি কোনো অন্যায় কথা বলেই থাকো, তার জন্য তোমাদের শিক্ষক হয়ে আমি কি রাগ পুষে রাখতে পারি? তুমি যে ক্ষমা চাইতে এলে, এতেই তোমার সংসাহসের পরিচয় পাওয়া গেল; আর বিশ্বাস করো, এতে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। যাও, এ নিয়ে আর ভেবো না।”

তরুণ মাথা তুলল। “অভীকে কখনও বলা হয়নি, আপনাকে বলছি। ও সত্যিই খুব ভালো ছেলে, সমরোত্তম নীলাভ।”

নীলাভ একটু হাসল। “আমি জানি।”

নীপা তরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমিও জানি। আমার অভীদাদার মতো ভালো মানুষ হয় না, আর নিয়ামক বিনীতেশের মতো খারাপ মানুষ হয় না।”

একটু চমকে উঠে বাচ্চা মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল নীলাভ। রাগে যেন চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার। তরুণ ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলল, “নীপা, সমরোত্তম নীলাভের সামনে এই প্রসঙ্গ নাই বা তুললে।”

নীপার নাকের পাটা ফুলে উঠল। “কেন বলব না? উচিত কথা সবার সামনে বলতে কবে ভয় পেয়েছি আমি? আর সমরোত্তম নীলাভ আমাদের কথাবার্তা নিয়ামকের কানে তুলতে যাবেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনা।”

নীলাভ বলল, “ভাগ্যিস করো না। আর একটা কথা চুপিচুপি বলি। ওই নিয়ামক ভদ্রলোককে আমিও খুব একটা পছন্দ করি না। কিন্তু আমরা সমরোত্তম তো – আমাদের সবগুলো পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ্যে বলা অশোভন।”

তরুণ বলল, “কিন্তু আমরা শিক্ষার্থীরা সবাই আমাদের অর্ধরাক্ষস বন্ধুদের নিয়ে উদ্ভিগ্ন, সমরোত্তম নীলাভ। সদ্য সদ্য সুদক্ষিণসারিতে নিয়ামকের অত্যাচার আর কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে, কুশপুতুলিকা দাহ

করা হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, এবার উনি অর্ধরাক্ষসদের বিরুদ্ধে ভয়ানক প্রতিশোধ নেবেন।”

মনের উদ্বেগটা বাইরে আনল না নীলাভ; বলল, “অনর্থক ভয় পেয়ো না। আমরা সমরোত্তমরা আছি। আমাদের এড়িয়ে উনি চট করে কোনো উলটোপালটা ঘটনা ঘটাতে পারবেন না।”

ওদের কাছে আর বেশিক্ষণ থাকা সমীচীন মনে করল না নীলাভ। নীপার বাবা দিগ্‌নাগ প্রতিবাদীদের একজন নেতা। এখন নীপার সঙ্গে বেশি কথা বলা মানে বাচ্চা মেয়েটাকে অনাবশ্যক বিপদে ফেলা। নিয়ামকের কোন্ চর কোথা থেকে নজর রাখছে, কে জানে।

সমরোত্তমদের উপর নজর যে রাখা হচ্ছে, সে কথা সৌজন্য তো স্পষ্ট করেই দিয়েছে।

বামদিকের পথ ধরে পীতপত্রবনের দিকে এগিয়ে চলল সে। পেছনে রয়ে যাচ্ছে আয়তন। জঙ্গল ক্রমশ গভীর হচ্ছে।

পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে মাটিতে – হলুদ পাতায় ভরে রয়েছে অরণ্যের পথ। পায়ের তলায় মচমচ করে শব্দ হচ্ছে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। পাখি ডাকছে দূরের কোন একটা গাছে।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর নীলাভ এসে দাঁড়াল পুকুরটার পাশে। সমাধির উপরে ধাতুর ফলকে লেখা কথাগুলোর উপর ধুলো পড়েছে ইতিমধ্যেই। স্থির দৃষ্টিতে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

“প্রিয় সমরোত্তম অধিনায়ক বজ্রধর – শিক্ষক, বন্ধু, সহযোদ্ধা। আমাদের মধ্যে যে সমরগরিমা আপনি জাগিয়েছেন, তার কখনও মৃত্যু নেই।”

সমাধিফলকটাকে সযত্নে মুছে দিল নীলাভ। তারপর বসে পড়ল তার পাশে।

পুকুরের শান্ত জলে মাঝেমধ্যে এসে পড়ছে একটা-দুটো পাতা। গোল গোল তরঙ্গ উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। নীলাভ চেয়ে রইল বজ্রধরের সমাধির দিকে।

“অধিনায়ক, বিশ্বাস করুন, আমি বিশ্বাসঘাতক ছিলাম না,” ফিশফিশ করে বলল সে। “আমি যা করেছিলাম, তা এই আয়তনের ভাল-র জন্যই। আপনাকে এই কথাটুকু জানাতে পেলাম না, এই আমার বিরাট দুঃখ রয়ে গেল।”

দূর থেকে ভেসে আসা একটা দুটো পাখির ডাক ছাড়া সমস্ত বনটা নিঃশব্দ হয়ে আছে। চুপিসারে কাঁদতে লাগল নীলাভ।

হঠাৎ তার মনে হল, কী যেন নড়ছে তার চারপাশে; বনের গাছগুলো যেন তার মাথার উপর একটা চাঁদোয়ার মতো গড়ে তুলছে পাতা দিয়ে। ডালগুলো নড়ছে আপনা থেকেই; তার মাথার উপরের আকাশটা ঢেকে ফেলছে। যেন একটা হালকা, স্নিগ্ধ সুগন্ধ তার নাকে আসছে। চোখ মুছে চারপাশে তাকিয়ে দেখল সে।

গাছগুলোর গা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা হলদে রঙের আভায়, তাদের পাতাদের গায়েও কোমল হলদে আলো, আর ডালগুলো থেকে টুপটাপ ফুল ঝরে পড়ছে বজ্রধরের সমাধির উপর – যেন শ্রদ্ধা নিবেদন

করছে ওরা সমরগরিমার অধিনায়ককে।

নীলাভ্রর মুখের উপরেও এসে পড়তে লাগল ফুল। অকারণেই যেন গা-ছমছম করে উঠল তার।

অধিনায়ক মাঝে মাঝে নিভুতে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য এসে বসে থাকতেন এই অরণ্যে। কয়েকবার সে-ও এসেছে তাঁর সঙ্গে। আজ এই সময়টুকু বড়ো নিঃসঙ্গ, বড়ো অসহায় লাগছে।

সে জানে, অধিনায়ক বজ্রধরকে ছাড়া আয়তন কতখানি অসম্পূর্ণ।

তার নিজের শরীরেও আগের মতো সেই জোর নেই। ওই বীভৎস নরকবাস তাকে ভেতর থেকে যেন শুকিয়ে দিয়েছে, তার অস্ত্রদক্ষতা অর্ধেক করে দিয়েছে।

সমাধির দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল, “অধিনায়ক, যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন আপনি।”

গাছগুলো থেকে ফুল ঝরানো বন্ধ হয়ে গেছে। আরেকবার চোখ মুছে নীলাভ্র উঠে পড়ল।

ঐদিকে পাতার উপরে পায়ের আওয়াজ হচ্ছে। কে যেন আসছে।

প্রতিবর্তক্রিয়াতেই হাতটা চলে গেল কোমরে ঝোলানো তরবারির মুষ্টিতে। কে আসে এই অসময়ে এই নির্জন বনে?

আগন্তুককে দেখে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিল সে; হাসল একটু অপ্রস্তুতভাবে। “রক্ষোবৈদ্য, আপনি?”

“বললাম না, কিছু ঔষধি লতা খুঁজতে আসব এখানে? আসতে আসতে দেখি, গাছগুলো হঠাৎ মায়া-আলোক বিকিরণ করতে শুরু করেছে।” রক্ষোবৈদ্য গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুলগুলোর কয়েকটা হাতে তুলে নিয়ে নিরীক্ষণ করতে শুরু করলেন এবং নীলাভ্র এখানে কী করছিল, সচেতনভাবেই সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন।

নীলাভ্র বলল, “হ্যাঁ, আমিও দেখলাম। কী হল বলুন তো ব্যাপারটা?”

ফুলগুলোকে সযত্নে হাতের থলিটায় ভরে তিনি বললেন, “এই পীতপত্রবনের গাছগুলো সাধারণ গাছ নয়; এদের মধ্যে বর্ষণমায়া আছে।”

তাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রক্ষোবৈদ্য বললেন, “বর্ষণমায়া মানে এরা বৃষ্টির মেঘ টেনে আনতে পারে বহুদূর আকাশ থেকে। পৃথিবীর মাটির রস পান করে বেঁচে থাকে এই গাছেরা। মাটি শুকনো হয়ে এলে এদের তৃষ্ণা পায়; পৃথিবী তখন এই গাছদের মাধ্যমে আকাশের মেঘ ডেকে আনে। এরা আছে বলেই এই শুকনো সমরগরিমায় বৃষ্টি আসে। এরা না থাকলে এ অঞ্চলে মানুষ থাকতে পারত না।”

নীলাভ্র চমৎকৃত হয়ে বলল, “বাঃ, এত ব্যাপার আছে এই গাছগুলোর মধ্যে জানতাম না তো।”

“বজ্রধর জানতেন। ওঁর কাছেই প্রথম শুনেছিলাম ব্যাপারটা। উনি ভালোবাসতেন এই অরণ্যকে। গাছগুলো থেকে রাতের বেলা এমনিতেই হালকা হলদে আভা বেরোয়, দেখেছ নিশ্চয়; তাতেই বোঝা যায়, এই বন নিতান্ত সাধারণ নয়। আর এখন এই ফুল পড়ার ব্যাপারটা সম্ভবত এই মায়া-উদ্ভিদদের

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। কে ওদের সত্যিই ভালোবাসে, গাছেরা বোঝে।”

ওঁরা ফিরে চললেন আয়তনে। যেতে যেতে নীলাভ আরেকবার মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল অধিনায়ক বজ্রধরের ফুলে ভরা সমাধিটাকে।

সুদক্ষিণসারির দিকে যে রাস্তাটা চলে যাচ্ছে, তার কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা। রক্ষোবৈদ্যকে দেখে দু'জন অর্ধরাক্ষস এগিয়ে এল। তারা ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক দেখছে, যেন এখনই কেউ এসে আক্রমণ করবে তাদের। নীলাভ এদের দেখেছে, কিন্তু এখনও নাম জানে না। কিন্তু তাদের একজনকে দেখে সে চমকে উঠল।

মুখের বেশ কয়েক জায়গায় কেটে গেছে লোকটার, ঠোঁটের একটা কোণ খেঁতলে গেছে। চোখের কোণে, কপালের পাশে কালশিটে পড়ে গেছে।

অন্যজন বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, একবার দয়া করে আমার ভাইকে দেখুন। নিয়ামকের সৈন্যরা একে এমন মেরেছে, মাথা-মুখ ফুলে গেছে।”

রক্ষোবৈদ্য ব্যস্ত হয়ে বললেন, “ওকে আমার সেবাকক্ষে নিয়ে চলো এফুনি।”

অর্ধরাক্ষসটি শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, “আয়তনের মধ্যে? ওরে বাবা! ওখানে গেলে নিয়ামক আর আমাদের জ্যান্ত ফিরতে দেবেন?”

রক্ষোবৈদ্য গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “আমি যে অসুস্থ ব্যক্তির দায়িত্ব নিয়েছি, তার গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ামকেরও নেই। এসো তোমরা আমার সঙ্গে। নীলাভ, আমি এদের নিয়ে চললাম আপাতত।”

আহত অর্ধরাক্ষসটিকে ডেকে নীলাভ বলল, “তোমার নাম কী? এমন করে মারল কেন তোমাকে ওরা?”

লোকটার কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। সে তার ভাইয়ের দিকে তাকাল। ভাইটি বলে দিল, “ওর নাম প্রবীর। আর ওর সবচেয়ে বড়ো অপরাধ – ও অর্ধরাক্ষস।”

নীলাভ তাকিয়ে রইল। সে আবার বলল, “কেন মারল, ওরাই জানে। সুদক্ষিণসারিতে আমাদের একটা ছোটো দোকান আছে। নিয়ামকের রক্ষীপ্রধান এসে কাল ঘোষণা দিয়ে গিয়েছিলেন, সূর্য মধ্যগগনে আসবার আগেই সব দোকানপাট বন্ধ করে দিতে হবে। এ কী অন্যায় দাবি, বলুন তো সমরোত্তম নীলাভ? গায়ের জোরে ব্যবসাপাতি বন্ধ করে দিলে খাব কী? তাও আজ ওই সময়েই দোকান বন্ধ করেই দেওয়া হচ্ছিল। আমি সেই সময় বাড়িতে ছিলাম; ভাই ছিল দোকানে। দোকান বন্ধ করছে, এমন সময় সহরক্ষীপ্রধান চক্রবাক তাঁর দলবল নিয়ে এসে হাজির। যথাসময়ে ঝাঁপ না ফেলার অভিযোগে রাস্তায় ফেলে বেদম মেরেছেন তিনি ওকে; দোকানের জিনিসপত্র ভাঙচুর করেছেন। আর বলে গেছেন, বাকি অর্ধরাক্ষস কুকুরগুলো যেন এই দৃশ্য থেকে শিক্ষা নেয়।”

শুনতে শুনতে নীলাভর ভেতরটা রাগে জ্বলছিল। সে বলল, “আমি দেখছি ব্যাপারটা। আপাতত চিকিৎসা করিয়ে এসো। তোমাদের দোকানের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আমি করে দেব, কথা দিচ্ছি।”

অর্ধরাক্ষস দু'জন হাতজোড় করে ধন্যবাদ জানাল তাকে। তারপর ধীরে ধীরে রক্ষাবৈদ্যের সঙ্গে ওরা চলে গেল আয়তনের দিকে।

নীলাভ বুঝতে পারছিল, অবস্থা ক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিয়ামক হঠাৎ এতটা উগ্র হয়ে উঠলেন কেন, তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। সৌজন্যের প্ররোচনায় কি? কিন্তু যত একগুঁয়েই হোন নিয়ামক, অর্ধরাক্ষসদের বিরুদ্ধে তাঁর যত রাগই থাকুক, এইরকম বিচারবুদ্ধিহীন নৃশংসতার কারণ কি শুধু সৌজন্যের উস্কানি? তা কি আদৌ সম্ভব?

মুখের উপর একটা ছায়া এসে পড়তে একটু অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকাল নীলাভ। একটা বিরাট পাখি নেমে আসছে ঠিক তার মাথার উপরে। পাখিটাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল সে।

আহুদি। মেঘবর্ণের জটায়ু।

পাখিটা এসে ডানা ঝাপটাচ্ছে তার মুখের সামনে। তার পায়ে বাঁধা চিঠিটা খুলে নিল সে; আহুদি একবার ঘাড় বাঁকিয়ে তাকে দেখে নিয়ে আবার হুশ করে উড়ে চলে গেল।

একটা সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল গোল করে পাকানো চিঠিটা। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়েই পড়তে শুরু করল নীলাভ।

নীল,

এখানে আমরা ঠিকঠাক পৌঁছেছি। শ্যামশ্রীকে খবরটা জানাস। প্রথমে এরা আমাদের ঢুকতে দিতেই চাইছিল না, কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটাতেই সে বিষয়ে আর অসুবিধা হয়নি।

খুব বেশি বড়ো করব না চিঠিটা। কিন্তু একটা আশঙ্কার কথা তোকে না বলে থাকতে পারছি না। আমার সঙ্গে যে তিনটি ছেলেমেয়ে এসেছে, তাদের আমি কথাটা বলতে পারিনি, পাছে ওরা ভয় পায়। এখানে এসে এদের সামরিক ক্ষমতা স্বচক্ষে দেখে আমার কী ভয় হচ্ছে, জানিস? কী বিশাল এদের সেনাদল! যদি এরা চায়, শুধু সৈন্যসংখ্যা দিয়েই সমরগরিমাকে ভাসিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

জানি তুই বলবি, আমরাও নেহাত কম যাই না। আমরা সমরোত্তমরা যেভাবে শিক্ষা পেয়েছি, আমাদের শিক্ষার্থীদের যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তাতে আমরা আমাদের চেয়ে তিনগুণ বড়ো সেনাদলের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা ধরি। কিন্তু তাও আমি চিন্তায় আছি। এরা এখন মুখে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করলেও ভেতরে ভেতরে যুদ্ধ বাধাবার তালে আছে, এ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। এদের বোধহয় ধারণা হয়েছে, অধিনায়ক বজ্রধরের মৃত্যুর পর আমরা কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছি। আশার কথা, বাকি সমরোত্তমদের প্রতি এদের সেই ভয় এখনও আছে। তাই আমাদের ক্ষমতা, প্রলয়যোদ্ধা হিসাবে অভীর ক্ষমতা – এগুলো ওরা পরখ করে নিতে চাইছে। আমরা সাবধানে আছি খুব। কোথাও যেন এতটুকু দুর্বলতা প্রকাশ না পায়, সে জন্য নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে।

কাল অভীর জন্য একটা বড়ো রকমের মহড়াযুদ্ধের আয়োজন করেছে ওরা। ভয় পাস না, অভী ঠিক সামলে নেবে। তুই হয়তো ওকে অস্ত্রহাতে বেশি দেখিসনি, কিন্তু আমি তো দেখেছি ও কী করার ক্ষমতা রাখে – তাই খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই; ও দুর্দান্ত যোদ্ধা। হ্যাঁ, তোর বা আমার মতো অতটা যুদ্ধের ব্যাকরণ মেনে চলে না হয়তো, কিন্তু যেকোনো প্রতিপক্ষকে আটকে দেওয়ার একটা অদ্ভুত প্রতিভা আছে তোর ছেলের।

তবে কাল অভীর সঙ্গে লড়াই করতে নামছে যে ছেলেটা, তাকে নিয়ে একটু চিন্তা আছে আমার। তার নাম সুতসোম। ওদের সেনানায়িকা ভদ্রমহিলা প্রজ্ঞাকে তোর মনে আছে নিশ্চয়ই। তুই আর আমি যখন এখানে শেষবার এসেছিলাম, তখন ও সহনায়িকা ছিল। সুতসোম ওরই ছেলে। ছেলেটাকে এমনিতে দেখলে আহামরি কিছু মনে হয় না, কিন্তু ওর মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধক্ষমতা আছে – আমি ওর অনুশীলন দেখেই বুঝতে পেরে গেছি। এতটাই ভয়ানক যে ওর যুদ্ধবিদ্যার কাহিনি এখানে প্রায় অলৌকিকের পর্যায়ে চলে গেছে। ওকে ওরা প্রলয়যোদ্ধার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ মনে করছে মানে কিছু একটা ব্যাপার ওর মধ্যে তো অবশ্যই আছে।

যাই হোক, আমি কাল উপস্থিত থাকব ওখানে; পরিস্থিতি কোনোমতেই হাতের বাইরে যেতে দেব না। রক্ত দেখলে বেশিরভাগ রাক্ষসের মাথা ঠিক থাকে না; ওরা তখন আরও রক্ত দেখতে চায়, আরও হিংস্রতা দেখতে চায়। ব্যাপার যদি সেদিকে গড়ায়, যেভাবেই হোক, অভীকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে আমি সামলে নেব সব, আর অনর্থক শত্রুতাও বাড়তে দেব না। পর্বত আর স্বর্ণশেখরের ব্যাপারটাও তো মাথায় রাখতে হচ্ছে। আমরা এখানে বন্ধুত্ব করতে আসিনি ঠিকই, কিন্তু শুধু শুধু শত্রুও বাড়াব না। আবার বলছি, চিন্তা করার কিছু নেই।

ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা। সেই শেষমুখ – যে স্বর্ণশেখরের পেছনে লেগেছিল – সে হতভাগা এখানে এসে হাজির হয়েছে; রেশমি রুমালে আমাদের চারজনেরই নাম লিখে মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করে গেছে। এখানের লোকেরা মনে করে, ওর এই ডাক সাক্ষাৎ মৃত্যুর ডাক। কিন্তু আমি ভাবছি, এই মারাত্মক খুনে লোকটা জানল কোথেকে যে আমরা এই চারজনই যাচ্ছি রক্ষোপুরী? দেখ, এসব উটকো খুনির ভয় আমি পাই না, তুই ভালো করেই জানিস। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারে আমি ভয় পাচ্ছি – ভেতরের কেউ নিশ্চয়ই ওকে খবর সরবরাহ করেছে।

যাই হোক, আমি দেখছি ব্যাপারটা; কিছু একটা সমাধান নিশ্চয়ই বার করব। সব কাজ মিটিয়ে মহাসপিণীর গুহা থেকে উত্তরাকে উদ্ধার করে স্বর্ণশেখরকে নিয়ে একেবারে ফিরব। তুই লতাকে বলিস, ওর কথা আমার খুব মনে পড়ছে।

সাবধানে থাকিস, নীল। আয়তনকে রক্ষা করিস।

মেঘ।

চিঠিটা পড়তে পড়তেই নীলাভ চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল, কী যেন একটা এগিয়ে আসছে তার দিকে। মুখ তুলে সে দেখল, একটা গোরুর

গাড়ি আসছে আয়তনের দিক থেকে।

গাড়োয়ানের মুখ তার চেনা; অর্ধরাক্ষস নয় এ, মানুষ – মানবমন্দির এলাকায় থাকে। কিন্তু লোকটা তাকে দেখে এমন ভয়-ভয় ভাব করছে কেন? কী আছে ওর গাড়িতে?

হাত তুলে তাকে দাঁড়াতে বলল নীলাভ। “তুমি এদিকে কোথায় যাচ্ছ?”

লোকটা তাকে দেখে বাঁশপাতার মতো কাঁপছে। এত ভয়ের কী আছে? ওর গাড়িতে কি তাহলে নিষিদ্ধ কোনো বস্তু চালান হচ্ছে?

লোকটা হাতজোড় করে বলল, “সমরোত্তম নীলাভ, আমার উপর পীতপত্রবনে যাওয়ার আদেশ আছে।”

“আদেশ আছে? কে দিয়েছেন আদেশ?”

“নিয়ামক মহোদয়।”

“নিয়ামকের আদেশ? বনের মধ্যে কোথায় যাচ্ছ তুমি গাড়ি নিয়ে?”

“ছায়াভবনে।”

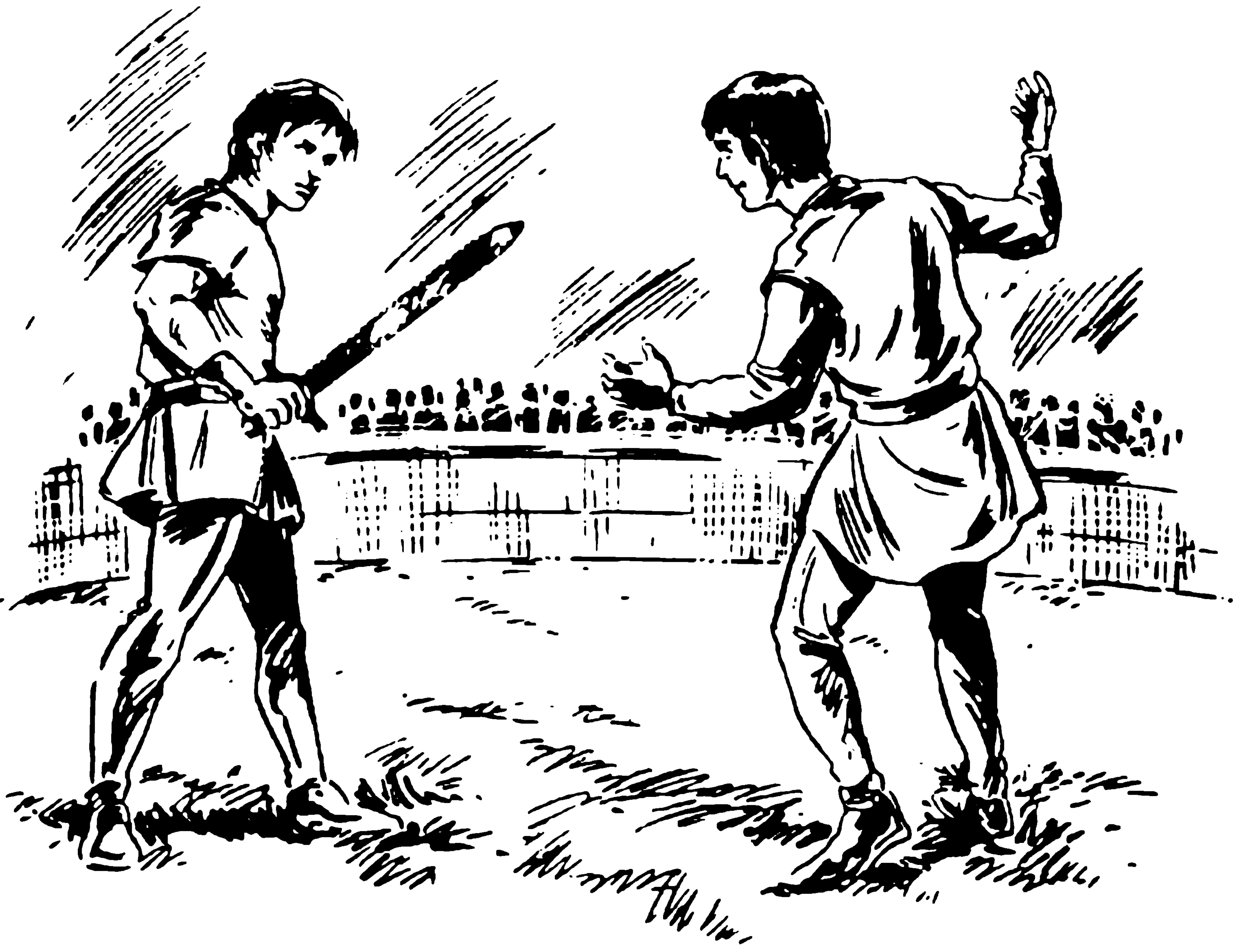
নীলাভ একটু অবাক হল। জঙ্গলের গভীরে ছায়াভবন সরাইখানায় গতবার রাক্ষসরা সমরগরিমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে জড়ো হত, সে জানে। উর্গায় আসত ওখানে তাদের খেপিয়ে তুলতে। কিছু অর্ধরাক্ষসও যেত ওইসব গা-গরম করা বক্তৃতা শুনতে।

গাড়িতে মোটা কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে অনেকগুলো বড়ো বড়ো পিপের মতো বস্তু। নীলাভ বলল, “কী আছে এতে?”

লোকটা হাতজোড় করে বলল, “নিয়ামক মহোদয় যদি জানতে পারেন আমি আপনাকে বলেছি, উনি আমাকে মেরে ফেলবেন। কিন্তু প্রথম শর্বর-যুদ্ধের সময় রাক্ষসদের হাত থেকে আমার ছোট্ট ছেলেটাকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন, সমরোত্তম নীলাভ; আমি আপনাকে মিথ্যেকথা বলতে পারব না, অধর্ম হবে। এই পিপেগুলোতে শুধু মোম আছে। আমার উপর আদেশ আছে, এগুলো ছায়াভবনে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসতে, আর সবার কাছে মুখ বন্ধ রাখতে। আমি চলি, সমরোত্তম মহোদয়; দয়া করে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না।”

গাড়ি নিয়ে লোকটা চলে গেল জঙ্গলের পথে। নীলাভ-র কপালে দারুণ জ্রকুটি।

নিয়ামকের আদেশে এক গাড়ি মোম যাচ্ছে ছায়াভবনে। মতলবটা বোঝা যাচ্ছে না তো!



॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥ সুতসোম

মৃত্যুর স্বপ্ন দেখছিল অভী।

লীনার মৃত্যু, নিধির মৃত্যু।

প্রথমে সে দেখল লীনাকে। দূরের দিকে তাকিয়ে আছে লীনা, তার ধনুকে বাণ যোজনা করে রেখেছে সে। অভী স্বপ্নের মধ্যেই জানে, ওই বাণ যার উদ্দেশ্যে ছাড়া হবে, তার মৃত্যু নিশ্চিত; কিন্তু সে এও জানে, বাণ মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হবে লীনারও। লীনার চোখে-মুখে দৃঢ় সংকল্প, যেন মৃত্যুবরণ করতে সে মনস্থির করে ফেলেছে।

তারপর দৃশ্যটা বদলে গেল। নিধি স্থির হয়ে পড়ে আছে মাটিতে – অজ্ঞান না মৃত, অভী বুঝতে পারল না। তবে জায়গাটা চিনতে পারল সে – পীতপত্রবন যেখানে শেষ হয়ে শুরু হচ্ছে মৃত দেবতার নদীর তীর, সেইখানে শুয়ে আছে নিধির নিখর দেহ। একটুও নড়ছে না সে; মুখটা নীল হয়ে গেছে – যেন তীব্র বিষক্রিয়ায় হুৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে তার। উষসী, সন্দীপ, তরুণরা কাঁদছে তাকে ঘিরে। আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে নদীর জলের মধ্যে; জলটার বুকে তীব্র একটা ঘূর্ণি জেগে উঠছে; বিরাট কী যেন একটা উঠে আসছে জলের ভেতর থেকে – মাথায় শিং, গায়ে আঁশ, হাতে ত্রিশূল...!

নীরসেনা!

মেঘবর্ণের সাবধানবাণীটা মনে পড়ে গেল তার। “ত্রিশূলধর মায়া হল নিয়তির ডাক; একে খণ্ডন করার কোনো উপায় নেই।”

ভয়ে স্বপ্নের মধ্যেই তার যেন দম আটকে আসছে। লীনা মরে গেছে! নিধি মরে গেছে! অসম্ভব! অসম্ভব!

ছটফট করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল অভী। হাতটা যেন প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বশেই চলে গেল বালিশের তলায়। স্বপ্ন-উপলটা বার করে আনল সে।

কী ভয়ংকর জিনিস - এই স্বপ্নগুলোকে কী ভীষণ জীবন্ত করে তোলে! একবার মনে হল, হতচ্ছাড়া পাথরটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আপদ বিদায় করে, কিন্তু সাহসে কুলোল না। যতই ভয়ের স্বপ্ন দেখাক, এ বস্তুকে রাখতে হবে; ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

সুতসোমের সঙ্গে কালকের যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যায় কিনা, সেই আশায় ওটাকে মাথার নীচে নিয়ে শুয়েছিল সে। এমন বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখতে হবে জানলে সে কখনও এমন কাজ করত না।

সারা গা ভিজে গেছে ঘামে। কপালে ফুটে ওঠা বিন্দুগুলোকে মুছে উঠে গিয়ে জল খেল অভী। গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

স্বপ্ন-উপল যখন এই রকম কোনো দৃশ্য দেখায়, তখন সে ঘটনা অদূর ভবিষ্যতে সত্যি হয়ে যায়; এ ব্যাপারে তার খুব খারাপ পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে।

সকালে উঠেও গোমড়ামুখে রইল অভী। তার বন্ধুরা, মেঘবর্ণ সবাই একে একে জিজ্ঞাসা করে গেল তার কী হয়েছে, আর সেও সবাইকে এক উত্তর দিলঃ “কিছু হয়নি।” কিন্তু প্রাতরাশ করতে করতে লীনা আর নিধি যখন নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, হাসাহাসি করছে, অভী তখন কিছুতেই ওদের চোখের দিকে তাকাতে পারল না।

লীনা বলল, “কী হল অভী? কালকের সেই বেফাঁস কথার রেশ এখনও কাটেনি নাকি? কাকতালুয়ার কলে হাঁড়ির মতো করে রেখেছ কেন মুখখানা?”

নিধি ফিকফিক করে হেসে বলল, “বলি, চোখকান খোলা রেখেছ তো? কাল দেখেছি, রাজকন্যা উর্মিমালার তোমার প্রতি সে কী প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টি!”

অভী হাসতে চাইছিল, কিন্তু তার শুধু নিজের দেখা গতবারের স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেবার স্বপ্নসরোবরের তীরে দেখা নরকগহ্বরের দৃশ্যটার মতোই জীবন্ত ছিল এবারের স্বপ্নটা। সেই স্বপ্নে দেখতে পাওয়া নিধির স্থির হয়ে যাওয়া বিষণ্ণ মুখটার কথা মনে পড়তেই ভেতরে ভেতরে যেন কেঁপে যাচ্ছিল সে; চেষ্টা করেও হাসতে পারছিল না।

তবু জোর করে মুখে একটা লোকদেখানো হাসি টেনে এনে সে বলল, “এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, নিধি। রাজকন্যাকে অন্তত টেনো না এসবের মধ্যে।”

প্রথমে আর এক প্রশ্ন হাসল ওরা। তারপর হাসি থামিয়ে লীনা বলল, “ভয় নেই, অভী, ভয় নেই। আমি থাকতে কেউ - সে যদি রাজকন্যাও হয় - প্রলয়যোদ্ধাকে বগলদাবা করতে চায়, দ্বন্দ্বযুদ্ধ লেগে যাবে কিন্তু আমার সঙ্গে তার!”

তার হাসিমুখটা দেখতে অভীর ভালো লাগছিল, কিন্তু একই সঙ্গে বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা ভয় কাজ করছিল। ওই একাঘ্নী বাণটা ছোড়ার সময় লীনার গম্ভীর, চোয়ালচাপা মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। সে জানে, এ স্বপ্ন সত্যি হবে - স্বপ্ন-উপলের দেখানো এই স্বপ্নগুলো সবসময় সত্যি হয়।

একটাই আশার কথা, লীনার কাছে ওরকম কোনো মায়া-বাণ নেই যেটা ছুড়লে ওর নিজেরও প্রাণের আশংকা থাকে।

তার মুখ দেখে নিধির বোধহয় একটু দয়া হল; সে বলল, “হয়েছে,

হয়েছে। এবার অভীকে আজকের লড়াই নিয়ে ভাবতে দাও। সুতসোম কিন্তু সহজ পাত্র নয়, এ আমি এখন থেকেই বলে রাখছি।”

লীনা বলল, “সহজ হলে অভীর বিরুদ্ধে তাকে যুদ্ধে নামাতই না ওই সেনানায়িকা। যাই বলো, ওই মহিলাকে দেখে আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। কেমন যেন একটা নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর ব্যাপার আছে ওর মধ্যে।”

অভী আর নিধিও কথাটা মানতে বাধ্য হল। যেভাবে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে জেনেও প্রজ্ঞা নিজের ছেলেকে অনাবশ্যক যুদ্ধে পাঠানোর আয়োজন করছেন, দেখে তাঁকে খুব স্নেহময়ী মা বলে ওদের আদৌ মনে হয়নি।

নিধি বলল, “আরেকটা ব্যাপার হতে পারে। এই সুতসোমটা হয়তো সত্যিই খুব ভয়ংকর যোদ্ধা; যা রটে তার কিছু তো বটে। কিন্তু অভী, তোমার চন্দ্রহাস নিয়ে ওকে আক্রমণ করলে ওই দৈবাস্ত্রের আক্রমণ থেকে ও বাঁচতে পারবে? যুদ্ধের মধ্যে একবার যদি ওর গায়ে চন্দ্রহাসের ছোঁয়া লেগে যায়, তাহলেই তো...”

তাকে থামিয়ে দিয়ে অভী বলল, “উঁহু, চন্দ্রহাস নিয়ে যদি যুদ্ধ করতে যাই, বিপদ হবে। আমি যেটুকু বুঝতে পারছি, এই যুদ্ধে চন্দ্রহাস আমার হাতে কাজ করবে না। সেবার তরুণের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে কী হয়েছিল মনে নেই? তোমরাও তো ছিলে সেখানে। আমার ব্যক্তিগত লাভ জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে; ব্যবহার করতে গেলে চন্দ্রহাস আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তাই ওই ময়ূরবজ্র তরবারি নিয়েই নামতে হবে আমাকে; দৈবাস্ত্র ব্যবহারের আশা ছাড়তে হবে আজ। তবে চন্দ্রহাসকেও সঙ্গে রাখব। অস্ত্রটা ব্যবহার না করি, ওটা দেখিয়ে ওদের একটু হলেও ভয় দেখানো যেতে পারে।”

দরজায় কেউ একজন ডাকছে বাইরে থেকে। অভী উঠে গিয়ে দরজা খুলল। রাজকন্যা উর্মি দাঁড়িয়েছিলেন বাইরে, পাশে ছিল প্রফুল্ল। উর্মি বললেন, “ভেতরে আসব?”

“আসুন, আসুন।” সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল অভী।

রাজকন্যার ইস্তিতে প্রফুল্ল পাহারায় রইল দ্বারের বাইরে; তিনি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

নিধি, লীনা, মেঘবর্ণ সবাই তাঁকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল। তিনি এসে বসলেন ওদের সামনে।

উর্মি বললেন, “সুতসোম তৈরি হচ্ছে দেখে এলাম। আমি তোমাকে নিয়ে একটু চিন্তিত, অভী। তুমি সত্যিই প্রলয়যোদ্ধা তো?”

অভী একটু হেসে বলল, “আমি নিজে ঠিক জানি না, তবে লোকে বলে।”

“আমার এক আত্মীয় তোমাদের ওখানে আছেন, জানো তো?”

ওরা তিনজনেই মাথা নাড়ল। লীনা বলল, “হ্যাঁ, রক্ষোবৈদ্য সম্পর্কে আপনার দাদু হন, এটা আমরা শুনেছি।”

উর্মি বললেন, “উনি যখন চলে যান, তখন আমার বয়স খুব কম। ভালো করে মনে পড়ে না ওঁর কথা। কিন্তু এখানে একটা চিকিৎসাকেন্দ্র খুলেছিলেন উনি; সেখানে রাক্ষস-অর্ধরাক্ষস, ধনী-গরিব সবার চিকিৎসা হত। কিন্তু বিমোহক রাক্ষসরা আপত্তি করল তাতে। এত ওষুধপত্রের দিকে রাক্ষসদের মন গেলে

নাকি তাদের যুদ্ধদক্ষতা কমে যাবে। এমন বোকার মতো কথা আমি জীবনে শুনিনি। ওই আলোকপর্ণের দলবল ওঁকে এ দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল।”

মেঘবর্ণ বলল, “কিন্তু এখন তো আপনি এখানে আবার নতুন করে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা শুরু করেছেন। আপনার বিখ্যাত সেবাকেন্দ্রের কথা শুনেছি আমরা। আপনার দাদু আপনাকে নিয়ে খুব গর্বিত।”

উর্মি বলল, “দাদুর লেখা একটা পুরোনো খাতা পেয়েছি; অনেক মায়া-ঔষধের বর্ণনা আছে সেখানে। সেটা পড়েই আমার মাথায় আসে, আর একবার একটা চিকিৎসা কেন্দ্র খুললে কেমন হয়? আমি স্বয়ং রাজার মেয়ে; দাদু আমাদের বংশের লোক হলেও সরাসরি রাজার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তার উপর উনি সমরগরিমায় গিয়ে যেরকম সুখ্যাতি অর্জন করেছেন চিকিৎসক হিসাবে, তারপর এখানে অনেকেই মনে মনে ভেবেছে, ‘ইস, লোকটাকে যেতে না দিলেই ভালো হত।’ মানুষদের তুলনায় রাক্ষসদের রোগব্যাধি কম হয় ঠিকই, কিন্তু রাক্ষসরাও আদৌ সবধরনের রোগের কবল থেকে ছাড় পায় না। তার উপর মানুষদের ওষুধে রাক্ষসদের সবসময় কাজও হয় না। আলাদা ধরনের রক্ত, তাই আলাদা ধরনের চিকিৎসা লাগে রাক্ষসদের।”

নিধি বলল, “আপনি অর্ধরাক্ষসদেরও চিকিৎসা করেন?”

“করি তো। ওদের মধ্যে কুসংস্কার বেশি, ভয় বেশি; তাই ওরা চট করে আসতে চায় না আমার কাছে। ওদের ধারণা, দেবতারা রোগ দিয়েছেন, তাকে তাড়ালে তাঁরা রুষ্ট হবেন। তবে হ্যাঁ, সবাই নয়; ওদের মধ্যেও অনেকেই এখন নতুন ওষুধপত্রে বিশ্বাস করতে শিখছে।”

অভী আড়চোখে নিধির দিকে তাকিয়ে দেখল, নিধি মাথা নাড়ছে। তার মানে, এরকম অদ্ভুত বিশ্বাস সত্যিই ওদের জাতির লোকেদের মধ্যে আছে।

মেঘবর্ণ বলল, “আরও একটা ব্যাপার। অর্ধরাক্ষসরা বোধহয় সবার কাছে খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারও পায় না। কাল রাজসভায় যা দেখলাম...”

উর্মি একটু হেসে নিধির দিকে তাকালেন। “তুমি অর্ধরাক্ষস, না?”

নিধি মাথা নাড়ল। উর্মি বললেন, “তোমার গায়ের গন্ধেই আমি বুঝেছি। তোমাদের মতো রাক্ষসদের নাকও বেশ তীক্ষ্ণ, জানো নিশ্চয়ই। তুমি তো সমরগরিমায় থাকো। বলো দেখি, এখানের তুলনায় কতটা ভালো আছে তোমরা ওখানে?”

নিধি ভ্রুকুঞ্জন করে রইল কিছুক্ষণ; তারপর বলল, “খুব ভালো আছি, বলব না। আমাদের জাতটাকে সব জায়গাতেই জুতোর ময়লার মতো মনে করে কিছু লোক – মানুষ হোক বা রাক্ষস। কিন্তু তবু বলতেই হবে, সমরগরিমায় আমাদের সম্মান বোধহয় এখানের চেয়ে একটু বেশি করা হয়। আমাদের আয়তনে সমরোত্তমরা যেভাবে আমাদের ভালোবাসেন, আমার জাতের লোকেদের সেইরকম ভাবে ভালোবাসার লোক এখানে এখনও সেইভাবে চোখে পড়েনি।”

অদ্ভুতভাবে হাসলেন উর্মি। “ক’জনকেই বা জেনেছ এখানে, নিধি? যাক ও কথা। তোমরা তো সবাই যোদ্ধা। যুদ্ধ নিয়েই তোমাদের যত কাজকর্ম। মানুষের সবচেয়ে বেশি শারীরিক কষ্ট, সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা কোথায় দেখেছ তোমরা? যুদ্ধক্ষেত্রে? লীনা?”

লীনা মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রেই। মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণার যে ভয়াবহতা, আমরা কাছ থেকে দেখেছি।”

মেঘবর্ণ আর নিধিও সায় দিল এ কথায়, কিন্তু অভী চুপ করে রইল। তার দিকে ফিরলেন উর্মি। “অভী, তুমি?”

অভীর মনে পড়ছিল নরকগহ্বরের দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা সেই অগ্নিদগ্ধ হাতগুলোর কথা। কী করুণ স্বরে ওরা তাকে থাকতে বলছিল! কী অপরিসীম যন্ত্রণা ছিল সেই অসহায় কণ্ঠস্বরগুলোতে!

সে বলল, “যুদ্ধক্ষেত্রের যন্ত্রণার থেকেও ভয়ংকর যন্ত্রণা আমি দেখে এসেছি নরকে। ওইভাবে নরকের আগুনে ঝলসে পোড়ার কষ্টের কোনো তুলনা নেই। কোনো ওষুধেই ওই যন্ত্রণার নিবারণ হওয়ার নয়।”

কথা বলতে বলতে তার গলা ধরে এল। উর্মি তো বটেই, বাকিরাও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। এসব কথা সে বন্ধুদেরও কখনও বলেনি।

“আমি সত্যিই আরও থাকতে চেয়েছিলাম ওখানে; ওরা বলছিল, আমি থাকলে নাকি ওদের কষ্টের একটু আরাম হচ্ছে। কিন্তু থাকতে পারিনি, কারণ তোমাদের বিপদে ফেলে আসতে আমার ইচ্ছা ছিল না। এখনো আমি মাথার মধ্যে যেন ওই আর্তনাদগুলো শুনতে পাই, ওদের কষ্টগুলো অনুভব করতে পারি।”

বড়ো বড়ো চোখ করে কথাগুলো শুনছিলেন উর্মি। নিধি একটু বাঁকাভাবে বলল, “এত যন্ত্রণার কথা শুনে আপনার কী হবে, রাজকন্যা উর্মি? অন্যের যন্ত্রণা শুনতে ভালো লাগে আপনার?”

মেঘবর্ণ তিরস্কারের ভঙ্গিতে তাকাল নিধির দিকে। উর্মি বললেন, “না, যন্ত্রণার কথা শুনতে ভালো লাগে না আমার। কিন্তু যন্ত্রণা আমার কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি যে বৈদ্য – আমি যন্ত্রণাকে জয় করতে সাহায্য করি। তোমাদের রক্ষাবৈদ্য আমার জীবনের আদর্শ।”

উঠে গিয়ে পুরোনো একটা খাতা বার করে আনলেন তিনি। খাতাটার পাতা ওলটাতেই দেখা গেল, পাতায় পাতায় ভারি সুন্দর সব রঙিন ছবি আঁকা আছে। রক্ষাবৈদ্যের যুবক বয়সের ছবিও আছে সেখানে। উর্মি ছবিটাকে মাথায় ঠেকিয়ে বলল, “মনে মনে ওঁকেই গুরু মানি আমি। ওঁর অনেক গল্প আমি বাবার মুখে শুনেছি। উনি যাওয়ার পর এ দেশের লোক বুঝেছে, তারা কী হারিয়েছে। জানো, আমিও ওঁর মতো মানুষ-রাক্ষস-অর্ধরাক্ষস সবার কষ্ট দূর করতে চাই।”

অভী বলল, “তাহলে তো আমাদের মতো যোদ্ধাদের থেকে আপনার কাজ অনেক বেশি মহৎ। আমরা শুধু অন্যকে আঘাত করতেই পারি; আঘাত নিরাময় করার বিদ্যা আমাদের শেখা হয়নি।”

লীনা সরু চোখে তাকাল অভীর দিকে; বলল, “আঘাত নিরাময়ের ব্যাপারে আমরা যোদ্ধারাও অল্পস্বল্প জানি, অভী। ধরো, যখন কেউ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে শুধুই কাঁদছে, হয়তো কাঁদতে কাঁদতে বমি করে ফেলছে, তখন তাদের যে সহানুভূতি নিয়ে যত্ন করে ভরসা দিতে হয়, ঐটুকু কিন্তু আমরাও জানি।”

অভীর মুখ লাল হয়ে উঠল। লীনা কোন সময়ের কথা বলছে, সে বুঝতে পেরেছে।

উর্মি ব্যাপারটা আঁচ করে সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বিষয় বদলে দিলেন। “আর একটু পরে সুতসোমের সঙ্গে লড়াইতে নামছ তুমি, অভী। কীভাবে নিজেকে বাঁচাবে, আর কীভাবে আক্রমণ করবে, কিছু ভেবেছ নাকি?”

মেঘবর্ণ এতক্ষণে একটু হাঁফ ছেড়ে বলল, “হ্যাঁ, বলো, বলো। আমরাও শুনি।”

অভী বলল, “কিছুই ভাবিনি। সুতসোম প্রচণ্ড দ্রুত নড়াচড়া করে, ওর অনুশীলনের সময় ঐটুকু শুধু দেখেছি।”

উর্মি বললেন, “মাল্যপর্বতে ওর সমকক্ষ যোদ্ধা একজনও নেই। ওর বয়স মাত্র দশ বছর হতে পারে, দেখলে ওকে নিতান্ত সাধারণ একটা বাচ্চা মনে হতে পারে, কিন্তু ওকে দুর্বল ভাবার মতো ভুল মোটেও কোরো না। একা একটা সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা ধরে ও।”

অভীর গলাটা একটু কেঁপে গেল। “কীভাবে?”

“প্রচণ্ড শক্তিশালী মায়াধর ও; অনেক সময় নিজের উপরেই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না ও। তখন কী হয় জানো?”

“কী?”

“মাল্যপর্বতে ভূমিকম্প হয়। না, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। দূরের বস্তু নিয়ন্ত্রণ করার মায়া, মানসিক শক্তিচালনার মায়া প্রবলভাবে আছে ওর মধ্যে – তাকে বশ করতে ও-ও পুরোটা পারে না। ও যদি রেগে যায়, নিজের অজান্তেই চারপাশের সব কিছুকে ধ্বংস করে দিতে পারে ও একাই।”

নিধি ঠান্ডা গলায় বলল, “আপনি আমাদের এত কথা বলে দিচ্ছেন কেন? নিজের দলের বিশ্বাসভঙ্গ করছেন না কি এভাবে? বিশ্বাসভঙ্গকারী যে পক্ষেরই হোক, তাকে কেউই পছন্দ করে না কিন্তু।”

মেঘবর্ণ ক্রুদ্ধভাবে বলল, “নিধি!”

উর্মি কিন্তু রাগলেন না। “একটু ভুল করছ তুমি। সমরগরিমা আর মাল্যপর্বতের মধ্যে কিন্তু আসল যুদ্ধ হচ্ছে না, তাই না? এ তো কেবল মহড়া-যুদ্ধ। আর তোমরা যখন আমার তত্ত্বাবধানে আছ, তখন তোমরা আমার ভবনের অংশ। আজ অভী যখন যুদ্ধে নামবে, তার নাম ঘোষণা করা হবে এইভাবে – “রাজকুমারী উর্মিমালা-ভবনের পক্ষ থেকে”। তাই আমি যেটা করছি, সেটাকে ‘বিশ্বাসভঙ্গ’ বলে না, নিধি; আমার ভবনের হয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে যে যোদ্ধা, আমি তাকে সতর্ক করে রাখছি যাতে সে বিপদে না পড়ে। অনাবশ্যক ভাবনা না ভাবতেই তোমাদের অনুরোধ করব; আশা করি, এই রাক্ষসপুরীতে বন্ধু কে আর শত্রু কে, সেটা তোমরা চিনতে পারবে।”

এত মার্জিত অথচ দৃঢ়ভাবে কথাগুলো বললেন উর্মি যে নিধির মুখে উত্তর জোগাল না। মেঘবর্ণ একটু হাসল; মহিলামহলের এই ঈষদুষ্ট আবহাওয়া যে অভীকে নিয়েই তৈরি হয়েছে, সেটা বুঝতে তার অসুবিধা হচ্ছিল না। অভীও কাতরভাবে তার দিকে তাকাচ্ছিল; ভাবখানা, “মেঘবর্ণ, বাঁচাও।”

প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যই সম্ভবত মেঘবর্ণ বলল, “এবার একটা কাজের

প্রশ্ন করি। সুতসোমকে হারানোর উপায় কী, রাজকন্যা উর্মি?”

“সত্যি বলব?” উর্মি মুখ ফেরালেন তার দিকে। “কোনো উপায় নেই। স্বয়ং ঐশিকরাও ওকে হারাতে পারবেন না। কেন জানেন? ও হচ্ছে বজ্রমানিকের সবচেয়ে বড়ো আধার।”

বজ্রমানিকের নাম শুনেই সোজা হয়ে বসল অভী। মেঘবর্ণ বলল, “মানে?”

“শেষমুখ আপনাদের নামে রেশমি রুমাল রেখে গেছে না? লোকে বলে, এই শেষমুখের শরীরের মধ্যে বজ্রমানিকের একটা টুকরো আছে; তাই ও এমন ভয়ানক যোদ্ধা, সাংঘাতিক হত্যাকারী হয়ে উঠতে পেরেছে। কোনো কোনো রাক্ষস জন্ম থেকেই এমন কোনো মায়ামণির অধিকারী হয়ে জন্মায়; তার শরীরের মধ্যে ওই মণি বাস করে আজীবন – সেই মণির সব মায়াশক্তি ওই ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারে। শেষমুখের এত ক্ষমতা ওই জন্মগত বজ্রমানিকের জন্য; তাও ওর শরীরে যেটা আছে, সেটা খুব একটা আকারে বড়ো নয় – তাতেই ওর এত ক্ষমতা। আর সুতসোমের মধ্যে আছে আমাদের জ্ঞানমতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বজ্রমানিক – ওর বুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে ওই পাথরটা। বজ্রমানিক হল দুনিয়ায় যতরকমের ধ্বংসাত্মক শক্তি আছে, সবকিছুর আধার। ওই মণির বলেই যুদ্ধে এমন অমানুষিক ক্ষমতা পায় আমার ভাই সুতসোম।”

লীনা বলল, “ও আপনার ভাই?”

“নিজের ভাই নয়, তবে স্নেহের পাত্র তো বটেই। ও আমাকে ‘দিদি’ বলে; আমি ওকে ভাইফোঁটা দিই প্রতি বছর।”

মেঘবর্ণ বলল, “আমি একটা কথা ভাবছি। বলব?”

উর্মি বললেন, “বলুন।”

“মায়ারত্ন বিদ্যা সম্পর্কে আমার জ্ঞান বেশি নয়, কিন্তু আমি যতটুকু জানি, এতখানি তীব্র ধ্বংসাত্মক মায়াশক্তি নিজের শরীরে ধারণ করলে কারও বেশিদিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাহলে সুতসোম কী করে...?”

উর্মি ম্লান হাসলেন। “ও সত্যিই আর বেশিদিন বাঁচবে না, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। কোনো জীবন্ত প্রাণীর দেহ এই ভয়ানক ধ্বংসশক্তিকে নিজের দেহে বেশিদিন লালন করতে পারে না। ওর শরীরের মধ্যে থাকা ওই বিরাট বজ্রমানিক ওকে অলৌকিক শক্তি দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু খুব শীঘ্রই মৃত্যু হবে ওর। আর এ রোগের কোনো ওষুধ হয় না।”

ওরা স্তব্ধ হয়ে রইল। ওইটুকু ছেলেটা...!

কিছুক্ষণ পর অভী জানতে চাইল, “আচ্ছা, সব রাক্ষসই কি এইরকম কোনো মণি শরীরের মধ্যে নিয়ে জন্মায়?”

উর্মি বললেন, “না না, শরীরের মধ্যে কোনো একটা মায়াশক্তিসম্পন্ন মণির অস্তিত্ব নিয়ে জন্মানোটা খুবই দুর্লভ এবং ব্যতিক্রমী ঘটনা। এই মায়া শুধু রাক্ষসদের জগতেই হয়; অর্ধরাক্ষসদের মধ্যেও একটা-দুটো এরকম ঘটনা শোনা গেছে বটে, তবে মানুষদের জগতে এরকম কখনও হয় না। জন্মগত রত্নমায়া ধারণক্ষমতা মানুষের থাকে না।”

অভী বলল, “আপনারও এরকম কোনো রত্ন আছে নাকি?”

উর্মি একটু হেসে বললেন, “আমি পরে বলব তোমাকে, কেমন?”

অভী দেখল, নিধি আর লীনা একসঙ্গে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হালকা করে মুখ বাঁকাল।

ভাগ্যিস উর্মি দেখতে পাননি!

বাইরে থেকে শিঙার গম্ভীর ধ্বনি ভেসে এল। উর্মি বললেন, “ওই যে, হরিংপ্রান্তর রণাঙ্গন থেকে ডাকছে আমাদের। প্রস্তুত হয়ে নাও সবাই।”

মেঘবর্ণ অভীকে ডেকে নিল একপাশে; বলল, “অভী, ভয় পেয়ো না একদম। সুতসোম নিঃসন্দেহে ভালো যোদ্ধা, কিন্তু তোমার হাতে চন্দ্রহাস আছে। আর তোমার উপর আমার ভরসাও আছে – তুমি ঠিক পারবে। প্রথমে একটু রক্ষণাত্মক থাকতেই বলব তোমাকে; প্রতিপক্ষের দুর্বলতা কোথায় আগে মেপে নেবে, তারপর আক্রমণে যাবে। এরা যতই বলুক সুতসোম সাজঘাতিক যোদ্ধা, তাতে চিন্তা করার কিছু নেই। যোদ্ধা যত ভয়ংকরই হোক, একটা না একটা দুর্বল জায়গা সবার থাকে। সেইটি আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে। আর আমি আছি দর্শকাসনে; কোনোরকম গণ্ডগোল হলে আমিও নেমে পড়ব মাঠে। ভয় পাবে না। তুমি-আমি মিলে কত ভয়ানক সব যুদ্ধ লড়েছি, আর এই একটা সামান্য মহড়া-যুদ্ধে ভয় পাওয়ার কিছু আছে কি?”

অভী বলল, “ভয় একটু লাগছে ঠিকই, কিন্তু কৌতূহলও হচ্ছে। একে নিয়ে এত কথা শুনছি, এই সুতসোমটি আসলে কেমন যোদ্ধা, দেখতে আমারও ইচ্ছা।”

চন্দ্রহাস আর মেঘবর্ণের দেওয়া ময়ূরবজ্র তরবারি দুটোই কোমরে গুঁজে অভী বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। উর্মি ইতিমধ্যে বাইরে এসে অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্য; প্রফুল্ল ছিল তাঁর সঙ্গে। অভীকে বেরোতে দেখে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল সে।

তারপর নিধি, মেঘবর্ণ আর লীনা বেরিয়ে এল এক এক করে। লীনার হাতে ধনুর্বাণ, নিধির হাতে ত্রিশূল, মেঘবর্ণের কোমরে তরবারি। প্রফুল্ল তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

“কিছু মনে করবেন না, আজকের যুদ্ধের আসরে একমাত্র প্রলয়যোদ্ধা ছাড়া আর কারও অস্ত্র বহন করার অনুমতি নেই।”

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর সিদ্ধান্ত নিল মেঘবর্ণ। “ঠিক আছে, আমরা অস্ত্র রেখে যাচ্ছি।”

কক্ষের মধ্যে ঢুকে অস্ত্রগুলো রেখে দিয়ে আবার বেরিয়ে এল ওরা। অভী উর্মিকে জিজ্ঞাসা করল, “আপনি ওখানে থাকবেন তো?”

উর্মি বললেন, “না। আমাকে একবার সেবাকক্ষে যেতে হবে। একজন রাক্ষস কঠিন একটা রোগ নিয়ে এসেছে সেখানে, প্রফুল্ল এইমাত্র জানাল। তবে চেষ্টা করব ওখানের কাজটা সেরে একবার হরিংপ্রান্তরের দিকে যাওয়ার।”

প্রফুল্ল বলল, “আপনারা দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।”

উর্মি চলে গেলেন অন্য দিকে, ওরা প্রফুল্লের সঙ্গে এগিয়ে চলল অতিথিভবন ছেড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে। লীনা ফিশফিশ করে জানতে চাইল, “অভী, ভয় লাগছে নাকি?”

ভয় অভীর করছিল ঠিকই, কিন্তু সে বন্ধুদের জানতে দিল না। “নাঃ, ভয় ঠিক নয়, ওই একটু অস্বস্তিমত হচ্ছে।”

মূল প্রাসাদের সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল হরিৎপ্রান্তরের মাঝখানে ইতিমধ্যেই চাঁদোয়া খাটিয়ে রাজকীয় অতিথিদের বসার জায়গা করা হয়েছে। স্বয়ং রাজা পুনর্বসু এসে উপস্থিত হয়েছেন। ওদের আসতে দেখে তিনি হাসিমুখে স্বাগত জানালেন।

নিধি নীচুগলায় বলল, “ইশ! হাসি দেখে কে বলবে, অতিথিদের কচুকাটা করার জন্য এত আয়োজন করেছেন?”

রাজার দু’পাশে যথারীতি বিরাজমান মরুময় এবং প্রজ্ঞা। তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র প্রহরীর দল। তাদের সঙ্গে তরবারি, ধনুর্বাণ, বর্শা সবরকমের অস্ত্রই মজুত।

মেঘবর্ণ প্রফুল্লকে বলল, “আচ্ছা, তোমরা অস্ত্রবহন করলে কোনো দোষ নেই। সব নিয়ম শুধু আমাদেরই জন্য?”

প্রফুল্ল একটু হাসল। “মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত আছেন কিনা। তাঁর দেহরক্ষীরা তো অস্ত্রধারণ করবেই। আপনারা বিদেশি; ভয়টা আপনাদের নিয়েই। আপনারা যাতে কোনোরকম অশান্তির সৃষ্টি করতে না পারেন, সেই কারণেই এই নিয়ম শুধু আপনাদের জন্যই।”

মাঠের মাঝখানে একটা বিরাট বড়ো গোলাকার ফাঁকা জায়গা, তার চারপাশে লম্বা লম্বা কাঠের খুঁটি পুঁতে দর্শকদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে মহড়া রণক্ষেত্রকে। দর্শকরা বাইরে থেকে সবই দেখতে পাবেন, কিন্তু ভেতরে যারা আছে, বাইরে থেকে কাঠের দরজাটা খুলে না দিলে তারা বেরোতে পারবে না। জায়গাটার দিকে তাকিয়েই অভীর বুক দুরুদুরু করে উঠল।

সুতসোমের সঙ্গে আগের দিন যে বিশালদেহী রাক্ষসকে দেখে ওদের চেনা চেনা লাগছিল, সে অভীর দিকে তাকিয়ে ছিল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। কী যে দেখছে সে, কে জানে! অভী আবার মনে করার চেষ্টা করতে লাগল একে কোথায় দেখেছে, কিন্তু এখন উত্তেজনার চোটে মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো এমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যে সে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

প্রফুল্ল ওদের পথ করে নিয়ে গেল রাজার ঠিক পেছনে। সেখানে অতিথিদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। লীনা, নিধি আর মেঘবর্ণ পাশাপাশি বসল; প্রফুল্ল রইল তাদের পেছনের আসনে। তাদের পাশে সতর্ক প্রহরায় দাঁড়িয়ে রইল বেশ কয়েক জন রাক্ষস; তাদের হাতে ধনুর্বাণ, কোমরে তরবারি। অভী বসল না; এফুনি তো নামতে হবে মাঠে।

আবার শিঙার আওয়াজ। সেই বিকট শব্দে চমকে উঠে অভী দেখল, সুবিশাল যন্ত্রটাতে ফুঁ দিচ্ছে এক রাক্ষস। রাজা পুনর্বসু উঠে দাঁড়ালেন।

“আমার ভবনের প্রতিনিধিকে আমি রণাঙ্গনে প্রবেশ করার অনুমতি দিচ্ছি। ঘোষক, নাম ঘোষণা করো।”

শিঙাটা মুখ থেকে নামিয়ে মায়াবলে গলার জোর বাড়িয়ে নিয়ে রাক্ষসটা ঘোষণা করল, “মাল্যপর্বতের রক্ষোরাজ পুনর্বসুর ভবনের পক্ষ থেকে রণাঙ্গনে আসছেন অমিতপ্রভাবশালী যোদ্ধা সুতসোম।”

বিপুল পরিমাণে দর্শক জমায়েত হয়েছে চারদিকে। তারা প্রবল হর্ষধ্বনি করে উঠল।

অভী তৈরি হল। এবার তার পালা। ভয়টাকে সে কোনোমতে চেপে রেখেছে।

সুতসোম এসে প্রবেশ করল রণাঙ্গনে। তার হাতে কোনো অস্ত্র দেখতে পেল না অভী। হয়তো ছুরিজাতীয় কিছু আছে তার পোশাকের মধ্যে লুকানো।

ঘোষক তাকিয়ে আছে রাজার দিকে; অপেক্ষা করছে। রাজা সুতসোমের দিকে দেখছেন। তাকে দেখছেন মরুময় এবং প্রজ্ঞাও। মনে হল, ওঁদের সঙ্গে সুতসোমের চোখে চোখে কী যেন কথা হয়ে গেল।

রাজা বললেন, “এবার রাজকন্যার ভবন-প্রতিনিধিকে আহ্বান জানানো হোক।”

ঘোষক গলা ফুলিয়ে ঘোষণা করল, “রাজকন্যা উর্মিমালার ভবনের পক্ষ থেকে রণাঙ্গনে আসছেন সমরগরিমা আয়তনের প্রলয়যোদ্ধা অভী।”

দর্শকরা উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ল। মেঘবর্ণ বলল, “অভী, এগিয়ে যাও। চিন্তা নেই, আমরা আছি।”

অভী মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিল, সে যে সামান্য হলেও ভয় পেয়েছে, সে-কথা বাইরের কাউকে বুঝতে দেওয়া যাবে না। কোমরে আটকানো চন্দ্রহাসকে স্পর্শ করতে একটু সাহস এল মনে। মাথা উঁচু করে দৃঢ় পদক্ষেপে সে হেঁটে এল সুতসোমের সামনে।

আলোকপর্ণ এসে দাঁড়াল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝখানে; মাথা নীচু করে প্রথমে রাজাকে, তারপর বাকি দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে সে বলল, “আজ দুই মহাযোদ্ধার মধ্যে এক মহাসংগ্রাম দেখতে চলেছি আমরা। মাননীয় দর্শকদের অনুরোধ, আপনারা করতালি দিয়ে যোদ্ধাদের উৎসাহ বর্ধন করবেন।”

দর্শকরা একপ্রস্থ হাততালি দিল। “সুতসোম”, “সুতসোম” ধ্বনিতে ভরে উঠল হরিৎপ্রান্তর।

আলোকপর্ণ বলল, “এবার সৌহার্দ্য-বিনিময়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরকে আলিঙ্গন করবেন।”

সুতসোম গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছে অভীর দিকে, যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে এইসব আলিঙ্গন-টালিঙ্গনের মতো প্রথা তার একেবারেই পছন্দ নয়। তার কাজলটানা দু’চোখে গভীর বিরক্তি। অভী বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার নিজে থেকেই এগিয়ে যাওয়া উচিত কিনা, সে বুঝতে পারছে না।

রাজা একবার গলা-খাঁকারি দিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুতসোম এগিয়ে এসে একবার জড়িয়ে ধরল অভীকে। অভীও আলাগা-হাতে আলিঙ্গন করল তাকে।

তখনই প্রথম তার সঙ্গে কথা বলল সুতসোম। খুব নীচু গলায় সে বলল, “অভী, আজ মোটেই চন্দ্রহাস ব্যবহার কোরো না। তুমি যদি হেরে যাও, ওই মহাশয়তাসম্পন্ন দৈবাস্ত্রের অসম্মান হবে।”

কথাটা বলেই তাকে হাতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে পিছিয়ে গেল সে। অভীও জানে, আজ তার চন্দ্রহাস ব্যবহার করা চলবে না। কোমরের কোষ

থেকে ময়ূরবজ্র তরবারিটা বার করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

আলোকপর্ণ বেরিয়ে গেল রণাঙ্গনের বাইরে। ঘোষক চিৎকার করে বলল, “যোদ্ধারা তৈরি?”

অভী বলল, “তৈরি।”

সুতসোমের হাতে কোনো অস্ত্রই নেই। তবুও সে জোরগলায় বলল, “তৈরি।”

রাজা হাত তুললেন। সংকেত পেয়ে ঘোষক ঘোষণা করল, “যুদ্ধ শুরু হোক।”

অভী ভাবছে, সুতসোম এবার কী অস্ত্র বার করে। কিন্তু দেখা গেল, সে কেবল তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে।

দর্শকরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এবার কী হয় দেখার জন্য। সুতসোম বলল, “অভী, এগিয়ে এসো। আমাকে আঘাত করো তোমার তরবারি দিয়ে।”

অভী বলল, “অসম্ভব। আমি নিরস্ত্র প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে পারব না।”

সুতসোম বলল, “আমি কিন্তু তোমাকে সুযোগ দিয়েছিলাম। নিরস্ত্র আমি নই, অভী; নিরস্ত্র তুমি।”

ডানহাতের মুঠোটা অভীর দিকে তুলে হালকা ভাবে শূন্যে ছুড়ল সুতসোম। দু'জনের মধ্যে অন্তত পাঁচ হাতের ব্যবধান ছিল। কিন্তু অভীর মনে হল একটা বুনো হাতি যেন ছুটে এসে প্রবল গতিতে ধাক্কা মারল তার বুকে। অদৃশ্য আঘাতটা এত জোরালো ছিল যে অভী পেছন দিকে ছিটকে পড়ল।

বুকে হাত রেখে হাঁপাতে লাগল সে। এই এক আঘাতেই মনে হচ্ছিল তার পাঁজরের গোটা দুই হাড় বোধহয় ভেঙে গেল। একটু একটু শ্বাসকষ্টও যেন হচ্ছিল তার।

সুতসোম যে কী মারাত্মক মায়াযোদ্ধা, সে এবার বুঝতে পারছে। অস্ত্র দরকার নেই, এ ছেলে খালি হাতেই বড়ো বড়ো প্রতিপক্ষকে দূর থেকেই খুন করে ফেলতে পারে।

দর্শকরা “সুতসোম”, “সুতসোম” নাম ধরে খুব উল্লাস করছে। “শেষ করে দাও,” “ওর মাথা কেটে নাও” – এইসব উপদেশও আসছে রণাঙ্গনের বাইরে থেকে।

“খুব লাগল নাকি, অভী?” ঠাট্টার সুরে বলল সুতসোম। “নাও, এবার মনের সাধ মিটিয়ে আক্রমণ করো। আমি কথা দিচ্ছি, আর মায়া-আঘাত করব না।”

উঠে দাঁড়াল অভী; তার কতটা ব্যথা লেগেছে, এই রক্তপিপাসু রাক্ষসগুলোকে বুঝতে দেওয়া চলবে না। মাটি থেকে ময়ূরবজ্র তরবারিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে তেড়ে গেল সুতসোমের দিকে।

কী অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে সুতসোম যে তার আঘাতটা এড়িয়ে গেল, অভী বুঝতেও পারল না। তরবারিটা তার শূন্যে এক পাক ঘুরে এল। ছমড়ি খেয়ে সামনে মুখ খুবড়ে পড়তে পড়তে সে সামলে নিল কোনোমতে।

দর্শক রাক্ষসরা হাসছে হো হো করে। “বাহবা!” করতালি দিয়ে উঠল সুতসোম। “আবার একবার হোক, প্রলয়যোদ্ধা।”

অভী আবার তরবারি চালান। কিন্তু আবার সেই এক কাণ্ড। শেষ মুহূর্তে বাতাসের মতো সরে যাচ্ছে সুতসোম; তার তরবারি কিছুতেই ওর অঙ্গস্পর্শ করতে পারছে না।

অভী বুঝতে পারছে, তাকে একটা হাস্যকর ভাঁড়ের মতো লাগছে। সুতসোম ওর মন পড়ে নিচ্ছে; ওর প্রত্যেকটা আঘাত কীভাবে, কোন্ দিক থেকে আসবে, ছেলেটা আগে থেকেই জানে। এ শত্রুকে হারানো অসম্ভব।

দর্শকাসনের দিকে চোখ গেল তার। সেনানায়িকা প্রজ্ঞার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই; পাথরের মতো শক্ত মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই তাঁর। কিন্তু রাজা পুনর্বসু স্পষ্টতই বেশ আনন্দিত; তাঁর প্রতিনিধি সুতসোম সমরগরিমার বিখ্যাত প্রলয়যোদ্ধাকে পর্যুদস্ত করছে, এতে যেন তাঁর খুশি আর ধরে না। মরুময়ের মুখটাও দেখতে পেল অভী। সে-মুখে আনন্দ বা দুঃখ আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না, শুধু একটা কৌতূহল যেন ঠিকরে পড়ছে – আর কতক্ষণ অভী পারবে সুতসোমের সামনে টিকে থাকতে?

অভীর মনে হল, সে কতটা শক্তিশালী যোদ্ধা, মরুময় যেন মনে মনে বিচার করছেন।

“এত নিম্নমানের অস্ত্রবিদ্যা নিয়ে নিজেকে ‘প্রলয়যোদ্ধা’ বলে প্রচার করো তুমি, অভী? ছি ছি ছি!” বিদ্রূপ করে উঠল সুতসোম।

অভী রেগে যাচ্ছে এইবার – অসহায়তার সঙ্গে ক্রোধ মিশতে শুরু করেছে। সে নিজেকে কোনোদিন প্রচার করেনি।

“চন্দ্রহাসের মতো পবিত্র অস্ত্রকে স্পর্শ করো তুমি কোন্ স্পর্ধায়?” আবার ব্যঙ্গ করে বলল সুতসোম। “তুমি একটা মিথ্যেবাদী, তুমি একটা অসৎ লোক! তোমার অস্ত্রধারণ দক্ষতার নমুনা দেখে গোটা মাল্যপর্বত হাসছে, দেখতে পাচ্ছ না তুমি?”

অভীর হাত খুব দ্রুত ঠান্ডা হতে শুরু করল। কবজি, হাতের তালু, আঙুল – বরফের স্রোত বইতে শুরু করেছে ভেতরে ভেতরে। তীব্র একটা ঘৃণা মাথা তুলছে তার অন্তরে।

সুতসোম বলল, “এই নাকি সমরগরিমার সেরা যোদ্ধার নমুনা? এই যুদ্ধবিদ্যা শিখেছ তুমি? আমার তো মনে হচ্ছে, তোমার শিক্ষকদের মৃত দেবতার নদীর জলে ডুবে মরা উচিত।”

হাতগুলোতে তার এসে জমেছে সুমেরুপর্বতের বরফ। লীনা, নিধি, মেঘবর্ণ এটারই অপেক্ষা করছিল। অভীর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে, স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে সুতসোমের দিকে। মেঘবর্ণ ফিশফিশ করে বলে উঠল, “আসছে! এইবার আসছে!”

সুবিশাল হিমবাহের ভেঙে পড়ার প্রবল শক্তিকে নিজের হাত দিয়ে চালনা করল অভী; সেই ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক স্রোত ধেয়ে গেল সুতসোমের দিকে।

কিন্তু চোখের পলক পড়ার আগেই সুতসোম বাড়িয়ে ধরল তার দুই হাত; অভীর হাত থেকে বেরিয়ে আসা সাদা রঙের প্রচণ্ড শীতল প্রবাহকে সে যেন

ধাক্কা মেরে পাঠিয়ে দিল আকাশের দিকে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। অভীর হাত থেকে বেরিয়ে আসছে দুর্দমনীয় বরফের স্রোত, আর সেই স্রোতের সামনে দুটো হাত মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুতসোম। ওই স্রোত তাকে স্পর্শ করছে না; তার হাতের সামনে থেকে একটা অদৃশ্য বাধার স্তরে প্রতিফলিত হয়ে স্তম্ভের মতো উঠে যাচ্ছে আকাশে। অভীর মাথা ঝিমঝিম করছে। এই ভয়ানক হিমকুশলতার মায়া সে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না, সে জানে। তবু এরই মধ্যে সে বুঝতে পারছে, সুতসোম যদি এই স্রোতটাকে আকাশের দিকে মায়াবলে চালনা করে না দিত, তাহলে এতে জমে গিয়ে এতক্ষণে দর্শকাসনে অনেকের ভবলীলা সাজ হয়ে যেত।

চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে আসছে। তবু মনের মধ্যে কাজ করছে তীব্র একটা ঘৃণা – যেন সবকিছুকে ধ্বংস করে ফেলতে পারলেই তার তৃপ্তি হয়। বরফস্তম্ভটা সগর্জনে উঠে যাচ্ছে উর্ধ্বপানে। দর্শকরা হাঁ করে দেখছে এই অতি ভয়ানক দৃশ্য। অভীর হাত পা অবশ হয়ে আসছে। অবশেষে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ক্লান্তিতে যেন আর সে খুলতে পারছে না চোখ দুটো। সংজ্ঞা হারায়নি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে অতল ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতে পারলে যেন একটু আরাম হত। সুতসোম এগিয়ে এল তার এলিয়ে পড়া শরীরটার দিকে।

সে যখন কথা বলল, তখন তার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল প্রশংসামেশা বিস্ময়। “অসাধারণ! অসাধারণ! শুনেছিলাম প্রলয়যোদ্ধাকে রাগিয়ে দিতে পারলে নাকি হিমকুশলতা মায়া স্বচক্ষে দেখা যায়। কথাটা দেখছি সত্যি। এই মায়া আমারও আয়ত্তে নেই, অভী। এই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্যিই খুব আনন্দ পেলাম।”

চোখ বন্ধ করেই অভী হাসল। সুতসোম যে তাকে ইচ্ছে করে উলটোপালটা কথা বলে রাগিয়ে দিতে চাইছিল, সে কথা সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে।

সুতসোম বলল, “কিন্তু এবার তোমার আত্মসমর্পণের পালা, অভী। দয়া চাইবে তো সবার সামনে?”

অভী চোখ খুলল। “মরে গেলেও নয়।”

“দয়াভিক্ষা অথবা মৃত্যু – একটা তোমাকে বেছে নিতেই হত। আমি দেখে খুশি হলাম যে সমরগরিমার যোদ্ধা হয়ে তুমি মৃত্যুকেই বেছে নিলে। আমার হাতটা তোমার হৃৎপিণ্ডের দিকে লক্ষ্য করে একবার খালি একটা মায়া-আঘাত করার অপেক্ষা। পরক্ষণেই তার ধুকপুক বন্ধ হয়ে যাবে। তাই হোক তাহলে, কী বলো?”

এত ক্লান্ত লাগছিল যে অভী উত্তর দিতেও পারছিল না। মাথা ভীষণ ঘুরছিল তার। আধখোলা চোখে সে দেখল, সুতসোমের মুখে বিজয়ীর হাসি।

দর্শকদের দিকে ফিরে সুতসোম বলল, “আপনারা কী বলেন? কী করা উচিত এই যোদ্ধার সঙ্গে?”

“মৃত্যু! মৃত্যু! আমরা ওর মৃত্যু দেখতে চাই!” গর্জন করতে লাগল রাক্ষসের দল।

মেঘবর্ণ বলে উঠল, “মহারাজ! এরকম কথা তো ছিল না। এবার কিন্তু

বাড়াবাড়ি হচ্ছে।”

সঙ্গে সঙ্গে এক রাক্ষস সেনা তার পিঠে তরবারি ঠেকাল। “লড়াইতে বাধা দেওয়া চলবে না। দিলে শাস্তি মৃত্যু।”

অবহেলাভরে তরবারিটা তর্জনী দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল মেঘবর্ণ। “এইসব হুমকি একজন সমরোত্তমকে দিতে যেও না, বালক - হ্যাঁ, সে সমরোত্তম নিরস্ত্র হলেও। ঘরে বউ-বাচ্চা আছে তো? তাদের মুখ আবার দেখার ইচ্ছা আছে তো?”

লীনা আর নিধির গায়ের তরবারি ঠেকাল আরও দু'জন সেনা। দুটি মেয়েই গর্জন করে উঠল, “খবদার বলছি!”

এবার সেনানায়িকা প্রজ্ঞা ফিরলেন ওদের দিকে; সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আঃ! এঁরা আমাদের অতিথি। এঁদের সঙ্গে অসভ্যতা কোরো না।”

হরিৎপ্রান্তরের রণাঙ্গনের সবুজ ঘাসেভরা মাটিতে পড়ে আছে অভী। তার দিকে তাকিয়ে মায়া-আঘাতের তরঙ্গ পাঠানোর ভঙ্গিতে হাত তুলল সুতসোম। “এবার তোমাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গেছে, প্রলয়যোদ্ধা।”

দর্শকাসনে মেঘবর্ণ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তার সঙ্গে সঙ্গে নিধি আর লীনা। মেঘবর্ণ চিৎকার করে বলল, “সমরগরিমার সঙ্গে যদি এই মুহূর্তে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে ওকে থামতে আদেশ দিন, মহারাজ।”

রাজা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন; কিন্তু কেউ কিছু বোঝার আগেই লীনা এমন একটা কাজ করে বসল যেটা কেউ ভাবতেই পারেনি। পলকের মধ্যে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রাক্ষসসেনার হাতের ধনুর্বাণ ছিনিয়ে নিল সে, আর সঙ্গে সঙ্গে ধনুতে বাণ পরিয়ে সেটা নিক্ষেপ করল সুতসোমের বুক লক্ষ্য করে।

অন্য যেকোনো ব্যক্তি হলে ওই বাণের আঘাতে তার মৃত্যু অবশ্যস্বাবী ছিল; কিন্তু সুতসোম অন্য ধাতুতে গড়া। শূন্য থেকেই উড়ন্ত তিরটাকে ধরে ফেলল সে। দর্শকরা এত অবাক, তারা যেন শব্দ করতেও ভুলে গেছে।

তিরটাকে কয়েক মুহূর্ত ভালো করে দেখল সে। তারপর বলল, “লীনা, তোমার লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা বেশ ভালো, আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। এটা না ধরে ফেললে আমার হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেত।”

লীনা ক্রুদ্ধভাবে বলল, “হ্যাঁ, আমারও ইচ্ছাটা সেরকমই ছিল।”

দর্শকরা হেসে উঠল। সুতসোমও হাসল। “কিন্তু কাজটা ভালো করলে না। দর্শকাসন থেকে রণাঙ্গনের যোদ্ধার উপর অস্ত্রাঘাত নিষিদ্ধ। কিন্তু হাত থেকে তির একবার বেরিয়ে গেলে আর তো ফেরানোর উপায় নেই। আমি তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই রণাঙ্গনে আসতে। এসো, আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের সম্মানিত করো।”

নিধির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে লীনা এসে প্রবেশ করল হরিৎপ্রান্তরের মহড়াযুদ্ধের অঙ্গনে। অভী একটু সামলেছে নিজেকে এতক্ষণে। সে বলল, “লীনা, তুমি আবার এখানে আসতে গেলে কেন?”

লীনা তার দিকে দেখল একবার শুধু; উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না।

সুতসোমের হাতে এখনও ধরা আছে তিরটা। “তুমি কিন্তু খুব ভালো লক্ষ্যভেদী। আমার হৃদয় লক্ষ্য করে ছুড়েছিলে না এটা? বেশ, বেশ। তিরের মধ্যেও হৃদয় থাকা ভালো।”

লীনার দিকে একবার আঙুলটা তুলেই নামিয়ে নিল সে; বলল, “এবার বলো তো লীনা, বুকে কোনোরকম ব্যথা অনুভব করছ?”

লীনা অবাক হয়ে বলল, “না তো। কেন?”

“বুকের বামদিকে হাত দিয়ে দেখো।”

“কী দেখব?।”

“নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছ?”

“এ আবার কীরকম বোকার মতো কথা?”

“আহা, একবার হাত দিয়ে ছুঁয়েই দেখো না জায়গাটা। স্পন্দনটা অনুভব করার চেষ্টা করো। কী অনুভূতি হচ্ছে, আমাকে বলো।”

নিজের বুকে হাত রেখেই লীনা অবাক হয়ে বলল, “আরে, আমার হৃৎপিণ্ডটা আর চলছেই না। আমি ওটার অস্তিত্ব আর বুঝতেই পারছি না।”

তার হাতে তিরটা ধরিয়ে দিল সুতসোম। “এই নাও তোমার হৃদয়, সমরগরিমার তিরন্দাজ। আমার উপহার বলতে পারো একে। মাল্যপর্বতের অপরাজেয় সুতসোমের দিকে তির নিক্ষেপ করার সাহস দেখিয়েছিলে তুমি; একে তাই আমার তরফ থেকে উপহার বলতে পারো।”

লীনা জ্রকুঞ্জন করে বলল, “বুঝতে পারলাম না। এ কি কোনো মায়া-অস্ত্র নাকি?”

“একদম তাই। এই একটা তির দিয়ে তুমি যেকোনো একজন প্রতিপক্ষকে মারতে পারো। যদি কোনো বিরাট জড়বস্তুর বাধা সামনে আসে, এই তির নিক্ষেপ করলে তাও ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। একে থামাতে পারে, এমন কোনো শক্তি এই পৃথিবীতে নেই। যেকোনো শত্রুকে বধ করতে পারবে তুমি এই অস্ত্র দিয়ে – শুধু আমাকে ছাড়া।”

অদ্ভুতভাবে হাসল সুতসোম; সে হাসিটা অভীর ভালো লাগল না – যেন কী একটা কথা চেপে গেল সে।

সুতসোম ফিরে দাঁড়াল অভীর দিকে। “অভী, তুমি অসাধারণ লড়াই করেছ। আমি চাইলে তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম। এমনকি, এখানে কেউ কেউ সত্যিই চান আমি তোমাকে মেরে ফেলি।”

দর্শকদের দিকে সরাসরি তাকাল সে – সেই দৃষ্টিতে তাক্সিল্যের ভাব স্পষ্ট। অভী বুঝতে পারল না ঠিক কার দিকে তাকাচ্ছে সে। মনে হচ্ছে যেন প্রজ্ঞা আর রাজা পুনর্বসুর সঙ্গেই দৃষ্টিবিনিময় করছে সুতসোম।

নাকি মরুময়ের সঙ্গে?

একটু থেমে সে বলল, “কিন্তু অতিথিদের হত্যা করা আমি পছন্দ করি না। জয়লাভের এত উগ্র বাসনাও আমার নেই। আর আমি ভাড়াটে খুনিও নই যে আমাকে আদেশ দেওয়া হবে আর আমি সেই আদেশমাফিক মানুষ-খুন করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দুনিয়ার দরকার আছে প্রলয়যোদ্ধাকে। যেরকম সব লোকজনে ভরে যাচ্ছে পৃথিবীটা, একটা প্রলয় আসা খুব দরকার হয়ে

পড়েছে।”

হাত ধরে টেনে অভীকে তুলে আনল সে মাটি থেকে। দর্শকরা চুপ করে রইল। একটা জমকালো খুনোখুনি দেখতে পেল না বলে তারা বেশ হতাশ।

ঘোষক জোরগলায় বলল, “জয়-পরাজয় নির্ধারিত হল না আজকের যুদ্ধে। অতএব এই মহড়া-যুদ্ধকে আমি ফলাফলহীন ঘোষণা করছি।”

শিঙার জোরালো আওয়াজে যুদ্ধশেষের সংকেত দেওয়া হল।

রাজা পুনর্বসু অপ্রসন্ন মুখে উঠে দাঁড়ালেন। “সুতসোম, আমি তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব। অভী, তুমি অতি সুন্দর লড়াই করেছ, আমাদের সবাইকে আনন্দ দিয়েছ। রক্ষোপুরীর আতিথ্য তোমরা অর্জন করেছ। প্রফুল্ল, এঁদের নিয়ে যাও রাজকন্যার ভবনে। প্রলয়যোদ্ধা এই যুদ্ধে আহত হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসা করতে অনুরোধ করবে উর্মিকে।”

প্রফুল্ল এগিয়ে এল। “আসুন আপনারা।”

সুতসোম বলল, “চলো, আমিও যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে।”

একদিকে অভীকে ধরল নিধি আর লীনা, আরেকদিকে সুতসোম আর মেঘবর্ণ। অভীর বুকে বেশ যত্নগা হচ্ছিল, তার সঙ্গে অতখানি হিমকুশলতা প্রয়োগ করার ফলে তার ভীষণ দুর্বলও লাগছিল। কিন্তু এই শারীরিক অস্বস্তির মধ্যেও সে খেয়াল করল, প্রফুল্ল তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না – বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখল।

তার মুখের দিকে দেখল অভী। কেমন যেন একটা অপ্রসন্ন ভাব সেখানে। যেন অভী এই যুদ্ধে মরে গেলেই সে খুশি হত।

অতিথিভবন পর্যন্ত এসে ওরা দেখল, উর্মিও সেইমাত্র এসে পৌঁছেছেন ওখানে। ওদের দেখে তিনি বললেন, “আমি ইতিমধ্যেই সংবাদ পেয়ে গেছি যে যুদ্ধ ফলাফলহীন হয়েছে। আর তাই ওখানে যাইনি। জানি, তোমরা এখানেই আসবে।”

মেঘবর্ণ উদ্বিগ্নভাবে বলল, “অভী আহত হয়েছে, রাজকন্যা। আপনি কি একটু দেখবেন?”

অভীর অবস্থা দেখে তিনি একটু হাসলেন। “সুতসোম, কতবার বলেছি, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখ। এতখানি জোরে কেউ মায়া-আঘাত করে?”

সুতসোম বলল, “তুমি তো জানো উর্মিদি, এখানের হতভাগাগুলোর সঙ্গে লড়াই করে আমার পোষায় না। ভাবলাম, প্রলয়যোদ্ধা যখন, তার উপর একটু জোরদার আঘাত দেওয়া যেতেই পারে।”

লীনা বলল, “একটু দেখুন না, পাঁজরের হাড় ভেঙেছে নাকি? যেভাবে বুক চেপে ধরে ও বসে পড়েছিল...!”

অভী দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করছিল। উর্মি তার বুকে আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে দেখছিলেন। “না, হাড় ভাঙেনি। যে পরিমাণে আঘাত লেগেছে, ভাঙলে অবাক হতাম না। কিন্তু ভাঙেনি। কিছু ওষুধ দিচ্ছি, ব্যথা কমে যাবে। না, সেবাকক্ষে যেতে হবে না; এখানেই কিছু খাওয়ার ওষুধ আর মলম পাঠিয়ে দিচ্ছি – ওতেই কাজ হবে। অনেকটা হিমকুশলতারও প্রয়োগ করেছ তুমি, অভী। গরম দুধ খেতে হবে একবাটি। পরিচারিকাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি সেটাও।”

সুতসোম বলল, “উর্মিদি, তোমার ভবনের এই যোদ্ধা কিন্তু একেবারে বিরল ক্ষমতার অধিকারী। ভালো করে যত্নটনু কোরো। একদিন গোটা পৃথিবীকে ধ্বংসের ভার নিতে হবে অভীকে। ততদিন পর্যন্ত ওকে বাঁচিয়ে রাখবে যেকোনো মূল্যে, কথা দাও আমাকে।”

উর্মি বলল, “দিলাম কথা। ...অভী, সত্যিই তুমি দুর্দান্ত লড়াই করেছ। আমার ভবনের সম্মান অটুট রেখেছ তুমি, তার জন্য আমার ধন্যবাদ রইল। ... সুতসোম, তোর কেমন লাগছে এখন শরীরটা?”

একটু হাসল সে। “সবসময় যেমন লাগে – মরো-মরো, যেন আর একটু পরেই সব শেষ হয়ে যাবে।”

অভী তাকিয়ে ছিল বাচ্চা ছেলেটার মুখের দিকে। চোখের নীচে সরু সরু দাগ পড়েছে তার; মুখের অভিব্যক্তিতে ব্যথা লুকানোর চেষ্টা। এখন ওকে যেন দশ বছরের বাচ্চা লাগছে না; মনে হচ্ছে, একটা নব্বই বছরের বুড়োর সারা জীবনের ক্লান্তি লুকিয়ে আছে ওই মুখটার চামড়াটার তলায়। যেন বেঁচে থাকার সব ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে সে।

উর্মি চুপ করে রইলেন, চুপ করে রইল কক্ষের বাকিরাও। সুতসোম আবার বলল, “এবার যেকোনো দিন ওপারের ডাক এসে পড়বে, দিদি। মায়ের কাছ থেকে খুব একটা বেশি কিছু আশা কোনোদিনই করিনি, আজও করি না। তুমি আমাকে মনে রাখবে তো?”

“রাখব। এসব কথা ছাড় এখন। লোকে মরে তো একবার। বারবার মরার কথা বললেও একবার, একবারও না বললেও সেই একবারই। আজকের যুদ্ধের কোনো বিশেষ ঘটনা থাকলে আমাকে বল। আমি তো একটুও দেখতেই পেলাম না।”

“বিশেষ ঘটনা? অভীর হিমকুশলতা ছাড়া?” বলে সুতসোম মিটিমিটি হাসল। “একটা ঘটনা ঘটেছে বৈকি। লীনা, তুমিই বলো উর্মিদিকে।”

তার বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু একটা ছিল যে উর্মির মুখের সহজ হাসিটা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন, “লীনা, কী হয়েছে?”

লীনা বলল, “আমি ভয় পাচ্ছিলাম, ও বোধহয় অভীকে মেরে ফেলতে চাইছে। তাই দর্শকাসন থেকে আমি তির ছুড়েছিলাম ওর দিকে। তাতে অবশ্য কোনো ক্ষতি হয়নি। উড়ন্ত তিরটাকে ও মাঝপথেই ধরে ফেলেছিল। এরকম অলৌকিক ক্ষমতা আমি আগে কখনও দেখিনি।”

“দর্শকদের মাঝখান থেকে তির ছুড়েছিলে তুমি সুতসোমের দিকে?” উর্মির কপালে ভ্রুকুটি জেগে উঠল। “যুদ্ধের নিয়মভঙ্গ করে কেন করতে গেলে এই কাজ, বোকা মেয়ে? সুতসোম, তুই কী করেছিস তারপরে, খুলে বল আমাকে।”

সুতসোমের আগে লীনাই বলল, “ও আমাকে তিরটা উপহার দিয়েছে তো।”

সুতসোম বলল, “তুমি কিন্তু কাজটা অত্যন্ত অন্যায় করেছিলে, লীনা। ন্যায়যুদ্ধের নিয়ম ভাঙা ঘোরতর অপরাধ।”

উর্মি কঠোরভাবে বললেন, “ওরা বিদেশি অতিথি। ওরা আমাদের এত নিয়ম জানবে কোথা থেকে? কিন্তু তোকে আমি ভালো করেই জানি; এমনি

এমনি ঘটনাটাকে যেতে দেওয়ার পাত্র তুই নয়। তিরটাতে কী করেছিস, সত্যি করে বল আমাকে।”

“হৃদয়শর মায়া।”

“হে ঈশ্বর!” কপালে করাঘাত করলেন রাজকন্যা উর্মি।

অভী দেখল, মেঘবর্ণের মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হয়ে উঠেছে কথাটা শুনেই। কিছুই বুঝতে না পেরে নিধি আর সে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

নিধি প্রশ্ন করল, “এটা কীরকম মায়া?”

উর্মি বললেন, “ওই তির দিয়ে লীনা যেকোনো প্রতিপক্ষকে – সে যদি অপরাজেয়ও হয় – পরাজিত করতে পারবে। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। ওই তিরটাতে তোমার হৃদয় আছে, লীনা। হৃদয়শরের আঘাত সহ্য করতে পারে, এমন কেউ পৃথিবীতে নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে ওই বাণ তুমি নিক্ষেপ করবে, সেই মুহূর্তেই...”

বলতে বলতে খেমে গেলেন তিনি। লীনা বলল, “সেই মুহূর্তেই?”

“তোমার মৃত্যু হবে।”

রাতের স্বপ্নটা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অভীর; তার সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল।



॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ হীনশক্তি

আয়তনে ফিরে রক্ষাবৈদ্যের সেবাকক্ষে গিয়ে একবার অর্ধরাক্ষস প্রবীরের অবস্থাটা দেখে এল নীলাভ। চোট বেশ ভালোই লেগেছে তার। তবে রক্ষাবৈদ্যের মতো নিপুণ চিকিৎসক থাকতে দৃষ্টান্তার কিছু নেই, সে জানে।

সে ভাবছিল একবার নিয়ামক বা সহনিয়ামকের সঙ্গে দেখা করে এই ঘটনার কৈফিয়ত চায়। কিন্তু তার আগেই আয়তনের দুই শিক্ষার্থী সন্দীপ আর উষসী দৌড়ে এসে ঢুকল সেবাকক্ষে।

“সমরোত্তম নীলাভ, আপনাকেই খুঁজছিলাম। একবার আসুন আমাদের সঙ্গে।”

ছেলেমেয়েদুটোর মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। নীলাভ ওদের নিয়ে বেরিয়ে এল সেবাকক্ষ থেকে। খারাপ খবর, বোঝাই যাচ্ছে। অসুস্থ রোগী আছে; এখানে তার সামনে এসব আলোচনা করা ঠিক নয়।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই উষসী বলল, “একবার সুদক্ষিণসারি যাবেন দয়া করে?”

“কেন বলো তো? নতুন করে গুগোল বেধেছে নাকি?”

সন্দীপ বলল, “বাধতে চলেছে। নিয়ামকের রক্ষীপ্রধান শ'খানেক সেনা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন সুদক্ষিণসারির দিকে। আপনি এক্ষুনি গেলে হয়তো কিছু করতে পারবেন।”

দেরি না করে নীলাভ বেরিয়ে পড়ল আয়তন ছেড়ে। রক্ষীপ্রধানের দলবল এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনেকটা এগিয়ে গেছে। দ্রুতগতিতে ছুটল সে।

সুদক্ষিণসারি ঢোকার মুখে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। সেনাদলটাকে পেছন থেকে দেখতে পেয়েই চাঁচিয়ে উঠল সে, “দাঁড়াও।”

স্বয়ং একজন সমরোত্তমের আদেশ লঙ্ঘন করল না সেনারা; দাঁড়িয়ে পড়ল বিরাট দলটা।

ওদিকে অর্ধরাক্ষসরাও তৈরি হয়ে আছে লাঠিসোঁটা, ছুরি-কাটারি-বাঁটির মতো ঘরোয়া অস্ত্র নিয়ে। নীলাভ বুঝতে পারছিল, যুদ্ধ যদি একবার শুরু হয়, ওইসব অস্ত্র নিয়ে এই প্রশিক্ষিত সেনার সামনে অর্ধরাক্ষসরা কয়েক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারবে না।

সেনাদলের মধ্য দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেল সে সামনের দিকে। সমরগরিমার সেনারা দু'দিকে সরে গিয়ে সসম্মানে তাকে পথ করে দিল।

সামনে দাঁড়ানো অর্ধরাক্ষসদের মুখে তাকে দেখে স্পষ্টতই স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। অর্ধরাক্ষস নেতা রথীন্দ্র, সুহাস এদের চিনতে পারছিল নীলাভ। আর সেনাবাহিনীর সামনে উদ্যত তরবারি হাতে রক্ষীপ্রধানের মুখের অসন্তুষ্টির চিহ্নও নজর এড়াল না তার।

“কী চান আপনি, সমরোত্তম নীলাভ?”

নীলাভ একবার দেখে নিল সেনাবাহিনীর যোদ্ধাদের মুখ। সে জানে, এরা নিয়ামকের অনুগত; কিন্তু একজন সমরোত্তমের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস এদের হবে কি?

সে বলল, “আমার কথা থাক। আপনি কী চান, সেটাই বলুন আগে। সমরগরিমার সেনাদল সশস্ত্র অভিযানে বেরিয়েছে, আর সমরোত্তমদের কাছে কোনো সংবাদ নেই- ব্যাপারটা এরকম হল কেন?”

“সহনিয়ামক সৌজন্য বলছিলেন, আপনি এই প্রশ্ন তুলতে পারেন।”

“সৌজন্য?” নীলাভ জ্র তুলল। “তাহলে তো সে আপনাকে এর উত্তরটাও শিখিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়?”

রক্ষীপ্রধান বললেন, “উনি আমাকে আইনটা বলে দিয়েছেন। নিয়ামক চাইলে নিজের ইচ্ছায় এবং ক্ষমতাবলে সেনাবাহিনীকে বিশেষ অভিযানে পাঠাতে পারেন।”

নীলাভ হাসল। “বটে? কিন্তু সমরগরিমার আইন যে আমিও একটু একটু জানি, মাননীয় রক্ষীপ্রধান। নিয়ামক তাঁর এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন যখন জরুরি অবস্থা চলছে, এবং সামরিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একজন সমরোত্তমও আয়তনে নেই। আইনভঙ্গ তো আপনারাই করছেন দেখছি।”

রক্ষীপ্রধান বললেন, “আমাদের উপর মাননীয় নিয়ামক মহোদয়ের আদেশ আছে, দেশদ্রোহীদের ধরে নিয়ে যেতে হবে।”

“তারপর?”

“তারপর ওদের ন্যায়বিচার হবে। আর বিচারের পরে ফাঁসি হবে।”

অর্ধরাক্ষসদের মধ্যে একটা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন উঠল। হেসে উঠল নীলাভ। “বিচারের পরে ফাঁসি হবে? তার মানে তো বিচারের আগেই এদের দোষী সাব্যস্ত করে ফেলেছেন নিয়ামক মহোদয়। এই আপনাদের ন্যায়বিচারের নমুনা? কার চোখে ধুলো দেবেন এভাবে আপনারা?”

“দয়া করে আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতে দিন, সমরোত্তম নীলাভ। আমি হুকুমের চাকর। প্রভু যা আদেশ করেছেন, আমাকে পালন করতেই হবে।”

নীলাভ বুঝতে পারছিল, এখনও সে তরবারি হাতে শক্ত কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা ফিরে পায়নি। নরক থেকে ফিরে আসার পরে শরীর এখনও তার বেশ দুর্বল। তাও সে বুঝতে দিল না নিজের অক্ষমতা। কোমর থেকে তরবারি নিষ্কাশন করে সে গম্ভীরস্বরে বলে উঠল, “সুদক্ষিণসারির একজন অর্ধরাক্ষসের গায়ে হাত দিতে হলেও আমাকে পেরিয়ে তবে যেতে পারবেন আপনি, মাননীয় রক্ষীপ্রধান।”

রক্ষীপ্রধানের মুখ শুকনো হয়ে গেল। তিনি বললেন, “কেন এমন করছেন আপনি? আমরা আদেশ পালন করছি মাত্র। একজন সমরোত্তমের সঙ্গে অসিযুদ্ধ করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনোটাই আমাদের নেই। আপনাদের যে দৈবী অস্ত্রবিদ্যা, তার সঙ্গে আমরা সবাই মিলে লড়াই করলেও কিছু করতে পারব না।”

“তাহলে ফিরে যান আপনি। গিয়ে আপনার প্রভুকে বলুন, উনি যদি শান্তি চান, তাহলে যেন অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। দু’পক্ষের যা কিছু ক্ষোভ, সেটা শান্তভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বললেই মিটবে। নয়তো কেবল অনর্থক রক্তক্ষয় হবে; তাতে আখেরে সমরগরিমারই ক্ষতি।”

রক্ষীপ্রধান জানেন, নীলাভর উপস্থিতিতে সুদক্ষিণসারিতে হামলা চালানো আপাতত সম্ভব নয়। নিজের বাহিনীকে ফিরতে আদেশ দিলেন তিনি। হর্ষধ্বনি করে উঠল অর্ধরাক্ষসরা।

নীলাভ বুঝতে পারছিল, রক্ষীপ্রধান ভয় পেয়েছেন। সুযোগটা সে হারাতে চাইছিল না। লোহা গরম থাকতে থাকতেই আঘাত করা ভালো।

সে ডাকল, “রক্ষীপ্রধান মহোদয়।”

তিনি ফিরে তাকালেন। নীলাভ বলল, “একবার অনুগ্রহ করে এইদিকে আসুন। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।”

একটু অবাক হয়েই তিনি এগিয়ে গেলেন তার দিকে। নীলাভ বলল, “আসুন, এইদিকে সরে আসুন।”

অর্ধরাক্ষসরা ওঁদের পথ করে দিল। দু’জনে সরে গেলেন ভিড় থেকে একটু দূরে, যেখানে কেউ ওঁদের কথা শুনতে পাবে না।

নীলাভ খুব নীচু গলায় বলল, “বক্রপুচ্ছকে চেনেন আপনি?”

“অ্যাঁ? কে?”

“বক্রপুচ্ছ। পর্বতের কুকুর।”

রক্ষীপ্রধান তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। নীলাভ আবার বলল, “চেনেন?”

“দেখেছি। কেন?”

“নিয়ামক বিনীতেশের আদেশ পালন করেন তো আপনি? তার আদেশে অন্যদের কাছে ‘ন্যায়বিচার’ পৌঁছে দেন? তার হয়ে তরবারি ধারণ করেন? কেমন হবে, রক্ষীপ্রধান, যদি একদিন দেখতে পান আপনার তরবারি ধরার হাতটা পড়ে আছে অনুশীলন মঞ্চের সামনে, আর খুব আরাম করে সেটাকে কামড়াচ্ছে বক্রপুচ্ছ?”

রক্ষীপ্রধান কথা বলার জন্য একবার অস্বস্তিভরে মুখ খুললেন, কিন্তু আবার বন্ধ করে নিলেন। নীলাভর দু’চোখে স্থির, শীতল দৃষ্টি। সে বলল, “হাতবিহীন

যোদ্ধা কি কারও কোনো কাজে আসে? তার প্রভুর বা তার নিজের?"

রক্ষীপ্রধান মুখের গাঙ্গীর্ষ বজায় রেখেছেন বটে, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলা কেঁপে গেল। "এই ভীতি-প্রদর্শন করে কী পেতে চাইছেন আমার কাছ থেকে, বলুন।"

"আন্দাজ করে বলুন তো, কী চাইছি আমি।"

"আপনি বোধহয় কিছু অগ্রিম সংবাদ চাইছেন।"

একটু হেসে রক্ষীপ্রধানের পিঠ চাপড়ে দিল নীলাভ। "এই তো ঠিক ধরেছেন। আমাদের মাননীয় নিয়ামক মহোদয়ের কাছে কাছেই তো থাকতে হয় আপনাকে। ওঁর সব বেআইনি কাজ করার দায়িত্বও এসে পড়ে আপনার উপর। এইটুকু খালি আপনাকে অনুরোধ, উনি যা বলবেন, সেগুলো যেন যথাসময়ে আমার কান অবধি পৌঁছে যায়। তাহলেই বক্রপুচ্ছকে আমি সামলে রাখব।"

আর কোনো কথা না বলে চলে গেলেন রক্ষীপ্রধান। নীলাভ মনে মনে খুশি হল। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, রক্ষীপ্রধান ভয় পেয়েছেন।

নিয়ামকের সেনাদল চলে যাওয়ার পরে অর্ধরাক্ষস নেতা রথীন্দ্র বললেন, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মাননীয় সমরোত্তম নীলাভ। আপনি উপস্থিত না থাকলে আজ একটা বড়রকমের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা ছিল।"

কিছুক্ষণ সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আয়তনের দিকে ফিরল নীলাভ। শ্যামশ্রীকে পুরো ব্যাপারটা জানাতে হবে।

তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল গ্রন্থাগারে। মন দিয়ে আইনের বই পড়ছিলেন তিনি; নীলাভকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। "কী ব্যাপার? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে?"

সংক্ষেপে তাঁকে বিগত একঘন্টার সংবাদ জানিয়ে দিল নীলাভ। শুনে ক্রুদ্ধমুখে তিনি বললেন, "এবার কিন্তু কড়াহাতে এসব ঘটনাকে দমন করতে হবে। নিয়ামক যদি ভেবে থাকেন, যা খুশি তাই করে উনি পার পেয়ে যাবেন, তাহলে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে, সমরগরিমার অধিবাসীদের জীবন ওঁর পৈত্রিক সম্পত্তি নয়।"

নীলাভ বলল, "কিন্তু তোমার অস্বাভাবিক লাগছে না ব্যাপারটা? নিয়ামক হঠাৎ এরকম পাগলের মতো আচরণ করছেন কেন, আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, অর্ধরাক্ষসদের উনি কোনোকালেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু বজ্রধরের মৃত্যুর পর এটা যেন উন্মত্ততার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।"

বইটা বন্ধ করে শ্যামশ্রী বললেন, "পাগলের পাগলামি কাটানোর ওষুধ আমরাই দেব ওঁকে। চলো, একবার যাওয়া যাক।"

হনহন করে হেঁটে চললেন তিনি সমরগরিমার মাঠের উপর দিয়ে। তাঁকে অনুসরণ করল নীলাভ।

নিয়ামকের কার্যালয়ের সামনের কক্ষে বসেছিল বেজারমুখো অসিত। ওঁদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, "মাননীয় নিয়ামক মহোদয় এখন কারও সঙ্গে..."

শ্যামশ্রী কোমরের তরবারি অর্ধেক কোষমুক্ত করে তাকিয়ে রইলেন তার

দিকে। অসিত মাথা নিচু করে চুপ করে গেল।

আর কিছু না বলে দু'জন সমরোত্তম ঢুকে পড়লেন পাশের কক্ষে। হঠাৎ ওঁদের ঢুকতে দেখে চমকে উঠলেন নিয়ামক বিনীতেশ। সৌজন্য দাঁড়িয়েছিল তাঁর ঠিক পেছনে, তাঁর ঘাড়ের পেছনে হাত দিয়ে কী একটা করছিল; ওঁদের দেখেই চমকে উঠে সে সরে এল ওখান থেকে। নীলাভ্রর মনে হল, সৌজন্য যেন নিয়ামকের মাথার পেছন থেকে পাকা চুল তুলে দিচ্ছিল। অদ্ভুত কথাটা মনে হতে এই গম্ভীর পরিস্থিতিতেও হাসি পেল তার; কিন্তু সেই হাসিকে সে ঠোঁট পর্যন্ত আসতে দিল না।

“আমার বিনা-অনুমতিতে আপনারা আমার কক্ষে প্রবেশ করেন কোন্ সাহসে?” গর্জন করে বলে উঠলেন নিয়ামক।

শ্যামশ্রী বললেন, “যে সাহসে আমার বিনা-অনুমতিতে আপনারা সুদক্ষিণসারিতে সেনা পাঠান, সেই সাহসে।”

নিয়ামক মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন সৌজন্যের দিকে। “এঁদের বেরিয়ে যেতে বলো, সৌজন্য।”

সৌজন্য নিজেকে দিব্যি সামলে নিয়েছে। সে বলল, “মাননীয় নিয়ামক মহোদয়, এঁরা এক্ষুনি বেরিয়ে যাবেন বলে আসেননি অবশ্যই; কিছু বক্তব্য নিশ্চয় নিয়ে এসেছেন। আশা করা যায়, সেই বক্তব্য বলা হয়ে গেলে এঁরা শেষমেশ বেরিয়েই যাবেন। বলুন সমরোত্তমগণ, আপনাদের বক্তব্য শোনা যাক।”

শ্যামশ্রী বললেন, “সুদক্ষিণসারিতে সেনা পাঠানো হল কেন?”

নিয়ামক বললেন, “এর উত্তর আপনি জানেন না? আগুন নিয়ে খেলছিল দেশদ্রোহীগুলো। আমার বিরুদ্ধে, দেশের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে ওরা, আমার কুশপুতুলিকা দাহ করা হচ্ছে ওখানে – এসব জানেন না আপনি? এই বিশ্বাসঘাতকগুলোকে ফাঁসিতে না চড়ানো অবধি আমার শান্তি নেই।”

নীলাভ্র বলল, “এই অর্ধরাক্ষসরা দেশের জন্য তাদের জীবন দিয়ে লড়েছে। তাদের আপনি ‘দেশদ্রোহী’ বলার সাহস পান কী করে?”

“অবশ্যই দেশদ্রোহী। আমার প্রত্যেকটি কথার বিরোধিতা করে ওই শয়তানগুলো।”

শ্যামশ্রী বললেন, “সে তো আমিও আপনার কথার বিরোধিতা করি। কাউকে সমর্থন করা বা না করার অধিকার সবার আছে। আমি আপনার মতের সমর্থন করছি না মানে কি আমি আপনার শত্রু? ভিন্নমতের প্রতি এত অশ্রদ্ধা কেন, নিয়ামক মহোদয়?”

“রথীন্দ্র বদমাশটা স্লোগান দিয়েছে, ‘ভালোভাবে শাসন করুন, নয়তো আমরা আপনাকে শেখাব শাসন করা কাকে বলে’। বলুন, এই ধরনের কথাবার্তাকে আপনি সমর্থন করেন?”

“আমার সমর্থনে কি আসে যায়? আপনি যদি প্রকৃতই নিয়ামক পদের মর্যাদা রক্ষা করতে চান, তাহলে ওদের সঙ্গে কথা বলুন, ওদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। অন্যদের কথা বলতে দিন, অন্যদের কথা শোনার অভ্যাস করুন – ভিন্নমতে বিশ্বাসী কারও গলা টিপে ধরলে তাতে আপনারই

খারাপ হবে।”

অসহায় রাগে ফুঁসতে লাগলেন নিয়ামক। শ্যামশ্রীর কথার উত্তরে কী বলবেন, খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। তাঁর নজর গিয়ে পড়ল নীলাভ্রর উপর।

“আপনি গিয়েছিলেন ওখানে, নীলাভ্র। কেন? কাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি আমার রক্ষীপ্রধানকে বাধা দিলেন? সেনাবাহিনীর কাজে বাধা দেওয়া অপরাধ, আপনি জানেন না?”

নীলাভ্র মুচকি হাসল। “সেনাবাহিনীর ব্যাপারগুলো আমি বোধহয় আপনার চেয়ে একটু বেশিই বুঝি, মাননীয় নিয়ামক মহোদয়। আইনের বইপত্র পড়ে দেখে নেবেন, সমরোত্তমরা উপস্থিত থাকতে আপনার ও বিষয়ে নাসিকাপ্রদান না করাটাই বাঞ্ছনীয়।”

রেগে আগুন হয়ে নিয়ামক বলে উঠলেন, “আপনাদের স্পর্ধা আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে, দেখছি। একটা কথার উত্তর আপনাদের দিতেই হবে আজ। আপনাদের ছেলে অভীই যে ‘প্রলয়যোদ্ধা’, সে কথা প্রমাণ হয়ে গেছে। আর প্রলয়যোদ্ধার জন্যই ধ্বংস হয়ে যাবে সমরগরিমাসহ গোটা মায়াজগৎ। এ তো ভয়ানক অপরাধ! ভয়াবহ দেশদ্রোহ!”

নীলাভ্র হাঁ করে তাকাল শ্যামশ্রীর দিকে। তিনিও অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর দু’জনে একসঙ্গে ফেটে পড়লেন হা-হা হাসিতে।

তারপর হাসি থামিয়ে নীলাভ্র বলল, “শ্যামশ্রী, এবার ওঠো। নিয়ামক মহোদয়ের এবার নিদ্রা প্রয়োজন। নিদ্রার অভাবেই সম্ভবত এইসব বকছেন উনি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “সৌজন্য, তোমার প্রভুর অনেক দোষ আছে, জানতাম; কিন্তু সমরগরিমার নিয়ামক কোনোদিন কোনো মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেছেন, এ অভিযোগ ওঁর অতি বড়ো শত্রুও করেনি কখনও। আজ কিন্তু আমার কেমন যেন অসংলগ্ন ঠেকছে ওঁর কথাবার্তা। চললাম আমরা; তুমি যত্ন নিও ওঁর। রক্ষাবৈদ্যকে পাঠাব একবার?”

নিয়ামক গর্জন করে বললেন, “এত বড়ো সাহস আপনার, সহ-অধিনায়িকা শ্যামশ্রী? আমি নেশাগ্রস্ত – এই অভিযোগ করছেন আপনি? এইসব বাজে কথা বলে নিজের দেশদ্রোহী ছেলের অপরাধ ঢাকতে চাইছেন?”

নীলাভ্র ঠান্ডাগলায় বলল, “ওই ছেলেটার জন্যই আজ আপনি ওই নরম গদি-আঁটা কাষ্ঠাসনে আরাম করে বসে দেশপ্রেম নিয়ে বড়ো বড়ো কথা বলতে পারছেন, নিয়ামক মহোদয়। আপনাদের সবাইকে বাঁচানোর জন্য ওই ছেলেটা স্বেচ্ছায় নরকবাস বরণ করে নিয়েছিল। আর তাকে আপনি বলছেন ‘দেশদ্রোহী’? আমার ছেলে না থাকলে শর্বরের দলবল সেদিন আপনাকে কুচি কুচি করে কাটত। আপনাদের সবার জীবন বাঁচিয়েছিল সেদিন ওই ছেলেটাই; আর এইভাবে তার প্রতিদান দিচ্ছেন আপনি?”

নিয়ামকের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। “আপনারা সবাই ষড়যন্ত্র করছেন আমার বিরুদ্ধে। করুন, করুন। আমি নজর রাখছি আপনাদের উপরে। একটু বেচাল দেখলেই কড়া ব্যবস্থা নেব।”

শ্যামশ্রী বললেন, “ঠিক এই কথাটা বলব বলেই আমরা এসেছিলাম,

জানেন তো? আমরাও নজর রাখছি আপনার উপরে - এইটুকু জানিয়ে দিয়ে গেলাম। বেচাল দেখলেই...! এসো, নীলাভ।”

খুব আড়ম্বর করে নমস্কার জানিয়ে দু’জন বেরিয়ে এলেন কক্ষ থেকে। বেরনোর আগে নীলাভ দেখল, নিয়ামক ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মতো ফুঁসছেন; কিন্তু সৌজন্য দিব্যি হাসিমুখে হাতজোড় করে প্রতিনমস্কার করল।

ফেরার পথে শ্যামশ্রী বললেন, “লোকটা পুরোপুরি পাগল হয়ে গেল নাকি বলো তো?”

নীলাভ গম্ভীর মুখে বলল, “আমার আরও বেশি চিন্তা লাগছে, এই পাগলটার সঙ্গে সৌজন্য এত সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়ে আছে কী করে।”

আয়তনের মূল ভবনে যখন ওঁরা প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, তখনই দেখা হয়ে গেল পর্বতের সঙ্গে। সে বলল, “এবার বেরিয়ে পড়ব, ভাবছি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “সাবধানে যেও। অবশ্য তোমাকে কথাটা বলা একপ্রকার অর্থহীনই বটে, পর্বত। তোমাকে বিপদে ফেলবে, এত বড়ো বীর এখনও মাল্যপর্বতে জন্মায়নি।”

পর্বত একটু হেসে বলল, “তা বটে। ওখানের কাউকে ভয় পাই না আমি, রাজাকেও না। শুধু ওই একটা লোক...”

শ্যামশ্রী বললেন, “কে বলো তো?”

“ওই আলোকপর্ণটা। ওকে যে আমি ভয় পাই, তা নয়। কিন্তু এমন কিছু পুরোনো তিক্ত স্মৃতি আছে যে ওর মুখোমুখি হতেই বিরক্ত লাগে আমার।”

নীলাভ বলল, “বলো না কী হয়েছিল। এসব কথা তো আমরা কখনও জানতেই পারিনি।”

পর্বত বলল, “আমিই বলতে পারিনি তোমাদের কখনও। নিজের বংশের লোকের নিন্দে করতে লজ্জা করে এখনও। একমাত্র বজ্রধর সব জানতেন। আর এই ওরা যখন গেল মাল্যপর্বতে, তখন মেঘবর্ণকে বলেছি। আলোকপর্ণ আমার নিজের ভাই, নীলাভ। আমরা দু’জন একসঙ্গে অস্ত্রবিদ্যাও শিখেছি একই গুরুর কাছে।”

শ্যামশ্রী অবাক হয়ে বললেন, “তাই নাকি? কিন্তু লজ্জা পাওয়ার কী আছে এর মধ্যে?”

পর্বত বলল, “আমার স্ত্রী উত্তরাকে মহাসর্পিণীতে রূপান্তরের শাপ কে দিয়েছিল, জানো? ওই আলোকপর্ণ।”

নীলাভ আর শ্যামশ্রী হাঁ করে রইলেন। পর্বত বলে চলল, “একটুকরো রক্তপদ্মরাগ মণি আমার কাছে ছিল। সেবার বিমোহক রাক্ষসদের একটা গোষ্ঠী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এরকম বিদ্রোহ-টিদ্রোহ ওখানে লেগেই থাকে। ওদের দাবি ছিল, পত্রতিলক রাক্ষসজাতির রাজা পুনর্বসুকে সরিয়ে ওদের এক রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাতে হবে। সেবার সেই গৃহযুদ্ধে আমাদের অস্ত্রগুরু ধনঞ্জয় মারাত্মক আহত হন।”

নীলাভ বলল, “তুমি কি তাঁকে সারিয়ে তুলতে রক্তপদ্মরাগ মণিটা দাওনি?”

পর্বত বলল, “দিতে চাইনি আমি সত্যিই। দিলে হয়তো উনি বেঁচে যেতেন। কিন্তু ওই বস্তু যে আমার কাছে আছে, আমি কাউকে জানতে দিতে

চাইনি। জানতে পারলে রাজা কেড়ে নিতেন। আমার স্ত্রী উত্তরা তখন ঘোরতর রক্তাশ্রিতার সমস্যায় ভুগছে। ওর চিকিৎসার জন্য আমি মণিটা নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম। ও-ই ব্যবহার করত। আমি অনেক প্রাণীহত্যা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছিলাম। আমি অযোগ্য ছিলাম ওই মণি ব্যবহারে, কিন্তু উত্তরা নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারত। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর আহত হয়ে আমাদের অস্ত্রগুরু মারা যান।”

“তারপর?”

“তারপর ব্যাপারটা একদিন জানাজানি হয়ে গেল। আলোকপর্ণ সব কথা তুলে দিল প্রজ্ঞা আর রাজা পুনর্বসুর কানে। প্রজ্ঞা খেপে উঠলেন রাগে। আমাদের অস্ত্রগুরু ধনঞ্জয় ছিলেন তাঁর স্বামী, মানে সুতসোমের বাবা।”

“এই সুতসোমের সঙ্গেই তো অভীর লড়াইয়ের ব্যবস্থা করেছে ওরা। মেঘ তার চিঠিতে লিখেছিল,” বলে উঠল নীলাভ। “তারপর কী হল?”

“হ্যাঁ, আলোকপর্ণ আমাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে দাগিয়ে দিল, আর অভিশাপ দিল উত্তরাকে। আমার অপরাধের শাস্তি পেল বেচারি নিরীহ মেয়েটা। আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল দেশ থেকে – বিরাট বড়ো অপরাধ আমারঃ দেশের প্রতি, সেনাবাহিনীর প্রতি বেইমানি। আর আমার কাছ থেকে ওই মণি কেড়ে নিয়ে রেখে আসা হল মহাসপিণীর গুহায়, যাতে কেউ কোনোদিন ওটাকে ব্যবহার করতে না পারে।”

নীলাভ আর শ্যামশ্রী কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলেন। তারপর শ্যামশ্রী বললেন, “বিদ্রোহীদের কী হল?”

“কী আবার হবে? মৃত্যুদণ্ড। সেই নাবালক বিমোহক রাজপুত্রকে শোনা যায় রাজা পুনর্বসু নিজে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিলেন। আমাদের রীতি আছে, পরাজিত রাজাকে বিজয়ী রাজা বিষের পানপাত্র হাতে তুলে দিয়ে সম্মানের মৃত্যু দেন। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমাদের জাতটা বড়ো নিষ্ঠুর হে; কথায় কথায় এরা মৃত্যুকে ডেকে আনে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “কিন্তু পর্বত, আলোকপর্ণ যে তোমার ভাই! ও কীভাবে পারল...?”

পর্বত বলল, “ওর কাছে এমনটাই তো আশা করা উচিত। ও হচ্ছে ঘটোৎকচ সেনার প্রধান নির্দেশক। ঘটোৎকচ সেনা হল গিয়ে...”

তাকে থামিয়ে দিয়ে শ্যামশ্রী বললেন, “থাক, আমরা জানি ঘটোৎকচ সেনা কী জিনিস। আর ওই জঘন্য প্রসঙ্গ তুলো না। মাল্যপর্বতের ওই বিশেষ বাহিনীটি সম্বন্ধে আমরা ভালো করেই জানি। শুধু তোমার ভাই যে তার প্রধান নির্দেশক, এইটুকু আমাদের জানা ছিল না।”

পর্বত বলল, “বজ্রধর জানতেন। আমি যে কী অসহায় অবস্থায় পড়ে ওঁর শরণ নিয়েছিলাম, সে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। উনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমার উত্তরার জন্য সমবেদনা জানিয়েছিলেন। আজ খুব মনে পড়ছে মানুষটার কথা।”

পর্বতের চোখের কোণ ভিজে উঠল। শ্যামশ্রী বললেন, “মৃত্যুর পরেও কতখানি জীবন্ত হয়ে তিনি আজও আছেন আমাদের মাঝখানে, ভাবলে অবাক

হয়ে যাই। যত দিন যাচ্ছে, আমরা বোধহয় সবাই অনুভব করছি, আমাদের প্রত্যেকের কাছে তিনি কতখানি ছিলেন।”

নীলাভ বলল, “যাও পর্বত, তোমার স্ত্রীকে খুঁজে বার করো। আমার ধারণা, স্বর্ণশেখরকেও এইভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সে তো ওখানেই যাবে, জানি। নিজের স্মৃতিভ্রংশ রোগ সারাতে সেও নির্ঘাৎ খুঁজছে ওই রক্তপদ্মরাগ মণি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “আমি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে একটু ভয় পাচ্ছি। অধিনায়ক বজ্রধর আর নেই। মেঘবর্ণ চলে গেছে। পর্বত, তুমিও চলে যাচ্ছ। নীলাভ, আমি জানি তোমার শরীরে সেই আগের মতো যুদ্ধক্ষমতা এখনও ফিরে আসেনি। সমরগরিমার সব অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে আমরা একটু দুর্বল হয়ে যাচ্ছি না কি?”

পর্বত বলল, “শ্যামশ্রী, তুমি তো আছ। যে কোনো পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “বাইরের শত্রুর আক্রমণের ভয় আমি এই মুহূর্তে পাচ্ছি না। আমার ভয় ভেতরের শত্রুকে। নিয়ামক বিনীতেশ অর্ধরাক্ষসদের কাছ থেকে পাওয়া এই অপমান হালকা ভাবে নেবেন না মোটেই, নিশ্চিত থাকো। যদি হঠাৎ খবর পাই – সুদক্ষিণসারিতে আমাদের লুকিয়ে একটা নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছেন উনি, তখন কী হবে?”

পর্বত বলল, “এখন যেরকম মেজাজে আছেন উনি, তাতে এরকম কাণ্ড ঘটানো মোটেই আর অসম্ভব ঠেকছে না। নীলাভ, তুমি কী বলো?”

নীলাভ বলল, “এ ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি নিজেও জানি, আমি পুরোপুরি সুস্থ নই। পনেরো বছরের নরকবাস আমাকে ভেতর থেকে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছে। কিন্তু সে খবর আর তো কেউ জানে না। রক্ষীপ্রধানকে জোর ভয় দেখিয়েছি আজ। নিয়ামক যদি আমাদের না জানিয়ে গোপনে কিছু করতেও চান, সে সংবাদ আমার কাছে ঠিক আগেভাগে পৌঁছে যাবে। আমার ভয়, অর্ধরাক্ষসরা না আবার উলটোপালটা কিছু করে বসে। ওরাও প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ কিন্তু; তার উপর ক্রমাগত মার খেতে খেতে ওদের এখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। ওরা যদি কোনোভাবে আঘাত করে, নিয়ামকের দিক থেকে তার দশগুণ জোরে প্রত্যাঘাত আসবে।”

পর্বত বলল, “নিধির বোন নীপার সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো কিন্তু। বাচ্চা হলে কী হয়, বেশ বুদ্ধি আছে মেয়েটার। ওর বাবা দিগ্‌নাগ ওদের আন্দোলনের একটা মাথাও বটে। ভেতরের খবর ওর কাছে যতটা পাবে, ততটা আর কেউ দিতে পারবে বলে মনে হয় না। দু’দিকেরই খবর তোমাদের দরকার হবে, যদি দু’দিককেই ঠান্ডা রাখতে চাও।”

শ্যামশ্রী বললেন, “মাথায় রাখব কথাগুলো। কিন্তু পর্বত, এবার তুমি রওনা দাও। আর দেরি কোরো না। ওখানে ওরা কী অবস্থায় আছে, জানি না। খবর পাঠিও অবশ্যই।”

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নিজের জটায়ুর পিঠে উঠে পড়ল পর্বত। তাকে বিদায় জানিয়ে আয়তনে প্রবেশ করলেন শ্যামশ্রী। নীলাভ তাঁকে অনুসরণ করল।

শ্যামশ্রী বললেন, “একবার সম্মেলন কক্ষে এসো তো।”

“আমি ভাবলাম, তুমি গ্রন্থাগারে যাবে। আইনের বই পড়তে।”

“যাব। কিন্তু তার আগে একটা ছোটো কাজ আছে এখানে। তোমার অন্য কোনো কাজ আছে নাকি?”

“নাঃ, জরুরি কিছু নেই। তরবারি চালনা অভ্যাস করব কিছুক্ষণ ভাবছি।”

“ও, সে কাজ তো সম্মেলন কক্ষেও করতে পারো। প্রচুর ফাঁকা জায়গা। এসো আমার সঙ্গে।”

সম্মেলন কক্ষ পুরোপুরি শূন্য। সারি সারি আসন ফাঁকা পড়ে আছে। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শ্যামশ্রী জড়িয়ে ধরলেন নীলাভকে। ফিশফিশ করে তার কানে কানে বললেন, “আমিও তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমাকে ক্ষমা কোরো তুমি।”

নীলাভর ভারি ভালো লাগছিল প্রিয় মানুষটাকে এতদিন পরে একটুখানি নিভূতে পেয়ে। ফিরে আসার পর থেকে এইটুকু ঘনিষ্ঠতারও সময় হয়ে ওঠেনি। সে বলল, “ক্ষমা করার প্রশ্নই নেই, কারণ তুমি কোনো অন্যায় করেইনি। কিন্তু এসব কথা এখন থাক না, শ্যামা।”

তার কাঁধে মুখ রেখে তাকে বেশ কিছুক্ষণ জড়িয়ে রাখলেন শ্যামশ্রী। নীলাভও শক্ত বাহুবন্ধনে বেঁধে রাখল তাঁকে, হাত বুলিয়ে দিল ঘন কালো একরাশ চুলে। তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল স্ত্রী-র মুখের দিকে; আঙুল দিয়ে মুছে দিল চোখের প্রান্তে টলটল করা জলটুকু; বলল, “দূর, এমন করে কাঁদতে আছে, বোকা?”

“কতদিন কাঁদতেও পারিনি, জানো?” শ্যামশ্রী আবার মাথাটি এলিয়ে দিলেন তার কাঁধে।

কে যেন ডাকল বাইরে থেকে। “নীলাভ, আছ ভেতরে?”

রক্ষোবৈদ্য।

তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে দিলেন শ্যামশ্রী। নীলাভ কোমর থেকে তরবারি বার করে শূন্য ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, “আছি। দয়া করে ভেতরে আসুন।”

শ্যামশ্রী দরজা খুলে দিলেন। রক্ষোবৈদ্য ভেতরে ঢুকতে নীলাভ বলল, “সহ-অধিনায়িকার তত্ত্বাবধানে অসিযুদ্ধ অভ্যাস করছি। কিন্তু সারা শরীরের দুর্বলভাবটা যাচ্ছে না, রক্ষোবৈদ্য; আগের মতো সেই গতি আসছে না। কী করি বলুন তো?”

রক্ষোবৈদ্য কেবল মুচকি হাসলেন। শ্যামশ্রীর গাল একটু লাল হয়ে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, “আপনারা কথা বলুন, আমি একবার গ্রন্থাগারে চললাম। একটা দরকারি জিনিস পড়তে পড়তে চলে এসেছিলাম।”

তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর রক্ষোবৈদ্য বললেন, “এই দুর্বলভাব সহজে যাওয়ার নয়, নীলাভ। যে পরিমাণে উত্তাপ তুমি এত দীর্ঘ সময় ধরে সহ্য করেছ, তাতে অন্য যে কেউ হলে অনেকদিন আগেই মরে যেত। ওই তাপ তোমাকে ভেতর থেকে শুকনো করে দিয়েছে। আগে শরীরের মধ্যকার সেই শুষ্কতাকে দূর করতে হবে। তারপর ব্যায়াম করে ফিরিয়ে আনতে পারবে পুরোনো শক্তি। অনেক সময় লাগবে তার জন্য।”

একটা কাচের ছোটো শিশি তার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। “এটা খাও। গতকালেরটা খেয়েছিলে তো?”

“খেয়েছিলাম।”

“কোনো তফাৎ বুঝতে পারছ?”

“খুব সামান্য। তবে একটু ভালো লাগছে, এটা ঠিক।”

শিশির তরলটা সে মুখে ঢালছে, এমন সময় ভেতরে এসে ঢুকল সৌজন্য। নীলাভ খেয়াল করল, সৌজন্য সরু চোখে দেখছে শিশিটাকে।

কিন্তু এ নিয়ে সরাসরি কিছু বলল না সে। রক্ষোবৈদ্যকে দেখে সে বলল, “দেখে ভালো লাগে, রোগাক্রান্ত মানুষের সেবায় আপনি যেভাবে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “যেটুকু আমার সাধ্যে কুলোয়, আমি করি। আত্মের সেবাই আমার জীবনধর্ম।”

বাঁকা হাসি হেসে সৌজন্য বলল, “তাহলে আপনার ধর্মপালনের বড়ো সুযোগ আসতে চলেছে। অনেক আত্মের সরবরাহ আসছে শীঘ্রই আপনার জন্য।”

নীলাভ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দুটি ছাত্র দরজা দিয়ে উঁকি মারল। মৃগেন্দ্র আর সন্দীপ। কিন্তু ভেতরে সৌজন্যকে দেখেই তারা থমকে গেল।

নীলাভ বলল, “কিছু বলবে তোমরা?”

সৌজন্যর চোখে চোখ রেখেই মৃগেন্দ্র বলল, “বলতাম অনেক কিছুই, সমরোত্তম নীলাভ। কিন্তু এখন আপনি ব্যস্ত আছেন; আমরা পরে আসব।”

সন্দীপ বলল, “প্রবীরদার সঙ্গে দেখা হল। সে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। নমস্কার।”

আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে দুই শিক্ষার্থী চলে গেল দ্রুত পদক্ষেপে। সৌজন্য বলল, “শিক্ষার্থীরা দেখছি আপনাকে একটু বেশিই পছন্দ করে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক শক্তির প্রতি এতখানি ভালোবাসা তো দেখি না ওদের।”

নীলাভ বলল, “সেটা যত না আমাদের কৃতিত্ব, তার বেশি তোমাদের ব্যর্থতা, সৌজন্য।”

সৌজন্য তির্যক হাসি হাসল। “ভালোবাসা আপনারাই রাখুন, ওদের ‘ভয়’টা পেলেই আমাদের চলে যাবে। এই হতভাগা রাক্ষস-অর্ধরাক্ষসদের ভালোবাসা না পেলেও আমাদের কোনো ক্ষতি নেই।”

নীলাভ বলল, “ভালোবাসাহীন একটা মানুষ হয়ে উঠতে এত ভালো লাগে তোমার? অন্যের ঘৃণা পেতে এত আগ্রহী তুমি?”

“সত্যি বলতে কী, ঘৃণা পেতে আমার ভালোই লাগে,” সৌজন্য বলল। “কেউ আপনাকে ঘৃণা করছে মানে সে আপনার কথা মনে মনে ভাবছেই। ঘৃণা খুব শক্তিশালী জিনিস, সমরোত্তম মহোদয় – ও কিছুতেই মনকে শান্ত হতে দেয় না। যার প্রতি আপনার ঘৃণা, সবসময় তার কথা ভাবায়। দেশের রাজার তো এইরকম অখন্ড মনোযোগই দরকার দেশবাসীর কাছ থেকে; ভালোবাসা-ফাসা না পেলেও তাঁর কোনো অসুবিধা নেই।”

“তোমার কথাগুলো ঠিক নিয়ামক বিনীতেশের মতো শোনাচ্ছে।”

সৌজন্য বলল, “আপনি নিশ্চয় প্রশংসা করে কথাটা বললেন না, কিন্তু আমি এটাকে প্রশংসা হিসাবেই নিচ্ছি।”

“দেশের রাজার কথা কেনই বা বলছিলে তুমি? তুমিও কি নিজেকে সমরগরিমার রাজা মনে করো?”

“না, না। কী যে বলেন! আমি সমরগরিমার রাজা হতে চাইব কেন? এরকম ছোট্ট একটা রাজ্যের রাজা হওয়ার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই।”

“তাহলে কীরকম রাজ্যের রাজা হতে চাও তুমি?”

কথাটার সরাসরি উত্তর দিল না সৌজন্য, খালি একটু রহস্যময় হাসি হাসল। “সে কথা পরে কখনও বলব আপনাকে। আপাতত গ্রন্থাগারে যাচ্ছি – একটা দারুণ মনোগ্রাহী বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করছি আজকাল। ভালো কথা সমরোত্তম নীলাভ্র, ওই শিশির ওষুধটা নিয়ম করে খাচ্ছেন তো?”

কথাটা বলে একটা নমস্কার করে বেরিয়ে গেল সে। রক্ষোবৈদ্য ভ্র কুঁচকে বললেন, “ও কিন্তু আন্দাজ করে নিয়েছে যে তোমার শরীর খুব একটা সুস্থ নেই, নীলাভ্র।”

নীলাভ্র বলল, “হঁ। একটা দুর্বল জায়গার খোঁজ ও পেয়েছে মানে সেখান দিয়ে আঘাত আসার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। তবে ও যদি আমাকে দুর্বল মনে করে কাউকে দিয়ে আক্রমণ করাতে চায়, তাহলে ওরই বিপদ। শরীরের এই অবস্থাতেও একসঙ্গে একাধিক সাধারণ যোদ্ধার আক্রমণ ঠেকাতে পারি আমি অনায়াসে।”

খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রক্ষোবৈদ্য। হঠাৎ তিনি ডাকলেন, “নীলাভ্র। একবার এসে দেখো তো ব্যাপারখানা কী?”

নীলাভ্র এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে। তিনটে গোরুর গাড়িতে কাপড় দিয়ে ঢাকা কীসব জিনিস যাচ্ছে সমরগরিমার মাঠের মধ্য দিয়ে। দেখেই চমকে উঠল সে।

“গতবার একটা গাড়িভর্তি মোম চালান যাচ্ছিল পীতপত্রবনে। গাড়ির চালক আমাকে বলেছিল, নিয়ামকের আদেশে এই মোম যাচ্ছে ছায়াভবনে।”

রক্ষোবৈদ্য অবাক হয়ে বললেন, “এত মোম ছায়াভবনে কেন পাঠাচ্ছেন নিয়ামক? গতবার তুমি একটা গাড়ি দেখেছিলে; আজ তো তিনগাড়ি মাল যাচ্ছে।”

নীলাভ্র বলল, “আজও মোম যাচ্ছে কিনা, তার অবশ্য কোনো নিশ্চয়তা নেই। অন্য জিনিসও হতে পারে। কিন্তু এসব জিনিস চালান করার মানেরটা কী?”

“সৌজন্যকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে হয় না?”

“সৌজন্য সত্যি কথা বলবে বলে মনে হয় আপনার? এমন ধূর্ত বদমাশ আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। ওর পেট থেকে কথা বার করা অসম্ভব।”

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গেলেন রক্ষোবৈদ্য। সেবাক্ষে একবার যেতে হবে তাঁকে। নীলাভ্র তরবারি বার করে অভ্যাস করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ একা একাই অসিচালনা অভ্যাস করে ক্লান্ত বোধ করে সে

বসে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল, “অভী এখন কী করছে?”

কতটুকু ছিল ছেলেটা; সেই কাঁথায় শোয়া বয়সের পর থেকে তাকে তো আর দেখতেই পায়নি। নরকের সেই ভয়াবহ আগুনের মধ্যে যখন এতকাল পরে দেখা হল, তাকে নীলাভ তখন চিনতেই পারেনি। ওখানে থাকতে থাকতে তার তখন শরীর-মন অবশ হয়ে গেছে।

নরকের সেই ভয়ানক বিষাক্ত আগুনের কথা মনে পড়তেই সর্বশরীর আবার কেঁপে উঠল তার। সেইসঙ্গে এও মনে পড়ল, অভী আসতেই চারপাশটা কেমন ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল পরে যেন সারাদেহে কী আরাম লাগছিল তার। অভী হাত রেখেছিল তার কপালে। কী স্নিগ্ধ লেগেছিল সেই ছোঁয়া। ভাবতে ভাবতে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার গাল বেয়ে।

তার ছেলে অন্তত ভরসা রেখেছিল তার উপর।

শ্যামশ্রী এসে বসলেন তার পাশে। দরজা খোলাই ছিল। নীলাভর ডানহাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে রইলেন তিনি। হাতটা যেন ঠান্ডা বরফের মতো হয়ে আসছে তার।

শ্যামশ্রী বললেন, “এত আবেগ নিজের মধ্য দিয়ে চালনা কোরো না, নীলাভ। তুমি হিমকুশল; এইরকমভাবে দুঃখ-কষ্টগুলোকে যদি হিমকুশলতার মধ্য দিয়ে বার করতে চাও, এগুলো তোমাকে ভীষণ দুর্বল করে দেবে। এমনিতেই তোমার শরীর ভালো নেই।”

নীলাভ প্রাণপণ চেষ্টা করছিল হাতের ঠান্ডাভাবটাকে দূর করার। সে অধীরভাবে বলল, “আমি দুর্বল হয়ে থাকতে চাই না, শ্যামা। কিন্তু আমি তো একসময় সমরগরিমার শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা ছিলাম। মেঘ ছাড়া আমার সমকক্ষ কেউ ছিল না তখন। কিন্তু এখন? এই তরবারি নিয়ে একা একা অভ্যাস করতে গিয়েই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। শত্রু এলে আমি তার মোকাবিলা করব কী করে? এই দুর্বলের জীবন, শক্তিহীনের জীবন আমি চাইনা, চাইনা।”

তার হাতটাকে শক্ত করে নিজের মুঠোয় ধরে তাপ দিতে লাগলেন শ্যামশ্রী। “তোমার শরীর ভয়ানক কষ্ট সহ্য করেছে দীর্ঘ সময় ধরে। তার প্রভাব তো শরীরে পড়বেই। কিন্তু দুর্বল কি তুমি সারা জীবন থাকবে? রক্ষাবৈদ্যের কাছে আমি খোঁজ নিয়েছি। তিনিও বলেছেন, তুমি সম্পূর্ণ সেরে যাবে, তবে একটু সময় তো লাগবেই। আর মানুষের আসল শক্তি তো তার মনে। মায়াযুদ্ধ তো পুরোপুরি মনেরই খেলা। এমন মায়াযোদ্ধাও আছে যারা এতটুকু শরীরকে না নড়িয়েও ভয়ানক মায়াযুদ্ধ করতে পারে।”

নীলাভ বলল, “মায়াযুদ্ধের চেয়ে অসিযুদ্ধই আমার প্রথম পছন্দ, তুমি তো জানো।”

শ্যামশ্রী বললেন, “হ্যাঁ, জানি। দেখো, এই সমরগরিমাকে আমরা প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। একে রক্ষা করার জন্য আমার সেই পুরোনো, দুঃসাহসী নীলাভকে চাই। তাই তুমি যত তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, ততই আমাদের সবার মঙ্গল। আর ওরকম একা একা অসিচালনা অভ্যাস করে কিছু হবে না। আমার সঙ্গে অনুশীলন মঞ্চে চলো; আমি তোমার সঙ্গে অভ্যাস করব। সত্যিকারের কঠিন প্রতিপক্ষের সঙ্গে অসিতে অসিতে টক্কর না দিলে তোমার আত্মবিশ্বাস

ফিরবে না। আমি তোমাকে বলছি, এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি উন্নতিটা বুঝতে পারবে।”

দরজার সামনে থেকে কে ডাকল, “নীলাভ।”

ওরা দেখল, রক্ষাবৈদ্য এসে দাঁড়িয়েছেন আবার। তাঁর হাতে একটা ছোট কাগজে মোড়া বস্তু।

নীলাভ উঠে গেল, তার পেছনে গেলেন শ্যামশ্রী। “কী এটা?”

“এটা আমার সেবাকক্ষে কেউ একজন রেখে গেছে। আদ্যোপান্ত কাগজ দিয়ে মোড়া আছে জিনিসটা। উপরে দেখো, তোমার নাম লেখা।”

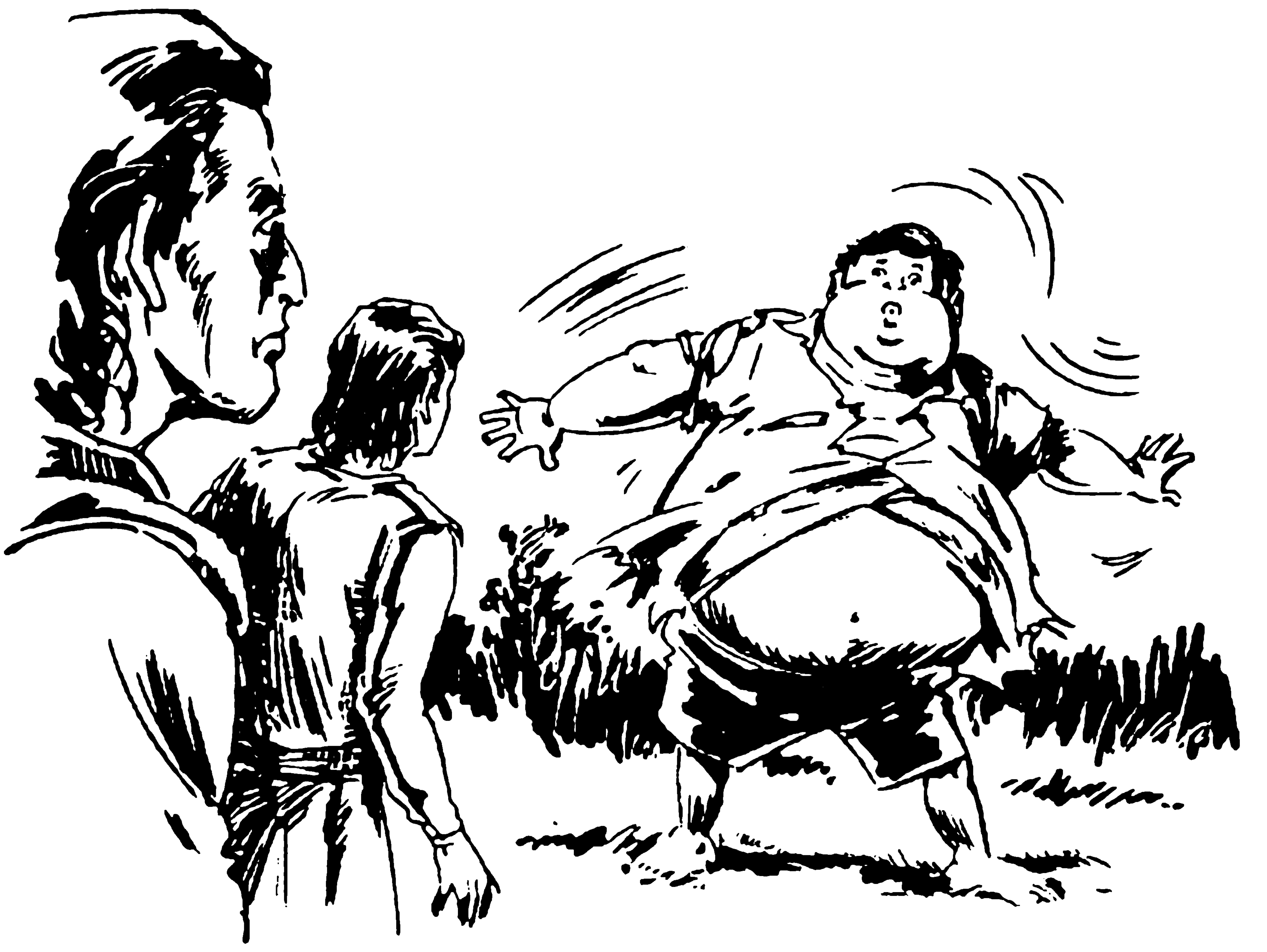
নীলাভ হাতে নিল মোড়কটা। তার উপরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, “সমরোত্তম নীলাভর জন্য।”

নরম নরম লাগছে বস্তুটাকে। যেন ভেতরে কাপড়-টাপড় জাতীয় কিছু আছে। নীলাভর ক্র কুণ্ঠিত হল। “এ আবার কী?”

তিনজনেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ওটার দিকে। তারপর শ্যামশ্রী বললেন, “খোলো। দেখা যাক কী আছে।”

মোড়ক খুলতেই বেরিয়ে এল ভেতরের জিনিসটা। একটা সাদা, রেশমি রুমাল। তার উপরে সুতো দিয়ে লেখা, “দেখা হবে শীঘ্রই। শেষমুখ।”

শ্যামশ্রীর চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। “শেষমুখ! এখানে?”



॥ সপ্তম অধ্যায় ॥ আলোকপর্ণ

বিকেলবেলা অতিথিশালায় হঠাৎ সেনানায়িকা প্রজ্ঞা এসে উপস্থিত। বললেন, “অভী, একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “আমার সঙ্গে?”

“হ্যাঁ। আমাদের সেনাদলের প্রশিক্ষণ শিবিরে এসো তুমি আমার সঙ্গে। ওখানেই তিনি কথা বলবেন তোমার সঙ্গে।”

মেঘবর্ণ বলল, “কে ইনি?”

প্রজ্ঞা বললেন, “আমার কাছে তো বটেই, আমার স্বামীর কাছেও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন ইনি। নাম আলোকপর্ণ।”

নামটা শুনেই মেঘবর্ণের মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সে বলল, “আচ্ছা, এখন অভীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক মহাবীর আলোকপর্ণ?”

‘মহাবীর’ শব্দটা যে মেঘবর্ণ একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে উচ্চারণ করল, সেটা কারও বুঝতে অসুবিধা হল না। প্রজ্ঞা গম্ভীর মুখে বললেন, “তাতে আপনার আপত্তি আছে, সমরোত্তম মেঘবর্ণ?”

“না, আপত্তি থাকবে কেন? তবে আলোকপর্ণের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আমারও আছে। আমি যেতে পারি অভীর সঙ্গে?”

“নিশ্চয় পারেন। আমরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী মানুষদের সঙ্গ উপভোগ করি। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আপনার কেন আছে, জানতে পারি?”

মেঘবর্ণ বলল, “ইচ্ছা হবে না এমন বীরপুরুষকে দেখার? একটি নিরীহ, নির্দোষ মেয়ে আজও ওরই কারণে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করছে, তাই না?”

প্রজ্ঞা বললেন, “নির্দোষ কাকে বলা যায়, সে বিষয়ে আমাদের ধারণা সমরগরিমার থেকে ভিন্ন, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। আমরা মনে করি, অন্যায়ের শাস্তি ছাড়া ন্যায়বিচার অসম্পূর্ণ থাকে।”

“তা তো বটেই। ওই নিরীহ মেয়েটাকে শাস্তি দিয়ে আপনারা কার প্রতি ন্যায়বিচার করছেন, একটু বুঝিয়ে বলবেন আমাকে?”

প্রজ্ঞা গর্বিতভাবে হাসলেন। “দৈহিক শাস্তি ওই মেয়েটিকে দেওয়া হচ্ছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু শাস্তি কি শুধু দেহের হয়, সমরোত্তম মেঘবর্ণ? ওই তুচ্ছ অর্ধরাক্ষস মেয়েটার জন্য যে সম্মানিত রাক্ষসযোদ্ধা তার নিজের জাতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাকে কি আমরা প্রতি মুহূর্তে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণাভোগ করার শাস্তি দিচ্ছি না? সে কি জানে না, তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছে ওই সাপের খোলসের মধ্যে চিরকালের জন্য বন্দি মেয়েটা? আমরা যোদ্ধার জাত, সমরোত্তম মেঘবর্ণ; কোনোরকম দুর্বলতাকে আমরা প্রশ্রয় দিই না। এইসব ভালোবাসা-টালোবাসা প্রকৃত যোদ্ধাদের কাছে বিলাসিতা; যুদ্ধক্ষেত্রে কীই বা মূল্য এর? আমরা আমাদের যোদ্ধা ভাইবোনদের স্বার্থ দেখি সবার আগে; পরিবার, ভালোবাসা – এদের স্থান তার নীচে। ...আসুন আপনারা; আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।”

মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেলেন প্রজ্ঞা। নিধি বলল, “এই আলোকপর্ণটা কে বলো তো?”

মেঘবর্ণ বলল, “চিনতে পারোনি? পর্বতের ভাই।”

সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই বুঝে ফেলল, কেন লোকটাকে এত চেনা-চেনা লাগছিল।

অভী বলল, “তোমরা যাবে আমার সঙ্গে?”

লীনা আর নিধি কিছু বলার আগেই মেঘবর্ণ বলল, “থাক, দরকার নেই। ওখানে আবার কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তখন...”

লীনা বলল, “কিন্তু তাহলে তো সংখ্যায় বেশি থাকাই ভালো।”

কথাটা বলে ফেলেই মনে মনে আপশোশ করছিল অভী; তার বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল স্বপ্নে দেখা দৃশ্যদুটো। সে তাড়াতাড়ি বলল, “ভয় নেই, আমরা কোনো ঝামেলায় জড়াব না। শুধু শুধু অশান্তি করতে যাবই বা কেন? তোমরা থাকো এখানে। আমরা যাব আর আসব।”

উর্মি বললেন, “লীনা, নিধি, তোমরা যদি থাকো, আমি তাহলে তোমাদের এই প্রাসাদের শিল্পসংগ্রহশালায় নিয়ে যেতে পারি। এত সব অসাধারণ দর্শনীয় শিল্পবস্তু আছে ওখানে যে একটা গোটা দিন ধরে দেখেও ফুরোবে না।”

নিধি আর লীনা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। তারা বুঝতে পারছিল, অভী আর মেঘবর্ণ কেউই তাদের সঙ্গে নিতে চাইছে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিধি বলল, “আঃ, এইরকম শিল্পবস্তুর ভাণ্ডার দেখার জন্যই তো অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন।”

লীনা কথাটাকে সামাল দেওয়ার জন্য বলল, “রাজকন্যা উর্মি, সে-ই বরং ভালো হবে। এরা আলোকপর্ণের সঙ্গে কথা বলুক গিয়ে। আমরা আপনাদের রাজকীয় সংগ্রহ দেখি।”

অতিথি ভবন থেকে বেরিয়ে এসে অভী হাঁটতে লাগল প্রজ্ঞা আর মেঘবর্ণের সঙ্গে। প্রজ্ঞা বললেন, “আমাদের সেনাবাহিনীর অনেকেই প্রলয়যোদ্ধাকে গত মহড়ায়ুদ্ধে দেখেছে। কিন্তু একজন সমরোত্তমকে সামনাসামনি দেখার কৌতূহল ওদের আছেই। ভালোই হল, সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন।”

মেঘবর্ণ হাসল। “দেখছেন তো, আমি কেমন অন্তর্যামী?”

প্রজ্ঞার কৌতুকবোধটা বোধহয় একটু কম। অভী হাসল, কিন্তু তিনি হাসলেন না; বললেন, “অন্তর্যামী হওয়াটা ভালো জিনিস নয়, সমরোত্তম মেঘবর্ণ। আমার ছেলে সুতসোম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পারে অন্যের মনের কথা বুঝে ফেলতে। তার জন্য ও খুব একটা শান্তিতে নেই কিন্তু।”

বাকি রাস্তাটায় আর কোনো কথা হল না।

আলোকপর্ণের কাছে পৌঁছে ওরা দেখল, সে প্রায় চল্লিশজন বাচ্চা ছেলেমেয়েকে হাত-পা নেড়ে খুব উত্তেজনাপূর্ণ একটা বক্তৃতা দিচ্ছে। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণবয়স্ক রাক্ষসযোদ্ধারা। বাচ্চাগুলোর কারও বয়সই সম্ভবত দশের বেশি হবে না। অভীর দেখে একটু অবাক লাগল, ওদের প্রত্যেকের পরনে যোদ্ধার পোশাক। সে অবাক হয়ে ভাবল, “এইটুকু বয়সে এরা কীই বা যুদ্ধ করতে পারবে?”

প্রজ্ঞা ডাকলেন, “আলোকপর্ণ। অতিথিদের নিয়ে এসেছি।”

আলোকপর্ণ ফিরে দাঁড়াল; তার মুখের সঙ্গে পর্বতের মুখের মিল স্পষ্ট বুঝতে পারল অভী।

খুব বেশি নত না হয়ে যতটুকু অভিবাদন জানানো যায়, সেইটুকুই জানাল আলোকপর্ণ। এরাও প্রত্যভিবাদন জানাল।

“সমরোত্তম মেঘবর্ণ, প্রলয়যোদ্ধা অভী, আপনাদের স্বাগত আমাদের সেনা-অনুশীলন ক্ষেত্রে। আপাতত ঘটোৎকচ বাহিনীর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ চলছে এখানে।” হাত প্রসারিত করে বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর দিকে দেখাল সে। “দেশের জন্য প্রাণ দিতে এই বাহিনীর একজনও দু’বার ভাববে না।”

অভী বুঝল, ছোটো থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিশুগুলোকে রীতিমতো যুদ্ধবাজ বানানোর কাজ চলছে। ওদের নিষ্পাপ মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে মনটা যেন তেতো হয়ে উঠল তার।

মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, আপনাদের এই বাহিনীর খ্যাতি সমরগরিমাতেও ছড়িয়ে পড়েছে।”

‘খ্যাতি’ শব্দটা আবার একটু ব্যঙ্গাত্মকভাবে উচ্চারণ করেছিল সে। প্রজ্ঞা একবার তাকিয়ে নিলেন তার মুখের দিকে। আলোকপর্ণ বলল, “এই বাহিনীকে ভয় পায় না, এমন কেউ গোটা মায়াজগতে নেই। আপনাদের সমরগরিমা বলুন, ঐশিকদের আকাশলোক বলুন, আর আমাদের মাল্যপর্বত – এই বাহিনী যেখানে যাবে, সেখানেই ধ্বংসলীলা চালানোর ক্ষমতা রাখে। আপনাদের মহান বজ্রধরও ভয় পেতেন এই বাহিনীকে।”

অভীর মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, “‘অধিনায়ক বজ্রধর’ বলুন। আর তিনি কাউকে ভয় পেতেন না। মৃত্যুকে তো

নয়ই। ওই মানুষটাকে অসম্মান করে বলা কথা কিন্তু আমরা কেউ সহ্য করব না।”

আলোকপর্ণ তাকে একবার ভালো করে নিরীক্ষণ করল; তারপর বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর একজন সম্মানিত মহাবীর যোদ্ধা ছিলেন, এ কথা আমরা সবাই জানি। তাঁকে অসম্মান করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। যে যোদ্ধা যমদন্তের অংশশক্তি ধারণ করেছেন, যিনি নিজের সহযোদ্ধাদের প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁকে নিয়ে আমরা কোনোদিন অসম্মানজনক উক্তি করব না। আমরা প্রকৃত যোদ্ধার কদর করি। উনি আমাদের শত্রুপক্ষের লোক হতে পারেন, কিন্তু আমরা বীরের মর্যাদা দিতে জানি।”

প্রজ্ঞা বললেন, “অধিনায়ক বজ্রধরের সুনাম মাল্যপর্বতে দীর্ঘদিন আছে। বহু বছর আগে উনি প্রায় একা হাতে আমাদের বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন। তখন আমরা কেউই বাহিনীতে যোগদান করিনি; তখন থেকেই ওঁর নাম যোদ্ধা হিসাবে এখানে প্রায় প্রবাদের মতো হয়ে গেছে।”

অভী মেঘবর্ণের মুখের দিকে তাকাল। তাকে দেখে মনে হল, সেও এই কাহিনি জানত না। হয়তো মেঘবর্ণ ঐশিকশ্রেষ্ঠের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে আসারও আগের ঘটনা এসব।

আলোকপর্ণ প্রসঙ্গান্তরে গেল। “অভী, তোমার হিমকুশলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এই ভয়ানক মায়াশক্তির অধিকারী আমাদের রাক্ষসদের মধ্যেও কেউ নেই। শুনলাম, তোমরা এখানে মহাসর্পিণীর গুহায় অভিযান করবে বলে এসেছ? ওই বিশ্বাসঘাতক পর্বতের জন্য এত বড়ো ঝুঁকি নেওয়ার কি কোনো দরকার ছিল।”

অভী গম্ভীরমুখে বলল, “পর্বতদা বিশ্বাসঘাতক নয়। অন্তত সে আমাদের সঙ্গে কোনোদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। আপনারাই বরং তার সঙ্গে অন্যায় করেছেন।”

আলোকপর্ণ বলল, “তুমি বোধহয় এতক্ষণে জেনে গেছ আমি কে। তাই তোমাকে খোলাখুলিই বলছি, আমার দাদা রাক্ষসজাতের কলঙ্ক ছিল। সে যে এই পবিত্র যুদ্ধভূমি থেকে বিদায় হয়েছে, তাতে আমি খুশিই হয়েছি। হ্যাঁ, সে নিজে অসামান্য যোদ্ধা ছিল, কিন্তু যে রাক্ষস তার নিজের অস্ত্রগুরু, নিজের সেনানায়কের চেয়ে একটা সামান্য অর্ধরাক্ষস মেয়ের জীবনকে বেশি মূল্যবান মনে করে, তার ঠাই নেই আমাদের দেশে।”

অভী আর কিছু বলল না। বোঝাই যাচ্ছে, রাক্ষসরা নিজেদের সেনাশক্তি নিয়ে এতটাই গর্বিত যে তারা নিজেদের ভুলগুলোকে স্বীকার করতেই রাজি নয়।

আলোকপর্ণ বলল, “এসো, তোমাদের দেখাই আমাদের ঘটোৎকচ সেনার কেরামতি।”

মেঘবর্ণ কঠিন মুখে বলল, “থাক না। আমরা দেখতে আগ্রহী নই।”

আলোকপর্ণ বলল, “আহা, সমরোত্তম মেঘবর্ণ, একবার দেখুনই না। এতে আপনাদেরই সুবিধা করে দিচ্ছি তো। বলা তো যায় না, যদি কোনোদিন সমরগরিমার সঙ্গে মাল্যপর্বতের যুদ্ধ লেগেই যায়, আপনারা অন্তত জেনে

রাখতে পারবেন, আমরা কী ধরনের শক্তি নিয়ে আপনাদের মুখোমুখি হচ্ছি।”

অভী বুঝতে পারছে, এসব সমরগরিমার কাছে মাল্যপর্বতের শক্তিপ্রদর্শন হচ্ছে। সে একটু কৌতূহলীও হয়ে উঠেছিল। এই ঘটোৎকচ সেনার রহস্যটা কী? এইটুকু বাচ্চাগুলোকে দিয়ে কীরকম যুদ্ধ করায় এরা?

পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর পেয়ে ওরা ঘুরে তাকাল। “আঃ! প্রলয়যোদ্ধা এসেছ আমাদের সেনাবল দেখতে? অতি উত্তম।”

মন্ত্রী মরুময়। তাঁকে রাজসভার বাইরে এই প্রথম দেখল অভী।

খোলা মাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছেন তিনি ওদের দিকে। অভী নজর করে দেখল, হাঁটার সময় একটা পা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন তিনি। হাতে একটা লম্বা দণ্ড ধরে আছেন মরুময়; তাতে ভর দিয়ে তিনি হাঁটছেন। ওই সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটাটুকু বাদ দিলে শরীরটি বেশ পোক্ত তাঁর। চোখদুটি উজ্জ্বল; মুখে ধারালো বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। চুল পেকেছে বটে, তবে দেহটি রীতিমতো ঋজু রয়েছে মন্ত্রী মরুময়ের।

ওরা সবাই তাঁকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল। মরুময় এসে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। “অভী, তোমাদের সমরগরিমায় বৃষ্টি-টিষ্টি কেমন হচ্ছে?”

অভী প্রশ্নটা বুঝতেই পারল না। যুদ্ধবিগ্রহের কথা হচ্ছিল, তার মাঝখানে উনি বৃষ্টির কথা এমন অপ্রাসঙ্গিক ভাবে টেনে আনলেন কেন, তার মাথায় এল না। আর, যে ক’দিন সে সমরগরিমায় এসেছে, বৃষ্টি দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি এখনও।

সে অবাক হয়ে মেঘবর্ণের দিকে তাকাল। মেঘবর্ণ বলল, “হ্যাঁ, বৃষ্টি ভালোই হয় বৈকি ওখানে। অবশ্য এখন বেশ কিছুদিন হয়নি।”

মরুময় বললেন, “একদিন তোমাকে আমার বৃষ্টি কারখানায় নিয়ে যাব, অভী। তার নাম ‘ধারান্নান’। যাবে তো?”

বৃষ্টি কারখানা বস্তুটা যে কী, অভী ধারণাও করতে পারল না। কিন্তু ভদ্রতা করে সে বলল, “হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।”

মরুময় আবার বললেন, “আমার ‘ধারান্নান’ সংস্থাই তো রাজপ্রাসাদে জলের সুব্যবস্থা করেছে। যত জল চাও, প্রাসাদে তার অভাব নেই। রাজকন্যা উর্মির অতিথিভবনের সামনেই একটা বিরাট পাথরের কুমিরের মুখের মধ্য থেকে সবসময় জল পড়ছে, দেখেছ নিশ্চয়ই। তোমরা অতিথিরা পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পাচ্ছ তো?”

অভীর একটু অস্বস্তি লাগছিল। মরুময় যেন জলের ভাবনায় ডুবে আছেন। কিন্তু মনের কথা চেপে রেখে সে সংক্ষেপে বলল, “হ্যাঁ, পাচ্ছি।”

মরুময় বললেন, “বাঃ! আলোকপর্ণ, তুমি নিশ্চয়ই এঁদের সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে কথা বলছিলে। বলো বলো, আমিও শুনতে এলাম; ভাবলাম, সমরোত্তম মেঘবর্ণ, প্রলয়যোদ্ধা এইসব মহাবীরের সঙ্গে থেকে আমিই বা বঞ্চিত হই কেন?”

আলোকপর্ণ বলল, “আজ বিকেলে রাজকন্যা উর্মির সঙ্গে তোমাকে দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন মহারাজ। তার আগে আমি তোমাদের এই ঘটোৎকচ বাহিনীর ক্ষমতা নিয়ে একটু বলি। প্রলয়যোদ্ধা,

সমরোত্তম - দু'জনেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী; মহামন্ত্রী মরুময়, আপনিও একসময় প্রচুর যুদ্ধ করেছেন। আশা করব, আপনাদের ভালো লাগবে।”

হাত নেড়ে একটি ছেলেকে ডাকল আলোকপর্ণ। ছেলেটি সামনে এসে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে অভিবাদন জানাল। “আদেশ করুন, সহনায়ক।”

আলোকপর্ণ বলল, “এই ছেলেটির নাম অনাবিল। আমাদের ঘটোৎকচ বাহিনীর অন্যতম সদস্য। অনাবিল, এঁরা আমাদের অতিথি; তোমাদের বাহিনীর কলাকৌশল দেখতে আগ্রহী। তুমি যা শিখেছ, এঁদের দেখাও। পারবে তো?”

অনাবিলের মুখ দেখে অভীর মনে হল, এর বয়স ওই আট-নয়ের বেশি কোনোমতেই হবে না। ছেলেটার ডানহাতটা বেশ কিছুটা বাঁকা; দেখে মনে হচ্ছে, হাতটা তার জড় হয়ে আছে, নড়াচড়া করছে না। মুখটি তার খুব শান্ত শান্ত গোছের - দেখলে মনে হয় না, সে আদৌ যুদ্ধ-টুদ্ধ করতে পারে। তার মুখের সরল হাসিটি বেশ লাগল অভীর।

আলোকপর্ণের কথা শুনে সে খুব খুশি হয়ে বলল, “নিশ্চয়। আমি আমার বিদ্যা প্রদর্শন করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।”

ছেলেটি কিছুটা পিছিয়ে গেল; বাহিনীতে তার বয়েসি বন্ধুদের সঙ্গে কীসব কথা বলতে লাগল সে। আলোকপর্ণ একটু নীচু গলায় বলল, “প্রত্যেকটি রাক্ষসজীবন দেশের জন্য নিবেদিত। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য হল, একটিও রাক্ষসের জীবন যেন ব্যর্থ না যায়। যেসব শিশু কোনো না কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মায়, তাদের আমরা এই কম বয়স থেকেই ভর্তি করে নিই ঘটোৎকচ সেনায়।”

অভী বলল, “কেন? এরা কী করে?”

“এই শিশুরা সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে পেরে উঠবে না। অনাবিলকেই দেখো। ওর একটা হাত ভালো করে নড়াচড়া করে না। এই অবস্থায় ওকে অসিযুদ্ধের শিক্ষা দিলেও শত্রুর চেয়ে ও সবসময় কিছুটা পিছিয়েই থাকবে। ধানুকী সেনাতেও এই কারণে ওকে নেওয়া যায়নি। কিন্তু যেকোনো শারীরিক সমস্যা থাকলেও এই ঘটোৎকচ বাহিনীতে সবার ঠাই আছে। এখানে ওদের আমরা বিশেষ ধরনের মায়াযুদ্ধ শেখাই।”

মেঘবর্ণ বলল, “জানি। এখানে ওদের কী ধরনের বীভৎস প্রশিক্ষণ দাও তোমরা, তার খবর কিছু কিছু সমরগরিমাতেও পৌঁছেছে।”

আলোকপর্ণ একটু হাসল। “ভালো কাজের খবর হাওয়ায় ছোটে। কী করব এই যুদ্ধ করতে অক্ষম শিশুদের নিয়ে আমরা, সমরোত্তম মেঘবর্ণ? এই পথে না আনলে এরা দেশের অন্নধ্বংস করবে, কিন্তু দেশের কোনো কাজেই আসবে না। তাই এই পন্থাই সর্বোত্তম। ওদের শেখানো হয়, নিয়তির ইচ্ছাতেই ওদের শরীর অন্যদের থেকে আলাদা হয়েছে, আর এইভাবে নিজের জাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই ওদের জীবনের লক্ষ্য।”

পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলল, “অভী, এসে পড়েছ এখানে? উর্মিদি খবর দিল, তুমি এখানে এসেছ।”

সুতসোম। তাকে দেখে অভী একটু হাসল। নীচুগলায় সুতসোম বলল, “আমাদের সামরিক কসাইখানা দেখতে এসেছ? কেমন লাগছে?”

তার কণ্ঠস্বরের অশ্রদ্ধার ভাবটা অভীর কান এড়াল না। সে বলল, “কেমন আর লাগবে? কসাইখানার দৃশ্য তো আর কখনই খুব মনোহর নয়।”

“যা বলেছ। মহামন্ত্রী মরুময় আছেন দেখছি। জলের কথা বলেননি এখনও?” ফিকফিক করে হাসল সুতসোম।

অভীও হাসল। “হ্যাঁ। জল, বৃষ্টি, ধারাম্নান – সব হয়ে গেছে।”

প্রজ্ঞা একবার আড়চোখে দেখে নিলেন সুতসোমকে অভীর সঙ্গে নিম্নস্বরে বাক্যালাপ করতে। কিছু একটা বলতে গেলেন তিনি, কিন্তু তারপরেই সামলে নিলেন। সুতসোম মাকে পাত্তাও দিল না, এমন একটা ভাব করল যেন সে তাঁকে দেখতেই পায়নি।

অনাবিল দৌড়ে এল। “সহনায়ক মহোদয়, এবার কি আমি আমার আত্মবর্ধন কৌশল দেখাব?”

আলোকপর্ণ বলল, “দেখাও, অনাবিল। আমাদের অতিথিদের মনোরঞ্জন করে রাক্ষসজাতির সম্মানরক্ষা করো।”

সুতসোম পাশ থেকে অভীকে বলল, “ছোটোবেলা থেকে এইধরনের বাচ্চাদের আলাদা করে নিয়ে এদের বিশেষ ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ খাওয়ানো হয় খুব কম মাত্রায়। আট ন'বছর বয়স হলে একটা বাচ্চার শরীরে এতটা বিস্ফোরক জমা হয় যে সে নিজেকে সহ যুদ্ধক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট জায়গার চারপাশে সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারে।”

অনাবিল ততক্ষণে ফুলতে শুরু করেছে। ওদের চোখের সামনে তার দেহটা বড়ো হচ্ছে, হয়েই চলেছে। মরুময় খুব তৃপ্তমুখে ব্যাখ্যা করে দিলেন, “মহাভারতে ঘটোৎকচের মৃত্যুটা মনে আছে? নিজের শরীরকে এতটাই বাড়িয়ে তুলেছিলেন তিনি যে কৌরবদের বহু সৈন্য তাঁর তলায় স্রেফ চাপা পড়েই মারা যায়। এই মায়া আমাদের আয়ত্তে আছে। কিন্তু আসল ঘটোৎকচের মায়ার উপর আমরা আর একটু উন্নতি করেছি। আমাদের দেশের যেসব বাচ্চা অন্য ধরনের যুদ্ধে অপারগ, তাদের আমরা লড়াই করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। এই ছেলেটার চেহারা অন্তত তিনটে হাতির মতো বড়ো হয়ে যাবে এখনই। আর তারপর এত বড়ো জিনিসটা যদি শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটায়, শত্রুর কতখানি ক্ষতি হবে, ধারণা করতে পারছ?”

অভী হাঁ করে দেখছিল। অনাবিলের সেই মিষ্টি, শান্ত, ছোটোখাটো চেহারাটা এতখানি ফুলে গেছে এর মধ্যেই, কেমন যেন বীভৎস লাগছে তাকে। চোখগুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, হাত-পাগুলোর মাংস ফেঁপে উঠছে, যেন অসংখ্য পুঁজভরা ফোড়ার মতো গজিয়ে উঠছে তার সারা গায়ে। ঠোঁটদুটো ঢুকে গেছে ভেতরে, গলাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে মাংসের পাহাড়ের তলায়। দেহটা তার বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু আনুপাতিক হারে নয় আর সেজন্যই আরও ভয়ংকর লাগছে তাকে। দেখতে দেখতে কেমন যেন গা গুলোতে লাগল অভীর।

সে বুঝতে পারছিল, মেঘবর্ণেরও অসহ্য লাগছে এই দৃশ্য। তার হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে অভীর বাম কাঁধ। এই ভয়াবহতা আর নেওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধে জেতার জন্য আর কত নীচে নামতে পারে এই রাক্ষসেরা? এইটুকু বাচ্চাগুলোকে নিয়ে...

অভী চিৎকার করে উঠল, “অনাবিল, ঢের হয়েছে। থামো এবার।”

অনাবিল থামল না, বেড়েই চলল। আলোকপর্ণ হেসে উঠল, “ওর কানে আর কিছু যাবে না, অভী। ও এখন জাতিগৌরবের স্বপ্নে বিভোর।”

“মানে?”

“ঘটোৎকচ বাহিনীর যোদ্ধাদের শেখানো হয়, যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারলে নিজের জাতির মুখ উজ্জ্বল করার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর পর মহাবীরের সম্মান পাবে ওরা। ওরা চলে যাবে সব যন্ত্রণার ওপারে আনন্দের জগতে। ও এখন আমার বিশ্বস্ত কুকুরের মতো; একমাত্র আমার কথা ছাড়া আর কারও কথা শুনবে না।”

মেঘবর্ণ বলল, “আমাদের মনোরঞ্জনের জন্যই তো এই আয়োজন? আমাদের যথেষ্ট মনোরঞ্জন ইতিমধ্যেই হয়েছে, আলোকপর্ণ। এবার এসব বন্ধ করো।”

“বিস্ফোরণটা দেখবেন না? চারপাশে রক্ত-মাংস-হাড় ছড়িয়ে পড়বে, গোলাপী রঙের ধোঁয়ায় ভরে যাবে চারদিক। ভয় নেই, আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। দেখবেন না একবার মজাটা?”

মেঘবর্ণ অনেক কষ্টে সামলে রেখেছে নিজেকে, অভী বুঝতে পারছে। “না। ওকে স্বাভাবিক হতে বলো।”

“তাই হোক তবে,” একটা ছদ্ম-দুঃখের মুখভঙ্গী করল আলোকপর্ণ। “অনাবিল, পুনর্মুখিক ভব।”

পাহাড়ের মতো মাংসপিণ্ডটা সঙ্গে সঙ্গে ছোটো হতে শুরু করল। পেটটা কমে যেতে থাকল, হাত-পাগুলো সরু হয়ে ফিরে পেতে লাগল পূর্বের অবস্থা, মুখের পাণ্ডুর বর্ণকে সরিয়ে ফিরে আসতে লাগল স্বাভাবিক রং। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সামনে এসে দাঁড়াল সেই পুরোনো অনাবিল – একটা হাত বাঁকা, অসাড়; কিন্তু মুখে সেই পরিচিত সারল্যমাখা হাসি। অভী এতক্ষণ শক্ত করে সুতসোমের হাতটা ধরে রেখেছিল। অনাবিল স্বাভাবিক হওয়ার পর সুতসোম গলার মধ্যে একটু কাশির শব্দ করল। অভী এবার সচেতন হয়ে একটু লজ্জা পেয়ে তার হাতটা ছেড়ে দিল।

প্রজ্ঞা বললেন, “এই কারণেই আমাদের ঘটোৎকচ সেনাকে সবাই এত ভয় পায়। ভেবে দেখুন সমরোত্তম মেঘবর্ণ, এইরকম সৈন্য যদি দশজনও ঢুকে পড়তে পারে শত্রুর এলাকায়, এরাই তো সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারে।”

মেঘবর্ণ যে ভয়ানক বিরক্ত হয়েছে, তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সে বলল, “এইভাবে আপনারা শিশুগুলোর শৈশব কেড়ে নিয়ে ওদের যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন দেওয়ার মাহাত্ম্য শেখাচ্ছেন, সেনানায়িকা প্রজ্ঞা? এই বয়সে বাচ্চারা খেলাধুলো না করে মায়াযুদ্ধ করছে!”

প্রজ্ঞার আগে আলোকপর্ণই উত্তর দিল। “কীসের শৈশব কেড়ে নেওয়ার কথা বলছেন আপনি? ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, ওরা খুশি কিনা। কী অনাবিল, ঘটোৎকচ সেনার সদস্য হয়ে তুমি খুশি নও?”

অনাবিল সঙ্গে সঙ্গে বলল, “দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে আমি সর্বদাই তৈরি। ঘটোৎকচ সেনা আমাকে সেই সুযোগ দেওয়ায় আমি আপনার কাছে

কৃতজ্ঞ, সহনায়ক আলোকপর্ণ।”

মেঘবর্ণ অভীর দিকে তাকাল; বলল, “অভী, এরা যে শুধু বিকৃতি করেই সম্ভুষ্ট, তা নয়; সেই বিকৃতিকে নিতান্ত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার বলে যে এরা ওইটুকু শিশুর মনে ছাপ ফেলে দিতে পেরেছে, এই দৃশ্য দেখেই আমি শিউরে উঠছি।”

অভী কিছু বলল না, কিন্তু সেও মনেপ্রাণে চাইছিল এখান থেকে চলে যেতে। ঘটোৎকচ বাহিনীর ওই ক্ষুদেগুলোর মুখগুলো আর যেন দেখতে পারছিল না সে। সুতসোম বোধহয় তার মনে কথা পড়ে ফেলেছিল। সে আস্তে করে বলল, “অভী, যদি ভালো না লাগে, ফিরে চলো। তোমার বন্ধুরা, উর্মিদি – সবাই তোমাকে পেলে খুশিই হবে।”

অভী দু’দিকে মাথা নাড়ল। মেঘবর্ণকে এদের সঙ্গে রেখে সে যেতে রাজি নয়।

মেঘবর্ণের কথা শুনে প্রজ্ঞা সম্ভবত একটু অপমানিত বোধ করছিলেন। তিনি বললেন, “দেশের জন্য সবাইকে কিছু না কিছু অবদান রাখতেই হয়। তার মধ্যে বিকৃতি দেখলেন কোথায়?”

মেঘবর্ণ ব্যথিতভাবে মাথা নাড়ল। “থাক, ও-কথা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু সত্যি বলুন তো, আপনারা নিজেরা বিশ্বাস করেন, যুদ্ধক্ষেত্রে ওইভাবে মরার পর ওদের জন্য খুব চমৎকার কোনো দিব্যজীবন অপেক্ষা করে থাকে?”

প্রজ্ঞা চুপ করে রইলেন। মরুময় মৃদু হাসলেন, যেন এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে মেঘবর্ণই বোকামি করেছে। আলোকপর্ণ অবশ্য চুপ করে থাকার পাত্র নয়। সে বলে উঠল, “আমাদের বিশ্বাস, আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে আপনাদের মাথা না ঘামালেও চলে। ওরা বীরের মৃত্যুবরণ করছে, এতেই ওরা খুশি। আর আমরাও এতে সম্ভুষ্ট।”

অভী দেখল, মেঘবর্ণের ঠোঁটের কোণে একটা তচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। “হ্যাঁ, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে মরবে তোমাদের জন্য, আর তাদের পেছনে লুকিয়ে তোমরা নিরাপদে থাকবে। এই না হলে বীর? ভাগ্যিস আমাদের সংস্কৃতি তোমাদের মতো নয়, আলোকপর্ণ। যুদ্ধ আমরাও করি, কিন্তু তোমাদের মতো মরতে এত ভয় পাই না।”

আলোকপর্ণ গর্জে উঠল, “আমরা মরতে ভয় পাই? এত বড়ো কথা বলছেন আপনি?”

“তাই তো মনে হচ্ছে। কচি বাচ্চাগুলোর এমন মগজধোলাই করে রেখেছে যে ওরা তোমাদের হয়ে তোমাদের লড়াইয়ে মরতে ছোট্টে, আর তোমরা ওদের পেছনে লুকিয়ে যুদ্ধজয়ের গর্ব করো।”

দাঁতে দাঁত ঘষে আলোকপর্ণ বলে উঠল, “সমরোত্তম মেঘবর্ণ, অদূর ভবিষ্যতে সমরগরিমার সঙ্গে মাল্যপর্বতের সংঘর্ষ একটা হবেই, এ-কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়, আপনি দেখবেন, কারও পেছনে লুকিয়ে যুদ্ধজয়ের গর্ব করতে হয় না আলোকপর্ণকে। আমি মৃত্যু দিতে বা নিতে – কোনোটাইতেই ভয় পাই না।

বিশ্বাস হচ্ছে না? বার করুন তবে আপনার তরবারি।”

মেঘবর্ণ বলল, “আস্তু, বীর, আস্তু। অনর্থক ঝুটঝামেলা করে লাভ কিছু আছে কি?”

“কী, ভয় পেয়ে গেলেন এতেই? অধিনায়ক বজ্রধর আপনার এই অবস্থা দেখলে লজ্জা পেতেন!” বিদ্রূপ করে উঠল আলোকপর্ণ।

মেঘবর্ণ হাসল। “এত ব্যঙ্গ করছ শুধু আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামানোর জন্য? হাত খুব চুলকোচ্ছে বুঝি? আলোকপর্ণ, হয়তো তুমি সত্যিই খুব বড়োমাপের অসিযোদ্ধা, কিন্তু কত বড়ো? শর্বরের থেকেও?”

আলোকপর্ণ চুপ করে গেল। তার সম্ভবত মনে পড়ে গেছে, স্বয়ং শর্বরও মেঘবর্ণকে তরবারিযুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেনি কখনও।

মেঘবর্ণ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল তার এই দোলাচল অবস্থাটা। প্রজ্ঞা, মরুময়, ঘটোৎকচ বাহিনীর সেনারা সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। সুতসোম মুচকি মুচকি হাসছে।

অভীর দিকে তাকিয়ে মেঘবর্ণ বলল, “অভী, আমাদের আলোকপর্ণের যখন এত ইচ্ছা, তখন তাকে একটু তরবারির পাঠ দেওয়া যাক। কী বলো?”

অভী একগাল হেসে মাথা নাড়ল। আলোকপর্ণের এতক্ষণের বাজে কথা শুনে শুনে তার মাথা ধরে গিয়েছিল। হতভাগার একটু শিক্ষা পাওয়া উচিত।

সুতসোম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল অভীর দিকে। অভী বলল, “সমরোত্তম মেঘবর্ণকে অসিযুদ্ধ করতে দেখা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। দেখতে থাকো, প্রচুর আনন্দ পাবে।”

কোমরের কোষ থেকে অসি নিষ্কাশন করল মেঘবর্ণ। নিজের অসি হাতে নিয়ে তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এল আলোকপর্ণ। প্রজ্ঞার মুখ গম্ভীর, যেন এই ঘটনায় তিনি খুব একটা প্রীত নন। কিন্তু মরুময়ের মুখে আনন্দ যেন আর ধরছে না। আর একটা যুদ্ধ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় তিনি যেন বড়ো প্রীত।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন অভী আর সুতসোমের পাশে। “প্রলয়যোদ্ধা অভী, তুমি বলো কে জিতবে। আমাকে বাজি ধরতে বললে আমি কিন্তু আমাদের অন্যতম সেরা যোদ্ধা আলোকপর্ণের উপরেই ধরব।”

অভী বলল, “সমরোত্তম মেঘবর্ণকে তরবারি হাতে আপনি কখনও দেখেননি তো, তাই ও-কথা বলছেন। আমার বাজি মেঘবর্ণ।”

মরুময় বললেন, “সুতসোম, তুমি?”

সুতসোম বললেন, “মন্ত্রীমশাই, বাজি ধরে আর কী হবে? আমি আমার মন খোলা রাখছি। যে জিতবে, তাকে অভিনন্দন জানাব; যে হারবে, তাকে দুয়ো দেব। এর বেশি আর ভাবতে চাই না এই মুহূর্তে।”

উদ্যত তরবারি হাতে মেঘবর্ণ দেখছিল তার প্রতিপক্ষের দিকে। অভী নিশ্চিন্ত ছিল, আলোকপর্ণ যত বড়ো যোদ্ধাই হোক, তার অসিশিক্ষককে বিপদে ফেলার মতো ক্ষমতা তার নেই। তাও যখন অত বড়ো রাক্ষসটা পায়ে পায়ে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করল মেঘবর্ণকে, তখন তার বুকটা একটু টিপটিপ করতে লাগল।

সুতসোম ফিশফিশ করে অভীকে বলল, “বেড়ালের ইঁদুর ধরার মতো এগোচ্ছে আলোকপর্ণ। হঠাৎ করে লাফাবে, মিলিয়ে নিও।”

মেঘবর্ণকে বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে, সে খুব নিশ্চিত। কিন্তু অভী বুঝতে পারছে, সেও সতর্কচোখে নজর রাখছে প্রতিপক্ষকে। দেখে তার ভালো লাগল যে মেঘবর্ণ আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু আত্মতুষ্ট নয়।

মেঘবর্ণকে কেন্দ্র করে ঘুরতে ঘুরতে বৃত্তের ব্যাসার্ধ ক্রমশ কমিয়ে আনছে আলোকপর্ণ। সেনাবাহিনীর লোকেরা এগিয়ে এসেছে অভীদের কাছে। এই দুই মহাবীরের লড়াই দেখবে তারাও।

সুতসোমের কথা মিলে গেল। ঘুরতে ঘুরতে বেশ কাছে এসে পড়েছিল আলোকপর্ণ; হঠাৎ চোখের নিমেষে অস্ত্র উঁচিয়ে মেঘবর্ণের উপর লাফিয়ে পড়ল সে।

সতর্ক ছিল মেঘবর্ণ; সঙ্গে সঙ্গে সে সরে গিয়ে নিজের তরবারি দিয়ে আঘাতটা আটকে দিল।

অভী বুঝতে পারছে, আলোকপর্ণের গায়ের জোর সাংঘাতিক। তার পায়ের নড়াচড়াও খুব ভালো। তবে বিরাট শরীরটা নিয়ে তার গতি একটু হলেও ধীর। কিন্তু মেঘবর্ণ যেন যোদ্ধা নয়, শিল্পী। তার হাতের তরবারির দীর্ঘ ফলক যেন ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎরেখার মতো; রৌদ্রের প্রতিফলনে ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ।

মুগ্ধচোখে এই যুদ্ধ দেখতে লাগল অভী। আলোকপর্ণ একটা আঘাত করেছিল সামনের দিকে খুঁচিয়ে; পলকের মধ্যে মেঘবর্ণ ডানদিকে সরে যেতেই সে ভারসাম্য হারিয়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল। ততক্ষণে তার পেটে সজোরে একটা লাথি মারল মেঘবর্ণ। ‘উঃ’ করে উঠল আলোকপর্ণ।

অভী মনে মনে হাসল। তার তরবারি শিক্ষার প্রথম দিন কিছুটা এমন ভাবেই লীনার কাছে মার খেয়েছিল সে।

সুতসোম পাশ থেকে বলল, “বাঃ! সমরোত্তম মেঘবর্ণ সত্যিই উত্তম যোদ্ধা। আলোকপর্ণের সামনে বেশিক্ষণ অসিহাতে টিকে থাকার লোক মাল্যপর্বতে কিন্তু সেরকম কেউ নেই – আমার মা ছাড়া।”

অভী বলল, “আর তুমি ছাড়া।”

অদ্ভুতভাবে হাসল সে। “আমার কথা ছাড়া। আমি আর ক’দিন?”

অভী একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, “আর আমি হলে আমার তরবারি লাগবে না। খালি হাতেই...”

অভী বুঝতে পারল সুতসোম কীসের কথা বলছে। বাস্তবিকই সে এতই শক্তিশালী মায়াযোদ্ধা যে তরবারি দিয়ে তাকে পরাস্ত করা অসম্ভব।

আবার তেড়ে আসছে আলোকপর্ণ। মেঘবর্ণ ডানহাতে উঁচু করে রেখেছে তার তরবারি, যাতে উপর থেকে আসা আঘাতটা আটকাতে পারে। কিন্তু তারপরেই সে কী এক অদ্ভুত কৌশলে মাথার উপর থেকে নেমে আসা অস্ত্রটা এড়িয়ে বসে পড়ল মাটিতে, আর ডান হাতের তরবারিটা বাম হাতে নিয়ে আঘাত করল আলোকপর্ণের তরবারির গোড়ায়। হাত থেকে ছিটকে পড়ল তার অস্ত্রটা, আর তার সঙ্গে অস্ত্রধারীও উলটে পড়ল ঘাসের উপর।

মাটিতে পড়ে থাকা আলোকপর্ণের গলায় তরবারির অগ্রভাগ ঠেকান মেঘবর্ণ। হাততালি দিয়ে উঠল অভী।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাততালি দিলেন প্রজ্ঞা, তাঁর সঙ্গে সেনাবাহিনীর বাকিরা। মরুময় অবশ্য এব্যাপারে যথেষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত। আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, “বাহবা, সমরোত্তম মেঘবর্ণ!”

ভূমিশয়ান আলোকপর্ণ তাকিয়ে রইল মেঘবর্ণের মুখের দিকে; সেখানে হালকা হাসি ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু তারপরেই ভেসে এল অভীর আর একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর।

“আরে ছোটোভাই, তোমাকে এইখানে সমরগরিমার তরবারির তলায় শুয়ে ধুলো খেতে দেখব, ভাবিনি কোনোদিন।”

পর্বত!

মেঘবর্ণ আর অভীর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে হাসল সে। আলোকপর্ণ হাতের পাশ দিয়ে সরিয়ে দিল তার মুখের সামনের তরবারিটাকে; মেঘবর্ণও আপত্তি করল না।

উঠে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সেও ফিরে তাকাল তার দাদার দিকে; বলল, “সমরগরিমার তরবারির সুরক্ষায় থেকে নিজের রাক্ষস-জাতিগর্ব বিসর্জন দিয়ে তুমি বেশ সুখে আছ দেখছি।”

পর্বত বলল, “সত্যিই সুখে আছি। এই রক্ষোপুরীতে আপনজনদের জন্য ‘সুরক্ষা’ বলে কোনো বস্তু তো কোনোদিন ছিলই না।”

মেঘবর্ণ তার তরবারি কোষবদ্ধ করে এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করল পর্বতকে। মরুময় কিন্তু সেদিকে মোটেই দেখছিলেন না। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল অভীর উপর। সেটা খেয়াল করে অভী একটু অস্বস্তিভরে জিজ্ঞাসা করল, “আমাকে কিছু বলবেন?”

পোশাকের মধ্য থেকে একটা ছোটো মুদ্রার মতো বস্তু বার করে তার হাতে দিলেন মরুময়। “এটা রাখো। তোমাদের সমরগরিমায় বৃষ্টির অভাব নেই জানি, কিন্তু যদি কোনোদিন হয়, তাহলে আমার সংস্থা ‘ধারান্নান’কে খবর দিতে পারো। আমরা যেকোনো জায়গায় বৃষ্টির ব্যবস্থা করে থাকি।”

অভী অবাক হয়ে দেখল, তার হাতের সোনার চাকতিটাতে একদিকে লেখা ‘ধারান্নান’, আর অন্যদিকে মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ার দৃশ্য খোদাই করা আছে।

আলোকপর্ণ ততক্ষণে উঠে পড়ে জমায়েত হওয়া সেনাদের ধমকাচ্ছে। “এখানে কি রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখানো হচ্ছে? এত ভীড় কেন? দূর হও সব, দূর হও।”

পর্বত আর মেঘবর্ণ সেই দেখে অভীর দিকে তাকিয়ে খুব হাসল। সুতসোম বলল, “আলোকপর্ণের আঁতে জোর ঘা লেগেছে।”

অভীও দেখছিল, আলোকপর্ণের মুখটা কেমন যেন কালো হয়ে গেছে। মনে মনে হাসল সে। “আরও নামতে যাও মেঘবর্ণের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায়!”

পর্বত তখন মেঘবর্ণকে বলছিল, “আরে না। প্রাকারের রক্ষী আমার পুরোনো দোস্তু। আমাকে আটকাবে কেন?”

প্রজ্ঞা একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিরস মুখে - আলোকপর্ণের হৃদিত্ব দেখছিলেন। এবার তিনি অভীর দিকে ফিরে বললেন, “আজ গোখুলির পরে তুমি যাবে দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে।”

অভী একটু খুশি হয়ে উঠল। যাক, পর্বতের স্ত্রীকে মুক্ত করার উপায় তাহলে জানা যাবে এবার। তার সঙ্গে রবিকাকাকে ফিরিয়ে আনার একটা ব্যবস্থাও হবে নিশ্চিত।

প্রজ্ঞা আবার বললেন, “মনে মনে তৈরি থেকো। জায়গাটা কিন্তু খুব একটা ভালো নয়। আর দ্রষ্টাদেবী...!”

বলতে বলতে চুপ করে গেলেন তিনি। মায়ের কথাটাকে সম্পূর্ণ করল সুতসোম। “দ্রষ্টাদেবীও খুব একটা সুবিধের জিনিস নয় - ওখানে গেলেই বুঝতে পারবে। তুমি যা জিজ্ঞাসা করবে, তার চেয়ে বেশিই উনি দেখতে পান, বলেনও অনেক বেশি - তাতে মন ভালো হওয়ার চেয়ে খারাপই বেশি হয়। আর ওখানে আছে জীবন্ত আঁধার - তার কবলে যদি একবার পড়ো, কেউ রক্ষা করতে পারবে না তোমায়।”

অভী বলল, “সেটা কী বস্তু?”

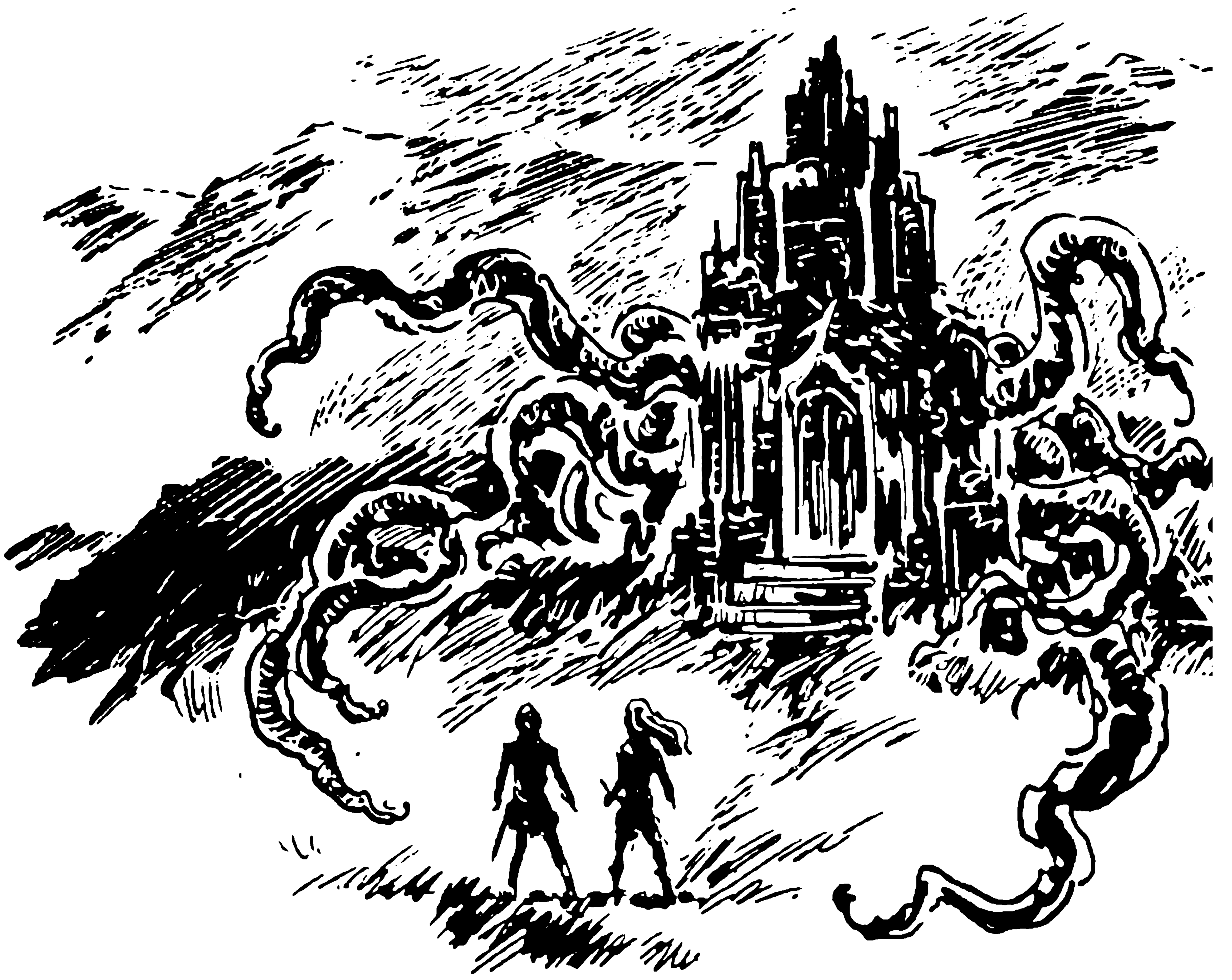
সুতসোম বলল, “ও এক অদ্ভুত জিনিস - না জ্যান্ত, না মরা। কিন্তু ওর খিদে সাংঘাতিক। কোনো জ্যান্ত জিনিস পেলে হল - ও তার সবটুকু প্রাণ চুষে শেষ করে দেবে। ওই অদ্ভুত অন্ধকারটা ভরে রেখেছে দ্রষ্টাদেবীর মন্দির। ওই অন্ধকারে কোনো আলো জ্বলে না। তুমি যদি মশাল নিয়ে যাও, দেখবে মন্দিরে ঢুকলেই সে মশাল নিবে যাচ্ছে। আর মন্দিরের একটু ভেতর দিকে আলোবিহীন অবস্থায় ওই অন্ধকার যদি তোমাকে বাগে পায় - ফিরে আসার আর কোনো আশা নেই।”

অভী ঢোঁক গিলল। “ওইখানে যেতে হবে আমাকে? যাব কী করে?”

“উম্মিদি যাবে তোমার সঙ্গে। ও থাকলে ওই ভয়ংকর অন্ধকার তোমার কিছু করতে পারবে না।”

“কেন?” প্রশ্ন করল অভী।

কাজলটানা দু'চোখ প্রসারিত করে হাসল সুতসোম। “ও জাদু জানে।”



।। অষ্টম অধ্যায় ।। দ্রষ্টাদেবী

অতিথিভবনে ফিরে সংক্ষেপে লীনা আর নিধিকে অভী জানিয়ে দিল আজকের অভিজ্ঞতা। আলোকপর্ণ মেঘবর্ণের সঙ্গে লড়তে গিয়ে গোহারা হেরেছে শুনে লীনা বলল, “বেশ হয়েছে। পর্বতদার সঙ্গে ও যা করেছে, তারপর আর ওর প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই আমার।”

নিধি বলল, “হ্যাঁ, পর্বতদার স্ত্রীর নাম বলতে গেলেই এরা মনে করিয়ে দেয়, সে অর্ধরাক্ষসের মেয়ে ছিল। যেন অর্ধরাক্ষসদের প্রাণের দাম থাকতে নেই!”

কিছুক্ষণ পর অভী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, “রাজকন্যার শিল্পবস্তুর সংগ্রহশালা কেমন লাগল?”

নিধি মুচকি হেসে বলল, “দারুণ লেগেছে।”

লীনা বলল, “ভালোই লাগল জায়গাটা। রাক্ষস-শিল্প নিয়ে যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে মন্দ লাগবে না তোমার। ছবি, ভাস্কর্য, গহনাপত্র অনেক কিছু আছে ওখানে। তবে অভী, আমাকে দোষ দিও না পরে। এই নিধিটা কিন্তু তোমাকে নিয়ে বেফাঁস বকেছে রাজকন্যার কাছে।”

অভীর আশঙ্কা ছিলই যে, তার অনুপস্থিতিতে নিধি নিশ্চয়ই কিছু বলে বসবে রাজকন্যাকে। উর্মিকে যে তার পছন্দ নয়, এ-কথা নিধি অনেকবার বুঝিয়ে দিয়েছে।

সে আতঙ্কিত স্বরে বলল, “কী বলেছ ওঁকে, নিধি?”

নিধি হি হি করে হেসে বলল, “দেখেছ, লীনা, অমনি বাবুর মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল?”

লীনা কিছু না বলে মিটিমিটি হাসতে লাগল। অভী বলল, “আরে, কী হয়েছে বলবে তো। এরকম ইয়ার্কি করলে ভালো লাগে না।”

নিধি দাঁত বার করে বলল, “উনি আমাদের ‘বন্ধু’ বলে পরিচয় দিচ্ছিলেন সংগ্রহশালার অধ্যক্ষকে। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি, আমরা ওঁর বন্ধু-টন্ধু নই। এখানে আমরা দরকারি কাজে এসেছি, বন্ধু বানাতে আসিনি।”

অভী বিরক্ত হয়ে বলল, “এটা না বললেই চলছিল না? এইটুকু ভদ্রতা কি বজায় রাখা যেত না? উনি তো আমাদের উপকারই করছেন; ওঁর প্রতি এত রূঢ়তা কেন?”

নিধি বলল, “আমি অসভ্য অর্ধরাক্ষস। কী বলতে কী বলে ফেলেছি! হি হি হি।”

অভী রাগত স্বরে বলল, “এইধরনের দু’মুখো কথাবার্তা তুমিও কিন্তু বোলো না, নিধি। যদি অর্ধরাক্ষস হিসাবে সম্মান চাও, তাহলে নিজেকে ‘অসভ্য অর্ধরাক্ষস’ বলা বন্ধ করতে হবে। নিজে যে অন্যায় করেছ, সেটা নিজের জাতের ঘাড়ে চাপানোটা তোমারও ঠিক হচ্ছে না।”

নিধি চুপ করে গেল। লীনা বলল, “অভী, তুমি কি রেগে গেলে?”

“তাতে তোমাদের কী আসে যায়?”

“আমার আসে যায়। সেজন্যই জিজ্ঞাসা করছি।”

নিধি বলল, “আমার আসে যায় না। তোমাকে দেখলেই রাজকন্যার চোখে কেমন যেন একটা প্রেম-প্রেম দৃষ্টি জেগে ওঠে, আমি খেয়াল করে দেখেছি। এসব বিষয়ে মেয়েরাই মেয়েদের ভালো বোঝে, বুঝেছ প্রলয়যোদ্ধা? আমি তাই ওঁকে বলে দিলাম, তোমার আর লীনার মধ্যে একটা ব্যাপার চলছে।”

অভী হাঁ করে বলল, “অ্যাঁ?”

নিধি বলল, “এবার আমাকে যত খুশি গালি দাও, কিন্তু আমি সবসময় আমার বন্ধুদের কথা ভাবি। ওই মেয়েটা, আর যাই হোক, আমার ‘বন্ধু’ নয়।”

অভী চুপ করে রইল। নিধির সঙ্গে তর্ক করতে তার ভালো লাগছে না। সে বুঝতে পারছে, নিধি তার সুযুক্তির কথা মোটেই শুনবে না।

লীনা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রাক্ষসদের শিল্পবস্তুর সংগ্রহশালায় ওরা কী কী দেখেছে, তার গল্প শুরু করে দিল। অভীও এই প্রসঙ্গটাকে আর বাড়াল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সে শুধু একবার বলল, “লীনা, তুমি বলো তো, উনি কি অপমানিত বোধ করেছেন?”

লীনা তাকে আশ্বস্ত করে বলল, “না, সেটাই সবচেয়ে ভালো কথা। উনি একটুও রাগ করেছেন বা অপমানিত বোধ করেছেন বলে মনে হল না। নিধির সঙ্গে ওইসব কথা হওয়ার পরেও উনি তো দিব্যি বহুক্ষণ ধরে আমাদের নিয়ে হাসিমুখে ঘুরলেন ওদের সংগ্রহশালায়; প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা করে দেখালেন। কথাবার্তাও বলেছেন বেশ প্রসন্নমুখেই – নিধির সঙ্গেও বলেছেন। আমার ধারণা, উনি ওই কথাগুলোকে পাত্রাই দেননি।”

একটু নিশ্চিত হয়ে অভী অতিথিভবনে তার নিজের কক্ষে ফিরে গেল।

সেখানে গিয়ে সে দেখে মেঘবর্ণের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছে পর্বত; তাঁদের সঙ্গে বসে আছেন রাজকন্যা উর্মি স্বয়ং।

তাকে ঢুকতে দেখে পর্বত বলল, “এসো অভী। আমরা রাজকন্যার সঙ্গে আলোচনা করছি কীভাবে মহাসর্পিণীর গুহায় যাওয়া যাবে।”

অভী সসংকোচে মেঘবর্ণের পাশে এসে বসল। উর্মি সম্ভবত বুঝতে পারছিলেন তার এই দ্বিধা। তিনি মুখ টিপে একটু হাসলেন শুধু, কিন্তু কিছু বললেন না।

মেঘবর্ণ বলছিল, “যতক্ষণ না আজ দ্রষ্টাদেবীর কাছ থেকে নিশ্চিত কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মহাসর্পিণীর গুহায় যাওয়া নিরাপদ নয়। আমি খবর নিয়েছি প্রাসাদরক্ষীদের কাছে। যখন উত্তরাকে বন্দি করা হয়, তখন ওই গুহার যে অবস্থা ছিল, এখন খুব সম্ভবত তা আর নেই। বছর দশেক আগে মাল্যপর্বতে বেশ বড়োরকমের ভূমিকম্প হয়েছিল। তাতে পাহাড়ের অনেক জায়গায় ধস নেমেছিল। মহাসর্পিণীর গুহার মুখের কাছে আর সেই আগের মতো সহজ প্রবেশপথ নেই। কাজেই আমাদের কাজটা সহজ হবে না।”

উর্মি বললেন, “দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরেরও একই দশা। ওখানে যাওয়ার পথও ওই ভূমিকম্পে অনেকটা ভেঙে পড়ে গেছে। ওখানে যেতে গেলে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। নয়তো মন্দিরে পৌঁছানোর আগেই পাহাড়ের গা বেয়ে খাদে গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা।”

বন্ধ দ্বারে কে যেন ডাকল। মেঘবর্ণ উঠে গিয়ে খুলে দিতে প্রফুল্ল এসে ঢুকল ভেতরে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত লোকগুলিকে দেখে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। অভীর মনে হল, প্রফুল্লের মুখটা যেন বিশেষত তাকে দেখেই অপ্রসন্ন হয়ে গেল।

সে কথা বলল অবশ্য পর্বতকে সম্বোধন করে। “আপনাকে মাননীয় মহারাজ রাজসভায় উপস্থিত হতে আদেশ করেছেন।”

পর্বত হাসিমুখে বলল, “ডাক এসে গেছে। মেঘবর্ণ, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? আমি যে স্বেচ্ছায় স্বদেশভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরেও ফিরে আসিনি, বরং সমরগরিমার সহঅধিনায়িকার ইচ্ছাক্রমে এখানে এসেছি – তুমি সাক্ষী দিলে সে কথাটা মহারাজকে বোঝাতে সুবিধা হবে আমার।”

মেঘবর্ণ বলল, “সে আর বলতে। চলো, চলো।”

ওরা দু'জন বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে। প্রফুল্ল আরও দু'তিন মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, যেন তার যাওয়ার ইচ্ছা নেই। সেটা খেয়াল করে উর্মি বললেন, “প্রফুল্ল, অতিথিদের রাজসভার কাজ মিটলে আমি তোমাকে যে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে বলেছিলাম, সেটা আমাকে জানিয়ে যেও।”

প্রফুল্ল মাথা নেড়ে বাইরে চলে গেল।

উর্মির সঙ্গে নিভৃত বসে থাকতে অভীর একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। এমনিতে অস্বস্তি হওয়ার কোনো কথাই ছিল না, কিন্তু নিধির কথাগুলো তার বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল।

উর্মিই সহজ করে নিলেন পরিবেশটা। “অভী, এখন শরীর কেমন?

সুতসোমের সঙ্গে যুদ্ধের প্রভাব এখনও আছে? বুকের ব্যথা কমেছে?”

“কমেছে। প্রায় নেই বললেই চলে।”

“বাঃ, খুব দ্রুত সারে তো তোমার শরীর! রক্তে রান্ধসমায়া আছে, এমন যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে এমনটা বেশি দেখা যায়। আচ্ছা অভী, তুমি তো একজন হিমকুশল গুনলাম।”

অভী বলল, “হ্যাঁ।”

“সুতসোম বলছিল। খুব প্রশংসা করছিল ও তোমার। আজ পর্যন্ত ওর কোনো প্রতিপক্ষের প্রশংসা শুনি নি ওর মুখ থেকে। বলছিল, তোমার মতো হিমকুশলতা গোটা মায়াজগতে আর কারও নেই।”

অভী বলল, “আছে। আমার বাবার আছে। আরও একজনের ছিল। তিনি মারা গেছেন।”

উর্মি বললেন, “আমি যতদূর জানি, কোনো একটা বিশেষ আবেগ ব্যবহার করে হিমকুশল তার শরীরকে ঠান্ডা করেন, আর সেই আবেগটাকে নিয়ন্ত্রিতভাবে হাতের মধ্যে দিয়ে চালনা করেন। তুমি কোন আবেগ ব্যবহার করো, অভী?”

অভী চুপ করে রইল। যে আবেগটিকে সে ব্যবহার করে হিমকুশলতা প্রয়োগ করে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার এখনও হয়নি। আর ওই প্রচণ্ড...

উত্তর না পেয়ে উর্মি আবার বললেন, “আচ্ছা, যদি বলতে ইচ্ছা না হয়, বোলো না। বেশিরভাগ মায়াদরই কিছু না কিছু ব্যক্তিগত আবেগ দিয়ে বিশেষ বিশেষ মায়া প্রয়োগ করেন; সেগুলো সাধারণত তাঁরা গোপন রাখতেই ভালোবাসেন। তুমি যদি তোমার হিমকুশলতার ব্যাপারে বলতে না চাও...”

অভী বলল, “আমি ঘৃণা দিয়ে হাত ঠান্ডা করি, রাজকন্যা উর্মি।”

উর্মি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। “পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর এবং সবচেয়ে অদ্ভুত আবেগ। ভীষণ শক্তিশালী, কিন্তু ও জিনিস তোমাকে খালি যন্ত্রণাই দেবে। যতবার ওকে ব্যবহার করবে, ততবার ও তোমাকে হতক্লান্ত করে দেবে, মনের ভেতরটা খালি-খালি করে দেবে।”

অভী মাথা নাড়ল। “তাই তো করে দেয়। সমরোত্তমরা বলেন ওই ভয়ানক আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে। কিন্তু আমি সবসময় ওকে থামাতে পারি না, ঠেলে বেরিয়ে পড়ে। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে চলছি যেন আমি নিজের মধ্যে।”

উর্মি বললেন, “হাতদুটো দেখি তোমার।”

দু’হাত বাড়িয়ে দিল অভী। উর্মি সেগুলো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিপুণ বৈদ্যের মতো ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন। দেখতে দেখতেই মন্তব্য করলেন, “খুব অদ্ভুত হাত। কোনো হিমকুশলের হাত দেখার সৌভাগ্য আমার এই প্রথম। এই মায়ার অধিকারী গোটা মায়াজগতে খুব বেশি তো নেই।”

তারপর তিনি বললেন, “আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখছি তোমার হাতে।”

“কী ব্যাপার?”

“তোমার দু’হাতেই নিয়তিলাঞ্ছন। এই নীলরঙের গোল চিহ্নগুলোকে তোমরা ‘নিয়তিলাঞ্ছন’ বোলো না সমরগরিমায়?”

“হ্যাঁ, আমরা মনে করি, এগুলো নিয়তির ডাক। যার হাতে এই চিহ্ন প্রকট হয়ে ওঠে, তাকে যেতে হয় সমরগরিমা আয়তনে।”

কী যেন ভাবতে ভাবতে উর্মি বললেন, “তুমি ছাড়া আর মাত্র একজনেরই দু’হাতেই এই চিহ্ন দেখেছি।”

“কার হাতে?”

সে কথার উত্তর দিলেন না উর্মি; ধরে রইলেন অভীর হাতদুটো। “তুমি যদি চাও, তোমার ভেতরের এই তীব্র ঘৃণাটাকে আমি দূর করে দিতে পারি, অভী।”

অভী অবাক হয়ে গেল। এটাকে যে নিরাময় করা যেতে পারে, তার এতদিন মাথাতেই আসেনি। সে বলল, “কীভাবে?”

“ঘৃণা দূর হয় কীসে জানো না? ভালোবাসায়। ভালোবাসার সামনে সব ঘৃণা শক্তিহীন হয়ে যায়। আমাকে যদি বলো, আমি এই ঘৃণা সারিয়ে দিতে পারি।”

অভী একবার তাকাল রাজকন্যার দিকে। এক মুহূর্ত, দুই মুহূর্ত। তারপর সে চোখ সরিয়ে নিল।

একটু হেসে উর্মি তার হাত ছেড়ে দিলেন। “অতি উত্তম। তুমি এই দুষ্ট আবেগটিকে দূর করার জন্য এখনও তৈরি নও, বুঝতে পারছি। ঘৃণা খুব নেশার জিনিস – যাকে একবার ধরে, তাকে আর ছাড়তেই চায় না।”

অভী আন্তরিকভাবেই বলল, “রাজকন্যা উর্মি, আমার এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। এই হিমকুশলতার মায়া কাছে থাকলে সেসব কাজ করতে আমার সুবিধাই হবে। একে আমি অস্ত্রের মতো ব্যবহার করি। নেশা কিনা জানি না, কিন্তু যদি পরে কোনো বড়োরকমের যুদ্ধ বাধে, এই হিমকুশলতা দিয়ে আমি আমার নিকটজনদের রক্ষা করতে পারব। তারপর নাহয়...”

উর্মি বললেন, “থাক, যে-কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারার সম্ভাবনা আছে, সে-কথা দিও না, অভী।”

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর উর্মি বললেন, “লীনা খুব ভালো মেয়ে।”

অভী তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি একটু হেসে যোগ করলেন, “নিধিও।”

তাঁকে হাসতে দেখে অভীও হাসল। তিনি বললেন, “আজ ওদের আমাদের শিল্পসংগ্রহ দেখালাম। আমরা রাক্ষসরা যুদ্ধবিগ্রহ না থাকলে শিল্পচর্চাও করি, বিশ্বাস করতে পারো?”

অভী হেসে বলল, “পারি।”

উর্মি বললেন, “রাক্ষসদের মধ্যে যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের চর্চাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবু বেশ কিছু রাক্ষস তো আছেই, যুদ্ধে যাদের মন ভরে না। তারাই করে শিল্পের চর্চা, সাহিত্যের চর্চা – রাক্ষসরা যেসব জিনিসকে একদম অদরকারি মনে করে, সেইসব বিদ্যার চর্চা।”

অভী বলল, “যেমন আপনার চিকিৎসা বিদ্যার চর্চা।”

“যা বলেছ। তোমাদের রক্ষাবৈদ্যের হাতে লেখা বেশ কিছু দুস্ত্রাপ্য ওষুধের প্রস্তুতপ্রণালী পেয়েছিলাম আমি। তাতে আরও উৎসাহটা বেড়ে গিয়েছিল। আসলে আমার মধ্যে...”

কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন তিনি। দ্বার খোলাই ছিল; প্রফুল্ল এসে দাঁড়িয়েছে বাইরে।

তাকে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করলেন উর্মি।

প্রফুল্ল কক্ষের মধ্যে আসতে উর্মি বললেন, “এবার বলো, আমি তোমাকে শেষমুখের সম্বন্ধে খবর জোগাড় করতে বলেছিলাম – সে কাজ কতটা করলে?”

প্রফুল্ল মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বলল, “রাজকন্যা, কিছু খবর সংগ্রহ করেছি। ওর পুরোনো শিকারদের ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখেছি, ও সাধারণত যে-ধরনের ছোরা ব্যবহার করে বেশিরভাগ খুনগুলো করেছে, সেই ছোরা আমাদের রাক্ষসবাহিনীতে খুব জনপ্রিয়। লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ সারতে ওর জুড়ি নেই। তাছাড়া ওর কার্যকলাপ শুনে মনে হয়, লোকটার সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ আছে। আমি তো বলব, আমাদের বাহিনীরই কারও শেষমুখ হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।”

অভী বলে উঠল, “এমনও তো হতে পারে, শেষমুখ হয়তো চাইছে আমরা ভাবি সে রাক্ষসবাহিনীর লোক। আসলে হয়তো সে আদৌ তা নয়।”

উর্মি একটু চিন্তা করে বললেন, “নিতান্ত অসম্ভব নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ওই সম্ভাবনার কথা ভাবতে চাইছি না। প্রফুল্ল, তুমি যে খবর এনেছ, তাতে আমার অন্তত মনে হচ্ছে, আমাদের বাহিনীর কেউই এর সঙ্গে জড়িত আছে। তোমার কী মনে হয়, অভী?”

অভী বলল, “আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। প্রফুল্ল, তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?”

প্রফুল্ল বলল, “এরকম দক্ষ লোক আমাদের সেনাবাহিনীতে অনেক আছে, প্রলয়যোদ্ধা; কিন্তু ঠান্ডা মাথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খুন করে বেড়ায় না তারা কেউই। তবে সবথেকে যার কথা মনে হয়, সে আকারে বেশ বড়ো, গায়েও প্রচুর জোর। মানে শেষমুখ হতে গেলে যে চেহারাটার কথা মাথায় আসে, তার সঙ্গে ওঁর মিল...” বলে দু’হাত দু’পাশে ছড়িয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ একটা ভঙ্গি করে করল প্রফুল্ল। বুঝতে অসুবিধা হল না সে কার কথা বলতে চাইছে।

আলোকপর্ণ!

উর্মি চুপ করে রইলেন; সম্ভবত ভাবতে লাগলেন আলোকপর্ণের পক্ষে শেষমুখের ছদ্মবেশ ধরে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া কতটা সম্ভব। অভীও ভাবছিল, আলোকপর্ণ বেশ হিংস্র প্রকৃতির রাক্ষস, অন্যের প্রাণ নেওয়াটা তার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। যুদ্ধবিদ্যাতেও সে বেশ দক্ষ; রাক্ষস-সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ তো তার আছেই। কিন্তু কোথায় যেন কথাটা মেনে নিতে তার অসুবিধা হচ্ছে।

উর্মি বললেন, “তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, প্রফুল্ল। চোখ-কান খোলা রেখো। যদি এ বিষয়ে আর কোনো সংবাদ পাও, আমাকে জানিও।”

প্রফুল্ল কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কী একটা বলতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে নিল। আড়চোখে একবার অভীর দিকে তাকিয়ে সে বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

অভীর আবার মনে হল, অকারণেই যেন প্রফুল্ল তার উপর অপ্রসন্ন হয়ে আছে।

তার কথা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে অভী একটু আমতা-আমতা করে বলল,
“রাজকন্যা উর্মি, একটা কথা।”

“হ্যাঁ, বলো।”

“আমার বন্ধু আপনার সঙ্গে যদি কোনো রূঢ় আচরণ করে থাকে, আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।”

উর্মি হেসে উঠলেন। “আরে না, না। নিধি আর লীনা দু'জনেই খুব ভালো মেয়ে। ওদের মধ্যে একটা বেশ চাঁছাছোলা সততা, সত্যি কথাকে সরাসরি বলার ক্ষমতা আছে। এ জিনিস আমাদের রাজপুরীতে চট করে পাওয়া যায় না। তুমি আর ও নিয়ে ভেবো না, অভী। বরং আজ গোধূলির সময় আমাদের যেতে হবে দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে, সেই কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করো।”

অভী বলল, “এই দ্রষ্টাদেবীর ব্যাপারটা কী, একটু বলবেন?”

উর্মি বললেন, “আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ কতটুকুই বা দেখতে পাই, বলো তো? রাক্ষস-অর্ধরাক্ষসদের কেউ কেউ একজনকে দেখে কিছুটা সাধারণ ধারণা করতে পারে ভবিষ্যতের; মানুষরা তাও পারে না। কিন্তু সে এমন কিছু বড়োগোছের মায়া নয়। দ্রষ্টাদেবী অনেক দূরের ভবিষ্যৎ দেখতে পান, এইখানেই তাঁর মাহাত্ম্য। কিন্তু তাঁকে খুশি করা সহজ নয়। আর তাঁর মন্দিরে যাওয়ার পথটিও যাকে বলে বেশ দুর্গম।”

অভী বলল, “কিন্তু উনি আসলে কে? আপনাদের রাজত্বে উনি এলেন কোথা থেকে?”

“কোথা থেকে আর আসবেন? এখানেই ছিলেন। অর্ধরাক্ষসী ছিলেন একজন উনি; গোটা মাল্যপর্বতে ওঁর সুনাম ছিল ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার জন্য। রাজা ওঁকে নিজের সভায় রেখেছিলেন রাজজ্যোতিষীর মর্যাদা দিয়ে; কিন্তু আরেকটি অর্ধরাক্ষসের প্রেমে পড়ে যান উনি। বিয়ের পর ওঁরা রাজসভা ছেড়ে আশ্রয় নিলেন ওই মন্দিরটিতে। শুনেছি, ওটা তখন বাসযোগ্য একটা পাথরের বাড়ি ছিল; এখন অবশ্য পুরো ভগ্নস্তুপ হয়ে গেছে জায়গাটা। আজ গেলেই বুঝবে। সে যাই হোক, রাজা তো খুব অপমানিত বোধ করলেন উনি রাজসভা ছেড়ে চলে যাওয়ায়। তার উপর তাঁর ভয় ছিল, কেউ না আবার ওঁর মায়াক্রান্তিকে কাজে লাগিয়ে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায়। তিনি করলেন কী, ওঁর স্বামীকে গোপনে লোক লাগিয়ে খুন করলেন।”

অভীকে হাঁ করে বলল, “রাজা? মানে তোমার...?”

উর্মি হাসলেন। “হ্যাঁ, আমার বাবার কথাই বলছি। সিংহাসনের জন্য রাক্ষসরা অনেক কিছু করেছে, ভবিষ্যতেও করবে, এ-কথা নিশ্চিত। অবাক হলে নাকি? রাজপরিবারে এরকম দু'চারটে খুনখারাপি লেগেই থাকে। আমরা তো পত্রতিলক রাক্ষস; আমার এক বিমোহক তুতোদাদা একবার আমার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাকে যুদ্ধে হারানোর পর নিজের হাতে বিষ খাইয়েছিল আমার বাবা।”

“কিন্তু দ্রষ্টাদেবী নিজের পরিবারের উপর এতবড়ো বিপদ আসছে, সেটাই দেখতে পাননি? নিজের স্বামীকে যে মারার ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তিনি জানতেন না?”

উর্মি বললেন, “ওইখানেই নিয়তির মার, অভী। দ্রষ্টাদেবী সবার ভাগ্য দেখতে পান, শুধু নিজের আর উনি নিজে যাদের ভালোবাসেন, তাদের ছাড়া। ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়, লোকে বলে না? উনিও জানতে পারেননি ওঁর জন্য, ওঁর স্বামীর জন্য কী অপেক্ষা করে আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর উনি পাগল হয়ে যান। ওই ভাঙা পাথরের বাড়িটার সঙ্গে পেছনের পাহাড়ের গুহার যোগ আছে। আমরা পুরো জায়গাটাকে দ্রষ্টাদেবীর মন্দির বলি। ওখানেই উনি থাকেন, কিন্তু কেউ আর ওঁর কাছে সাহস করে যেতে পারে না।”

“কেন?”

“জীবন্ত আঁধারের জন্য। কে সাধ করে যাবে ওখানে মরতে?”

“এই নামটা শুনেছি রাজসভায়। সম্ভবত সেনানায়িকা প্রজ্ঞা বলছিলেন এর কথা। সুতসোমও আজ এর ব্যাপারে কথা বলছিল। এটা আসলে কী বস্তু?”

“তুমি তো শুনেছি নরক থেকেও ফিরে এসেছ। ওখানে আগুন আর লাভা দেখেছ, না? এই জীবন্ত আঁধার বস্তুটা সেই নরকের চেয়ে কিছু কম ভয়াবহ নয়। ওটা একটা চোরাবালির মতো; মানুষের মনকে, চেতনাকে গিলে খায়। ওর পাল্লায় পড়লে কারও মুক্তি নেই – তার মাথার মধ্যে ঢুকে তার অস্তিত্বকে গ্রাস করে ওই অন্ধকারটা। প্রচণ্ড হতাশা থেকে, ভয়ংকর উন্মত্ততা থেকে ওর জন্ম – কোনো সুস্থ প্রাণী ওর সামনে কয়েক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারে না।”

“কোথা থেকে এল এই জিনিস? ওই মন্দিরেই বা ওটা বাসা বেঁধে আছে কেন?”

উর্মি একটু দুঃখমেশা হাসি হাসলেন। “আর যাবেই বা কোথায়? ওটা কোথা থেকে এল জানো? স্বামী মারা যাওয়ার পর দ্রষ্টাদেবী পাগল হয়ে যান। তাঁর সেই কষ্ট, সেই অসহায় অস্থিরতা, সেই ভয়ংকর পাগলামি জমাট বেঁধে অন্ধকার করে রেখেছে ওই মন্দিরের ভেতরটা। অত শক্তিশালী একজন মায়াধর ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মাথায় যখন এতবড় গণ্ডগোল হয়ে যায়, তখন তার কিছু ভয়ানক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তো থাকবেই। ও জিনিস জন্মেছে তাঁর মস্তিষ্ক থেকে। মাথার মধ্যে যত পাগলামি, যত উন্মাদনা ছিল, সবকিছুকে তিনি টেনে বার করে এনেছেন ওই মন্দিরের গুহার মধ্যে। অত প্রতিভাবান একজন মহিলা – বন্দি হয়ে আছেন স্রেফ নিজের মস্তিষ্কের উন্মাদ চিন্তার কবলে।”

অভী রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। উর্মি থামতে সে বলল, “তারপর?”

“কোনো আলো জ্বলে না ওখানে। ওই বিকট কালো অন্ধকারটা যেকোনো ধরনের আলোর গলা টিপে নিভিয়ে দেয়। আর যদি আলোবিহীন অবস্থায় ওই মন্দিরগহ্বরে পা রেখেছ তো আর রক্ষা নেই; ওই জীবন্ত আঁধার তোমার মাথার সব সুস্থতা চুষে খেয়ে নিয়ে তোমাকে দমবন্ধ করে মেরে ফেলবে। আর সেই জন্যই এই নিতান্ত অকাজের রাজকন্যাটির সাহায্য লাগবে তোমার।”

“কীভাবে? একটু খুলে বলো।”

উর্মি বললেন, “আমি তোমাকে বলেছিলাম, পরে বলব আমার মধ্যেও কোনো জন্মগত মায়ামণি আছে কিনা। আমি রক্তপদ্মরাগ মণি শরীরের মধ্যে নিয়ে জন্মেছি, অভী। আমার হৃৎপিণ্ডে বাস করছে ওই মণি। রক্তপদ্মরাগ কী কাজে লাগে, তুমি জানো?”

অভী মাথা নাড়ল। “শুনেছি, অনেক শুভশক্তি একত্র হয়ে তৈরি হয় ওই মণি। বহু রোগ সেরে যায় ওর মায়ায়। রক্ষাবৈদ্য বলছিলেন।”

রক্ষাবৈদ্যের নাম শুনে কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে উর্মি বললেন, “ঠিকই বলছিলেন তিনি। আমার মধ্যে জন্মগতভাবে এই মণি আছে বলেই বোধহয় আমি চিকিৎসাশাস্ত্রে এত দ্রুত উন্নতি করতে পেরেছি। আমি এর ক্ষমতাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি; পুরোপুরি যদি পারি, তাহলে বহু কঠিন রোগের নিরাময়ও একমুহূর্তে করে ফেলতে পারব। যাই হোক, ওই মন্দিরে গেলে আমার মধ্যকার ওই রক্তপদ্মরাগ জেগে ওঠে – ওর আলোকে নষ্ট করার ক্ষমতা ওই জীবন্ত আঁধারেরও নেই। ওই শুভ আলোয় তখন দ্রষ্টাদেবী অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন; যে কালো কালো মেঘগুলো ওঁর চিন্তাশক্তি, ওঁর ভবিষ্যৎদর্শনের শক্তিকে ঢেকে রাখে, তারা সাময়িকভাবে সেরে যায়। ওঁর মন পরিষ্কার হয়ে গেলে তুমি ওঁকে যে প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করো, তার উত্তর উনি তোমাকে বলে দিতে পারেন।”

অভী সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে ঠিক করে নিল, মহাসপিণীর কথাটা ছাড়াও আর একটা কথা সে জিজ্ঞাসা করবে দ্রষ্টাদেবীকে।

কেউ যদি জানে তো উনিই জানবেন।

ওরা যখন যাত্রা করল দ্রষ্টাদেবীর মন্দির-গুহার উদ্দেশে, তখন মাল্যপর্বতের পশ্চিমদিকের চূড়াগুলোর মাথায় এসে পড়েছে গোধূলির লালচে রঙের আলো। হাওয়া দিচ্ছে না এতটুকু; পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে হয়ে আছে।

পথে ওদের বেশ কিছুটা এগিয়ে দিয়ে গেল মেঘবর্ণ, পর্বত, লীনা আর নিধি। রাক্ষসদের পক্ষ থেকে সঙ্গে ছিলেন প্রজ্ঞা। উর্মির সঙ্গে রাজার কাছে গিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে অভী বেরোল রাজপ্রাসাদ থেকে।

এর আগে নিধি আর লীনার সঙ্গেও কিছুক্ষণ কথা হয়েছে তার। লীনা যেন একটু কম কথা বলছিল। কারণটাও অভী বুঝতে পারছিল না, এমন নয়। সে তাকে আড়ালে ডেকে বলল, “লীনা, তোমার জায়গা নেওয়ার সাধ্য কারও হবে না, এইটুকু আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি।”

লীনা তার কাঁধে হাত রাখল; কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে; তারপর বলল, “আমি জানি। সাবধানে যেয়ো।”

দলটা ওদের এগিয়ে দিয়ে গেল পার্বত্য পথটা যেখান থেকে একটা সরু চড়াইতে বেঁকে যাচ্ছে, ততটা পর্যন্ত। ওখানে গিয়ে প্রজ্ঞা বললেন, “আর আমরা এগোব না। রাজকন্যা উর্মি, আপনি প্রলয়যোদ্ধাকে নিয়ে চলে যান। আমাদের আর যাওয়া নিরাপদ নয়।”

বাকি সঙ্গীরা চলে যাওয়ার পর অভী একবার দেখে নিল চারপাশটা। ততক্ষণে অন্ধকার হতে শুরু করেছে পরিবেশ। মাথার উপরের আকাশে দু’একটা ছিন্ন মেঘের টুকরো ঘুরছে – তাদের গায়ে মরা দিনের রক্তাভা লেগে আছে এখনও। কিন্তু যে উঁচু হয়ে যাওয়া সরু পথটা একটা আলসের মতো জেগে আছে পাহাড়ের গা বরাবর, সেটা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কথা ভাবতেই

অভীর কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সে বলল, “আচ্ছা, জটায়ুবাহিনীর পিঠে চেপে গেলে হয় না?”

উর্মি বললেন, “না। এই জীবন্ত আঁধারের মায়া এত তীব্র যে জটায়ুরা এর কাছাকাছি এলেই দিশাহারা হয়ে পড়ে, ওদের দিগ্‌দর্শন ক্ষমতা আর কাজ করে না। তখন পিঠে বসে থাকা আরোহীকে সে ফেলে দিতেও পারে। এই পথটুকু হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।”

বিরাট পাহাড়ের গা বেয়ে বেরিয়ে আছে একটুখানি পা ফেলার সুরু জায়গা। উর্মি বললেন, “খুব সাবধানে এসো, অভী। পা ফসকায় না যেন। আর খবর্দার, নীচের দিকে তাকাবে না।”

কিন্তু ‘তাকাবে না’ বললেই কি আর না তাকিয়ে পারা যায়? অভী কিছুক্ষণ সামলে রেখেছিল নিজেকে, একটি একটি করে পা ফেলছিল খুব সতর্কতার সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চোখ চলেই গেল নীচের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে গেল তার।

কী গভীর খাদ অপেক্ষা করে আছে তার জন্য এই পাহাড়ের গা থেকে – একবার পড়লে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না তাকে! মাথাটা টলে গিয়ে মনে হচ্ছিল পা ফসকে যাবে, কিন্তু উর্মি সজাগভাবে নজর রাখছিলেন এ দিকে; তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন তাকে। একটু তিরস্কারের সুরে বললেন, “অমনি তাকিয়ে ফেললে নীচের দিকে?”

অভী সন্ধ্যার ধূসর পাহাড়ের গায়ের খাঁজে আঙুল আটকে ধরে নিজেকে একটু সামলাল। “ভুল হয়ে গেছে খুব।”

উর্মি বললেন, “নজরটা আমার দিকে রাখো। আমি যেভাবে যাচ্ছি, সেইভাবে এসো। এখান থেকে পথ যে খুব বেশি, তা কিন্তু নয়। দিনের আলো থাকলে একটু সুবিধা হত ঠিকই, কিন্তু এই মন্দিরে গোধূলি না নামলে আসার নিয়ম নেই। পথটা অন্ধকারে তাই আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।”

অতি সাবধানে অসমান পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে হাত রেখে ওরা এগিয়ে চলল। যত সামনের দিকে যাচ্ছে ওরা, অভীর মনে হতে লাগল, অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে আসছে। এ যেন স্বাভাবিক অন্ধকার নয়। যত এগিয়ে চলেছে, ততই যেন চারপাশ থেকে ঢেউয়ের মতো ঘিরে ধরছে তাদের এই অন্ধকারটা; যেন অজস্র হুঁড়ের মতো হাত পা দিয়ে জড়িয়ে নিতে চাইছে তাদের।

সুরু পথটা প্রশস্ত হচ্ছে একটা উন্মুক্ত, সমতল স্থানে। উর্মি বললেন, “আমরা এসে পড়েছি। এইবার কিন্তু আসল বিপদের জায়গা শুরু হচ্ছে।”

বলতে বলতেই অভীর মনে হতে লাগল, তার নিতান্ত অকারণেই খুব ভয় করতে শুরু করেছে। কোনো দুর্ধর্ষ শত্রুর সামনে দাঁড়িয়েও এমন ভয় তার কখনও করেনি। আলোর এই অনুপস্থিতিটা যেন এত তীব্র যে তার মনে হচ্ছে এই ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসা পাথুরে জায়গাটাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে সে।

একবার তার মনে হল, “এখানেই মরে গেলে ক্ষতি কী?” কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেই শিউরে উঠল। এসব কী ভাবনা আসছে তার মাথায়?

অন্ধকারটা যেন তাদের পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করে নিয়েছে; আর কিছু সে দেখতে পাচ্ছে না। উর্মিকে না, সামনের ফাঁকা জায়গাটাকে না, মাথার উপরে

যে তারাভরা আকাশটা এতক্ষণ ছিল, সেটাকেও না। তার চোখের উপর একটা কালো পর্দা পড়ে গেছে; যেন অন্ধ হয়ে গেছে সে। আর এই অন্ধকারটা – এটার যেন নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি আছে – ঠিক অজগরের মতো শীতল পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে শিকারকে। অভীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল; প্রচণ্ড আতঙ্কে সে চোঁচিয়ে উঠল, “রাজকন্যা উর্মি, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না!”

আর সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের সামনে দপ করে জ্বলে উঠল একটা সাদা আলো। সে দেখতে পেল, উর্মির ডানহাতের তালু থেকে বেরিয়ে আসছে মোলায়েম কিন্তু উজ্জ্বল একটা প্রভা। সেই আলোতে অভী দেখল, যে ভয়ানক অন্ধকারটা ঠান্ডা গুঁড়ি বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছিল তাদের, সেটা আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে – ঠিক পিছিয়ে যাওয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো।

উর্মির হাত থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় অভী দেখতে পেল দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরের দ্বার। ভয়টা কেটে গেছে; আবার ঠিকঠাক শ্বাস নিতে পারছে সে।

একটা ভাঙা পাথরের বাড়ির চৌকোমতো দরজা; তার গায়ে শ্যাওলা পড়ে সবুজ হয়ে গিয়েছিল একসময়। কিন্তু এখন সেই শ্যাওলাগুলোও শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে লেগে আছে দরজার গায়ে। ভেতরটা পুরো অন্ধকার। উর্মির আলো অতটা পর্যন্ত এখনও পৌঁছোচ্ছে না। অভী এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে।

উর্মি বললেন, “আমার কাছে কাছে থাকো। কোনো ভয় নেই – এই রক্তপদ্মরাগের আলোর সামনে জীবন্ত আঁধার তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”

ওরা এগিয়ে গেল মন্দিরদ্বারের দিকে। আলো হাতে উর্মি যত সামনের দিকে যাচ্ছেন, অন্ধকারটা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের ভেতরে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই; থাকার কথাও নয়। ভেতরে এতটুকু বাতাস আসছে না, কেবল একটা দমচাপা ভাব ঘিরে রেখেছে ওদের। অন্ধকারটা যেন হিংস্র চিতার মতো ওৎ পেতে আছে – একটু আলোটা কমলেই ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

খনখনে গলাটা ভেসে এল ভেতর থেকে। “উর্মি এসেছিস? আয়। কাছে আয়।”

উর্মি তাকালেন অভীর দিকে। বয়স্কা মহিলার কণ্ঠস্বর। একটু কাঁপা কাঁপা, কিন্তু গলায় জোর আছে। ওরা আরও একটু ভেতরে ঢুকল মন্দিরের।

উর্মির হাতের স্নিগ্ধ লালচে-সাদা আলোটা ওদের ঘিরে একটা উজ্জ্বল বলয় তৈরি করেছে। তার বাইরে অন্ধকার। সেই আলোয় অভী দেখতে পেল এবার মহিলাকে।

মুখের চামড়া একেবারে কুঁচকে গেছে তাঁর, কিন্তু চোখগুলি জ্বলজ্বল করছে এই মায়া-আলোতে। সেই চোখের মধ্যে একই সঙ্গে একটা অদ্ভুত হাসি আর একটা উন্মাদনা খেলা করছে। হাতে তাঁর সুচ-সুতো ছিল; কী যেন সেলাই করছিলেন তিনি। ওরা আসতে সেগুলো তিনি নিজের পেছনে সরিয়ে রাখলেন।

দ্রষ্টাদেবীকে দেখে অভীর কেমন অস্বস্তি হতে শুরু করল। মহিলা তাকিয়ে আছেন তারই দিকে – কী যেন দেখছেন একদৃষ্টে।

তারপর ফিশফিশ করে তিনি কথা বললেন, “শরীরে তিন তিনটে রক্ত! প্রলয়যোদ্ধা!”

অভী অবাক হয়ে গেল। তাকে দেখামাত্র এই মহিলা চিনে ফেলবেন, সে ভাবেনি।

তিনি আবার বললেন, “কী জন্য এসেছিস? মহাসর্পিণীর গুহায় যাবি?”

উর্মি হাতজোড় করে বললেন, “দ্রষ্টাদেবী, আপনার দৃষ্টির সামনে অজানা কিছুই নেই। আমরা কীভাবে ওখানে যেতে পারি, কীভাবে সফল হয়ে ফিরতে পারি, আমাদের উপদেশ দিন দয়া করে।”

দ্রষ্টাদেবীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। “মহাসর্পিণীকে যে ওই গুহায় বন্দি করে রেখেছে, সে উচিত শাস্তি পাবে। কিন্তু ওই সাপকে আক্রমণ করতে গেলে আক্রমণকারীর মৃত্যু নিশ্চিত। ওই মেয়েটি ভুলে গেছে সে একসময় কী ছিল – কাজেই সাধারণ মানুষ বা রাক্ষসের মতো আচরণ সে করবে না। অসহ্য কষ্টে সে সবসময় খেপে আছে, তাই যেকোনো জ্যান্ত প্রাণী দেখলেই সে হামলা করবে।”

উর্মি বললেন, “তাহলে উপায়?”

“ওই মহাসর্পিণীর গুহাতেই আছে রক্তপদ্মরাগ মণি। সেই মণিটিকে উদ্ধার করতে পারলে তাদের সমরোত্তমের স্মৃতিবিভ্রম আর সাপটার রূপান্তরমায়ার বন্দিদশা – দুইই কাটানো যাবে।”

অভীকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে দ্রষ্টাদেবী একটু হাসলেন। “হ্যাঁ, আমি জানি সমরোত্তম স্বর্ণশেখরের ব্যাপার। আমি তাকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি – সে পৌঁছে গেছে ওই গুহার খুব কাছাকাছি। আগামীকাল দ্বিপ্রহরের আগেই সে প্রবেশ করবে গুহায়। কিন্তু তার কাছে তার মায়াঅস্ত্র নেই; তাই সে ভাবছে, গুহায় প্রবেশ করবে কি করবে না। ভালোই করছে – কারণ ওই লোকটা যদি গুহায় ঢোকে, তাহলে ওদের দু’জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু তোরা তো দু’জনকেই বাঁচিয়ে রাখতে চাস, তাই না?”

অভী বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ।”

দ্রষ্টাদেবী বললেন, “মনে রাখিস অভী, মহাসর্পিণীর দেহকে কোনো সাধারণ অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা যায় না – এতই দুর্ভেদ্য সে চামড়া। তোর চন্দ্রহাস সেই কাজ করতে পারবে বটে, কিন্তু তুই যদি হাতে চন্দ্রহাস নিয়ে ওকে আঘাত করিস, ওই সাপ মরবেই মরবে। প্রলয়যোদ্ধার হাতের চন্দ্রহাসের আঘাত কোনোদিন ব্যর্থ হবার নয়। কিন্তু তাহলে পর্বতের বউকে জ্যান্ত পাওয়ার আশা ছাড়তে হবে।”

অভী তাকিয়ে রইল। এসব কথা তার জানা। নতুন কিছু শোনার অপেক্ষায় সে চুপ করে রইল। একবার তার মনে হল, তাদের আলোকবৃত্তের বাইরের অন্ধকারটা যেন নড়াচড়া করছে। দেখার ভুলও হতে পারে অবশ্য।

দ্রষ্টাদেবী আবার বললেন, “ওই সাপকে শান্ত করতে হবে কোনোভাবে। একমাত্র তখনই আমাদের রাজকন্যা ওই গুহায় লুকানো রক্তপদ্মরাগ উদ্ধার করে ওকে অভিশাপমুক্ত করতে পারবে। কী রে উর্মি, পারবি তো?”

“পারব,” উর্মি মাথা নাড়লেন। “কিছু পাহাড়ি লতা আছে, যাদের রস ব্যবহার করে ওঁকে আবার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যায়। সে-জন্য রক্তপদ্মরাগ মণি ব্যবহার করতেই হবে, নয়তো কোনো ফল হবে না। কিন্তু সাপটাকে

কীভাবে শান্ত করা যায়, সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন না।”

“যা বলার বলে দিয়েছি,” দ্রষ্টাদেবী হাসলেন। “এখন তোরা ভাব, কী করে অভীকে ছাড়াই চন্দ্রহাসকে ব্যবহার করা যায়। এবার আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করার পালা। উর্মি, বলেছিস ওকে?”

উর্মি একটু খতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, “না, বলা হয়নি।”

“হি হি। আমি জানি তো, বলিসনি। অভী, এগিয়ে আয়।”

অভী অবাক হয়ে তাকাল উর্মির দিকে। তিনি একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেন, “তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম। দ্রষ্টাদেবীর গুহায় আমার সঙ্গে যারা আসে, তাদের ভবিষ্যৎ দেখেন উনি। যদি বলার মতো কিছু থাকে, তাহলে সেটা বলেও দেন। কিন্তু এখানে এসে ওঁর পরামর্শ নেওয়ার জন্য এইটুকু মূল্য উনি নিয়ে থাকেন।”

অভী বলল, “আমার আপত্তি নেই। ভবিষ্যৎ গণনা করাইনি কখনো। এখন যদি হয়ে যায়, মন্দ কী?”

এগিয়ে গেল সে দেবীর দিকে। তিনি বললেন, “হাত বাড়া।”

নিজের দু’হাত প্রসারিত করল সে। দ্রষ্টাদেবীর হাতদুটো এসে ধরল সেগুলোকে। তাঁর হাতগুলোর চামড়া কুঁচকে পুরোনো কাগজের মতো হয়ে গেছে; উর্মির আলোয় ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য লাগছে সেগুলোকে; শিরাগুলো উঠে আছে চামড়ার মধ্য দিয়ে। অভীর হাত ধরে দেবী কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করলেন। আর তারপরেই চমকে উঠে চোখ খুললেন তিনি। চিৎকার করে উঠলেন, “তুই জানিস তোর মধ্যে কী আছে?”

অভী রীতিমত চমকে গেল। দ্রষ্টাদেবীর গলার স্বর পালটে গেছে – খনখনে গলাটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে; কপালে ভয়ংকর জ্রুকুটি। বলে চলেছেন তিনি, “প্রলয়যোদ্ধা! প্রলয়যোদ্ধা! এত ভয়ানক শক্তি লুকিয়ে রেখেছিস তুই! আমি বুঝতেও পারিনি এতক্ষণ!”

অভী অসহায়ভাবে উর্মির দিকে তাকাল। দেবী কী বলছেন, সে কিছুই বুঝতে পারছে না। উর্মিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। দেবীর এমন রূপ তিনিও আগে কখনও দেখেননি।

“কিছু বুঝতে পারছিস না তুই, না? নিজেকে কখনও প্রশ্ন করেছিস? আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ, রাক্ষস, অর্ধরাক্ষস – কেউ শিবের চন্দ্রহাস হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে পারেনি। তুই পেরেছিস। কেন? আজ পর্যন্ত কেউ নরকে গিয়েও একটুও আহত না হয়ে ফিরে আসতে পারেনি। তুই পেরেছিস। কেন? যে মুহূর্তে তুই নরকগহ্বরে পড়ছিলি, তখনই তোর পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু একটিও আঁচড় গায়ে না নিয়ে তুই ফিরে এলি? কেন? হিমকুশলতার জন্য? দূর দূর! ভাব, অভী, ভাব। কেন ফিরে এলি তুই?”

অভী কোনোক্রমে বলল, “কেন?”

“কারণ তুই একদিন সব ধ্বংস করে দিবি, তাই। নিয়তি তোকে বাঁচিয়ে রাখছে, কারণ একদিন তোকে দিয়ে সে সব ধ্বংস করাবে, তাই। তুই নিজেই সেই ধ্বংস; তুই নিজেই সেই সর্বনাশ – তুই জানিস না? তুই বুঝিস না?”

দ্রষ্টাদেবীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। অভীর হাতদুটো তিনি

ধরে রেখেছেন শক্ত করে। তাঁর চোখ জ্বলছে উন্মাদের মতো। অভীর ভয় করতে লাগল। সে বলল, “আপনি কী বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।”

তিনি বলতে লাগলেন, “প্রলয়ের অস্ত্র দিয়ে প্রলয়যোদ্ধা একদিন সব ধ্বংস করে দেবে। কী অস্ত্র? তুই জানিস না, কী অস্ত্র? এই সর্বনাশা অস্ত্র অর্জুন পেয়েছিল শিবকে তুষ্ট করে। কিন্তু তুই? তুই কোথায় পেলি এ জিনিস?”

পাশ থেকে ফিশফিশ করে উর্মি বললেন, “মনে হচ্ছে, পাশুপতের কথা বলছেন উনি। মহাশক্তিশালী মন্ত্রমুক্ত দৈবাস্ত্র।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “আমার কাছে কোনো মন্ত্রমুক্ত দৈবাস্ত্র-ট্টেবাস্ত্র নেই। এই একটি আছে – চন্দ্রহাস; সেটিও সবসময় আমার কথা শোনে না।”

“মহাশক্তিশালী দৈবাস্ত্ররা ওইরকমই হয়,” দ্রষ্টাদেবী বললেন। “তাদের নিজস্ব মন থাকে, নীতিবোধ থাকে। ওই পাশুপতের শক্তিকে আমি অনুভব করছি তোর আশেপাশে। হয় তুই এর মধ্যেই পেয়ে গেছিস ওই অস্ত্র, নয়তো শীঘ্রই পাবি। কিন্তু তারপর আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না; আমার ভবিষ্যৎদৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুধু একটা দৃশ্য আমি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট দেখছি। শুনবি তুই? শোনার সাহস আছে তোর?”

অভী বলল, “আছে। আপনি বলুন।”

দ্রষ্টাদেবীর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। “আমি তোর মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। ভয়াবহ মৃত্যু। আমি দেখছি, তুই পাশুপতকে জাগিয়ে তুলছিস – শিব যে অস্ত্রে জগৎ সংহার করেন, যে ভয়ংকর শক্তিকে কখনও জাগিয়ে তুলতে নেই, তাকেই প্রাণ দিচ্ছিস তুই। তাকে থামানোর ক্ষমতা গোটা বিশ্বে কারও নেই। ও অস্ত্র প্রলয়ের অস্ত্র – ও জাগলে সব সৃষ্টির বিনাশ।”

কাঁপতে কাঁপতে অভীর হাত ছেড়ে দিলেন তিনি। ওরা দু’জন কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এইসব ভয়ানক কথা শুনে দু’জনেই একটু বিপর্যস্ত বোধ করছে।

দেবী বললেন, “এবার ভাগ এখান থেকে। আর কিছু তোদের বলার নেই আমার।”

উর্মি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “অভী, চলো।”

অভীর বুক এখনও ধকধক করছে। কিন্তু তার মনে পড়ে গেল, একটা কথা দেবীর কাছে সে জানবে, ভেবে রেখেছিল। সাহস সঞ্চয় করে সে বলল, “আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে।”

“বল।”

“শেষমুখ সম্বন্ধে কী জানেন আপনি?”

দ্রষ্টাদেবী মৃদু হাসলেন। তাঁর এলোমেলো দাঁতের সারি স্পষ্ট দেখা গেল উর্মির হাতের আলোতে। “ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়, না রে উর্মি?”

উর্মি একটু চমকে উঠলেন। এ তো তাঁরই কথা। দেবী জানতে পেরে গেছেন!

তিনি আবার বললেন, “অভী, অন্ধ কি আর দেখতে পায়? যে জিনিস আমি দেখতেই পাই না, তার সম্বন্ধে বলব কী করে? যা, পালা এবার এখান থেকে।”

হাত নেড়ে পেছন ফিরলেন তিনি; পিছিয়ে গেলেন আলোর বৃত্তের বাইরে।

অন্ধকারটা ঘিরে ফেলল তাঁকে। উর্মি বললেন, “চলো অভী, ফেরা যাক। আর কিছু বলবেন না উনি।”

ওরা বেরিয়ে এল মন্দিরের দরজার বাইরে। আসতে আসতে অভী বুঝতে পারছিল, অন্ধকারটা দ্রুতবেগে গ্রাস করে নিচ্ছে ওদের ফেলে আসা পথটুকু। সঙ্গে আলোটা না থাকলে ওদেরকেও গিলে খেত ওই ভয়ানক জীবন্ত আঁধার।

অতি সাবধানে সেই সংকীর্ণ পাহাড়ি পথটা পেরিয়ে আবার আসতে হল। এবার অবশ্য অভীর অতটা অসুবিধা হল না। মাথার উপর তারা-ঝলমলে আকাশ; খোলা হাওয়ায় আবার শ্বাস নিতে পেরে তার ভালো লাগছিল।

ওরা যখন নেমে এল মোটামুটি নিরাপদ রাস্তায়, তখন অভী বলল, “শেষে উনি ওগুলো কী বললেন বলো তো? শেষমুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করতে কেমন যেন হেঁয়ালির মতো উত্তর দিলেন না?”

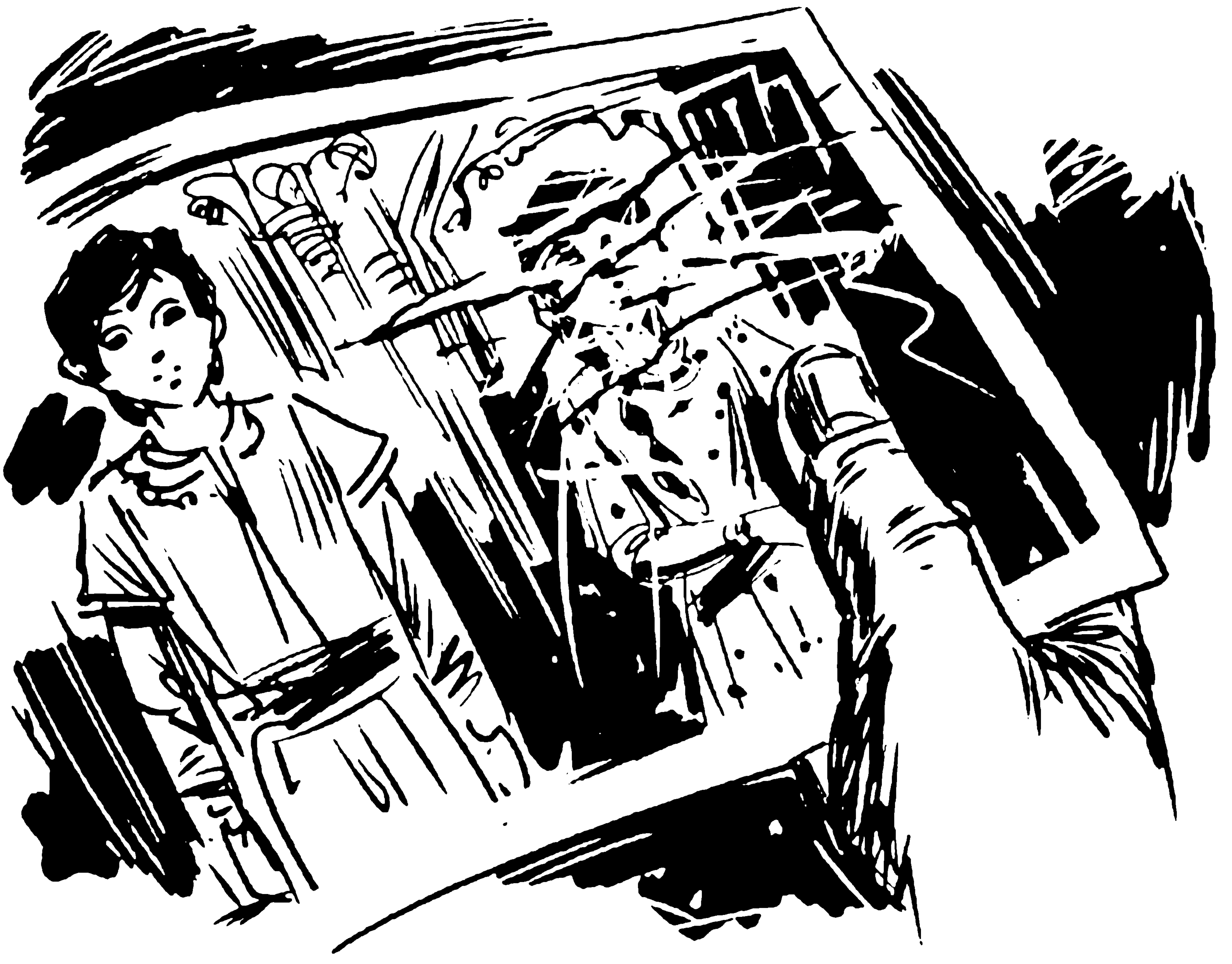
উর্মি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। “তার মানে, ওঁর পেছনে কী ছিল, তুমি খেয়াল করে দেখোনি? আমরা যখন পৌঁছাই, তখন উনি কী করছিলেন, তাও দেখোনি?”

অভী মনে করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে বলল, “মনে পড়ছে না।”

উর্মির চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। “অভী, আমরা যখন যাই, তখন উনি রুমাল সেলাই করছিলেন। সাদা, রেশমি রুমাল। ওঁর পেছনে ও জিনিস অন্তত কুড়ি-বাইশখানা লুকানো ছিল অন্ধকারে। তুমি দেখোনি, কিন্তু আমি দেখেছি।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “সত্যি? তার মানে শেষমুখ...?”

“হুঁ। এত বড়ো ঘটনাটা সমাপতন হতে পারে না। উনি জানেন, শেষমুখ কে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে ওঁর ভালোমতোই যোগাযোগ আছে।”



॥ নবম অধ্যায় ॥ বিদ্রোহ

সম্মেলন কক্ষে একা বসে নীলাদ্র ভাবছিল শেষমুখের কথা। মেঘবর্ণ তার শেষ চিঠিতে লিখেছিল এই ভয়ংকর খুনির বিষয়ে। কিন্তু তার কাজকর্ম তো সব মাল্যপর্বতেই সীমাবদ্ধ ছিল এতদিন। হঠাৎ সমরগরিমায় তার আবির্ভাব কেন?

এমন সময় হুড়মুড় করে ছুটে এলেন শ্যামশ্রী। “নীলাদ্র, অভী...!”

নীলাদ্র চমকে উঠল। “কী হয়েছে অভীর?”

শ্যামশ্রীর হাতে একটুকরো কাগজ। তিনি বললেন, “এই চিঠিটা এইমাত্র এক জটায়ু এসে দিয়ে গেল। খামের উপরে ‘সমরগরিমা আয়তন’ লেখা ছিল বলে আমি খুলেছিলাম। ভেতরে দেখছি, তোমাকে লেখা মেঘবর্ণের চিঠি। অভী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওদের বৈদ্য বলেছেন, প্রাণের আশংকা দেখা দিয়েছে ওর।”

নীলাদ্র হাঁ হয়ে গেল। “সে কী? কীভাবে?”

শ্যামশ্রীর মুখ শুকিয়ে গেছে ভয়ে। তিনি বললেন, “অভী গিয়েছিল দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে। সে-জায়গা আবার জীবন্ত আঁধারের বাসস্থান। ওখানে গিয়ে সম্ভবত একটু হলেও সেই আঁধারের স্পর্শ লেগেছিল ওর গায়ে। আর তারপর থেকেই ভুল বকছে ও; গা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, আর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মেঘবর্ণ লিখেছে, ওদের বৈদ্য বলছেন, অবস্থা সংকটজনক। নীলাদ্র, আমাকে যেতেই হবে।”

“তুমি যাবে?”

“যাব না? আমার ছেলেটা ওখানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, আর আমি যাব না? নিয়ামকের কথা ভাবছ? অনুমতি না দিয়ে ও যাবে কোথায়? চলো আমার সঙ্গে। দেখি ওর কত বড়ো ক্ষমতা!”

দু'জনে প্রায় ছুটে চললেন নিয়ামকের কার্যালয়ের দিকে। সকালের রোদ ঝলমল করছে, কিন্তু নীলাদ্র মনের মধ্যে কাজ করছে চাপা ভয়। শ্যামশ্রীর সামনে সেই ভয় সে প্রকাশ করতে পারছে না; কিন্তু খবরটা শোনার পর থেকে তারও বুকের মধ্যে ধুকপুকনি শুরু হয়ে গেছে।

অভীর যদি ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে যায়?

কার্যালয়ের সামনের কক্ষে বসে থাকা অসিতের দিকে তাকালেনও না শ্যামশ্রী; সোজা ঢুকে গেলেন নিয়ামকের কক্ষে। তাঁদের হঠাৎ ঢুকতে দেখে নিয়ামক যতটা না রেগে, তার থেকেও বেশি অবাক হয়ে বললেন, “এ কী? সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রী? হঠাৎ আপনি...?”

শ্যামশ্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল নীলাদ্র। নিয়ামকের পাশে সৌজন্যের মুখের হালকা হাসির আভাসটা তার নজর এড়াল না। শ্যামশ্রী বিনা ভূমিকায় কাজের কথায় চলে এলেন। “আমি এফুনি মাল্যপর্বত যাব। জরুরি দরকার। আপনার লিখিত অনুমতিপত্র চাই আমার। অভী অসুস্থ; আমাকে যেতেই হবে।”

নিয়ামক গম্ভীর মুখে বললেন, “এই সামান্য কারণের জন্য অনুমতিপত্র দেওয়া যাবে না।”

শ্যামশ্রী আজ অন্যরকম মেজাজে আছেন। তিনি বললেন, “সৌজন্য, তুমি তো সহনিয়ামক। নিয়ামককে সাহায্য করাই তোমার কাজ। তুমি দয়া করে ওঁকে বোঝাও, এতে লাভ ওঁরই হবে। আর যদি উনি না বোঝেন, তাহলে লাভ তোমার।”

নিয়ামক ভ্রূ কুঞ্জন করে বললেন, “মানে?”

“মানে এই, আমি বজ্রধর নই। অত নিয়ম কানুন – আজ আমি কিছু মানব না। আমার ছেলের বিপদ – আজ আমি সহঅধিনায়িকা হিসাবে নয়, অভীর মা হিসাবে অনুমতিপত্র চাইছি। সৌজন্য, ওঁকে বলো, ভালোয় ভালোয় কাগজটায় স্বাক্ষর করে আমার হাতে দিতে। যদি দেন, তাহলে কোনো চিন্তা নেই, আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব। আর যদি না দেন,” – কোমর থেকে টেনে তরবারি বার করে আনলেন তিনি – “তাহলে এই মুহূর্তেই ওঁকে কেটে দু'টুকরো করে তোমাকে ওঁর আসনে বসাব, আর তারপর তোমার সই নিয়ে মাল্যপর্বত যাব। রক্ত-টক্ত ছিটিয়ে এত সুন্দর ঘরটা নোংরা হবে জানি, কিন্তু তোমার উপর ভরসা আছে – তুমি ঠিক পরিষ্কার করিয়ে নিতে পারবে।”

নিয়ামক বুঝতে পারছেন, শ্যামশ্রী ফাঁকা হুমকি দিচ্ছেন না। তাও তিনি একবার মানরক্ষার শেষ চেষ্টা করলেন। “আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, সহঅধিনায়িকা?”

শ্যামশ্রী বাঘের মত গর্জন করে বললেন, “ভয় পাওয়াই তোমার জন্য ভালো। যদি নিজের মঙ্গল চাও, অপদার্থ, তো কাগজটায় সই করো।”

সৌজন্য এবার অবস্থা বেগতিক দেখে এগিয়ে এসে নিয়ামকের কানে কানে কী যেন বলল। নিয়ামকের মুখের ভাব তার কথা শুনে কোমল হয়ে এল। কথা না বাড়িয়ে একটা কাগজে খসখস করে কীসব লিখে তলায় সই করে তিনি বস্তুটা ধরিয়ে দিলেন সৌজন্যের হাতে। সৌজন্য লেখাটায় একবার চট করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল শ্যামশ্রীর দিকে।

“এই নিন আপনার অনুমতিপত্র।”

শ্যামশ্রী ওটা নিয়ে একবার পড়ে দেখে সম্ভ্রষ্টভাবে মাথা নাড়লেন।

নীলাদ্র তার স্ত্রীর এই রুদ্রমূর্তি দেখে একটু হাসল। শ্যামশ্রীকে এতখানি উত্তেজিত হতে সে দেখেনি আগে। কিন্তু তার অদ্ভুত লাগছিল, সৌজন্য কী এমন বলল নিয়ামককে যে উনি এত সহজে অনুমতিপত্রে সই করে দিলেন।

কাগজটা নিয়ে ওঁরা আবার ছুটতে ছুটতে ফিরলেন আয়তনের মূলভবনে। কোমরের তরবারিটাকে শক্তভাবে আটকাতে আটকাতে শ্যামশ্রী বললেন, “চিন্তা কোরো না, আমি থাকতে অভীর কোনো ক্ষতি হতে আমি দেব না।”

নীলাদ্র বলল, “আমি জানি। তুমি সাবধানে যেও। আমাকে ওখানে পৌঁছে সংবাদ দিও।”

শ্যামশ্রীর চোখে জল চলে এসেছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নীলাদ্রর হাতটা ধরে তিনি বললেন, “আমি চললাম। তুমি সাবধানে থেকো।”

নীলাদ্র একবার আলিঙ্গন করল তাঁকে; বলল, “থাকব। তুমি চিন্তা কোরো না, আমি এখানে সব সামলে নেব।”

শ্যামশ্রী ইতিমধ্যেই তাঁর জটায়ুকে আহ্বান করেছেন শঙ্খ বাজিয়ে। তার পিঠে উঠে পড়লেন তিনি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিশাল পাখিটা তাঁকে নিয়ে আকাশপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীলাদ্র ফিরে এল সম্মেলন কক্ষে। অভীর কথা ভাবলেই তার ভয় হচ্ছে। কী জানি ছেলেটা এখন কেমন আছে। সে নিজে একবার মাল্যপর্বতে যেতে পারলে ভালো হত, কিন্তু ওর মা গেছে মানে আরও ভালো হয়েছে।

সে জানে, শ্যামশ্রী স্বচক্ষে অভীকে না দেখলে মনে শান্তি পাবেন না।

চুপ করে বসে রইল সে। মেঘবর্ণের চিঠিটা পড়ে আছে সামনে। সেটাই তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল নীলাদ্র। সংক্ষিপ্ত লেখা – মাত্র কয়েক লাইন।

নীলাদ্র,

একটা দুঃসংবাদ দেওয়ার আছে। অভীর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। কাল ও গিয়েছিল দ্রষ্টাদেবীর গুহায়। সেখানেই সম্ভবত কোনোভাবে জীবন্ত আঁধার অঙ্গস্পর্শ করে ফেলেছে ওর। তুই তো জানিস, ও জিনিস যেকোনো প্রাণির মস্তিষ্কে অসীম ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। ওখান থেকে ফিরে আসার পরেই অভী কেমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে। সারা শরীর ঠান্ডা হিম হয়ে গেছে ওর; প্রলাপও বকছে। শ্বাসকষ্টও হচ্ছে ভীষণ। অসহায় লাগছে; কী করব, কিছু বুঝতে পারছি না।

মেঘবর্ণ

চিঠিটা পড়তে পড়তেই নীলাদ্রর কপালে ভাঁজ পড়ল। কোথায় যেন কী একটা গন্ডগোল আছে। কী যেন একটা মিলছে না, কী যেন একটা অন্যরকম লাগছে।

আরও একবার আদ্যোপান্ত পড়ল সে পুরোটা। এইবার পুরোটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে।

এ চিঠি আদৌ মেঘবর্ণ লেখেনি!

আফশোসে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছিল নীলাভ্র। এ চিঠি মেঘবর্ণের লেখা হতেই পারে না। কেন সে শ্যামশ্রী চলে যাওয়ার আগে অন্তত একবার পড়ে দেখেনি জিনিসটা?

নীলাভ্রকে চিঠি লেখার সময় মেঘবর্ণ সবসময় সম্বোধনে লেখে “নীল”, আর নিজের নামের জায়গায় লেখে “মেঘ”। যে হতভাগা এই নকল চিঠি পাঠিয়েছে, সে সবই জানে; মেঘবর্ণের হাতের লেখাও চমৎকার নকল করেছে। শুধু দুই বন্ধুর একদম ভেতরের এই কথাটুকু জানত না সে।

কিন্তু কেন? কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে এটা পাঠানোর?

একটু ভাবতেই উদ্দেশ্যটাও আন্দাজ করতে পারল সে। কেউ একজন চাইছিল, হয় শ্যামশ্রী নয়তো সে (বা দু’জনেই) সমরগরিমা আয়তন ছেড়ে যেন বাইরে যায়।

নীলাভ্র দ্রুত ভাবতে লাগল। কে হতে পারে এই ব্যক্তি? তাদের আয়তনের বাইরে পাঠিয়ে কার স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে? রাক্ষসদের কারও হতে পারে না; কারণ আরও একজন বা দু’জন সমরোত্তমকে নিজেদের দেশে টেনে এনে তাদের কোনো সুবিধা হবে না। তাহলে?

সমরোত্তমরা আয়তনে না থাকলে সবচেয়ে বেশি লাভ কার হবে?

পলকের মধ্যে উত্তরটাও এসে গেল মাথায়। নিয়ামক আর সহনিয়ামকেরই সোনায়ে সোহাগা, কারণ সমরোত্তমরা না থাকলে সুদক্ষিণসারির অর্ধরাক্ষসদের আক্রমণ করতে আর কোনো বাধা দেওয়ার মতো কেউ থাকছে না।

আইনও তখন নিয়ামকের পক্ষেই কথা বলবে। কোনো সমরোত্তম আয়তনে না থাকলে নিয়ামক সেনাবাহিনীকে নিজের মতো কাজে লাগাতে পারবেন। আর নিয়ন্ত্রণহীন নিয়ামক বিনীতেশ যে কীভাবে অর্ধরাক্ষসদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারেন, সে-কথা ভাবতেই শিউরে উঠল নীলাভ্র।

দেরি না করে সে চলল রক্ষীপ্রধানের খোঁজে। সৌভাগ্যবশত তাঁকে পাওয়া গেল নিয়ামকের কার্যালয়ের কাছাকাছিই। নীলাভ্র ডাকল, “রক্ষীপ্রধান, একটু শুনুন।”

রক্ষীপ্রধান মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন; নীলাভ্রকে দেখেই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। “আমাকে ডাকছেন, সমরোত্তম নীলাভ্র?”

“হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি। একটু কথা ছিল।”

ভয়ে ভয়ে চারপাশ দেখে নিলেন তিনি – সম্ভবত দেখলেন কেউ তাঁদের নজর করছে কিনা। নিয়ামকের কক্ষের বাইরের দিকের জানালা বন্ধ; সেখানে কারও না থাকারই কথা। তাও সাবধানতাবশত ওঁরা কার্যালয় থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলেন।

নীলাভ্র সরাসরি কাজের কথায় এল। “নিয়ামক আর সহনিয়ামক মিলে কী পরিকল্পনা করছেন, বলুন আমাকে।”

একটু ইতস্তত করছিলেন রক্ষীপ্রধান; নীলাভ্র বলল, “আমাকে লেখা মেঘবর্ণের চিঠিটা নিয়ামকের কার্যালয় থেকেই পাঠানো হয়েছিল, না?”

তাঁকে মুখ নামিয়ে চুপ করে থাকতে দেখে নীলাভ্র আবার বলল, “বক্রপুচ্ছের কথাটা মনে আছে তো আপনার?”

আর বলতে হল না, গড়গড় করে সব কথা স্বীকার করে ফেললেন রক্ষীপ্রধান। “বলছি, বলছি। হ্যাঁ, ও চিঠি নিয়ামকের ওখান থেকেই গেছে।”

“কেন? সুদক্ষিণসারিতে আবার যাচ্ছেন আপনি সেনা নিয়ে?”

রক্ষীপ্রধান মাথা নাড়লেন। “নিয়ামকের আদেশ। হঠাৎ করে আক্রমণ করলে ওরা দিশাহারা হয়ে যাবে, প্রতিরোধ করতে পারবে না। সমরোত্তমদের মধ্যেও কেউই নেই – আপনি ছাড়া। শুধু সেনা নিয়ে যাওয়াই নয়, আমাদের উপর আদেশ আছে, ওই বিদ্রোহী নেতাদের বন্দি করে আনতে হবে। বন্দি করা না গেলে তাদের মৃতদেহ নিয়ে আসতে হবে। আর...”

“আর?”

“আর যারা বাধা দেবে, তাদের নির্বিচারে হত্যা করতে হবে।”

সে যে কতখানি স্তম্ভিত হয়ে গেছে, নীলাভ সেটা রক্ষীপ্রধানকে বুঝতে দিল না। বিনীতেশ কি হিংস্র পশুতে পরিণত হয়েছেন?

সে জানতে চাইল, “কখন নির্ধারিত হয়েছে আক্রমণের সময়?”

“সূর্যাস্তের পরেই।”

“যান তাহলে। দেখা হবে তখন।”

রক্ষীপ্রধান অসহায়ভাবে বললেন, “আমি আপনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ চাই না, সমরোত্তম নীলাভ। কিন্তু আমার প্রভু আমাকে যা আদেশ দেন, তা পালন না করলে আমার চাকরি থাকবে না।”

নীলাভ বলল, “আপনার চাকরি রক্ষার জন্য আমি কি কয়েকজন নিরপরাধ অর্ধরাক্ষসের প্রাণ নিতে পারি আপনাদের? আপনিই বলুন না? আপনি আপনার কর্তব্য করবেন, আমি আমার কর্তব্য করব। তারপর যা হয়, দেখা যাবে।”

রক্ষীপ্রধান একটু মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন। নীলাভ দেরি না করে চলল অনুশীলন মঞ্চের দিকে।

সন্দীপ আর ঊষসী দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। তাদের দেখে সে বলল, “যতজনকে পাও, এক্ষুণি ডেকে আনো এখানে। জরুরি দরকার। মৃগেন্দ্রকেও খবর দিও।”

ওরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল, দরকারটা কী বিষয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা এসে উপস্থিত হল অনুশীলন মঞ্চে।

অল্প কথায় ওদের পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিল নীলাভ। “আজ বিকেলে সূর্যাস্তের পর সুদক্ষিণসারি অভিযান স্থির করেছেন নিয়ামক মহোদয়। সেনাবাহিনীর উপর আদেশ থাকবে বিদ্রোহী নেতাদের জীবিত বা মৃত ধরে নিয়ে আসার। একই সঙ্গে, কেউ যদি বাহিনীকে বাধা দেয়, তাদেরকেও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন নিয়ামক।”

ক্রুদ্ধ গুঞ্জে ভরে উঠল জমায়েতটা। নীলাভ বলল, “এই মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য, সুদক্ষিণসারিতে সবাইকে সাবধান করে দেওয়া। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে রক্তপাত এড়ানো যায়, কিন্তু ওখানে অর্ধরাক্ষসদের, বিশেষত যাঁরা গতবার নিয়ামক-বিরোধী আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সতর্ক থাকতেই হবে।”

মৃগেন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেছে। সে বলল, “আমার বাবার উপরে নিয়ামক ভীষণ রেগে আছেন। বাবাকে যদি একবার উনি হাতের মুঠোয় পান, তাহলে আর ছাড়বেন না।”

নীলাভ বলল, “জানি। তোমার বাবাসহ আর যারা নেতা ছিলেন, সবাইকেই বিশেষভাবে সাবধান করা প্রয়োজন। আজকের অভিযানের মূল লক্ষ্য কিন্তু তাঁরাই।”

সন্দীপ বলল, “সমরোত্তম সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রী কোথায়? তিনি কী বলছেন এই আক্রমণ ঠেকানো নিয়ে?”

নীলাভ জানত, এ প্রশ্ন আসবে। সব ঘটনা শিক্ষার্থীদের সামনে খুলে বলা সে সমীচীন মনে করল না; বলল, “তাঁকে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে হয়েছে। আপাতত আয়তনের দায়িত্বে আমিই আছি।”

মৃগেন্দ্র বলল, “সমরোত্তম নীলাভ, আমি একবার সুদক্ষিণসারি যেতে চাই এখনই। বাবাকে এবং সেই সঙ্গে বাকি নেতাদের সাবধান করে দিয়ে আসতে চাই আমি।”

নীলাভ বলল, “না, তুমি যেও না। তোমার উপর সবচেয়ে বেশি নজর থাকে নিয়ামকের। তরুণ, তুমি তো নীপার সঙ্গে দেখা করতে মাঝেমধ্যেই সুদক্ষিণসারি যাও, না?”

তরুণ একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ।”

“তাহলে তুমিই যাও। তোমার যাওয়াটা কম সন্দেহের উদ্রেক করবে নিয়ামকের চরদের মধ্যে। যদিও জেনে রাখো, তোমার একটি অর্ধরাক্ষস মেয়েকে ভালোবাসাটা নিয়ামক ভালো চোখে দেখছেন না নিশ্চয়। তাও বলব, তুমিই যাও। নীপার সঙ্গেও দেখা করে এসো, আর তার বাবা দিঙনাগকে বলে এসো, তিনি যেন সংকটমূহুর্তে মাথা ঠান্ডা রাখেন।”

তরুণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। নীলাভ বলল, “তুমি যাও। ফিরে এসে আমাকে জানাবে, কী হল ওখানে। আমি সম্মেলন কক্ষে থাকব। এই বিষয়ে আর কারও সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। মনে থাকবে?”

তরুণ বলল, “থাকবে।”

সে চলে গেল সুদক্ষিণসারির পথে। সন্দীপ জিজ্ঞাসা করল, “সমরোত্তম নীলাভ, এই ব্যাপারটা নিয়ে কি আমরা খোদ নিয়ামকের সঙ্গেই একটা আলোচনায় বসতে পারি না?”

নীলাভ বলল, “একদম নয়। তাহলে এই যে গোপন খবরগুলি পাওয়া যাচ্ছে, এর উৎসটাই বন্ধ হয়ে যাবে। নিয়ামক বা সহনিয়ামককে একেবারেই জানতে দেওয়া যাবে না যে আমরা ওঁদের পরিকল্পনা জেনে গেছি। যাঁর কাছ থেকে আমি সংবাদ পেয়েছি, তিনিও অনর্থক বিপদে পড়বেন।”

কিছুক্ষণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওদের সাহস দিয়ে নীলাভ ফিরে এল সম্মেলন কক্ষে। সে ভাবছিল, কী ধূর্ত এই সহনিয়ামক সৌজন্য। এই নকল চিঠির পরিকল্পনা করার মতো বুদ্ধি নিয়ামক বিনীতেশের নেই। এ নির্ঘাত ওই ব্যাটারই কীর্তি।

আচ্ছা, মাল্যপর্বতে অভীর ব্যাপারে এত খুঁটিনাটি খবর সৌজন্য পেল কী

করে? পুরোটাই কি ওর কল্পনাপ্রসূত?

বেশ কিছুক্ষণ পরে তরুণ এসে দাঁড়াল দ্বারের সামনে। তাকে দেখে নীলাভ হাতের ইশারায় কাছে ডাকল।

“কী খবর বলো।”

তরুণ বলল, “মোটামুটি সবাইকে সাবধান করে এলাম। ওরা বেশ ভয় পেয়ে গেছে। নিধির মা তো ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন দেখলাম। আমার হাত ধরে বললেন, ‘আমার বড়োমেয়ে তো সমরগরিমা আয়তনের ছাত্রী; শর্বরের বিরুদ্ধে দারুণ লড়াই করেছিল সে। সমরোত্তমরাও আমাদের ভালোবাসেন। আমার মেয়ে তো প্রলয়যোদ্ধারও বন্ধু। এতকিছুর পরেও আয়তন আমাদের মারার জন্য সেনা পাঠাচ্ছে?’ সে-কথা শুনে নিধির বাবা বললেন, ‘আমরা অর্ধরাক্ষস; আমাদের মারার জন্য ওইটুকুই যথেষ্ট অজুহাত; বুঝেছ?’”

নীলাভ বলল, “তুমি কী বললে?”

তরুণ বলল, “আমি বললাম, ‘আয়তন সেনা পাঠাচ্ছে না, মাসিমা; পাঠাচ্ছেন নিয়ামক।’ সমরোত্তমরা যে আমাদের পক্ষেই আছেন, সেকথাও বললাম।”

“আর বাকিরা?”

“মৃগেন্দ্রের বাবার সঙ্গেও কথা হল। উনি অবশ্য খুব একটা ভয় পাননি। উনি বললেন, ‘সমরোত্তম নীলাভের উপর আমার ভরসা আছে। অবস্থা বেগতিক হলে উনি ঠিক সামলে দেবেন।’”

নীলাভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। “ঠিক আছে, তরুণ। এবার তুমি যাও। আমি একটু ভেবে দেখি, কী করা যায়।”

তরুণ নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। নীলাভ তার পুরোনো চিত্তার সূত্রটা নিয়ে আবার ভাবতে লাগল।

নিয়ামক বিনীতেশ নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক হতে পারেন, কিন্তু মাথায় তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে, এ অপবাদ তাঁর অতি বড়ো শত্রুও দেবে না। মেঘবর্ণের নাম করে নকল চিঠি পাঠানোর চালাকি তাঁর মস্তিষ্ক থেকে বেরতেই পারে না। এ কাজ সৌজন্য ছাড়া আর কারও হওয়া একান্তই অসম্ভব। কিন্তু তার কী স্বার্থ থাকতে পারে এর পেছনে? অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে শত্রুতা করে কীই বা ব্যক্তিগত লাভ হবে তার?

নীলাভের মনে হল, সৌজন্য যেন এইভাবে নিয়ামককে দিয়ে একটা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে তুলতে চাইছে সমরগরিমাতে। কিন্তু কেন? আর নিয়ামক এই উন্মাদ পরামর্শ গুনছেনই বা কেন?

মনস্থির করে উঠে দাঁড়াল সে। লোকটার আসল পরিচয় যতদিন না জানা যাচ্ছে, ততদিন এই ধোঁয়াশা কাটবে না।

এই সময়টা সৌজন্য থাকে নিয়ামকের কার্যালয়ে। ওর ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো এই সুযোগে নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে, সেখানে ওর পরিচয় কিছু পাওয়া যায় কিনা।

দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল নীলাভ। সূর্যাস্তের আগে সুদক্ষিণসারি আক্রমণ করতে যাচ্ছে না নিয়ামকের সৈন্যরা। বেশ কিছুটা সময় আছে হাতে। এই সময়টুকুতে একবার ওর বাসস্থানে তদ্বাশি চালিয়ে দেখলে বোঝা যেতে পারে,

মৎস্যটির বাস জলের কতটা গভীরে।

সহকারী নিয়ামকের কার্যালয়ের সামনের কক্ষে একজন সহায়ক থাকত আগে; সৌজন্য আসার পর থেকে সে আর থাকে না। আগের সহকারী নিয়ামক নারদ অনেক বেশিক্ষণ থাকতেন নিজের কার্যালয়ে; কিন্তু সৌজন্য যে প্রায় সবসময় নিয়ামক বিনীতেশের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, এটা শ্যামশ্রী একবার বলেছিলেন তাকে। নীলাভ্রর অবশ্য তাতে আপত্তির কিছু নেই। সৌজন্য নিজের বাসস্থানে বেশি থাকে না, এই ভালো; সে থাকলে তো আর নির্বিবাদে তার জিনিসপত্রের খানাতল্লাশি চালানো যেত না।

সহকারী নিয়ামকের কার্যালয়ের সামনে তালা ঝুলছে। নীলাভ্র এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। তালা ভাঙলে সৌজন্য বুঝে ফেলবে, কেউ এসেছিল। কে এসেছিল, দুই আর দুইয়ে চার করে নিতে ওর মতো ধূর্তশিরোমণির বেশি সময় লাগবে না।

কার্যালয়ের পেছন দিকে গেল সে হাঁটতে হাঁটতে। সারি সারি প্রশস্ত আয়তাকার জানালাগুলির কোনোটিতেই গরাদ নেই, কিন্তু ভেতর থেকে অর্গল বন্ধ করা আছে। একটাকে যদি খোলা যেত কোনোভাবে, তাহলে ঢুকে পড়তে অসুবিধা হত না।

নীলাভ্র এগিয়ে এসে একটা জানালার কাঠের পাল্লা ঠেলল ভেতর দিকে। না, বন্ধ আছে। লোহার হুড়কো দিয়ে আটকানো আছে ভেতর থেকে। পাল্লাদুটোর মাঝখানটা সামান্য ফাঁক হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল বটে, কিন্তু খুলল না। একটা মানুষ দূরের কথা, একটা টিকটিকিও গলবে না ওইটুকু ফাঁক দিয়ে। হুড়কোটা খুলতে না পারলে কোনো উপায় নেই।

একটু ভাবল সে; একটা বুদ্ধি মাথায় আসছে। যদি এইভাবে...

পাল্লাদুটোর ফাঁক দিয়ে লোহার হুড়কোটার যেটুকু দৃশ্যমান হচ্ছে, সেইদিকে ডানহাতের তর্জনী তুলে মনঃসংযোগ করল নীলাভ্র। শরীর দুর্বল - এই মায়া প্রয়োগ করতে গেলে আরও দুর্বলতা বাড়বে, সে জানে। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই।

আঙুলের অগ্রভাগ থেকে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এল বরফের একটা সূক্ষ্ম ধারা; সেই বরফের রেখা গিয়ে স্পর্শ করল দুটো পাল্লার মাঝের সরু ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান হুড়কোটাকে। তার ধাতব গায়ে আটকে রইল জমাট বরফের লম্বা, নাতিপ্রশস্ত অংশটা একটা হাতলের মতো। এবার আস্তে আস্তে হাতলটাকে ধরে উপর দিকে ঠেলল নীলাভ্র। হুড়কোটা খুলে গেল নিঃশব্দে।

কপালের ঘাম মুছে আপনমনেই একটু হাসল সে। মাথাটা একটু ঘুরছে বটে, কিন্তু ওটুকু সে সামলে নিতে পারবে।

জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে অবশ্য আদৌ অসুবিধা হল না। ঘরের ভেতরটাতে আলো খুব বেশি নেই; কেবল এই খোলা জানালাটুকু দিয়ে যেটুকু আসছে, সেইটুকু। জানালাটাকে খুলে রাখতে খুব একটা সাহস হচ্ছিল না তার। যদি সৌজন্য এসে পড়ে, দূর থেকেই দেখতে পেয়ে যাবে, জানালা খোলা।

সামান্য ফাঁক রাখল সে পাল্লাদুটোর মধ্যে, যাতে ঘরের ভেতরটা একটু হলেও দেখা যায়। তারপর সে অনুসন্ধান শুরু করল সৌজন্যের জিনিসপত্রের মধ্যে।

ঘরটি মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাকের উপর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা আছে কাগজপত্র। সেগুলো নামিয়ে একবার উলটে পালটে দেখে নিল নীলাদ্র। না, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ছে না। খাতাপত্র খুলে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল সে। নিতান্তই সাধারণ হিসাবপত্র লেখা আছে; সবই আয়তনের কাজের জিনিস; তার ব্যক্তিগত কিছু নেই। কয়েকটা বই আছে। সেগুলোর সবকটাই সমরগরিমার গ্রন্থাগার থেকে আনা। বিষয় সবগুলোরই এক – নরকগহ্বর, তার নদী, নরক-সংক্রান্ত মায়াবিদ্যা। একটু অবাক হল নীলাদ্র। এইসব অদ্ভুত বিষয় পড়ে কী লাভ লোকটার?

জামাকাপড় খুব বেশি না হলেও খুব কমও নেই। সেগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখে নীলাদ্র রেখে দিল। ওখানে খুঁজে লাভ নেই। সৌজন্য যদি কিছু লুকিয়ে রাখতে চায়, সবার চোখের সামনে ফেলে রাখার মতো বোকা সে নয়।

ঘরটা অন্ধকার-অন্ধকার হয়ে আসছে। নীলাদ্র জানালার ঈষৎ খোলা ফাঁকটা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশে মেঘ করছে। বৃষ্টি হবে নাকি রে বাবা?

একবার শয্যার তলায় দেখা যাক, কিছু আছে কিনা। এই ভেবে মাথার দিকের তোশক উলটে দেখতেই ছবিটা এসে পড়ল মাটিতে।

হাতে তুলে নিল সে জিনিসটাকে। একটা ছোট্ট হাতে আঁকা রঙিন ছবি। যে-ই এঁকে থাকুক, খুবই দক্ষ হাতের আঁকা। কিশোর বয়স্ক দুটি ছেলে মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটি নিঃসন্দেহে কমবয়সের সৌজন্য। আর মেয়েটি...

তাকে দেখে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল নীলাদ্রের। ছবিতে মেয়েটির মুখটা যেখানে থাকার কথা, সেই জায়গায় ছুরির মতো কোনো ধারালো জিনিস দিয়ে বারবার আঘাত করে কাগজটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মুখটা বোঝার কোনো উপায় নেই মেয়েটির।

নীলাদ্র অবাক হয়ে ভাবছিল, কে এই মেয়ে, আর কেনই বা তার ছবির উপর এ হেন নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে সৌজন্য। দেখতে দেখতে সে চিনতে পারল আরও একটা জিনিস।

বাচ্চা ছেলেমেয়েদুটো দাঁড়িয়ে আছে যে জায়গায়, সেই জায়গাটা। এ রক্ষোপুরী না হয়ে যায় না। ওখানে সে গিয়েছিল আগে; ওদের দেশের শিল্পের ধাঁচ তার চেনা। দেয়ালে বাচ্চাদুটোর পেছনে রাক্ষসশিল্পের ঢঙে আঁকা ছবি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কিশোর সৌজন্য রাক্ষসদের রাজপ্রাসাদে কী করতে গিয়েছিল?

তোশকের তলাটা সে আরেকবার ভালো করে দেখতে যাবে আরও কোনো মূল্যবান বস্তুর সন্ধান, ঠিক তখনই তালা খোলার শব্দ হল কক্ষের বাইরের প্রধান দ্বারে। নীলাদ্র ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল।

সৌজন্য এসে পড়েছে!

সর্বনাশ! যেভাবেই হোক লুকিয়ে পড়তে হবে। ও তাকে এখানে দেখে ফেললে বিপদ হয়ে যাবে।

রীতিমতো আতঙ্কিত চোখে এদিক ওদিক দেখতে লাগল মরিয়া নীলাদ্র। ওদিকে প্রধান প্রবেশদ্বারের তালা খুলে ফেলেছে সৌজন্য – আসছে সে এই

কক্ষের দিকে। তার পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। কোথায় লুকোনো যায়?
একটা ভালো আড়ালও ছাই চোখে পড়ছে না!

আওয়াজটা থামল এই বন্ধ দরজার সামনে। এই ঘরেরও তালা খুলছে
সে।

হাতের ছবিটাকে বিদ্যুৎগতিতে শয্যার তলায় যথাপূর্বং রেখে দিয়ে বড়ো
একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়ল নীলাভ। পরক্ষণেই
দ্বার খুলে এসে ঢুকল সৌজন্য।

নীলাভ নিশ্বাস বন্ধ করে আছে। এখান থেকে সে দেখতে পাচ্ছে সৌজন্যের
পা দুটো; সেগুলো এগিয়ে যাচ্ছে একটুখানি ফাঁক হয়ে থাকা জানালাটার দিকে।
নীলাভ বুঝতে পারছে, জানালা খোলা দেখে সন্দেহ করতে পারে সৌজন্য; যখন
সে এই ঘর ছেড়ে গিয়েছিল, তখন সে যে জানালা খুলে রেখে যায়নি, এটা
নিশ্চয় সৌজন্যের মতো সাবধানী লোকের মনে আছে।

আচ্ছা, হড়কোর সঙ্গে লেগে থাকা বরফের সরু হাতলটা কি এখনও
আছে?

নীলাভ দেখতে লাগল, সৌজন্যের পা দুটো থেমে আছে জানালার সামনে।
ঝুঁকে পড়েছে সে; বসেছে হাঁটু মুড়ে; মাটিতে স্পর্শ করল তার হাত।

নীলাভর বুক দূরদূর করতে লাগল। সৌজন্য কি মাটিতে গুয়ে পড়ে
দেখতে চাইছে শয্যা বা টেবিলের তলায় কেউ আছে কিনা?

না, ওই যে তার হাতের আঙুলগুলো মাটিতে পড়ে থাকা কী একটা
জিনিসকে ছুঁল। দেখেই নীলাভ বুঝতে পারল বস্তুটা কী।

জল!

হড়কোর সঙ্গে লেগে থাকা বরফটা গলে গিয়ে একটুখানি জল জমেছে
খোলা জানালার সামনে মেঝেতে। নীলাভ আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রইল। সৌজন্য
কি বুঝতে পারবে এর মানে?

পাগুলো আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার হাঁটছে ও। এদিকেই
আসছে। দাঁড়িয়েছে শয্যার পাশে। টেবিলের ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পা
দুটো। ও কি কিছু সন্দেহ করেছে? ও কি নীচু হয়ে দেখবে তলায় কেউ আছে
কিনা? যদি দেখে, একেবারে মুখোমুখি হয়ে যেতে হবে। বুঝে ফেলল নাকি
জানালার সামনে জলের ব্যাপারটা? মনে হচ্ছে যেন ঝুঁকছে ও সামনের দিকে।
সর্বনাশ! সর্ব...

“সহকারী নিয়ামক মহোদয়।”

আহ্বানটা এল কক্ষের দরজার সামনে থেকে। পা দুটো পিছিয়ে গেল
নীলাভর লুকিয়ে থাকা জায়গার সামনে থেকে।

আগন্তকের কণ্ঠস্বর চেনা চেনা লাগল তার। সৌজন্যের কথা শুনে সে
চিনেও ফেলল লোকটাকে।

সৌজন্য বলল, “কী ব্যাপার, অসিত?”

অসিত বলল, “নিয়ামক মহোদয় আপনাকে স্মরণ করেছেন। জরুরি
দরকার।”

একটু বিরক্ত কণ্ঠে সৌজন্য বলল, “ওঃ, এইমাত্র তো এলাম ওঁর কাছ

থেকে। আবার কী জরুরি দরকার পড়ল?"

অসিত কোনো উত্তর দিল না। সৌজন্য নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "একবার গ্রন্থাগারে যাব ভাবছিলাম, সে আর হল না। যাক গে, চলো, দেখা যাক।"

দ্বার বাইরে থেকে আবার তালা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল সে। নীলাভ কয়েক মুহূর্ত বসে রইল ওখানেই; কপাল থেকে ঘাম মুছে এতক্ষণের চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটা 'ফোঁস' করে ছাড়ল সে।

তারপর আর দেরি না করে তোশকের তলা থেকে ছবিটা বার করে সেটাকে পোশাকের মধ্যে গুঁজে নিয়ে সে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে নামল। জানালাটা সৌজন্য ভাগ্যিস বেরনোর আগে লাগিয়ে যায়নি, নয়তো আবার অনেক কসরত করতে হত।

বাইরে এসে সে একবার দেখে নিল সৌজন্য বা অসিতকে ধারেকাছে দেখা যাচ্ছে কিনা। না, কেউ নেই। বৃকের মধ্যে এখনও উত্তেজনায় দুম দুম শব্দ হচ্ছে তার। একটা বড়ো ধরনের ঝামেলা অল্পের জন্য এড়ানো গেছে।

ছবিটা নিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে সে এসে পৌঁছল আয়তনে; রক্ষোবৈদ্যকে ডেকে বলল, "আমার সঙ্গে সম্মেলন কক্ষে একবার আসুন তো।"

রক্ষোবৈদ্য তার মুখের ভাব দেখেই বুঝেছিলেন, গুরুতর ব্যাপার কিছু একটা আছে। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি তার পিছু পিছু এসে হাজির হলেন সম্মেলন কক্ষে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে নীলাভ ছবিটা তাঁর হাতে তুলে দিল।

"কী বুঝছেন, বলুন এবার।"

"এ তো সৌজন্য দেখছি! কোথায় পেলেন এ জিনিস?"

"একদম বাঘের গুহায়। জায়গাটা দেখুন তো। মাল্যপর্বতে রাক্ষসদের প্রাসাদ মনে হচ্ছে না পেছনের দেয়ালের ছবিগুলো দেখে?"

রক্ষোবৈদ্যের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। "নীলাভ।"

"কী?"

"এটা শুধু রাক্ষসপ্রাসাদ নয়, এটা আমার পুরোনো সেবাকক্ষ। এই বাচ্চা মেয়েটা যে কে, তা আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু এই ঘরটা আমার খুব চেনা। এই ঘরে দাঁড়িয়ে ওরা দু'জন এই ছবিটা আঁকিয়েছে শিল্পীকে দিয়ে। আমি যখন ওখানে থাকতাম, এই ঘরটাতেই রোগীদের সেবার ব্যবস্থা করেছিলাম।"

নীলাভ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার মানে সৌজন্যের সঙ্গে রাক্ষসদের ভালোই যোগাযোগ ছিল একসময়। বা, এখনও আছে হয়তো। সেই কারণেই সবার সামনে আত্মপরিচয় দিতে ওর এত আপত্তি।

ব্যাটা রক্ষোপুরীর গুপ্তচর নাকি?

বিকেল থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল সুদক্ষিণসারির অর্ধরাক্ষসরা। আয়তনের মানুষ ছাত্রছাত্রীরাও তাদের বন্ধুদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যোগ দিয়েছিল প্রতিরোধ বাহিনীতে। নীলাভ ছিল একদম সামনে; তার নির্দেশে রথীন্দ্র, সুহাসদের মতো নেতাদের ঘিরে রেখেছিল বেশ কিছু অস্ত্রধারী অর্ধরাক্ষস। আজকের সেনা

অভিযানের লক্ষ্য এই নেতারা - নিয়ামক যেকোনো মূল্যে তাদের ধরে নিয়ে যেতে চান।

মনে মনে নীলাভ চাইছিল রক্ষীপ্রধানকে ভয় দেখিয়ে বা অন্য যেকোনোভাবে ফেরত পাঠাতে। একবার যদি সংঘর্ষ লাগে, তাহলে কত রক্ত যে ঝরবে! আর নিজেদের মধ্যে এই মারামারিতে সুবিধা পাবে বাইরের শত্রু রাক্ষসরা। এই সহজ সত্যটা বিনীতেশ কেন যে বোঝেন না, কে জানে!

নীলাভ নিশ্চিত, রাক্ষসরা এখানের সব খবরই রাখে। তারা যদি বোঝে, সমরগরিমার লোকেরা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করবে।

একটাই ভরসার কথা, রক্ষীপ্রধান তাকে ভয় পান। সেনাবাহিনীর লোকেদেরও একটা শ্রদ্ধা আছে সমরোত্তমদের প্রতি। এইটুকু কাজে লাগিয়ে যদি আজকে কিছু করা যায়।

সমরগরিমার সশস্ত্র বাহিনী যখন এসে পৌঁছোল, তখন বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামতে চলেছে। অর্ধরাক্ষস প্রতিরোধ বাহিনীর সামনে ছিল মৃগেন্দ্র আর তরুণ। তারা চিৎকার করে বলল, “আপনারা ফিরে যান। সুদক্ষিণসারিতে ঢোকার অনুমতি নেই আপনাদের।”

রক্ষীপ্রধান এগিয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে এল আর একটা লোক। একেও নীলাভ চেনে, কিন্তু নামটা জানে না। লোকটার চোখমুখে কুটিলতার ছাপ স্পষ্ট। দু’জনেরই কোমরে ঝুলছে তরবারি।

রক্ষীপ্রধান বললেন, “সমরোত্তম নীলাভ। আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।”

নীলাভ এগিয়ে গেল। রক্ষীপ্রধান বললেন, “নিয়ামক ও সহনিয়ামক দু’জনেই আমাকে বলেছিলেন যে আপনি আমাদের পথ রোধ করবেন, আর আমিও জানতাম, তাই হবে। আপনি জানেন, আপনার সঙ্গে সম্মুখসমরে আমার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, অনর্থক লোকক্ষয় করার ইচ্ছাও আমার নেই। কিন্তু আমার উপরে আদেশ আছে, রথীন্দ্র, নির্মল, সুহাস, দিগ্‌নাগ – এই অর্ধরাক্ষস নেতাদের ধরে নিয়ে যেতে হবে। এবার আপনি বলুন আমার কী করা উচিত।”

নীলাভ বলল, “ফিরে যান। ফিরে গিয়ে নিয়ামককে বলুন, এইধরনের কাজ আমরা সমরগরিমায় করিনা। আমরা আমাদের নাগরিকদের সুরক্ষা দিই; তাদের বিনাবিচারে শূলে চড়ানোর জন্য ধরে নিয়ে যাই না।”

রক্ষীপ্রধান অসহায়ভাবে বললেন, “সে-কথা আপনারা বলতে পারেন ওঁর মুখের উপর। কিন্তু আমরা? আমরা বেতনভুক কর্মচারী – আমাদের পক্ষে প্রভুর মুখের উপর এরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলা সম্ভব কি?”

এইবার পাশের লোকটা মুখ খুলল; ককর্শকণ্ঠে সে বলল, “এত কথার দরকার কী? আপনি সৈনিক – সৈনিকের মতো কাজ করুন, রক্ষীপ্রধান। আমাদের অভিযানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এমন লোকের কথায় কান দিয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন আপনি?”

নীলাভ চোখ সরু করে তাকাল তার দিকে। “ওহে সৈনিক, আরেকটু মার্জিতভাবে কথা বলা শিখতে হবে তোমাকে। তোমার চেয়ে পদমর্যাদায় বড়ো

দু'জন ব্যক্তি যখন কথা বলছেন, তখন কথা বলার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখতে হয়, বাহিনীর এই প্রাথমিক সহবংশিক্ষাটুকুও হয়নি দেখছি তোমার।”

লোকটা ফস করে কোমর থেকে তরবারি বার করে নীলাভ্রর কাঁধের পাশ দিয়ে গলায় ঠেকাল। রক্ষীপ্রধান আতঙ্কিত হয়ে চোঁচিয়ে উঠলেন, “ওটা নামাও বলছি, চক্রবাক। এফুনি নামাও।”

নীলাভ্র হেসে উঠল। “আঃ, রক্ষীপ্রধান, থামুন না। অনেকদিন এমন মজা পাইনি। ও যা করছে, করতে দিন ওকে।”

অর্ধরাক্ষসরা উদ্যত করেছে তাদের অস্ত্র – নীলাভ্র এতটুকু আহত হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা। নীলাভ্র তরুণের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল আক্রমণ না করতে, তারপর তাকাল চক্রবাকের দিকে। তরবারি না সরিয়ে চক্রবাক বলল, “রক্ষীপ্রধান, এই লোকটাকে খামোকা ভয় পাওয়ার কী আছে? এ একসময় যা ছিল, এখন আর তা নেই – দুর্বল হয়ে পড়েছে। সহনিয়ামক আমাকে বলেছেন, অবস্থা এতটাই খারাপ যে, এ এখন রক্ষাবৈদ্যের কাছ থেকে শক্তি-পুনরুদ্ধারের ওষুধ খাচ্ছে। এই বুড়োটাকে এত ভয় পাওয়ার কী আছে?”

রক্ষীপ্রধান বললেন, “তোমাকে অত কিছু ভাবতে হবে না। তুমি সরে এসো ওখান থেকে। তরবারি নামাও।”

চক্রবাক বলল, “এত কাপুরুষ আপনি? নিয়ামক, সহনিয়ামক – কেউ আপনার উপর প্রীতি নন, রক্ষীপ্রধান; এই কথাটা জেনে রাখুন আপনি। আমি বরং এর মুণ্ডটা নামিয়ে দিচ্ছি; একটা ঝামেলাবাজ সমরোত্তম বিদায় হলে নিয়ামক মহোদয় খুশিই হবেন।”

নীলাভ্র বলল, “আর ঝামেলাবাজ সমরোত্তম নীলাভ্রটা বিদায় হলেই তোমার পদোন্নতি পাকা, তাই না, চক্রবাক?”

চক্রবাক কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নীলাভ্র পলকের মধ্যে নিজের তরবারি বার করে আঘাত করল তার তরবারির ফলকের নীচের দিকে। এত দ্রুত কাণ্ডটা ঘটে গেল যে কেউ কিছু বোঝার আগেই দেখা গেল, চক্রবাক হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে; তার হাতে ধরা একটা ভাঙা তরবারির আধখানা, আর নীলাভ্র তরবারি ঠেকিয়ে রেখেছে তার বুকে। অর্ধরাক্ষসরা হা হা করে হেসে উঠল।

ভয়ে, অপমানে মাথা নীচু করে আধখানা তরবারি ধরে পিছিয়ে গেল চক্রবাক।

নীলাভ্র বলল, “তোমাকে আমি এবারের মতো ছেড়ে দিচ্ছি, সৈনিক, কারণ আমার ধারণা, তোমার বাড়িতে তোমার জন্যও কেউ অপেক্ষা করে আছে। তাছাড়া সমরগরিমার পক্ষের লোকেদের প্রাণ নিতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। পরেরবার তুমি যদি ভুলে যাও, তুমি কার পক্ষে লড়াই করতে নেমেছ, তাহলে কিন্তু বিপদ তোমারই হবে, এ কথা আমি এখন থেকে বলে রাখলাম।”

চক্রবাক কোনো উত্তর দিল না। রক্ষীপ্রধান বললেন, “কী ছোকরা? যুদ্ধ করার শখ মিটেছে? এই সমরোত্তমরা ঐশিকদের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন। মাল্যপর্বতের বড়ো বড়ো যোদ্ধারাও এঁদের ভয় পান। আর উনি এলেন তাদের

সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে! তোমার সহনিয়ামককে বলে দিও, এঁদের যে দুর্বল ভাবে, তার চেয়ে বড়ো নির্বোধ পৃথিবীতে আর দুটো নেই।”

রথীন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছিলেন নীলাভ্রর পাশে। তিনি চাপা গলায় বললেন, “অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সমরোত্তম নীলাভ্র। আমাদের এই আন্দোলনের লক্ষ্যকে সমর্থন করার জন্য আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।”

নীলাভ্র বলল, “দেখুন, নির্দোষ নিরপরাধের প্রাণ বাঁচানোর জন্যই আমাকে আসতে হয়েছে এখানে। আপনাদের আন্দোলন বা তার লক্ষ্যকে সমর্থন করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই।”

রথীন্দ্র হাসলেন। “নির্দোষ নিরপরাধের প্রাণ বাঁচানোটাই তো আমাদের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য, সমরোত্তম নীলাভ্র। দেখা যাচ্ছে, আমরা তাহলে একই পথের পথিক।”

সেনাবাহিনী তখনও অপেক্ষা করছে। তবে মনে হচ্ছে, তারা আর এগোবে না। রক্ষীপ্রধান তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছেন নীচুগলায়। এদিকে অর্ধরাক্ষসরাও অপেক্ষা করে আছে অস্ত্র নিয়ে।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, এবারও বাহিনী ফিরেই যাবে, আর তখনই ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা।

চক্রবাক নীচুগলায় কথা বলছিল সেনাবাহিনীর কয়েকজনের সঙ্গে। এমন সময় অর্ধরাক্ষসদের দিক থেকে প্রবল চোঁচামেচি শুরু হল।

নিধির বাবা দিঙনাগ।

বৃদ্ধ ছুটে এলেন পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে। “দূর হ’ তোরা, সমরগরিমা আয়তনের রক্তচোষার দলবল। দূর হ’ হতচ্ছাড়া খুনির দল। দূর হ’।”

এতটাই অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি তেড়ে এসেছিলেন সেনাবাহিনীর দিকে যে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই চক্রবাক তার পাশের সৈন্যটির হাত থেকে বর্শাটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল তাঁর দিকে, আর পরক্ষণেই একটা আর্তনাদ করে তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্র উদ্যত করে দাঁড়াল অর্ধরাক্ষসরা। পালটা অস্ত্র উঁচিয়ে ধরল সমরগরিমার সেনারাও। নীলাভ্র প্রমাদ গুণল। এত কষ্ট করে যুদ্ধ আটকাতে গিয়েও শেষরক্ষা হবে না নাকি?

চিৎকার করে উঠল সে। “অর্ধরাক্ষসরা। অস্ত্র নামাও।”

মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছেন দিঙনাগ। তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে অর্ধরাক্ষস বাহিনী। নীলাভ্রও কঠোর চোখে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। ধীরে ধীরে তারা অস্ত্র নত করল।

নীলাভ্র চোখের ইশারা করল রক্ষীপ্রধানকে। তিনি চোঁচিয়ে বললেন, “এটা নিতান্তই দুর্ঘটনা। আমরা দুঃখিত; আমরা ওঁকে আহত করতে চাইনি। আপনারা ওঁর চিকিৎসা করুন। আমরা চলে যাচ্ছি।”

বাহিনীকে ফেরার আদেশ দিলেন তিনি। রথীন্দ্র বললেন, “ওদের যেতে দেবেন?”

নীলাভ্র বলল, “হ্যাঁ। নিতান্ত সৈনিকের প্রতিবর্তক্রিয়া হিসাবেই অস্ত্রনিষ্ক্ষেপ

করে ফেলেছে ওরা। বৃদ্ধ দিঙনাগ ওদের দিকে হঠাৎ অমন হিংস্রভাবে চোঁচামেচি করে ছুটে না গেলেই পারতেন।”

চলে যাচ্ছে সমরগরিমার বাহিনী। নীপা আর তার মা এসে হাজির হয়েছে। দিঙনাগের অবস্থা দেখে নীপার মা কেঁদে উঠলেন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

নীলাভ বলল, “ভয় পাবেন না। চিকিৎসক কে আছেন এখানে?”

রথীন্দ্র বললেন, “কেউ নেই।”

“তাহলে ওঁকে নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে আয়তনে। রক্ষোবৈদ্যের তত্ত্বাবধানে থাকলে উনি সেরে উঠবেন ঠিক। নীপা, পরিষ্কার কাপড় আর তুলো নিয়ে এসো। রক্তটা এই মুহূর্তেই বন্ধ করতে হবে।”

প্রাথমিক একটা বন্ধনী দিয়ে অনর্গল রক্তপাতটা একটু কমাতে পারল নীলাভ। তারপর বাকিদের সাহায্য নিয়ে অচেতন দিঙনাগকে নিয়ে যাওয়া হল রক্ষোবৈদ্যের কাছে।

অর্ধরাক্ষসরা অনেকেই এল সেবাকক্ষ পর্যন্ত। রথীন্দ্র উদ্বিগ্নভাবে বললেন, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, উনি বাঁচবেন তো?”

ক্ষতস্থানটা পরিষ্কার করতে করতে রক্ষোবৈদ্য বললেন, “বলা মুশকিল। একটা আশার কথা হল, কোনো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কাঁধের পাশে বিঁধেছিল ফলকটা, তাও খুব বেশি ভেতরে ঢুকতে পারেনি – তাই সহজে বার করাও গেল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ওঁর বয়স অনেক হয়েছে, আর অনেকটা রক্তও বেরিয়ে গেছে।”

নীপা-নিধির মা পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। নীপাও দাঁড়িয়েছিল বজ্রাহতের মতো – কী যে করবে, কিছু বুঝতে পারছিল না। তরুণ তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করছিল, “ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।”

নীলাভ কোমল সুরে বলল, “চিন্তা করবেন না আপনারা। রক্ষোবৈদ্য মহোদয় ওঁর ভার হাতে নিয়েছেন মানে নিশ্চিত থাকুন। খুব দ্রুত সেরে উঠবেন উনি।”

নীপার মা কান্নার মাঝখানেই বললেন, “সমরোত্তম নীলাভ, দয়া করে নিধিকে ফিরে আসতে বলুন। ও আমাদের বড়ো মেয়ে – ও কাছে থাকলে আমাদের মনে একটু ভরসা হয়।”

নীলাভ মাথা নাড়ল। “আমি আজই চিঠি লিখছি ওখানে।”

সেবাকক্ষের বাইরে এসে দাঁড়াল সে। সমরগরিমার মাঠে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। কপালের ঘামটা মুছে সে তাকাল পাশের দিকে; এসে উপস্থিত হয়েছেন রথীন্দ্র।

নীলাভ বলল, “রথীন্দ্র, তৈরি থাকুন। এবার কিন্তু অন্যভাবে আক্রমণ আসবে। নিয়ামক বিনীতেশ এত সহজে আপনাদের রেহাই দেবেন না।”

রথীন্দ্র বললেন, “এই কথাটাই ভাবছিলাম আমি। নতুন আক্রমণ না এলেই আমি অবাক হব।”

নীলাভ বলল, “হ্যাঁ, আর সে আক্রমণ আসবেও একদম নতুন রূপে। নিয়ামক বুঝে গেছেন, সরাসরি সুদক্ষিণসারিতে হামলা চালানো যাবে না। তিনি এবার অন্য প্যাঁচ কষবেন।”

রথীন্দ্র হঠাৎ হাতদুটো জড়িয়ে ধরলেন তার। “সমরোত্তম নীলাদ্র, অনেকগুলি নির্দোষ জীবনরক্ষা করায় যদি কোনো পুণ্য থাকে, সে পুণ্য আপনি আজ অর্জন করলেন। আপনার মঙ্গল হোক।”

আর কিছু না বলে ধীর পদক্ষেপে আয়তন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ডেকে তাদের পরবর্তী কার্যপন্থা নির্ধারণ করে দিল নীলাদ্র। “এখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে, খেয়াল রাখবে। আর কড়া নজর রাখবে সুদক্ষিণসারির দিকে। পরবর্তী আক্রমণ ওখানে হবে, আমরা নিশ্চিত, কিন্তু কীভাবে হবে, জানা নেই। আর, ওখানের নেতাদের বোলো, আগামী কয়েকদিন যেন খুব সাবধানে থাকেন।”

সবাইকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নীলাদ্র হাঁটতে লাগল আয়তনের অলিন্দপথগুলোতে। কেমন যেন অস্থির লাগছে তার ভেতরে ভেতরে। এখানে এই কাণ্ড, ওদিকে অভীর কী হচ্ছে, কে জানে? শ্যামশ্রীই বা কী করছে? মেঘবর্ণও চুপচাপ কেন?

আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পৌঁছেছিল সংগ্রহশালার দ্বারের সামনে। চাবি তার কাছেই ছিল; ভেতরে ঢুকে সে এসে দাঁড়িয়ে রইল অধিনায়ক বজ্রধরের ধাতব দণ্ডটির সামনে।

যমদণ্ডের অংশশক্তি ছিল এটার মধ্যে!

অজান্তেই চোখ জলে ভরে উঠল তার। ফিশফিশ করে সে বলল, “অধিনায়ক, এই মুহূর্তে আপনাকেই সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল আমাদের। আপনার আয়তন ভেঙেচুরে যেতে বসেছে; আমরাও বোধহয় ঠিকমতো পেরে উঠছি না সব দিক সামলাতে। আমি দুঃখিত, অধিনায়ক। আমি ক্ষমা চাইছি।”

কে যেন ধাক্কা দিল বন্ধ দরজায়। ফিরে তাকাল নীলাদ্র। রক্ষোবৈদ্য কি? না, উনি তো এভাবে ডাকেন না।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল সে। ডাকটার মধ্যে যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে। কই, আর তো কেউ ধাক্কা দিচ্ছে না। অথচ, একটু আগেই কে যেন একবার দরজায় ডেকেছিল, সে স্পষ্ট শুনেছে।

কোমরের কোষ থেকে তরবারি বার করে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল সে। দরজাটা খুলতেই তার চোখে পড়ল দৃশ্যটা।

রক্ষীপ্রধান। পড়ে আছেন তিনি উপুড় হয়ে দরজার সামনে পাথুরে মেঝের উপর। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দেহে প্রাণ নেই।

পিঠের উপরে একটা গভীর ক্ষত; সেখান থেকে রক্ত নামছে এখনও চুইয়ে চুইয়ে। তরবারি বা বড়ো কোনো ছোঁরাজাতীয় অস্ত্রের আঘাত। সম্ভবত হঠাৎ করে পেছন থেকে এসে আঘাত করেছিল আততায়ী; রক্ষীপ্রধান নিজেকে বাঁচানোর সুযোগটুকুও পাননি।

আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। মৃত মানুষটার গলায় পেঁচানো আছে একটা সাদা রেশমি রুমাল।



॥ দশম অধ্যায় ॥ মহাসর্পিণী

অতিথিভবনের বাইরে থেকে যখন চিৎকারটা শোনা গেল, তখন ভেতরে বসে নিধি রাজকন্যা উর্মির নামে যে কথাগুলো বলছিল, সেগুলো আদৌ বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।

মেঘবর্ণ আর পর্বত দু'জনেই গেছে রাজসভায়; সেখানে প্রজ্ঞার সঙ্গে ওরা আলোচনা করছে মহাসর্পিণীর গুহায় আসন্ন অভিযান নিয়ে। পর্বত বলছিল, প্রজ্ঞার কাছে নাকি একটা বিশেষ ছুরি আছে, যেটা দিয়ে যেকোনো বস্তুকে ছেদন করা যায়। সেইটি যাতে উনি এই অভিযানে ওদের ব্যবহার করার জন্য ধার দেন, তার অনুরোধ জানাতেই ওরা গেছে রাজসভায়।

অভীর হাতের পানপাত্রে টলটল করছিল লাল রঙের একটা পানীয় – উর্মি দিয়ে গেছেন। গতকাল থেকেই তার একটা অসুবিধা হচ্ছে; জীবন্ত আঁধারের কাছাকাছি আসার পরেই দেখা দিয়েছে এই সমস্যা – মাঝেমধ্যেই শ্বাস নিতে গেলে একটু যেন টান লাগছে বুকে; খুব বেশি কিছু নয়, কিন্তু সামান্য অস্বস্তি হচ্ছে। উর্মি তাই ওষুধ মিশিয়ে এই পানীয়টা দিয়ে গেছেন। এটা খেলেই নাকি ওইটুকু টান কেটে যাবে।

নিধি বলছিল, “তোমার জন্য রাজকন্যার কত চিন্তা দেখেছ?”

অভী বলল, “উনি একজন বৈদ্য। সবার স্বাস্থ্যের জন্যই চিন্তা করা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তার উপর আমরা ওঁরই তত্ত্বাবধানে থাকা অতিথি। আমাদের উনি যথাসম্ভব যত্নে রাখার চেষ্টা করবেন, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।”

লীনা কিছু না বলে মিটিমিটি হাসছিল আর ওদের দু'জনের বাকরুদ্ধ দেখছিল। নিধি বলল, “যাই বলো, উনি যখনই তোমার দিকে তাকান, ওঁর চোখের একটা মুগ্ধতার দৃষ্টি আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। তাই না, লীনা?”

লীনা দু'হাত তুলে বলল, “আমাকে বাদ দাও এই তর্ক থেকে, নিধি। এই ব্যাপারটাতে আমি কোনো মন্তব্যই করব না।”

অভী রাগতঃস্বরে বলল, “হ্যাঁ, ওই দৃষ্টি খালি তুমিই দেখতে পাও, নিধি। আর কেউ পায় না।”

নিধি বলল, “আমি তো অনেকবার বলেছি, ছেলেদের এইসব ব্যাপার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে ওরা দেখতেই পায় না। কিন্তু যাই বলো, উনি একজন রাক্ষস। রাক্ষসরা আমাদের শত্রু নয় কি? তাদের কি বিশ্বাস করা যায়?”

অভী বলল, “এই কথাটা তোমার মুখ থেকে শুনতে হল বলেই আজ আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে, জানো কি? তুমি নিজে একজন অর্ধরাক্ষস; ঠিক এই ধরনের জাত তুলে অবিশ্বাসের কথা তোমাদের জাতিকে কম শুনতে হয় না। সে নিয়ে তুমি আমাদের কাছেও কম দুঃখ করোনি। কিন্তু আজ অন্য একজনকে – স্রেফ তাকে তুমি অপছন্দ করো বলে – জাত তুলে অসম্মান করাটা তোমাকে অন্তত শোভা পায় না।”

উত্তর দিতে গিয়েও থমকে গেল নিধি। কক্ষের বাইরে একটা প্রচণ্ড চিৎকার চোঁচামেচি শুরু হয়েছে।

লীনা বলল, “কী যেন বলছে? ‘চোর’, ‘চোর’ বলে চোঁচাচ্ছে না?”

নিধি বলল, “হ্যাঁ, তাই তো। চলো দেখি ব্যাপারটা কী।”

ওরা তিনজনেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কক্ষের বাইরে। প্রাসাদভবনের রক্ষীরা ধরে রেখেছে এক বৃদ্ধাকে; তার সামনে মাটিতে পড়ে আছে দুটো জলভর্তি কলসি।

বৃদ্ধার মাথার চুলগুলো সব সাদা; চোখেমুখে ভয় আর অসহায়তার ছাপ স্পষ্ট। অভী অবাক হয়ে ভাবল, “এ কেমন চোর?”

প্রফুল্ল ছিল সামনে। তাকে ডেকে লীনা জিজ্ঞাসা করল, “কী হয়েছে?”

প্রফুল্ল বলল, “এই বুড়িটা জল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে প্রাসাদরক্ষীদের কাছে।”

অভী অবাক হয়ে তার বন্ধুদের দিকে ফিরে নীচুগলায় জিজ্ঞাসা করল, “জল কি একটা চুরি করার মতো জিনিস? তার জন্য এত কড়াকড়ি?”

নিধিও ফিশফিশ করে উত্তর দিল, “এই মাল্যপর্বতে জলের মতো দামি জিনিস আর নেই। পুরো রাজ্যটা শুকনো খটখটে। খালি মরুময়ের সংস্থা ‘ধারান্নান’-এর কৃপায় রাজপ্রাসাদে ওই জিনিসটির সরবরাহ অফুরন্ত।”

লীনা বলল, “শিল্পসংগ্রহশালা দেখাতে দেখাতে রাজকন্যা উর্মি এদেশের ভয়ানক জলসংকটের কথা বলছিলেন আমাদের। মহামন্ত্রী মরুময় রাজপ্রাসাদকে পর্যাপ্ত জল দেন, আর তার বিনিময়ে রাজা পুনর্বসুর কাছ থেকে গোটা দেশে জলনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন তিনি। বৃষ্টিনির্মাণ মায়া একমাত্র তিনিই জানেন কিনা।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “বৃষ্টিনির্মাণ মায়াটা আবার কী জিনিস?”

লীনা বুঝিয়ে বলল, “মরুময়ের সংস্থা মায়াবলে মেঘনির্মাণ করে বৃষ্টি আনে মাল্যপর্বতে বছরে মাত্র দু’বার। তখন এখানকার রাক্ষসরা তার যতটা পারে, সঞ্চয় করে রাখে। আর সপ্তাহে একবার পরিবারপিছু দুই কলসি করে জল নিয়ে যেতে পারে এরা রাজপ্রাসাদের সামনের জলভাণ্ডার থেকে। এর বেশি লাগলে মরুময়ের সংস্থা ধারান্নান থেকে চড়া দামে জল কিনতে হয় নাগরিকদের। প্রাসাদের ভেতরের বা অতিথিভবনের এইসব অজস্র জলাধারের জল সাধারণ মানুষের ছোঁওয়ার অনুমতি নেই।”

আগেই সে এ ব্যাপারটা শুনেছিল, কিন্তু এখন আবার গরিব রাক্ষসদের অবস্থাটা ভাবতেই অভীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। সারা সপ্তাহের বরাদ্দ মাত্র দুই কলসি জল! কী সর্বনাশ!

ইতিমধ্যেই প্রফুল্লের নির্দেশে সংবাদ চলে গিয়েছিল উর্মির কাছে। তিনি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন নিজের ভবন থেকে।

“কী ব্যাপার, প্রফুল্ল? এত চেষ্টামেচি কেন এই সাতসকাল বেলা?”

প্রফুল্ল অল্পকথায় তাঁকে বলে দিল ব্যাপারটা। উর্মি এগিয়ে গেলেন চোরের দিকে।

বেচারি বৃদ্ধা তাঁকে দেখে মাটিতে তাঁর পায়ের কাছে শুয়ে পড়লেন।

“রাজকন্যা, আমার অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করুন।”

উর্মি বললেন, “রাক্ষস নও তো তুমি? অর্ধরাক্ষস মনে হচ্ছে! নাম কী?”

“হ্যাঁ, রাজকন্যা, খুব গরিব অর্ধরাক্ষস আমি; আমার নাম স্নিগ্ধা। তিনতিনটে বাপ-মাম্মরা নাতি-নাতনি আছে বাড়িতে – তিনটেই অসুস্থ। দয়া করুন আমাকে – এই জলটুকু নিয়ে না যেতে পারলে ওরা আর দুটো দিনও বাঁচবে না।”

“এ সপ্তাহের জল নিয়ে যাওনি?”

“নিয়ে গেছলাম। কিন্তু কুলোয়নি। জল কিনে খাওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। পরের সোমবার আসতে এখনও অনেক দেরি; আর বর্ষা কবে দেবেন মহামন্ত্রী, তা তিনিই জানেন। এইটুকু জল আমাকে নিয়ে যেতে দিন, রাজকন্যা। বাচ্চাগুলো নয়তো মরে যাবে।”

“কিন্তু তুমি যে চুরি করেছ, স্নিগ্ধা। চোরের শাস্তি জানো না?”

বৃদ্ধার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। “চুরি না করে কোথায় যাব, রাজকন্যা? দু’কলসি জল নিয়ে কতগুলো মুখ ভেজাব? গত দু’সপ্তাহে আমি দু’আঁজলা জলও খাইনি – ঘরের সামান্য জলটুকু জমিয়ে জমিয়ে রেখেছি, যাতে ওরা কাঁদলে ওদের জিভটুকু অন্তত ভিজিয়ে দিতে পারি। চোখের সামনে ওইটুকু বাচ্চাগুলোকে শুকিয়ে মরতে দেখতে পারছি না আর। রাজকন্যা, চোরের শাস্তি আমি জানি। আমার মাথা নিতে হয় নিন, কিন্তু এইটুকু শুধু দয়া করুন, এই কলসিদুটো অন্তত লোক দিয়ে আমার ঘরে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।”

পাথরের মতো কঠিন মুখে রাজকন্যা তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর পেছনে শ্বেতপাথরের সিংহের মুখের ফোয়ারা থেকে উচ্ছল ধারায় বেরিয়ে আসছে জল – এসে পড়ছে একটা বিরাট জলাশয়ে। অভীর মুখে এসে লাগছে সেই জলমেশা বাতাসের স্পর্শ। অন্যসময় হলে তার আরাম লাগত, কিন্তু এখন

যেন সেই আরামদায়ক স্পর্শটুকুকেও অসহ্য মনে হচ্ছে।

উর্মি হঠাৎ ফিরলেন ওদের তিনজনের দিকে। “রাজার আইনে আমার হাত-পা বাঁধা। কিন্তু তোমরা আমার অতিথি, আর তোমাদের যেকোনো ইচ্ছা পূরণ করতে রাজার আদেশেই আমি বাধ্য। তোমরা বলো, এই চোর আর তার দু’কলসি জলকে নিয়ে আমার কী করা উচিত।”

তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, “ওঁকে ছেড়ে দিন।”

হাসলেন উর্মি। “তথাস্তু। তোমরা যখন বলছ, তখন তাই হোক। ...স্নিগ্ধা, এঁরা আমার বন্ধু, এঁদের অনুরোধ আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারব না। এই কলসির জল আর তোমার অপরাধের মার্জনা – এই দুটিই তোমাকে আমার বন্ধুরা দিচ্ছেন, বুঝতে পেরেছ? এবার ওঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে তুমি বিদায় নিতে পারো।”

অভীই ছিল তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সামনে। কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধা এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে অভীর পা ছুঁতে গেলেন।

চমকে উঠে অভী তাঁকে প্রণাম করা থেকে নিরস্ত করল। “আরে ছি ছি মাসিমা, আপনি গুরুজন, আপনি আমাকে প্রণাম করছেন কেন?”

তিনি সেই যে ঝুঁকেছেন, রাজকন্যার আদেশ পালন না করে, অর্থাৎ অভীর পা না ছুঁয়ে কিছুতেই উঠবেন না। জড়িয়ে জড়িয়ে তিনি ধন্যবাদ দিচ্ছেন ওদের, ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল কামনা করছেন। অভী অসহায়ভাবে বন্ধুদের দিকে তাকাল।

বৃদ্ধা হাপুসনয়নে কেঁদেই চলেছেন। নিধি এগিয়ে এসে তাঁকে টেনে তুলল। “স্নিগ্ধামাসি, আমিও অর্ধরাক্ষসের মেয়ে। সব জায়গাতেই আমাদের হাল কমবেশি একই দেখছি। যান, বাড়ি যান। বাচ্চাদের কাছে জল নিয়ে যান। যা আপনার হকের পাওনা, তা পেয়েছেন বলে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো দরকার নেই।”

কলসিদুটো তুলে নিয়ে তিনি যখন চলে যাচ্ছেন, তখন উর্মি একবার এগিয়ে গেলেন তার দিকে, নীচুগলায় কী যেন বললেন। নিধি আর লীনা শুনতে পেল না বটে, কিন্তু অভীর কানে এল, উর্মি বলছেন, “কাল বাচ্চাগুলোকে নিয়ে একবার আমার সেবাকক্ষে আসবে।”

তারপর ওদের কাছে ফিরে এসে স্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, “কী কাণ্ড দেখো! সকাল সকাল তোমাদের শান্তির ব্যাঘাত ঘটে গেল।”

লীনা বলল, “আপনার উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হলাম, রাজকন্যা। যেভাবে আপনি আইন বাঁচিয়ে ওকে সাহায্য করলেন...”

উর্মি হাত নাড়লেন, যেন ও প্রসঙ্গে আর কথা বলতে চাইছেন না তিনি। অভী বলল, “যাই বলুন, এখানে এসে দেখছি জল যাদের আছে আর জল যাদের নেই – এই দুটো শ্রেণির মধ্যে পার্থক্যটা বড়ো দৃষ্টিকটু।”

উর্মি হেসে বললেন, “হ্যাঁ, ওই জায়গাতেই আমরা রাক্ষসরা আর তোমরা মানুষেরা বেশ ভাই-ভাই হয়ে আছি। আমরা সবাই বেচারী গরিব অর্ধরাক্ষসদের উপর অত্যাচার করতে ভালোবাসি, তাই না নিধি?”

নিধি বলল, “রাজকন্যা উর্মি, আপনি মজা করছেন, আমি বুঝতে পারছি।

কিন্তু একটা কথা বললে আশা করি কিছু মনে করবেন না। আপনার হৃদয় মহৎ, সন্দেহ নেই। কিন্তু আসল দারিদ্র্য কাকে বলে, সে আপনি দেখেননি।”

উর্মি বললেন, “এতে মনে করার কী আছে? আমি রাজকন্যা, জন্ম থেকে রাজপ্রাসাদে বড়ো হয়েছি। রাজকন্যারা আর কবেই বা দারিদ্র্য দেখতে অভ্যস্ত হয়?”

ঠিক সেই মুহূর্তেই একজন বার্তাবহ এসে দাঁড়াল মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে। “রাজকন্যা, মহারাজ আপনাকে ও প্রলয়যোদ্ধাকে একবার রাজসভায় আসতে অনুরোধ করেছেন।”

উর্মি অবাক হয়ে বললেন, “কেন, কিছু জানো তুমি?”

বার্তাবহ বলল, “সদ্য সমরগরিমা থেকে একজন সমরোত্তম এসে পৌঁছেছেন। সম্ভবত সেই ব্যাপারেই মহারাজ আপনাদের স্মরণ করেছেন।”

অভীরা তিনজনেই চমকে উঠল। আরও একজন সমরোত্তম এসেছেন? কে? শ্যামশ্রী, না নীলাভ?

লীনা বার্তাবহকে প্রশ্ন করল, “যিনি এসেছেন, তিনি পুরুষ, না মহিলা?”
“মহিলা।”

অভী অবাক হয়ে ভাবল, “মা এসেছে! কিন্তু কেন?” সে বলল, “তোমরা থাকো। আমি যাচ্ছি। কিন্তু এভাবে হঠাৎ কোনো খবর না দিয়ে মা এসে পড়ল কেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।”

উর্মির সঙ্গে সে চলল রাজসভার উদ্দেশে। যেতে যেতে উর্মি বললেন, “তোমার মা আর বাবা, দু’জনেই সমরোত্তম, না?”

“হ্যাঁ।”

“তাই তোমার মধ্যে যুদ্ধবিদ্যার এত উত্তম প্রকাশ।”

অভী বলল, “আমি তাদের কারও মতোই অসামান্য যোদ্ধা হতে পারিনি। আচ্ছা, বাবা-মায়ের গুণ কি সবসময় সন্তানের মধ্যে ফুটে ওঠে? কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি রোগাক্রান্তকে রোগ সারানোর জন্য ওষুধ খাওয়ান দেখেছি, আর আপনার পিতা সিংহাসনের কাঁটা দূর করার জন্য একজনকে বিষ খাইয়েছেন শুনেছি। এ পার্থক্য কেন?”

উর্মি হেসে উঠলেন, “মাত্র একজনকে? কিন্তু তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কী বলো তো, রাক্ষসদের মধ্যে দয়ামায়া বরাবরই একটু কম। আমিই কী করে যেন বংশের কুলাঙ্গার হয়ে গেছি!”

অভী হাসল। “রাক্ষসজাতির মঙ্গলের জন্য আপনার মতো একজনকে দরকার ছিল। আজ ওই দরিদ্র বৃদ্ধাকে যে দয়া আপনি দেখালেন...”

উর্মি বললেন, “তোমাকে চুপিচুপি বলছি, কাউকে বোলো না, আমার কিছু গুপ্তচর আছে। তারা আমাকে রাজ্যের কোথায় কোথায় কোন কোন পরিবারে অর্থসংকট দেখা দিয়েছে, সে খবর এনে দেয়। তাদের হাত দিয়ে আমি আমার পিতা মহারাজ আর ওই হতভাগা জলপিশাচ মন্ত্রী মরুময়কে লুকিয়ে ওই লোকগুলো সাহায্য পাঠাই।”

অভী চমৎকৃত হয়ে বলল, “এ তো দারুণ কাজ করছেন আপনি। লীনা আর নিধির সামনে বলতে পারতেন ব্যাপারটা – ওরা খুশি হত।”

উজ্জ্বল একটা হাসি হাসলেন তিনি। “ভালো কাজ করে বলে বেড়াতে নেই; ওতে অহংকার চলে আসে।” তারপর একটু থেমে বললেন, “তোমাকেও বলব না ভাবছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলে ফেললাম।”

বাকি রাস্তাটা আর এ নিয়ে কোনো কথা হল না। রাজপ্রাসাদের সামনে অপেক্ষা করছিলেন শ্যামশ্রী - অতীকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। “বাবা অতী, তুই ঠিক আছিস তো? তোর কোনো শরীর খারাপ হয়নি তো?”

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মেঘবর্ণ। সে বলল, “আমি তো তোমাকে বললাম, ও সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। আমি ওরকম কোনো চিঠি লিখিইনি।”

সামনে উর্মি আছেন, এতগুলো রাক্ষসপ্রহরী আছে; অতীর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে বলল, “আঃ, মা! ছাড়ো এবার।”

শ্যামশ্রী তাকে ছেড়ে দিলেন। আপনা থেকেই অতীর চোখ চলে গেল উর্মির দিকে। সে দেখল, তিনি মুচকি হাসছেন।

স্বয়ং রাজা পুনর্বসু বেরিয়ে এসেছিলেন। উর্মিকে ডেকে তিনি নির্দেশ দিলেন, “সমরগরিমার সহঅধিনায়িকা এসেছেন। তোমার অতিথিভবনে ওঁর যথোচিত মর্যাদাসহকারে সেবার ব্যবস্থা করো, মা।”

মেঘবর্ণ রাজার দিকে ফিরে বলল, “সহঅধিনায়িকার জন্যও আপনারা কোনো আতিথ্যস্বীকারের পরীক্ষাযুদ্ধ রাখছেন নাকি?”

রাজা জিহ্বা দংশন করলেন। “না না, স্বয়ং প্রলয়যোদ্ধা যখন সে যুদ্ধে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তখন আর ওসবের দরকার হচ্ছে না। আপনারা আমার সভাগৃহে আসুন, বাকি আলোচনাটুকু শেষ করা যাক।”

মেঘবর্ণের চোখের ইশারায় অতী এগিয়ে গেল তার দিকে। সে ফিশফিশ করে জানিয়ে দিল, “প্রজ্ঞা বলে দিয়েছেন, ওই ছুরি তিনি দেবেন না। ওটাকে বেশ কিছুদিন বিশ্রাম দিলে তবে ওর মধ্যে সর্বভেদক মায়াশক্তি জন্মায়। কী একটা বিশেষ কাজের জন্য ওর মায়া তিনি সংরক্ষণ করে রাখছেন। ওর মধ্যে সঞ্চিত মায়া পর্বতের মতো দেশদ্রোহীর বউকে বাঁচানোর জন্য ব্যয় করতে তিনি সম্মত নন।”

অতী বলল, “চন্দ্রহাস ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই তাহলে। কিন্তু কী করে করব, সেটাই বুঝতে পারছি না।”

ওরা সবাই এসে বসল রাজার সভাকক্ষে। প্রজ্ঞা ও মরুময় আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সবাই বসার পর উর্মি বললেন, “মহারাজ, আমি এই অভিযানে দলের সঙ্গে যেতে চাই। আমি না থাকলে এঁদের পক্ষে মহাসর্পিণীকে অভিশাপমুক্ত করা অসম্ভব, কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রে অতখানি দক্ষতা এঁদের কারও নেই। আর তাছাড়া রক্তপদ্মরাগ ব্যবহার করার উপযুক্ত আর কাউকেই তো আপাতত চোখে পড়ছে না।”

অতীর মনে পড়ে গেল, একবারও কোনো মানুষের (বা রাক্ষস, বা অর্ধরাক্ষসের) প্রাণ নিয়েছে যে, সে ওই মণি ব্যবহার করার অনুপযুক্ত।

উর্মি যে যাবেন, তা অবশ্য জানা ছিল। তবু রাক্ষসদের রীতি অনুযায়ী তাঁর একবার আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

রাজা মাথা নাড়লেন। “সে আমি জানি। সমরগরিমার সহঅধিনায়িকা স্বয়ং উপস্থিত আছেন এখানে। আমি আপনাকেই বলছি, একটিমাত্র শর্তে আমরা রাজকন্যা উর্মিকে আপনাদের মহাসর্পিণীর গুহায় অভিযানে যেতে দিতে রাজি আছি।”

শ্যামশ্রী বললেন, “বলুন কী শর্ত।”

রাজা প্রজ্ঞার দিকে তাকালেন। প্রজ্ঞা বললেন, “রাজকন্যা উর্মি রাক্ষস হলেও তিনি অস্ত্রবিদ্যা কিছুই জানেন না, অর্থাৎ বিপদ উপস্থিত হলে তিনি আত্মরক্ষা করতে একান্তই অক্ষম। তাঁর সুরক্ষার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। সাপটিকে যখন আপনারা আক্রমণ করবেন, সেই যুদ্ধে তিনি কোনোভাবেই অংশ নেবেন না। যদি ওটিকে আপনারা পরাভূত করতে পারেন, কেবল মাত্র তখনই তিনি চিকিৎসা-বিষয়ে নিজের জ্ঞান দ্বারা আপনাদের সাহায্য করবেন। বলুন, আপনারা সম্মত কিনা।”

শ্যামশ্রী চট করে একবার সবার মুখগুলো দেখে নিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, এতে আমাদের আপত্তির কোনো কারণ নেই। রাজকন্যাকে আদৌ যুদ্ধ করতে হবে না, এবং তাঁর সুরক্ষার দায়িত্বও আমরা নিচ্ছি।”

অভী হঠাৎ দেখল, মরুময় পুরো সময়টা একটাও কথা না বলে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। সেদিকে চোখ পড়তেই তার কেমন অস্বস্তি শুরু হল।

আর কেউ কি খেয়াল করেছে ব্যাপারটা? না মনে হয়।

রাজা বললেন, “অতি উত্তম। আপনারা তবে অতিথিভবনে ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। তারপর সকালের আহার সমাধা করে যাত্রা করুন মহাসর্পিণীর গুহার উদ্দেশে। নিয়তি আপনাদের সহায় হোন।”

রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে ওরা একে একে বেরিয়ে এল সভাকক্ষ থেকে। প্রজ্ঞা এসে দাঁড়ালেন মেঘবর্ণের পাশে; নিচুগলায় বললেন, “কাজ হয়ে গেলে মণিটা কিন্তু ফেরত দিতে হবে, মনে আছে তো, সমরোত্তম মেঘবর্ণ?”

মেঘবর্ণ বলল, “আছে। কথা দিয়েছি যখন, তখন ও জিনিস অবশ্যই আপনাকে প্রত্যর্পণ করব।”

ওরা এসে বসল অতিথিভবনে অভীদের কক্ষে, লীনা আর নিধির সঙ্গে। শ্যামশ্রী বললেন, “অভী, কেউ একজন অবশ্যই চাইছিল সমরগরিমা থেকে আমাকে বা নীলাভকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে দিতে। সে জানত, তুই অসুস্থ গুনলে আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। ঠিকই বুঝেছিল সে আমাকে – আমিও বোকার মতো চলে এলাম এখানে। ওখানে এখন কী হচ্ছে, কে জানে।”

অভী বলল, “আমার মনে হয়, এই নকল চিঠির বুদ্ধি একজনের মাথা থেকেই বেরোতে পারে।”

নামটা বলারই দরকার হল না, সমরগরিমার বাসিন্দারা প্রত্যেকে একসঙ্গে মাথা নাড়ল। মেঘবর্ণ বলল, “আমারও দৃঢ় ধারণা, এ কাজ ও ছাড়া আর কারও নয়।”

শ্যামশ্রী বললেন, “কিন্তু কেন? এটাই এখন সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। নীলাভ আছে বটে ওখানে, কিন্তু একা হাতে ও সব সামলাতে পারবে তো? যদি অর্ধরাক্ষসদের উপর হামলা হয়...?”

নিধি বলল, “সমরোত্তম শ্যামশ্রী, আপনি কি ফিরে যাবেন ভাবছেন?”

শ্যামশ্রী বললেন, “নকল চিঠির ব্যাপারটা জানার সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলাম, ফিরে যাব। কিন্তু এরা মহাসর্পিণীর গুহা থেকে ফেরা পর্যন্ত ভাবছি অপেক্ষা করেই যাই। সত্যিই স্বর্ণশেখরের দেখা পাওয়া যায় কিনা, আর পর্বতের স্ত্রীর শাপমুক্তি ঘটানো যায় কিনা – এই দুটো ব্যাপারে বড্ড কৌতূহল হচ্ছে।”

অভী বলল, “তাহলে আমরা কে কে যাচ্ছি আজ?”

তার কথার উত্তর আসার আগেই দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল প্রফুল্ল। “রাজকন্যা উর্মি, একটি চিঠি আছে।”

উর্মি অবাক হয়ে বললেন, “চিঠি? কার চিঠি?”

“খামের উপরে লেখা আছে, ‘সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রী’।”

শ্যামশ্রী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে চিঠিটা নিলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

পড়া শেষ করে তিনি বললেন, “নিধি।”

তাঁর গলা শুনেই নিধি চমকে উঠল। “বলুন।”

“তুমি এক্ষুনি বাড়ি যাও – সমরগরিমায় ফিরে যাও। নীলাভ্র লিখেছে, তোমার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তোমার মা তোমাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেছেন।”

ভয়ার্ত স্বরে নিধি বলল, “কী হয়েছে বাবার?”

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন শ্যামশ্রী, যেন ভাবতে লাগলেন সত্যিকথাটা ওকে বলবেন কিনা। তারপর মনস্তির করে বললেন, “নিয়ামক কাল সুদক্ষিণসারিতে সেনা অভিযান করেছিলেন। তোমার বাবা তাতে আহত হয়েছেন। বর্তমানে রক্ষোবৈদ্যের চিকিৎসাধীনে আছেন। তোমার মা নীলাভ্রকে সংবাদ দিতে বলে অনুরোধ করেছেন, যাতে তুমি ফিরে যাও।”

নিধি অসহায়ের মতো বলল, “কিন্তু আমি ফিরব কী করে?”

উর্মি বললেন, “চিন্তা কোরো না, আমি জটায়ুর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি ফিরে যাও; তোমার বাবা কেমন থাকেন, চিঠি লিখে জানিও। ভয় পেয়ো না, রক্ষোবৈদ্য তাঁর দায়িত্ব নিয়েছেন মানে তিনি ঠিক সেরে উঠবেন। আর হ্যাঁ, খালি পেটে যেও না; জটায়ুর পিঠে চেপে অত উঁচুতে উঠলে মাথা ঘুরবে। যাহোক দুটি খেয়ে তারপর বেরিও।”

একটা থলিতে একটা খাতার মতো জিনিস আর একটা ছোট কাগজের খাম ভরে থলিটা নিধির হাতে দিলেন উর্মি। বললেন, “এটা তোমাকে আমার উপহার। আমাদের রাক্ষসপুরীর অনেক নতুন-পুরোনো ছবি আঠা দিয়ে আটকানো আছে এই খাতাটার পাতায় পাতায়। দেখো, ভালো লাগবে আশা করি। আর এই খামটায় একটা স্বপ্ন-উপল রইল। এটা রক্ষোবৈদ্যকে দিও; ওঁর সেবাকক্ষে এটা পেয়েছিলাম আমি। এতে ওঁর কিছু দুঃপ্রাপ্য ওষুধ তৈরি করার পদ্ধতির প্রক্রিয়া ধরে রাখা আছে। ওঁকে বোলো, আমি একদিন ওঁর মতো বিরাট মাপের বৈদ্য হয়ে উঠতে চাই, উনি যেন আমাকে আশীর্বাদ করেন।”

অভী দেখল, নিধির মুখে আর সেই ব্যঙ্গের হাসি নেই। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে আলিঙ্গন করল উর্মিকে। “হ্যাঁ, ওঁকে বলব আপনার কথা। এই আতিথেয়তার

জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।”

উর্মি বললেন, “চলো, তোমার জটায়ুর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।”

বাকিদের অনুমতি নিয়ে ওঁরা দু'জন বেরিয়ে গেলেন। অভী একবার লীনার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। যাক, শেষ পর্যন্ত ভাব হয়েছে দু'জনের মধ্যে। লীনাও হাসল।

মেঘবর্ণ বলল, “এবার দেখা যাক, কে কে যাবে এই অভিযানে। অভী, তোমাকে যেতে হবে, কারণ চন্দ্রহাসকে লাগবে। রাজকন্যা উর্মি যাবেন, কারণ রক্তপদ্মরাগ মণি ব্যবহার করার ক্ষমতা আর কারও নেই। পর্বত যাবেই, কারণ উত্তরা তার স্ত্রী। আর সঙ্গে থাকবে একজন – সেই ব্যক্তি আমি – কারণ ...নাঃ, কারণ কিছু নেই। এমনিই।”

অভী হেসে ফেলল। লীনা তীব্র প্রতিবাদ করে বলল, “এ অন্যায়। আমি কেন যাব না?”

শ্যামশ্রী বললেন, “না, লীনা, তুমি যেও না। আমিও তো যাচ্ছি না। নীলাভ্র লিখেছে, তোমার মায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তিনি অনুরোধ করেছেন, যতটা সম্ভব তোমাকে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে দূরে রাখতে। নীলাভ্র তাঁকে কথা দিয়েছে, আমাদের যেটুকু সাধ্যে কুলোয়, আমরা করব। অতএব, আজকের এই অভিযানে আমি তোমাকে যেতে নিষেধ করছি।”

অপ্রসন্নভাবে মাথা নিচু করে বসে রইল লীনা। কথাগুলো তার মনঃপূত হয়নি, কিন্তু সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রীর মুখের উপর কথা বলার সাহস তার নেই।

অভী, মেঘবর্ণ, উর্মি আর পর্বত – এই চারজনের দলটা যখন রক্ষোপুরীর প্রাকারদ্বার পেরিয়ে বেরিয়ে এল পার্বত্যপথে, তখন সূর্য উঠে এসেছে মাথার উপরে। পাহাড়ি রাস্তায় তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন প্রজ্ঞা; তিনি অবশ্য বলে দিয়েছেন, কিছুটা এগিয়ে দিয়ে তিনি ফিরে আসবেন। মহাসপিণীর গুহার মুখ পর্যন্ত তিনি যাবেন না, শুধুমাত্র পথনির্দেশ দিয়ে দেবেন।

গিরিপথে চলতে চলতে অভীর হাঁপ ধরে যাচ্ছিল; বাকিদের অবশ্য কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলে তার মনে হচ্ছিল না। উর্মি, প্রজ্ঞা আর পর্বত তো এখানকারই লোক, আর মেঘবর্ণ শারীরিকভাবে চূড়ান্ত শক্তিশালী। অভী ভাবছিল, “আমিই বোধহয় দলের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল।”

পাহাড়গুলোর মধ্যে কী ভীষণ রুম্মতা, মনে হচ্ছিল তার। এতটুকু সবুজের ছাপমাত্র যেন কোথাও নেই। থাকবেই বা কী করে – বৃষ্টি তো হয় না বললেই চলে। কয়েকটা নিচু মাঠের মত জায়গা দেখিয়ে উর্মি বললেন, “শুনেছি, ওইগুলো আগে হ্রদ ছিল। এখন সব শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে।” বলে তিনি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে চুপ করে গেলেন।

পাহাড়ের কোলে এতগুলো হ্রদ কী করে শুকিয়ে গেল, অভী আর জিজ্ঞাসা করল না, কিন্তু উর্মির মুখ দেখে সে বুঝতে পারছিল, ভেতরে কোনো একটা ব্যাপার আছে।

ছোটো ছোট পাথুরে বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অভী খেয়াল করল, স্থানীয় লোকদের মধ্যে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। অথচ একটু দূরেই রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে বৈভব, তার সঙ্গে এদের জীবনযাত্রাকে যেন সে মেলাতে

পারছিল না। দারিদ্র, অভাব সমরগরিমাতেও আছে, কিন্তু সেখানেও মানবমন্দির বা সুদক্ষিণসারির জীবনযাপনের সঙ্গে আয়তনের জীবনের তফাতটা এতখানি দৃষ্টিকটু নয়।

এখানের গরিব রাক্ষসদের মুখগুলো সবসময় কেমন যেন শুকনো হয়ে আছে। জলের অভাব বলে?

জনপদ পেরিয়ে বেশ কিছুটা চড়াই উৎরাই ভেঙে চলার পর একটা সরু পাহাড়ি পথ বেঁকে গেছে ডানদিকে। সেই পথের মুখে এসে প্রজ্ঞা বললেন, “আমার যাত্রা এখানেই ফুরোল। সমরোত্তম মেঘবর্ণ, আপনি এই দলের নেতা। আশা করি, সবাইকে নিয়ে অক্ষত দেহে ফিরে আসবেন আপনি। আপনাদের অভিযান সফল হোক।”

আর কোনো কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে চলতে শুরু করলেন তিনি। পর্বত এতক্ষণ চুপ করে ছিল। প্রজ্ঞা চলে যাওয়ার পর সে বলল, “ওঁকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আলোকপর্ণের মতো বদমাশের সঙ্গে ওঁর হৃদয়তা আছে ঠিকই, কিন্তু আবার কোথাও যেন পুরোপুরি নির্ভেজাল শয়তান বলে ভাবতেও কষ্ট হয়।”

বলেই তার খেয়াল হল, রাজকন্যা উর্মি সঙ্গে আছেন। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, “আমাকে ক্ষমা করুন, রাজকন্যা। আপনার সামনে আপনাদের সেনানায়িকা সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করা আমার উচিত হয়নি।”

উর্মি হাসলেন। “তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি। রাক্ষসদের যুদ্ধপ্রিয়তার জন্য আপনার ব্যক্তিগত জীবন যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার জন্য আমিই লজ্জা পাচ্ছি আপনার সামনে দাঁড়াতে। আজ যদি সবাই মিলে আপনার স্ত্রীকে উদ্ধার করে সুস্থ করে তুলতে পারি, তাহলে হয়তো আপনার ও তাঁর প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, তার কিছুটা উপশম হবে।”

ওরা যত এগোচ্ছে, পথটা ততই চওড়া হচ্ছে। উর্মি বললেন, “মহাসর্পিণীর গুহা আসলে চারদিক থেকে ঘিরে থাকা পাহাড়ের মাঝখানের একটুখানি ফাঁকা জায়গা। একটা খোলা হাতের আঙুলগুলো আকাশের দিকে তুলে রাখলে যেরকম দেখতে হয়, অনেকটা সেইরকম পাঁচটা পাহাড়ের চূড়া ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। খুব সাবধানে যেতে হবে ওখানে। সাপটা যদি টের পেয়ে যায় আমরা আসছি, তাহলে ও কিন্তু আক্রমণ করবে সঙ্গে সঙ্গে।”

অভী মাথা নাড়ল। চন্দ্রহাসকে কোমর থেকে খুলে নিয়ে হাতে ধরে রইল সে; অস্ত্রটার বক্ষিম ফলকে হালকা একটা সাদা আলো খেলে গেল একবার।

চলতে চলতে অভী মনে হচ্ছিল, ওদের পেছনে যেন কেউ আসছে। বার কয়েক মাথা ঘুরিয়ে সে তাকিয়েও দেখল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। উর্মি বললেন, “কী দেখছ, অভী?”

“মনে হচ্ছে যেন কে আমাদের অনুসরণ করছে।”

একটু রহস্যময় হাসি হাসলেন উর্মি; তারপর বললেন, “পাগল হয়েছে? মহাসর্পিণী অতি হিংস্র প্রাণী; এই বিপজ্জনক জায়গায় সাধ করে কে মরতে আসবে?”

সামনে পাহাড়চূড়াগুলো দেখা যাচ্ছে। বাস্তবিকই সেগুলোকে দেখলে মনে

হচ্ছে একটা খোলা হাতের পাঁচটা ধূসর আঙুল জেগে আছে আকাশের দিকে। ওদের মাঝখানে যেতে হবে তাদের। সেখানেই অপেক্ষা করে আছে মহাসর্পিণী।
অভী ভাবছিল, “রবিকাকা এখন কোথায়?”

মেঘবর্ণ বলল, “সবাই খুব সাবধান। সাপের কান নেই, কিন্তু মাটির খুব সামান্য কম্পনেই ও বুঝে যাবে, অনেক লোক আসছে। তাই অতি সাবধানে পা টিপে টিপে ঢুকবে সবাই গুহার মধ্যে।”

পথটা ঢালু হতে শুরু করেছে – ওরা নামছে দ্রুতগতিতে। পাহাড়চূড়াগুলোর খুব কাছে এসে পড়েছে ওরা। তাদের আকাশছোঁয়া সুবিশাল চেহারা দেখে অভীর যেন বুকের মধ্যে একটু কাঁপুনি হতে লাগল।

পর্বত বলল, “এই দিকে মনে হচ্ছে ঢোকার মুখটা। আস্তে আস্তে এসো।”

তাকে অনুসরণ করে ওরা চলল যথাসম্ভব কম শব্দ করে। উঁচু উঁচু পাথর দিয়ে ঘেরা আছে প্রবেশপথটা। অভীর মনে হল, সম্ভবত কোনো একটা ভূমিকম্পে উপর থেকে গড়িয়ে পড়েছে এই বিরাট পাথরের চাঁইগুলো – জমে আছে গুহামুখের সামনে মূর্তিমান বাধার মতো। বাতাস বইছে না খুব একটা; দুপুরের রোদে ঝলমল করছে চারদিক। সূর্য প্রায় মাথার উপরে – তাই বেঁটে বেঁটে ছায়াগুলো ঘুরছে পায়ের সঙ্গে সঙ্গে।

অভী ভাবল, পর্যাপ্ত আলো আছে, এই ভালো হয়েছে। যদি দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরের মতো অন্ধকারে এই জায়গায় আসতে হত, তাহলে ওই সাপের কাছ থেকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার আশা থাকত না।

এখনও অবশ্য খুব বেশি আশা না করাই ভালো।

হঠাৎ তার আবার মনে হল, কে যেন পেছন থেকে দেখছে তাদের। কিন্তু মাথা ফিরিয়ে ভালো করে দেখেও কাউকে নজরে পড়ল না। অবশ্য এ যা পাহাড়ি জায়গা – কেউ চাইলে অনায়াসে নিজেকে কোনো একটা টিপির আড়ালে লুকিয়ে রেখে নজরদারি চালাতে পারে।

মেঘবর্ণ আর পর্বত গুহামুখের সন্ধানে এদিক ওদিক দেখছিল। শেষমেশ মেঘবর্ণই খুঁজে পেল নতুন প্রবেশপথটা। সে ইশারা করে বাকিদের ডাকল।

ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখল, পাহাড়ের গায়ে ভেতরে ঢোকার মুখটা খুব একটা বড়ো নয়, তবে চাইলে এক এক করে ঢোকাটা কঠিন কিছু নয়। পর্বত বলল, “আমিই প্রথমে যাচ্ছি। যদি দেখো, আমাকে আক্রমণ করেছে, তাহলে...”

তাকে থামিয়ে দিয়ে উর্মি বললেন, “আমার একটা পরামর্শ আছে।”

পোশাকের মধ্য থেকে একটা ছোটো কাচের শিশি বার করে ওদের দেখালেন তিনি – তার ভেতরটা কালো একটা তরলে পরিপূর্ণ।

“গোটা মায়াজগতের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘুমের ওষুধ এটা। এই জিনিস যদি মহাসর্পিণীর রক্তে কোনোভাবে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে ঘুমিয়ে পড়বেই। আর যদি তাকে একবার ঘুম পাড়ানো যায়, তাহলে যে মণি সে পাহারা দিচ্ছে, সেটাকেও উদ্ধার করা যাবে, আর আমি তাকে অভিষেকমুক্ত করতে পারব।”

পর্বত বলল, “কিন্তু ওর চামড়ায় কোনো অস্ত্র কাজ করে না তো। রক্তে ওটা মেশাবেন কী করে?”

উর্মি বললেন, “আমি এই কথাটাই ভাবছিলাম এতক্ষণ। অভী, তোমার চন্দ্রহাস...”

অভী বলল, “আমি যদি চন্দ্রহাস দিয়ে মহাসর্পিণীকে আঘাত করি, তাহলে তাতে তার চামড়া কাটবে বটে, কিন্তু প্রাণীটার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু কেউ আটকাতে পারবে না।”

“আঃ, পুরোটা তো শোনো।” রাজকন্যা একটু অসহিষ্ণুভাবে হাত নাড়লেন। “তুমি আঘাত করবে না তাকে। যদি চন্দ্রহাসকে মাটিতে কোনোভাবে আটকে রাখা যায়, আর তার উপর দিয়ে সাপটা বুকে হেঁটে আসে, তাহলে?”

মেঘবর্ণ উত্তেজিত হাসিমুখে বলল, “শাবাশ! দারুণ বুদ্ধি। তার আগে শুধু চন্দ্রহাসের ফলকে আপনার ওই ঘুমের ওষুধটা ভালো করে মাখিয়ে রাখতে হবে। মহাসর্পিণীর সঙ্গে চন্দ্রহাস ছুঁলে তাতেই ওর চামড়া যত শক্তই হোক না কেন, কিছুটা কেটে যাবেই, আর তাতেই কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।”

অভী চমৎকৃত হয়ে বলল, “আর আপনি বলেন, আপনি যুদ্ধবিদ্যা বোঝেন না?”

উর্মি হেসে বললেন, “খুব একটা বুঝি না সত্যিই, কিন্তু যতই হোক, রাক্ষসের মেয়ে তো।”

শিশি খুলে কালো ওষুধটা একটু একটু করে ঢালতে লাগলেন উর্মি, আর সেটাকে খুব সাবধানে চন্দ্রহাসের ফলায় মাখাতে লাগল অভী। পর্বত আর মেঘবর্ণ সতর্কভাবে পাহারা দিতে লাগল ওদের।

পর্বত বলল, “আচ্ছা, স্বর্ণশেখর কোথায় থাকতে পারে বলো তো এখন?”

অভী বলল, “কাল দ্রষ্টাদেবী বলেছেন, সেও নাকি এখানে এসে উপস্থিত হবে যেকোনো মুহূর্তে।”

ওষুধ মাখানো চন্দ্রহাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। উর্মি সাবধান করে দিলেন, “অভী, নিজেকে বাঁচিয়ে। ওই ওষুধ একফোঁটা তোমার রক্তে মিশলে সঙ্গে সঙ্গে মহাঘুম নেমে আসবে কিন্তু।”

অভী মাথা নাড়ল। তারপর পর্বতের পিছু পিছু ওরা আস্তে আস্তে প্রবেশ করল তর্জনীর মতো দেখতে পাহাড়ের গায়ের গুহার মধ্যে।

ভেতরটা কেমন অন্ধকার; চন্দ্রহাস এই কালো ওষুধমাখা অবস্থাতেও জ্বলছে মৃদু সাদা আভায়। একটা জান্তব গন্ধ নাকে আসছে। গুহাপথে চলতে চলতে অভী বুঝতে পারছিল, এই ঢালু পথটা তাদের নিয়ে যাচ্ছে পাঁচটা আঙুলের মতো পাহাড় যেখানে হাতের তালুর মতো জায়গাটায় মিশেছে, সেইখানে।

পর্বত ছিল সামনে; হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে – ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে বলে উঠল, “শশশ!”

তার কাঁধের পাশ দিয়ে অভী দেখতে পেল সাপটাকে – স্থির হয়ে পড়ে আছে সে গুহার এককোণে। ঘুমোচ্ছে নাকি?

এতবড়ো সাপ সে জীবনে দেখেনি। প্রাণীটার প্রস্থ হবে তিনটে মেঘবর্ণের সমান, আর দৈর্ঘ্যটা সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে বলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বটে, তবে এইটুকু স্পষ্ট যে পুরোপুরি পাক খুলে গেলে আকারে তা বিরাট হবে।

এগোবে কিনা ভাবছিল সে, এমন সময় সাপটা মাথা তুলে তাকাল ওদের দিকে।

কী শান্ত, ঠান্ডা সে চোখের দৃষ্টি! চেরা জিভটা মুখের মধ্য থেকে একবার বেরিয়ে এল, আবার পরক্ষণেই ঢুকে গেল।

অভী বুঝতে পারছে, সাপটা দেখে নিয়েছে তাদের। কিন্তু এখনও ওটা তেড়ে আসছে না কেন? প্রতিপক্ষের ক্ষমতা মাপছে?

প্রতিপক্ষ নয়, সাপটা সম্ভবত ওদের 'শিকার' ভাবছে।

পর্বত পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওটার দিকে, নরম গলায় ডাকছে, “উত্তরা! উত্তরা!”

অভীর খুব মনে হচ্ছিল, পর্বত ভুল করছে; উত্তরা আর মানুষ নেই; পর্বতকে তার চিনতে পারার কথা নয়। দম বন্ধ করে ওরা তাকিয়ে রইল সামনের দিকে।

“উত্তরা! চিনতে পারছ আমাকে? আমি পর্বত। উত্তরা?”

সাপটা মাথা দোলাচ্ছে; ফণা নেই তার। গায়ের দাগ দেখে অভীর মনে হল ওটা অজগর জাতীয় সাপ। মাথাটা তুলছে সে, উঁচু হয়ে উঠছে – ইতিমধ্যেই পর্বতের মাথা ছাড়িয়ে আরও দু'হাত উঠে গেছে সে উপরে।

“উত্তরা, আমরা তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। আমাকে চিনতে পারছ না?”

উত্তরা বোধহয় ভাবল, ঢের হয়েছে, এবার এই লোকগুলোকে একটু শিক্ষা দেওয়া যাক। তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল, মুখের দু'দিকে দেখা গেল বিরাট দুটো দাঁত। সেই হাঁ-মুখটা তীব্রগতিতে নেমে এল পর্বতের উপর। মেঘবর্ণ চিৎকার করে উঠল, “সাবধান।”

পর্বত সাবধানই ছিল। লাফ দিয়ে সে সরে গেল পলকের মধ্যে; নয়তো ওই সাপের মাথার আঘাতেই তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল।

অভী উর্মিকে বলল, “আপনি এখানে থাকুন, আর এগোবেন না।”

চন্দ্রহাস হাতে নিয়ে সে লাফিয়ে পড়ল সাপটার সামনে; তার বাম পাশে পর্বত, ডানপাশে খোলা তরবারি হাতে মেঘবর্ণ। তিনজনে তারা ঘিরে ধরেছে মহাসর্পিনীকে, যদিও সাপটাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে একটুও ভয় পেয়েছে।

অভীর মনে হল, দুপুরে একটা চমৎকার ভোজের আশায় মহাসর্পিনী খুশিই হয়েছে।

তার হাতের চন্দ্রহাস জ্বলছে; এই অস্ত্র দিয়ে ওকে আঘাত করা যাবে না। অভী গুহার অসমান মেঝেতে খুঁজতে লাগল অস্ত্রটা কোথাও পুঁতে রাখা যায় কিনা।

পাথুরে মাটিতে সেইরকম ফাঁকফোকর খুঁজতে গিয়েই তার চোখে পড়ল এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে ভাঙা ডিমের খোল। সাপের ডিম নাকি?

মেঘবর্ণ তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল, নয়তো ওপর থেকে নেমে আসা সাপের বিশাল ছুরির মতো দাঁত বিঁধে যেত তার মাথায়। মেঘবর্ণের তরবারি আঘাত করল মহাসর্পিনীর গায়ে; ঠং করে আওয়াজ হল, কিন্তু আঁচড়টিও পড়ল না।

আঘাতটা করেই মেঘবর্ণ সরে গিয়েছিল, কিন্তু সাপটার সামনে পড়ে গেল পর্বত। সে কিছু করে ওঠার আগেই পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে নিল ভয়াবহ মহাসপিণী।

অভী হাতে ধরে আছে চন্দ্রহাস, কিন্তু কিছু করতে পারছে না। পর্বতের দম বন্ধ হয়ে আসছে এই ভয়ংকর কুন্ডলীর চাপে; তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে, চক্ষু বিস্ফারিত। সে বলার চেষ্টা করছে, “উত্তরা, আমি... আমি পর্বত!”

মেঘবর্ণ বলে উঠল, “আর কিছু করার নেই। পর্বতকে এভাবে মরতে দেওয়া যায় না। অভী, চন্দ্রহাস চালাও। এই সাপকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।”

সেই অবস্থাতেও পর্বত চেষ্টা করল, “না, না! একদম নয়!”

অভী মনস্থির করে নিল। মেঘবর্ণই ঠিক। পর্বত এভাবে মরে গেলে তারপর কী হবে? এই মহাসপিণী তখন অবধারিতভাবেই তাদের দিকে নজর দেবে। তার চেয়ে বরং...

সাপটার মুখ এগিয়ে আসছে পর্বতের দিকে – বোধহয় এইবার তাকে জ্যান্ত গিলে খাবে। মরণপাকে তাকে জড়িয়ে রেখেছে মহাসপিণী – তার চোখে চোখ রেখে পর্বত এখনও বিড়বিড় করে কীসব বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই মানবিক আবেদন আদৌ পৌঁছোচ্ছে না উত্তরার জান্তব মস্তিষ্কে। চন্দ্রহাস মাটিতে পোঁতার উপযুক্ত জায়গা একটা আছে বটে, কিন্তু অনেক দূরে; অতদূর পর্যন্ত সাপটা এখন কোনোমতেই যাবে না। আর কিছু করার নেই।

বাঁকা চাঁদের মতো উজ্জ্বল তরবারি হাতে নিয়ে অভী ঝাঁপিয়ে পড়ল মহাসপিণীর গায়ের উপর। সাপটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল; পর্বতকে নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিল বলে সে অভীর দিকে এতক্ষণ একটু কম মনোযোগ দিয়েছিল। অভী আঘাত করতে যাচ্ছিল তার মাথায়; চন্দ্রহাস নেমে আসছিল সাপটার উপরে, এমন সময়...

“অভী, থাম, সরে যা!”

অবাক হয়ে আঘাতটা করতে ভুলে গেল অভী। রবিকাকা লাফ দিয়ে এসে পড়েছে পর্বতের সামনে; তার হাতে দুটো পাকা বাঁশের লাঠি – একটা বড়ো, একটা ছোটো।

লাঠি ঘুরিয়ে একের পর এক অবিশ্রান্ত আঘাত করতে লাগল সে সাপটার গায়ে। অভী বলে উঠল, “রবিকাকা, ওর একটুও ব্যথা লাগছে না।”

রবিকাকা বলল, “জানি, কিন্তু ওর মনোযোগ আকর্ষণ করছি এইভাবে। একটা বুদ্ধি বার করেছি। আমার কাছে আয় এখনি।”

সাপটা বাস্তবিকই বিরক্ত হয়ে পর্বতকে তার বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে হিস্-হিস্ শব্দ করে তেড়ে এল রবিকাকার দিকে। হাঁ করে সে আঘাত করতে যেতেই রবিকাকা অসম্ভব ক্ষিপ্ৰতায় সরে গেল পাশে, আর সাপটার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল বাঁশের ছোটো লাঠিটা।

“অভী, এইবার!” চিৎকার করে উঠল সে।

অভী বুঝতে পারল কাকা কী বলতে চাইছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে সাপটা; চাইলেও হাঁ বন্ধ করতে পারছে না সে, এমন বেকায়দায় আটকে

আছে লাঠিটা তার মুখের মধ্যে। গুহাময় ছুটে বেড়াচ্ছে সে। অস্ত্রটা মাটিতে একজায়গায় গুঁজে সরে গেল অভী। রবিকাকা আর মেঘবর্ণ প্রায় সংজ্ঞাহীন পর্বতকে টেনে সরিয়ে আনল ওখান থেকে।

সাপটা ছুটে আসছে। অভী মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, “একবার! একবার অন্তত চন্দ্রহাসের স্পর্শ লাগুক ওর গায়ে।”

ছুটছে সাপটা; ওদের আবার দেখতে পেয়েছে সে। তেড়ে আসছে ওদের দিকেই। ওই যে, চন্দ্রহাস চাপা পড়ল ওর শরীরের তলায়। নিশ্চয়ই কেটেছে ওর ত্বক, নিশ্চয়ই ওষুধটা মিশেছে ওর রক্তে। তাও আপদটা এদিকেই ছুটে আসে কেন? তাহলে কি... তাহলে কি উর্মির ওষুধে কাজ হল না? পিছোতে পিছোতে ওদের পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে। ওই যে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে হিংস্র মহাসর্পিণী ওদের হত্যা করবে বলে! ওই যে তার বিরাট দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে বন্ধ না হওয়া মুখটা থেকে! চেরা জিভটা বারবার বেরোচ্ছে চড়াক চড়াক করে। উর্মি কাঁপছেন ওর পেছনে দাঁড়িয়ে। এই তাহলে শেষ!

ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে সাপটা, এমন সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। মহাসর্পিণী ভেসে উঠল শূন্যে। সে নিজে ভাসল না, কিন্তু যেন একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওদের থেকে দূরে। উর্মি বললেন, “খুব হয়েছে, এবার সামনে আয়।”

হাত বাড়িয়ে শূন্যে ভাসমান সাপটাকে দোলাতে দোলাতে গুহার মধ্য থেকে সামনে বেরিয়ে এল সুতসোম। মুহূর্তের মধ্যে অভীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, কেন তার মনে হচ্ছিল কেউ তাদের উপর নজর রাখছে।

সুতসোম লুকিয়ে অনুসরণ করছিল ওদের।

উর্মি বললেন, “ওষুধ কাজ করতে শুরু করেছে। ওই দেখ, মহাসর্পিণীর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে ঘুমে। এবার ওকে সাবধানে মাটিতে নামিয়ে আন।”

সুতসোমের হাতের ইশারায় মহাসর্পিণী ভাসতে ভাসতে নেমে এল গুহার মেঝেতে। অভী দেখল, সুতসোমের হাতের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে বেগুনি রঙের বজ্রমানিকের প্রতিচ্ছবি। মেঘবর্ণ আর রবিকাকা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সাপটার দিকে।

সুতসোম অভীর অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমরা কি ভেবেছিলে আমার মা আর মহারাজ তোমাদের সঙ্গে রাজকন্যাকে কোনো রাক্ষসপক্ষীয় সুরক্ষা ছাড়াই মহাসর্পিণীর গুহার মতো প্রচণ্ড বিপজ্জনক জায়গায় আসতে দেবেন? তবে হ্যাঁ, সমরগরিমার যোদ্ধাদের যা ক্ষমতা দেখলাম, তাতে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যুদ্ধবিদ্যা তোমরা ভালোই জানো।”

উর্মি একটু হেসে বললেন, “অভী, আমি জানতাম সুতসোম আসছে। কিন্তু কাউকে বলা বারণ ছিল। ওর উপরেও সেনানায়িকার আদেশ ছিল, যদি অবস্থা হাতের বাইরে যাচ্ছে মনে হয়, কেবল তখনই যেন আত্মপ্রকাশ করে।”

মেঘবর্ণ ডাকল, “রাজকন্যা উর্মি, মহাসর্পিণী ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার আপনার কাজ শুরু করে দিলে ভালো হয়।”

উর্মি তাকালেন বিশাল ঘুমন্ত সাপটার দিকে। পর্বত এতক্ষণে একটু সামলেছে; সে এসে দাঁড়াল তার স্ত্রীর একপাশে।

রবিকাকা এসে জড়িয়ে ধরল অভীকে। “কেমন আছিস, অভী?”

অভী অবাক হয়ে দেখছিল তাকে। এই মানুষটার সঙ্গেই তো কাটিয়েছে সে তার জীবনের প্রায় বেশিরভাগটা, অথচ লোকটা যে এত বড়ো একজন যোদ্ধা, সে আগে কখনও জানতেও পারেনি। ঢোঁক গিলে সে বলল, “ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?”

“মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শেষমুখের কিছু কথা সবাইকে বলার আছে আমার। সব কথা তোকে চিঠিতেও লিখিনি ইচ্ছা করেই। অধিনায়ক বজ্রধরকে বলেছিলি আমার কথাগুলো?”

অভী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর মারা গেছেন।”

বিস্ময়ে বাক্যস্ফূর্তি হল না রবিকাকার। তারপর সে বলল, “কী করে?”

মেঘবর্ণ পাশ থেকে বলল, “সে অনেক গল্প, রবি। আমি পরে বলব সব। আপাতত আমাকে একটু সাহায্য করো। এই গুহাতেই কোথাও আছে রক্তপদ্মরাগ মণি। ওটা খুঁজতে তোমাদের সবার সাহায্য লাগবে।”

সবাই খোঁজাখুঁজি শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু উর্মি বললেন, “তার দরকার নেই। আমি খুঁজে নিচ্ছি।”

চোখ বন্ধ করে কী যেন মনে মনে ভাবতে লাগলেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত পরে চোখ খুলে একটা বিশেষ দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, “সুতসোম, ওই জায়গায় আছে মণিটা। নিয়ে আয় না।”

সুতসোম সত্যিই গিয়ে পাথুরে দেওয়ালের সেই খাঁজ থেকে বার করে নিয়ে এল মণিটা। অভী অবাক হয়ে বলল, “আপনি জানলেন কী করে ওটা ওখানে আছে?”

উর্মি বললেন, “তোমাকে বলেছিলাম না, আমার মধ্যে জন্মগত রক্তপদ্মরাগ আছে। এইরকম মায়ামণি একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করে; রক্তপদ্মরাগ করে অন্য রক্তপদ্মরাগকে, বজ্রমাণিক করে অন্য বজ্রমাণিককে। এখানে আসার পর থেকেই আমি অনুভব করছিলাম ওইদিকেই কোথাও একটা আছে ওই মণিটা।”

সুতসোম জিনিসটা তাঁর হাতে দিতেই ওটার মধ্য থেকে বেরোতে লাগল একটা স্নিগ্ধ লালভ সাদা আলো – ঠিক এইরকম আলো বেরোতে অভী দেখেছিল উর্মির হাত থেকে দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে। মণিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি বিরাট সাপটার দিকে।

গুহার মেঝেতে পড়ে থাকা ডিমের খোলাগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে ভ্রুকুঞ্জন করলেন তিনি, কী যেন একটা বলতে গিয়েও বললেন না। তারপর কয়েকটা ওষুধের শিশি বার করে ঢাললেন রক্তপদ্মরাগ মণির উপর। মণিটাকে ভালো করে ওষুধে ভিজিয়ে নিতে নিতে তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, “ওষুধগুলো কাজ করে কেবল মাত্র মণিটার মায়াশক্তি আছে বলে। নয়তো শুধু এইসব ওষুধ প্রয়োগ করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।”

মহাসর্পিণীর শরীরটাকে তাঁর ইঙ্গিতে বাকিরা সবাই মিলে টেনে সরাল। অভী তুলে নিল মাটিতে পড়ে থাকা চন্দ্রহাস। উর্মি খুঁজে বার করলেন ওর শরীরের ঠিক কোথায় চন্দ্রহাসের আঘাতে বিদীর্ণ হয়েছে ত্বক; সেই জায়গায়

ওষুধমাখানো রক্তপদ্মরাগ চেপে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, “এবার সবাই পিছিয়ে যাও। সুতসোম, বস্ত্র আনতে বলেছিলাম। এনেছিস?”

একটা শাড়ি বার করে তাঁর হাতে দিল সে। অভীরা অপেক্ষা করতে লাগল।

তারপর তাদের চোখের সামনে ওই বিশাল সাপটার দেহ পরিবর্তিত হয়ে গেল একটা মানুষের দেহে – একটি যুবতী মেয়ে – অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সে গুহার মধ্যে। উর্মি গিয়ে শাড়িটা জড়িয়ে দিলেন তার গায়ে।

তারপর একটা সাদা রঙের গুঁড়ো তার নাকের সামনে কিছুক্ষণ ধরে রাখতেই জ্ঞান ফিরল তার। ঝাপসা দৃষ্টি মেলে সে তাকাতে লাগল চারপাশে, যেন কিছুই সে চিনতে পারছে না।

“উত্তরা!” বলে তার পাশে এসে বসল পর্বত। মেয়েটি একটু হাসল। অভীর মনে হল, পর্বতকে সে চিনতে পেরেছে।

পর্বত তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। উত্তরার মুখে কোনো ভাষা নেই – সে কেবল একটা হাত দিয়ে দুর্বলভাবে আঁকড়ে রইল পর্বতকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণিটা নিয়ে রবিকাকার সামনে এসে দাঁড়ালেন রাজকন্যা উর্মি। “সোজা হয়ে দাঁড়ান, সমরোত্তম স্বর্ণশেখর। আপনার কপালের একজায়গায় কেটে গেছে দেখছি; ওখানে এই মণিটি বসিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তাহলেই চিরস্থায়ী রূপান্তরের যে প্রভাব আপনার শরীরে এবং মনে পড়েছিল, তার থেকে মুক্ত হবেন আপনি।”

অভী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা, এই জীবনটার কথাগুলো ওঁর মনে থাকবে তো?”

উর্মি হেসে বললেন, “থাকবে। তোমার সঙ্গে কাটানো দিনগুলো উনি ভুলে যাবেন না। খালি যেসব কথা উনি এখন ভুলে গেছেন, সেইগুলো সব মনে পড়ে যাবে।”

রবিকাকার কপালের কাটা জায়গাটায় রক্তপদ্মরাগ চেপে ধরে রইলেন উর্মি। অভীর চোখের সামনেই চেহারা বদলাতে লাগল রবিকাকার। অল্প সময়ের মধ্যেই সে পরিণত হল সমরোত্তম স্বর্ণশেখরে – যে চেহারা একদিন অভীদের দেখিয়েছিল মেঘবর্ণ স্বপ্ন-উপলে।

অভী বলল, “আমাকে চিনতে পারছ, রবিকাকা?”

স্বর্ণশেখর একগাল হেসে বলল, “তোকে চিনতে পারব না, তাই আবার হয় নাকি রে?”

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অভী। ওই তো সেই ‘মায়াময়’ চোখগুলো। যাক, কাকার চেহারাটা একটু অন্যরকম লাগলেও মানুষটা সেই আগের মতোই আছে।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই তার চোখ চলে গেল পর্বত আর উত্তরার দিকে। পর্বত তখনও জড়িয়ে ধরে রেখেছে স্ত্রীকে, কিন্তু আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থাতেই উত্তরার একটা হাত মাটি থেকে চুপিসারে তুলে নিচ্ছে ভাঙা ডিমের খোলার

টুকরোগুলো। উর্মির দিকে তাকাতে সে দেখতে পেল, কপালে জ্রকুটি নিয়ে তিনিও ওই দৃশ্যটাই দেখছেন।

স্বর্ণশেখর বলল, “মেঘবর্ণ, অভী, আমার একটা ব্যাপার জানানোর আছে। আমি চিঠিতে ‘নরকবিষ’-এর কথা লিখেছিলাম, মনে আছে?”

অভী বলল, “আছে। কেন বলো তো?”

স্বর্ণশেখর বলল, “অতিরিক্ত ক্ষমতা আশ্ফালন করতে গিয়ে শেষমুখ ওই কথাটা আমার সামনে বেফাঁস বলে ফেলেছিল। নরকবিষ হল বজ্রমাণিকের বিষ – নরকের আগুনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিষ। ওই জিনিস ওরা গোটা সমরগরিমার উপর ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।”

মেঘবর্ণের মুখ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল। অভী বলল, “ওরা মানে কারা?”

স্বর্ণশেখর বলল, “কারা আবার? ঐশিকরা।”



॥ একাদশ অধ্যায় ॥ চিত্ররহস্য

নিধি যখন এসে পৌঁছোল, তখন অচেতন দিঙনাগের পাশে সেবাকক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল নীলাভ্র আর নীপা।

এই সেবাকক্ষটিতে রক্ষোবৈদ্যের অবাধ ক্ষমতা; সমরগরিমার আইন অনুযায়ী এখানে তিনি যেকোনো ব্যক্তির, এমনকি শত্রুরও চিকিৎসা করতে পারেন; তাতে নিয়ামকের কিছু বলার নেই।

নিধির একহাতে ঝুলছে রাজকন্যা উর্মির দেওয়া থলিটা, অন্যহাতে ত্রিশূল। সে এসে তার বাবার রোগশয্যার পাশে দাঁড়াল।

দিঙনাগের অজ্ঞান মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখে জল এসে পড়েছিল। চোখ মুছে নীলাভ্রর দিকে তাকিয়ে সে বলল, “সমরোত্তম নীলাভ্র, একে প্রতিজ্ঞা বলবেন তো প্রতিজ্ঞা, আর ভবিষ্যৎবাণী বলবেন তো ভবিষ্যৎবাণী। কিন্তু আমি আজ ঘোষণা করে রাখছি, যে অর্ধরাক্ষসদের উনি এত ঘৃণা করেন, তাদের হাতেই শেষ হবেন একদিন নিয়ামক বিনীতেশ।”

নীলাভ্র একটু হেসে বলল, “উঁহু, এসব কথা শুনলে নিয়ামক মহোদয় এখনই তোমাকে ‘দেশদ্রোহী’ ঘোষণা করে দেবেন, জানো না?”

নিধি বলল, “জানি, কিন্তু পরোয়া করি না।”

নিধির হাতের ত্রিশূলটা দেখে নীলাভ্রর কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল, কিন্তু সেকথা বুঝতে না দিয়ে সে বলল, “রক্ষোপুরীর কী খবর, বলো। কেমন বুঝলে ওখানের সব ব্যাপার স্যাপার?”

নিধি বলল, “ওরা মহাসর্পিণীর গুহায় যাবার তোড়জোড় করছিল, এমন সময় আমি চলে এলাম তো। তার পরের খবর আর কিছু পাইনি। তবে

সমরোত্তম শ্যামশ্রী বলেছেন, ওরা ওখান থেকে ফিরে এলে উনিও সমরগরিমায় ফিরবেন।”

রক্ষীপ্রধানের মৃত্যুসংবাদটা নিধিকে দিল নীলাভ। শুনে নিধি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, “এখানেও শেষমুখ? সে তো ওখানেও বার বার হানা দিচ্ছে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে প্রায় একসঙ্গে দুটো জায়গায় সে নির্বিবাদে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে কীভাবে? আর কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না-ই বা কেন?”

নীলাভ বলল, “এরকম অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কোনো মায়া আছে নাকি, জানো কিছু? আমি তো এমন মায়ার কথা শুনি নি কখনও।”

নিধি বলল, “আমারও জানা নেই। আর এ লোকটা তাহলে বলতে হবে শুধু অদৃশ্য হওয়ার মায়াই নয়, প্রচণ্ড দ্রুত এক দেশ থেকে পাশের দেশে যাওয়ার মায়াও জানে। সমরগরিমা থেকে মাল্যপর্বত খুব কম রাস্তা তো নয়।”

নীলাভ বলল, “এরকম কোনো মায়া আদৌ আছে কিনা, আমার সন্দেহ আছে। না থাকারই কথা। থাকলে শ্যামশ্রী অবশ্যই জানত। না নিধি, ওই শেষমুখটা অসম্ভব ধূর্ত লোক – ও এমন কিছু একটা বুদ্ধি বার করেছে, যেটা আমরা এখনও কেউ ধরতে পারছি না।”

বলতে বলতেই নিধিকে চোখের ইশারা করে চুপ করে থাকতে বলল নীলাভ; বাইরে অনেকগুলো পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে; শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত কণ্ঠস্বরও। নীলাভ মনে মনে বিরক্ত হল। আবার কিছুক্ষণ বাজে বকতে হবে লোকটার সঙ্গে।

দুম দুম করে পা ফেলে ভেতরে এসে ঢুকলেন নিয়ামক বিনীতেশ; সঙ্গে তাঁর আছে সৌজন্য আর চক্রবাক।

মৃদু হেসে নীলাভ বলল, “আসুন, আসুন নিয়ামক মহোদয়। আপনি যে অসুস্থ দিগ্‌নাগকে দেখতে এখানে পদধূলি দেবেন, আমি ভাবতেই পারিনি।”

নিয়ামক বললেন, “সেইজন্যই এখানে লুকিয়ে বসে আছেন, না? রক্ষীপ্রধানকে খুন করে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন?”

নীলাভ এতটাই অবাক হয়ে গেল যে উত্তর দিতে তার একমুহূর্ত দেরি হয়ে গেল। “মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি?”

নিয়ামক বললেন, “কী বলতে চাইছি, আপনি ভালোই বুঝতে পারছেন। কাল সন্ধ্যায় সবার সামনে আপনি লোকটার সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছেন সুদক্ষিণসারিতে, আর রাতে সেই লোকটার লাশ প্রথম আবিষ্কার করলেন সেই আপনিই। তাহলে খুনটা কে করেছে, বুঝতে আর একটুও অসুবিধা আছে মনে হয়?”

নীলাভ কথাটার উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগে নিয়ামক আবার বললেন, “আপনার বিরুদ্ধে আরও একটা গুরুতর অভিযোগ আছে। কর্তব্যরত সেনাকর্মীকে বাধা দিয়েছেন আপনি, তাকে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছেন।”

চক্রবাকের মুখে কুটিল হাসি; ভাবখানা, “কেমন ফাঁদে ফেলেছি?”

নীলাভ হা হা করে হেসে উঠল। “মাননীয় নিয়ামক, আমি মাঝেমধ্যে ভেবে অবাক হয়ে যাই, আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কতখানি শিশুসুলভ। আপনাদের

সুদক্ষিণসারি আক্রমণের পরিকল্পনা আমার কাছে আগে থেকেই কে ফাঁস করে দিয়েছিল, জানেন? ওই রক্ষীপ্রধান। উনি আপনাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র আমাকে আগাম জানিয়ে রাখতেন। আমার এই গোপন তথ্যের উৎসটিকে যে আমি নিজেই খুন করব না, সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আপনার এখনও আছে, এইটুকু আশা আমি রাখছি। দেহটা আমি আবিষ্কার করেছিলাম, কারণ চতুর হত্যাকারী সেটাই চেয়েছিল। আমি ছিলাম সংগ্রহশালায়; দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। হত্যাকারী এসে দেহটাকে দরজার পাশে রেখে টাকা দিয়ে পালিয়ে যায়, যাতে বেরোলেই ওটা আমার চোখে পড়ে।”

সৌজন্য বলল, “সমরোত্তম নীলাভ্র, আপনি যেমন বলছেন, তেমনটা হতেও পারে; নিতান্ত অসম্ভব কিছু নয়।”

একটু অবাক হলেও মুখে সেটা প্রকাশ না করে নীলাভ্র বলল, “আর একটা কথা। রক্ষীপ্রধানের আঘাতটা ছিল পিঠে। মানে, আততায়ী পেছন থেকে এসে চুপিচুপি ছুরি মেরেছিল তাঁকে। এইটুকু ভরসা আমি আপনাদের দিতে পারি, আমি যদি কাউকে মারতে চাই, তাহলে আঘাতটা কোনোদিন পিঠে হবে না, হবে শরীরের সামনের দিকে; বুঝেছেন?”

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললেন না। তারপর নীলাভ্র আবার বলল, “আর এই চক্রবাকের মতো কাঁচা ছেলের কথায় আপনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, নিয়ামক মহোদয়? তাহলে শুনে রাখুন, আপনার এই কর্তব্যরত সেনাকর্মীটি নিজে থেকে এসে আমার স্কন্ধে তরবারি স্থাপন করেছিলেন আমার মাথা নামিয়ে দেওয়ার সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে। অতএব আপনি যেটাকে ‘অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ’ বলছেন, সেটা আসলে ‘আত্মরক্ষা’ মাত্র। ওখানে ঠিক কী হয়েছিল, তার সাক্ষী আছে গোটা সুদক্ষিণসারি।”

চক্রবাক রেগে গিয়ে তোতলাতে লাগল। “আপনি... আপনি একটা রাষ্ট্রনির্ধারিত সেনা-অভিযানে ব্-বাধা দিয়েছেন, সমরোত্তম নীলাভ্র। এটা শ্-শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়?”

আবার হাসল নীলাভ্র। “আইন-টাইন খুব বেশি জানো না দেখছি, ছোকরা। তুমিও শোনো, আর আপনিও শুনুন নিয়ামক মহোদয়, আপনার যে সেনাবিভাগ দিয়ে আপনি যখন তখন অর্ধরাক্ষস পেটাতে পাঠান, তার আসল নিয়ন্ত্রক আমরা – সমরোত্তমরা। একবার যদি কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সমরগরিমার আইনবলে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নেবেন সমরোত্তমরাই। ঐশিকশ্রেষ্ঠ না থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর তৈরি করা আইন আমরা এখনও মেনে চলছি, তাই না? সেই আইন অনুযায়ী আপনি যখনই কোনো সেনা-অভিযানের পরিকল্পনা করবেন, সে ব্যাপারে আগে সমরোত্তমদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে আপনাকে। নয়তো সে অভিযানের কোনো বৈধতা থাকেনা।”

নিয়ামক উত্তেজিতভাবে কী একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে নীলাভ্র আবার বলল, “আপনি রাজা, আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন – এই অন্যায়, অসত্য কথাগুলো আর বলবেন না দয়া করে, নিয়ামক মহোদয়। হ্যাঁ, আপনার একটা সেনাদল আছে, একথা ঠিক; কিন্তু সেই

সেনাদলকে দিয়ে যখন যা খুশি তাই করানোর ক্ষমতা আপনার নেই, এইটুকু খুব ভালো করে জেনে রাখুন।”

বুনো জন্তুর মতো গরগর করতে লাগলেন নিয়ামক, কিন্তু কী বলবেন, খুঁজে পেলেন না। নীলাভ্র একবার দেখে নিল সৌজন্যকে; তার চোখ মাটির দিকে, কিন্তু ঠোঁটে খেলে বেড়াচ্ছে একটা হালকা হাসি। বুঝতে অসুবিধা হল না, নিয়ামকের এই অপমানটা সে দিব্যি উপভোগ করছে।

নীলাভ্র বুঝে পেল না, সৌজন্য আসলে কার দলে।

অনেকক্ষণ ধরেই মুখ খোলার জন্য উসখুস করছিল নিধি, এবার এগিয়ে এল সে। “মাননীয় নিয়ামক মহোদয়, আপনাকে কয়েকটা কথা বলার আছে আমার। আপনাদের মতো অর্ধরাক্ষসদেরও বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার আছে। আমরা জন্তুজানোয়ার নই যে আপনি যখন খুশি আমাদের বেঁধে আনতে পারেন, যাকে খুশি মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। বাঁচতে সবাই চায়; আপনি যদি আমাদের অন্যায় ভাবে মারতে চান, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া তো আসবেই।”

চক্রবাক তার তরবারি বার করে এগিয়ে গেল নিধির দিকে। “এইরকম উদ্ধতভাবে আমাদের মাননীয় নিয়ামকের সঙ্গে কখনও কথা বলবি না, অর্ধরাক্ষসী।”

নীলাভ্র এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু বেঁটেখাটো নীপা যে কাজটা করে বসল, সেটা বড়োই অদ্ভুত। নিধির কোমরের তরবারি টেনে বার করে সে আড়াল করে দাঁড়াল নিধি আর নীলাভ্রকে; কড়া গলায় বলল, “তুমিও গুনে রাখো, আমরা যাদের ভালোবাসি, তাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগলে আমরা তোমাদের দেখে নেব।”

নীলাভ্র হেসে ফেলল বাচ্চা মেয়েটার বীরত্ব দেখে। নীপার মধ্যে যে এতখানি তেজ লুকিয়ে আছে, সে এতদিন বুঝতে পারেনি।

চক্রবাক তরবারি উদ্যত করল, কিন্তু তার আগেই নিধির দীর্ঘ ত্রিশূলের অগ্রভাগ এসে ঠেকল তার গলায়। এইবার সৌজন্য হস্তক্ষেপ করল। “আঃ, চক্রবাক! কী হচ্ছে? এটা সেবাকক্ষ, ভুলে যেও না। সবাইকেই অনুরোধ করছি, এখানে অন্তত অস্ত্রপ্রদর্শন বন্ধ করুন।”

নীপা বলল, “ও-ই তো শুরু করল।”

সৌজন্য বলল, “অন্যায় করেছে। ...চক্রবাক, তরবারি নামাও। এখানে মারামারি শুরু করার অনুমতি তোমাকে কেউ দেয়নি।”

অনিচ্ছাসহকারে সে তরবারি কোষবদ্ধ করল। নিধি আর নীপাও অস্ত্র নামাল। নীলাভ্র এগিয়ে এল।

“চক্রবাক, তোমার শিরস্ত্রাণে আটকানো শকুনের পালক দেখে বুঝতে পারছি, ইতিমধ্যেই তুমি ‘রক্ষীপ্রধান’ পদে উন্নীত হয়েছ। সে-জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে স্পষ্ট করে বলে রাখছি আমি। যুদ্ধ যতদিন লাগেনি, ততদিন মনের সুখে নিয়ামকের পাদুকালেহন করে নাও। কিন্তু একবার যদি যুদ্ধ শুরু হয়, তখন বুঝবে, তোমার নিয়ামক তার বিন্দুবিসর্গও বোঝেন না। যুদ্ধে ওঁর সৈনিকরা যখন শত্রুর আক্রমণে জীবন বিসর্জন দেয়, তখন উনি পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসেন। কাজেই

তখন বেঁচে থাকার জন্য, সমরগরিমাকে রক্ষা করার জন্য এই সমরোত্তমদের সাহায্যই তোমার লাগবে। তোমার জায়গা আমাদের মতো যোদ্ধাদের সঙ্গে, চক্রবাক; ওই রাজনীতিবিদ নেতাদের সঙ্গে নয়।”

চক্রবাক মাথা নিচু করে রইল। বিনীতেশ বললেন, “যারা অন্যায় করেছে, রাষ্ট্র তাদের শাস্তি দেবে, এই ভরসা আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। অপেক্ষা করুন শুধু; দেখুন এরপর কী হয়।”

কথাটা বলে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি সেবাকক্ষ ছেড়ে।

নীলাভ হেসে নীপার পিঠ চাপড়ে দিল। “খুব সাহসী মেয়ে তুমি, নীপা। আমরা সবাইকে রক্ষা করি ঠিকই, কিন্তু সত্যি বলছি, কেউ যখন আমাদের রক্ষা করার জন্য অস্ত্র তুলে নেয়, তখন মনটা সত্যিই ভালো হয়ে যায়।”

নিধি হেসে উঠল। একটু লাল হয়ে গিয়ে নীপা তার দিদিকে তরবারিটা ফেরত দিল।

রক্ষোবৈদ্য এসে ঢুকলেন সেবাকক্ষে; ওদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “সপার্ষদ নিয়ামক মহোদয়কে যেতে দেখলাম এই পথ দিয়ে। এখানে পদধূলি দিয়েছিলেন নাকি?”

নীলাভ বলল, “হ্যাঁ, এসেছিলেন এখানে। তারপর আবার চলেও গেলেন।”

“বক্তব্য কী মহাপ্রভুর?”

“ওই যা হয়। নতুন সংযোজন – আমিই নাকি মেরেছি রক্ষীপ্রধানকে।”

রক্ষোবৈদ্য হেসে উঠলেন। “পুরো মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখছি। খুব অল্প পরিমাণে মায়াবিষ রক্তে মিশলে মানুষের এরকম পাগলামি হয় শুনেছি, যদিও বাস্তবে তার প্রয়োগ দেখিনি কখনও। তবে ঐর ব্যাপারটা অবশ্য...” বলে আবার হাসলেন তিনি।

নিধি বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, বাবার অবস্থা কেমন বুঝছেন? প্রাণের ভয় নেই তো?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে অবস্থা স্থিতিশীল। প্রাণটা বেঁচে যাবে, ও নিয়ে চিন্তা নেই। কিন্তু ওঁর বয়স হয়েছে; যাবতীয় উত্তেজনা থেকে ওঁকে দূরে রাখতে হবে, এটা মনে রেখো। আপাতত ঘুমের ওষুধ দিয়েছি; এখন দীর্ঘক্ষণ উনি ঘুমোবেন।”

নিধি তার হাতের থলি থেকে স্বপ্ন-উপলটা বার করে রক্ষোবৈদ্যের হাতে তুলে দিল। “এটা রাজকন্যা উর্মি পাঠিয়েছেন আপনাকে উপহার হিসাবে।”

“উর্মি?” রক্ষোবৈদ্যের মুখ খুশিতে ভরে উঠল। “আমার কথা বলছিল ও?”

“হ্যাঁ। আপনার প্রতি তাঁর খুব শ্রদ্ধা। আপনাকেই গুরু বলে মানেন তিনি।”

স্বপ্ন-উপলটা হাতের মধ্যে রেখে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রক্ষোবৈদ্য কিছুক্ষণ। “কী ভালো যে লাগছে! ওই নাতনিটাকে আমিও খুব ভালোবাসি, জানো তো নিধি? তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এটা এনে দেওয়ার জন্য।”

তাঁর উৎফুল্লতা দেখে নিধি তাকে দেওয়া উর্মির ছবির খাতাটাও তুলে দিল তাঁর হাতে। “এটা উনি আমাকে দিয়েছেন। আপনিই আপাতত এটা রাখুন, ছবিগুলো দেখুন। আপনার পুরোনো স্মৃতি মনে পড়বে অনেক। আমি পরে নিয়ে যাব আপনার কাছ থেকে।”

হাসিমুখে খাতাটা নিলেন রক্ষাবৈদ্য। তারপর আরও দু'একটা কথার পর তিনি নীলাভকে বললেন, “শেষে ওরা তোমাকে ধরেছে রক্ষীপ্রধানের খুনি হিসাবে?”

নীলাভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “সেটাই তো আমাকে অবাক করেছে। নিয়ামক বোকা ছিলেন, ক্ষমতালোভী ছিলেন, কিন্তু এতটা যুক্তিহীন উদ্ভাদ তো আগে ছিলেন না।”

রক্ষাবৈদ্য বললেন, “আমার মনে হয়, রক্ষীপ্রধান যে তোমাকে সংবাদ সরবরাহ করছিলেন, সে খবর কোনোভাবে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। এই খুন নিয়ামকের দলবলই করিয়েছে শেষমুখকে কাজে লাগিয়ে।”

নীলাভ বলল, “শেষমুখকে কাজে না লাগালেও হয়। একটা লোককে পেছন থেকে ছুরি মেরে খুন করে তার গলায় রেশমি রুমাল পেঁচিয়ে দিলেই মনে হবে, শেষমুখই মেরেছে লোকটাকে। কিন্তু সেখানেও একটা ব্যাপার। আমরা যে শেষমুখকে নিয়ে চিন্তিত, সেটা তো নিয়ামকের দলের কারও জানার কথা নয়। তাহলে কি এ আসল শেষমুখেরই কাণ্ড?”

নিধি বলল, “কিন্তু আসল শেষমুখের পক্ষে আপনার সঙ্গে রক্ষীপ্রধানের গোপন যোগাযোগ জেনে ফেলা কি আদৌ সম্ভব ছিল? আর রক্ষীপ্রধান আপনাকে নিয়ামকের কার্যালয়ের গোপন খবর দিয়ে যেতেন, এতে শেষমুখের কীই বা ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছিল, আমি বুঝতে পারছি না।”

নীলাভ মাথা নাড়ল। নিধির কথায় যুক্তি আছে।

তার চোখ পড়ল নিধির হাতের অঙ্গুষ্ঠের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গেই তার বুকটা কেঁপে উঠল। খুব শান্তভাবে সে জানতে চাইল, “ত্রিশূল চালনা কতদূর শিক্ষা করলে?”

নিধি বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, “খুব বেশি অনুশীলন করার সুযোগ এখনও হয়নি, কিন্তু এ যেন আমার হাতের অঙ্গ হয়ে উঠেছে, এতটাই ভালো চালাতে পারছি।”

গলার মধ্যে একটা “হুঁ” শব্দ করল শুধু নীলাভ।

নিধি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে সুদক্ষিণসারি চলে যাওয়ার পর নীপা একবার জিজ্ঞাসা করল, “সমরোত্তম নীলাভ, ত্রিশূল নিয়ে আপনি চিন্তিত কেন? কী হয়েছে?”

ত্রিশূলধর মায়ার কথা এই বাচ্চা মেয়েটাকে বলতে ইচ্ছা হল না তার। “কই, কিছু না। এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।”

রক্ষাবৈদ্য বসে বসে পাতা উলটে উলটে দেখছেন নিধির আনা উর্মির খাতাটা। কৌতূহলী হয়ে নীপাও এগিয়ে গেল সেইদিকে। ওদের সেবাকক্ষে রেখে নীলাভ বেরিয়ে এল বাইরে।

মাঠের উপর দিয়ে আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে সে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিল সহনিয়ামকের কার্যালয়টাকে। দেখে আপন মনেই একটু হাসি পেল তার। বাপ রে, সেবার ধরা পড়তে পড়তে অঙ্গের জন্য বেঁচে গেছে সে। সৌজন্য সম্ভবত ওই মেঝেতে পড়ে থাকা জলের রহস্যটা বুঝে উঠতে পারেনি। পারলে আকারে

ইঙ্গিতে ঠিক বুঝিয়ে দিয়ে যেত।

কিন্তু ওর ঘর থেকে ছবিটা যে উধাও হয়ে গেছে, সেটাও কি ও এখনও খেয়াল করেনি? নাকি চুপ করে কিল খেয়ে কিল চুরি করে বসে আছে?

ওটা কে যাচ্ছে সৌজন্যের কার্যালয়ের দিকে? আর ওরকম সাবধানীভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে যাচ্ছেই বা কেন? কে লোকটা?

নীলাভ চিনতে পারল তাকে – এর নাম সঞ্জীব – একজন অর্ধরাক্ষস। গত যুদ্ধে পর্বতের হাতে চঞ্চল মারা যাবার পর থেকে এ-ই ছায়াভবনের দায়িত্ব সামলায়। একে আগে একবারই দেখেছিল সে; বিশেষ কিছু না জানলেও এইটুকু সে জানে, এর বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই বজ্রধরকে মরতে হয়েছিল।

এই লোকটা এরকম চোরের মতো যাচ্ছে কেন সহনিয়ামকের কার্যালয়ে?

সঞ্জীবেরও চোখ পড়ে গেল তার দিকে। দু'জনের মাঝখানে দূরত্ব অনেক। একবার কী মনে করে থেমে গিয়ে সঞ্জীব হাঁটা শুরু করতে যাচ্ছিল তার দিকে, যেন নীলাভকে কিছু একটা বলার আছে তার; কিন্তু তারপর আবার মত পরিবর্তন করে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সৌজন্যের কার্যালয়ের দিকে।

একটু যেন সন্দেহজনক লাগছে ব্যাপারটা!

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নীলাভ। হয়তো ফেরার পথে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সঞ্জীব কিছু বলতেও পারে। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও সে আসছে না দেখে নীলাভ আবার উলটো পথে হাঁটা ধরল।

অনুশীলন মঞ্চের কাছে যখন সে এসে পড়েছে, তখন লীনার মা লতাদেবীর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়ে গেল তার। কালও একবার কথা হয়েছিল ঐর সঙ্গে। মহিলাকে দেখলে নীলাভর মনে হয়, সবসময় যেন কী হারানোর ভয়ে থাকেন তিনি।

লতাদেবী নমস্কার করে বললেন, “সমরোত্তম নীলাভ, সব কুশল তো?”

পালটা নমস্কার করে নীলাভ বলল, “হ্যাঁ, লতা। সব কুশল। তোমার মুখ শুকনো দেখছি কেন?”

তিনি বললেন, “লীনা কেমন আছে, মেঘবর্ণ কেমন আছে, কিছু সংবাদ পেয়েছেন?”

নীলাভ বলল, “লীনা ভালোই আছে। কাল বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, মেঘবর্ণ চিঠি লিখে জানিয়েছে, ওরা ওখানে নিরাপদেই পৌঁছেছে; কাজও এগোচ্ছে বিনাবাধায়।”

লতাদেবী মন্তব্য করলেন, “হুঁ, শুধু আমাকেই চিঠি লেখার সময় নেই ওর।”

নীলাভ তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করল। “আসলে রাক্ষসেরা ওদের খুব বেশি চিঠি লিখতে দেয় না তো। ও কিন্তু আমার কাছে তোমার কুশল সংবাদ নিয়েছে।”

“কেন মিথ্যে কথা বলছেন, নীলাভ? বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য?”

নীলাভ বলল, “মিথ্যে কথা বলছি না, লতা; বিশ্বাস করো। আয়তনে চিঠিটা এখনও রাখা আছে। তুমি চাইলেই আমি তোমাকে দেখাতে পারি।”

লতাদেবী বললেন, “আচ্ছা, তাই নাহয় হল। কিন্তু আপনারা আসলে এই যুদ্ধ জিনিসটাকে এত ভালোবাসেন যে যারা আপনাদের ভালোবাসে, তাদের খবর নেওয়ার আর সময় হয় না আপনাদের। সে-ও না হয় মানলাম; মেঘবর্ণ আমার ঘরের লোক হয়েছে মানে তরবারি আমার সতীন হয়েছে। কিন্তু আমি লীনার জন্য খুব দুশ্চিন্তায় আছি। মেঘবর্ণকে বিপদে ফেলতে পারে, এমন লোক দুনিয়ায় নেই বললেই চলে, আমি জানি। কিন্তু লীনা একটা অতি-উৎসাহী বাচ্চা মেয়ে, আর ভীষণ আবেগপ্রবণ। আমি কাল রাতেও খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি ওকে নিয়ে।”

নীলাভ্র জুঁকুঁচকে প্রশ্ন করল, “কী দেখেছ? কীরকম খারাপ স্বপ্ন?”

তিনি বললেন, “স্বপ্নটা যেন বড়ো বেশি জীবন্ত লাগছিল। দেখলাম, লীনার হাতে ধনুর্বাণ, কিন্তু একটা ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার যেন ওকে ঘিরে রেখেছে। অভী আছে, আর অন্য কে একজন আছে ওর সঙ্গে। ও কাঁদছে, ও অভীকে কী যেন বলছে, আর তারপর ও হাতের তিরটা ছুঁড়ে দিল ওই ধোঁয়ার মধ্যে। পরক্ষণেই দেখছি, ও ধনুকহাতে লুটিয়ে পড়ে আছে মাটিতে, একটুও নড়ছে না।”

নীলাভ্রের কপালের ভাঁজটা গভীরতর হল। “যেভাবে তুমি বর্ণনাটা দিলে, তাতে মনে হচ্ছে, ঘুমের সময় মাথার তলায় স্বপ্ন-উপল নিয়ে শুয়েছিলে। সত্যি করে বলো লতা, তাই না?”

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন লতাদেবী, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে “হ্যাঁ” বললেন।

তিরস্কারের সুরে নীলাভ্র বলল, “ঐ পাথরগুলো ভীষণ শক্তিশালী মায়াবস্ত্র, তুমি কি জানো না? অকারণে যদি প্রতিদিন ও জিনিস ব্যবহার করো স্বপ্ন দেখার জন্য, তাহলে তোমার পাগল হতে বেশিদিন লাগবে না। হ্যাঁ, ওরা ভবিষ্যতের কিছু দৃশ্য দেখাতে পারে, আমি জানি। কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার করতে থাকলে ওই পাথর তোমার চোখে আর ঘুম আসতে দেবে না, তোমাকে মানসিক রোগী বানিয়ে ছাড়বে। কথা দাও, আর তুমি স্বপ্ন-উপল ব্যবহার করবে না!”

লতাদেবী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। “আচ্ছা, কথা দিলাম। কিন্তু আপনিও আমাকে কথা দিন, আমার লীনার কোনো ক্ষতি হতে আপনি দেবেন না।”

নীলাভ্র কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর বলল, “লতা, আমি চাইলে তোমার কথার উত্তরে ছোট্ট একটা ‘হ্যাঁ’ বলে প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তু এই মিথ্যেকথাটা তোমাকে বলার ইচ্ছা আমার নেই। খুব খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা। অধিনায়ক বজ্রধর আর নেই। ঐরকম প্রভাবশালী একজন মানুষ যখন মারা যান, তখন একটা বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। এখন আমাদের অবস্থাটা ভেবে দেখো। ঐশিকরা আমাদের বন্ধু নন, রাক্ষসরাও নয়। সমরগরিমাকে বিপদে ফেলতে পারলে এরা সবাই বেশ খুশি হয়। শুধু লীনা নয়, আমাদের সকলের সামনেই এখন বড়োরকমের বিপদ অপেক্ষা করে আছে।”

লতাদেবী তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। নীলাভ্র বলে চলল, “তুমি লীনার সুরক্ষার কথা ভাবছ। মা হিসাবে তার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু ভেবে

বলো তো, লীনা নিজে কি সেই সুরক্ষা পেতে চায়? সমরগরিমার একজন গর্বিত যোদ্ধা তোমার মেয়ে; যদি দরকার পড়ে, অন্যদের প্রাণরক্ষার জন্য নিজের জীবন বাজি রাখতে সে দু'বার ভাববে না বলেই আমার ধারণা। তাই আমি এই কথা তোমাকে দিতে পারছি না যে, লীনার কোনো ক্ষতি আমি হতে দেব না। তুমি স্বপ্ন-উপলে কিছু একটা দেখেছ বলে তোমার ভয় হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি। যা দেখেছ, তা সত্যি হবে কিনা, তাও আমার জানা নেই। কিন্তু সহজ কোনো উত্তর আমি তোমাকে দিতে পারছি না, লতা। এ সহজ উত্তরের সময় নয়।”

লতাদেবী স্নান হাসলেন। “আপনার এই ব্যাপারটা আমার বেশ লাগে, নীলাভ। মেঘবর্ণ হলে এত বড়ো বজ্রতার বদলে স্রেফ একটা ‘হ্যাঁ’ বলে আশ্বাস দিয়ে আমাকে চুপ করিয়ে দিত।”

নীলাভ বলল, “কিন্তু আমি মেঘবর্ণ নই। লীনার জন্য তোমার দুশ্চিন্তার কারণ আমি বুঝতে পারছি, লতা। ভুলো না, আমার ছেলেটাও ওই একই জায়গায় লড়াই করছে ওই একই শত্রুর বিরুদ্ধে। সমরগরিমার বাইরে প্রায় প্রত্যেকে এবং সম্ভবত সমরগরিমার মধ্যেও কেউ কেউ চায়, ও মরে যাক। কিন্তু আমার তবু দুশ্চিন্তা করা চলবে না। আমাকে দুশ্চিন্তা করতে দেখলে শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। আমাদের অবস্থাটা খুব একটা আলাদা নয়। আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবা-মা – আমাদের ছেলেমেয়েগুলো যেন আসন্ন যুদ্ধ থেকে অক্ষতদেহে বেঁচেবর্তে ফিরে আসে, এইটুকুই আমাদের সবচেয়ে বড়ো চাওয়া।”

লতাদেবীকে বিদায় করে অনুশীলন মঞ্চে কিছুক্ষণ বসে রইল সে; তরবারি নিয়ে একটু অভ্যাস করল। এখনও শরীরে জোর ফেরেনি আগের মতো; তবে রক্ষাবৈদ্যের দেওয়া ওষুধটা যে কাজ করছে, সেটা সে বুঝতে পারছে। আগের চেয়ে একটু ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। কিন্তু মাথার মধ্যে নানা চিন্তা ঘোরাফেরা করছে তার – অভী, পর্বত, শ্যামশ্রী, বজ্রধর, স্বর্ণশেখর; নরকের সেই অগ্নিময় দৃশ্যগুলোও বারবার ফিরে আসছে মনে। কেমন যেন অস্বস্তি হয় ওই কথাগুলো মনে পড়লেই।

আবার নতুন চিন্তা জুটেছে একটা – শেষমুখ।

সন্দীপ, অরিত্র, দেবদত্ত তিনজন শিক্ষার্থী এগিয়ে আসছে এইদিকে। নীলাভকে দেখে তারা সামনে এসে নমস্কার করল।

সন্দীপ প্রথম প্রশ্ন করল, “অভী কেমন আছে, সমরোত্তম নীলাভ?”

নীলাভ বলল, “ভালো আছে। ওরা মহাসর্পিণীর গুহায় অভিযানে যাবে, এতদূর খবর পেয়েছি। কিন্তু তার পরের সংবাদ এখনও এসে পৌঁছয়নি আমার কাছে।”

দেবদত্ত বলল, “সমরোত্তম সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রীও কি মাল্যপর্বতেই গেছেন?”

নকল চিঠির কথাটা শিক্ষার্থীদের বলাটা উচিত মনে করল না নীলাভ। সে বলল, “হ্যাঁ, উনি ওখানেই গেছেন একটা জরুরি দরকারে। খুব শীঘ্রই ফিরে আসবেন।”

সবচেয়ে ভয়ানক প্রশ্নটি এবার করে বসল সন্দীপ। “আচ্ছা, রক্ষীপ্রধানকে কে মারল, আপনি আন্দাজ করতে পারেন?”

এই প্রশ্নের উত্তর ওদের জানা দরকার বলে মনে হল নীলাভ্র। সে খুব সংক্ষেপে শেষমুখের ইতিহাস শুনিয়ে দিল ওদের। শুনে ছেলে তিনটে হাঁ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অরিত্র বলল, “কিন্তু আমাদের রক্ষীপ্রধানকে মেরে ওই খুনিটার কী লাভ?”

নীলাভ্র স্বীকার করল, “সেটাই বুঝতে পারছি না।”

সন্দীপ আবার বলল, “আরেকটা ব্যাপার আপনাকে বলব ভাবছি ক’দিন ধরেই। নিয়ামকের কার্যালয়ের মধ্যে তো আমাদের যাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু মাঝেমধ্যেই দেখছি, ওখান থেকে গোরুর গাড়িতে করে ঢাকা দিয়ে কীসব মালপত্র যেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পীতপত্রবনে। গাড়ির চালককে প্রশ্ন করলে সে একটা কথাই বলে, ‘নিয়ামকের আদেশে বনে যাচ্ছি। এর বেশি বলা বারণ।’ আমরা খেয়াল করে দেখেছি, গাড়িটা যায় ভর্তি হয়ে, কিন্তু ফিরে আসে খালি হয়ে।”

নীলাভ্র মনে পড়ে গেল, গাড়িভর্তি মোম যাচ্ছিল পীতপত্রবনে নিয়ামকের আদেশে – সে নিজে দেখেছিল। সে বলল, “জানি। আমার চোখেও পড়েছে ওরকম গাড়ি। কিন্তু...”

আর কিছু সে বলার আগেই দূর থেকে ভেসে এল রক্ষোবৈদ্যের আহ্বান। “সমরোত্তম নীলাভ্র! শীঘ্র আসুন একবার।”

শিক্ষার্থীদের মুখের দিকে তাকাল একবার নীলাভ্র। ওরাও তার মতোই ভেবেছে, বোধহয় কোনো বিপদ হয়েছে – নিয়ামক বোধহয় আবার কোনো সমস্যা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে অসি নিষ্কাশন করে ছেলেগুলো বলে উঠল, “কী হয়েছে, বলুন? আমরাও সঙ্গে যাব।”

মাঠের উপর দিয়ে প্রায় দৌড়ে আসছেন বৃদ্ধ রক্ষোবৈদ্য। নীলাভ্র বলল, “কী হয়েছে? দিঙনাগের অবস্থার অবনতি হল নাকি?”

অরিত্র বলল, “নাকি নিয়ামক মহোদয় আপনাকে কিছু বলেছেন? তা যদি উনি বলে থাকেন, তাহলে আজ...” তরবারি ঘোরাল সে শূন্যে।

রক্ষোবৈদ্য হাত তুলে বললেন, “না বাবা, ওসব কিছু নয়। দিঙনাগও ভালো আছেন; প্রাণের ভয় নেই। জ্ঞানও ফিরে এসেছে তাঁর। ভাবছি, আজ বিকেলের দিকে সেবাকক্ষ থেকে ছেড়ে দেব তাঁকে। কিন্তু ওসব নয়, অন্য একটা জরুরি ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলার আছে আমার।”

নীলাভ্র বলল, “এখানে বলবেন? না আয়তনে?”

শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে রক্ষোবৈদ্য বললেন, “তোমরা কিছু মনে কোরো না বাবারা, তোমাদের সমরোত্তমকে আমি একটা বিশেষ দরকারে একবার আয়তনে নিয়ে যাচ্ছি।”

শিক্ষার্থীরা হেসে মাথা নাড়ল। ওরা দু’জন সরে এলেন অনুশীলন মঞ্চের কাছ থেকে। নীলাভ্র বলল, “কী হয়েছে, খুলে বলুন তো এবার।”

“না, আগে সেবাকক্ষে চলো।”

অগত্যা দু'জনেই হেঁটে চললেন হনহনিয়ে মাঠের সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে। নীলাভ লক্ষ্য করল, রক্ষাবৈদ্য ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন। ভয়ও পেয়েছেন কি একটু?

সেবাকক্ষে এসে নিধির দেওয়া সেই খাতাটা নীলাভর হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। “দেখো শুধু জিনিসটা। নিয়তির খেলা ছাড়া আর কী বলবে একে?”

“কী বলুন তো?” খাতাটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছিল নীলাভ। ভেতরে সারি সারি ছবি – বেশিরভাগই রক্ষাপুরীর নানা জায়গার, বিভিন্ন ধরনের শিল্পবস্তুর। কোনো কোনো পাতায় অভিজাত কিছু রাক্ষসের ছবিও আছে। “আপনি বরং দেখিয়ে দিন, কোন্ জিনিসটা দেখে আপনি এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।”

খাতার কয়েকটা পাতা উলটে একজায়গায় এসে থামলেন রক্ষাবৈদ্য; আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলেন একটা বিশেষ ছবিকে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। সঙ্গে সঙ্গে ছবিটাকে চিনে ফেলল নীলাভ।

“আরে, এই ছবিরই আরেকটা জোড়া তো লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলাম সৌজন্যের ঘর থেকে।”

“হ্যাঁ। ছবিতে সৌজন্যের পাশে দাঁড়ানো মেয়েটাকে দেখছ? ওর কাছে যে ছবিটা ছিল, তাতে এর মুখটাকে কেমন ধারালো ছুরিজাতীয় অস্ত্র দিয়ে ফালাফালা করেছিল, মনে আছে?”

“আছে। কিন্তু মেয়েটা কে?”

রক্ষাবৈদ্যের মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। ভয়ার্তমুখে তিনি বললেন, “ও রাজকন্যা উর্মিমালা।”

নীলাভ চমকে উঠল। “মাল্যপর্বতের রাজকন্যা? তার মানে...”

“তার মানে, আমাদের সহকারী নিয়ামক মহোদয় বড়ো সহজ লোক নন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মাল্যপর্বতের রাক্ষসপুরীর সঙ্গে তাঁর কোনো একটা সম্পর্ক অবশ্যই আছে। আর যেভাবে ছবিতে রাজকন্যার মুখের উপর তিনি ছুরি চালিয়েছেন, তাতে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, সম্পর্কটা খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।”



।। দ্বাদশ অধ্যায় ।। বজ্রমাণিক

বাইরে থেকে এসে উর্মি মেঘবর্ণের হাতে রক্তপদ্মরাগ মণিটি তুলে দিলেন। “এই নিন। সেনানায়িকা প্রজ্ঞা আসছেন এদিকে, দেখে এলাম। উনি এলে এটি দিয়ে দেবেন ওঁকে। পাশের কক্ষে এই মণি দিয়ে যতটুকু কাজ করার ছিল, আমি করে এসেছি।”

ওরা বসেছিল রাজকন্যা উর্মির বৃহত্তর সেবাকক্ষে। শয্যার উপরে অচেতনের মতো পড়ে আছে পর্বতের স্ত্রী উত্তরা। তার চিকিৎসা চলছে রাজকন্যার তত্ত্বাবধানে। কয়েকটি সেবিকা সবসময় ঘিরে রেখেছে তাকে।

উর্মি আবার কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রজ্ঞাকে ঢুকতে দেখে চুপ করে গেলেন। তিনি গম্ভীর মুখে এসে দাঁড়ালেন কক্ষের মধ্যে। “সমরোত্তম মেঘবর্ণ।”

তাঁর প্রসারিত হাতে রক্তপদ্মরাগ মণিটি রেখে দিল মেঘবর্ণ। “এই নিন, আমাকে ঋণমুক্ত করুন।”

মণি নিয়ে প্রজ্ঞা ফিরলেন উর্মির দিকে। “রাজকন্যা উর্মি, একবার দয়া করে বাইরে আসুন। একটা কথা আছে।”

উর্মি বেরিয়ে গেলেন প্রজ্ঞার সঙ্গে। কক্ষের মধ্যে অভী, মেঘবর্ণ, লীনা আর স্বর্ণশেখর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল। প্রজ্ঞার মুখ বরাবরই গম্ভীর থাকে, কিন্তু আজ যেন স্বাভাবিকের থেকেও গম্ভীরের মাত্রাটা একটু বেশি।

ওরা গুনতে পেল উর্মি বলছেন, “না, না, একদম নয়। ওতে কিন্তু বিপদ বাড়বে, আমি সাবধান করে দিচ্ছি আপনাকে।”

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা, তারপর সম্ভবত প্রজ্ঞা চলে গেলেন; উর্মি আবার এসে ঢুকলেন কক্ষে। তাঁর ভ্রুকুণ্ডন দেখে অভী অনুমান করল, প্রজ্ঞার সঙ্গে কথা বলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি।

মেঘবর্ণ বলল, “রাজকন্যা, কেমন বুঝছেন উত্তরার শরীরের অবস্থা?”

উর্মি বললেন, “খুব ভালো বলতে পারি না। প্রাণের ভয় নেই, ঠিকই; কিন্তু চিরস্থায়ী রূপান্তর মায়া জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওর উপর। সমরোত্তম স্বর্ণশেখর, আপনিও এই মায়ার অধীনে দীর্ঘকাল ছিলেন, কিন্তু আপনার শরীর শক্তসমর্থ ছিল, এবং আপনি স্বেচ্ছায় এই মায়া নিজের শরীরে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাই আপনার উপর এর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়েনি। কিন্তু এই মেয়েটির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকম হয়নি। একে ওই মায়া দেওয়া হয়েছিল অভিশাপ হিসাবে – ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আপনি এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের চেহারায়ে ছিলেন, কিন্তু একে মানুষ থেকে সরীসৃপ বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতির নিয়মের এতটা বিরুদ্ধাচরণ করা ভালো নয়। এতে লাভের বদলে ক্ষতিই হয়েছে মেয়েটার।”

লীনা বলল, “কীরকম ক্ষতির কথা বলছেন?”

“মহাসর্পিণী যে জাতের সাপ, তার দাঁতে অল্প হলেও বিষ থাকে। মায়াবলে রূপান্তরিত মানুষ কোনোদিন সেই বিষের আধার হতে পারে না। ওই বিষ ধারণ করার ফলে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ওর গলার। সম্ভবত উত্তরা আর কোনোদিন কথা বলতে পারবে না।”

অভী বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। উর্মি বললেন, “আরও একটা ব্যাপার আছে। রাক্ষসজাতির একটি মেয়ে হিসাবে আমারও কথাটা বলতে লজ্জা করছে। এই অনাবশ্যক হিংস্রতাকে প্রশ্রয় দেওয়া আমি কোনোদিন সমর্থন করিনি। মহাসর্পিণীর গুহায় ভাঙা ডিমের খোলার টুকরো দেখেছিলেন কেউ?”

অভীর মনে পড়ে গেল দৃশ্যটা। সে বলল, “আমি দেখেছিলাম।”

উর্মি দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন। “সেই ডিমের টুকরো এখনও ওর হাতের মুঠোর মধ্যে আছে। প্রথমটা কিছুতেই ছাড়তে চায়নি, তারপর অজ্ঞান করে ওর মুঠো থেকে বার করেছি সেগুলো।”

স্বর্ণশেখর বলল, “কিন্তু কেন? ওগুলো এল কোথা থেকে?”

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন উর্মি। তারপর বললেন, “সম্ভবত পর্বতও জানত না। উত্তরাকে যখন আলোকপর্ণ শাপ দিয়ে চিরস্থায়ী রূপান্তরমায়া প্রয়োগ করে মহাসর্পিণীতে পরিণত করে, তখন ও গর্ভবতী ছিল।”

কক্ষসুদূর সকলে স্তম্ভিত হয়ে রইল। উর্মি আবার বললেন, “মাস দেড়েক বয়স ছিল সম্ভবত ভ্রূণটার। হঠাৎ মায়ের দেহ মায়াবলে সরীসৃপ হয়ে যাওয়ার ধকল পেটের বাচ্চাটা নিতে পারেনি। সরীসৃপের দেহে মানুষ বা রাক্ষসের বাচ্চার বেঁচে থাকা সম্ভবই নয়। ভাঙা ডিমের খোলাগুলো কীসের, এবার বুঝতে পারছ?”

মেঘবর্ণ আর স্বর্ণশেখর একসঙ্গে বলে উঠল, “পর্বত জানে না?”

“সম্ভবত না। জানলে বলত নিশ্চয়ই। সেরে উঠুক আগে, তারপর জিজ্ঞাসা করে দেখা যাবে।”

অভী জানে, পাশের সেবাকক্ষে আহত পর্বতেরও চিকিৎসা চলছে। শ্যামশ্রী আছেন তার কাছে। মহাসর্পিণীর ওই প্রচণ্ড বাঁধনে পড়লে কোনো সাধারণ মানুষ হলে মরেই যেত। নেহাত পর্বতের চেহারাটাও বিশাল আর গায়ে দানবের মতো শক্তি, তাই প্রাণটা রক্ষা পেয়েছে তার।

উর্মি আবার বললেন, “পর্বতের যে অভিশাপ ছিল, সেটাও কাটানো গেছে রক্তপদ্মরাগ দিয়ে।”

পর্বতের অভিশাপ? অভীর মনে পড়ে গেল, সে শুনেছিল, পর্বতকে কখনও মরতে না পারার অভিশাপ দিয়েছিল আলোকপর্ণ। তা নিয়ে পর্বত তার কাছে একবার দুঃখও করেছিল – সেই প্রথম পরিচয়ের সময় – তার আয়তনে আসার দিনে।

মনটা খারাপ লাগছিল অভীর। সে বলল, “লীনা, একটু বাইরে যাবে?”

লীনা সঙ্গে সঙ্গে রাজি। “চলো।”

বাকিদের রেখে ওরা বেরিয়ে এল সেবাকক্ষের বাইরে। সুবিশাল, আলো-ঝলমলে অলিন্দপথে বিকেলের রোদ এসে পড়ছে। জায়গায় জায়গায় জলের ফোয়ারা; কোথাও সিংহ, কোথাও ঈগল, কোথাও নেকড়ের মুখ দিয়ে এসে পড়ছে স্বচ্ছ, সুন্দর জলধারা – এসে পড়ছে বিশাল মর্মরনির্মিত জলাধারে। তাদের পাশে বসবার জায়গা করা আছে সাদা সবুজ পাথর দিয়ে। স্নান করার জন্য প্রাসাদের মাঝেই কৃত্রিম পুষ্করিণী, তাতে খেলা করছে রাজহংসী। দেখতে দেখতে অভীর মুখ নিজের অজান্তেই গম্ভীর হয়ে উঠছিল।

লীনা সেটা খেয়াল করেছিল। “সেই বৃদ্ধার কথা মনে পড়ছে, না?”

“হঁ। এদের কী অটেল জল, অথচ দেশের লোক একফোঁটা জল বেশি নিতে চাইলে চুরির দায়ে ধরা পড়ে।”

লীনা বলল, “দিলে এদের কম পড়ে যাবে, এমনটাও কিন্তু নয়। কিন্তু দিয়ে দিলে পাছে মরুময়ের সংস্থা থেকে আর কেউ জল না কেনে, তাই রাজাকে দিয়ে তিনি এই ব্যবস্থা করিয়েছেন। রাজাও অফুরন্ত জলের লোভে এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিয়ে বসে আছেন। আমি রাজকন্যার কাছে শুনেছি, মরুময়ের মেঘ তৈরির কারখানা আছে প্রাসাদের বাইরে। সেখান থেকেই জল সরবরাহ করেন উনি গোটা রাজ্যে – তবে যে উপযুক্ত দাম দেয়, শুধু তাকে।”

অভী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। “নিধির বাবা কেমন আছেন, কে জানে।”

লীনা বলল, “আমিও একটু আগেই ভাবছিলাম ওঁর কথা। ভেবে দেখো, আর কেউ আহত হল না, শুধু উনিই হলেন। আমার তো মনে হয়, উনি নিজেই হয়তো আগ বাড়িয়ে কোনো ঝামেলা বাধিয়ে থাকবেন। অকারণেই একটু বেশি মাথা গরম করেন ভদ্রলোক।”

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে দাঁড়াল একটা বিরাট জলাধারের সামনে। পাথরের শকুনের মুখ দিয়ে এসে পড়ছে ধারা; এই জলাধারের পাথরগুলো লাল রঙের, তাই মনে হচ্ছে, লাল রঙের একটা তরল যেন ভর্তি করে রেখেছে জায়গাটাকে। ওটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অভী। একবার আড়চোখে চেয়ে দেখল লীনাকে। সে মন দিয়ে দেখছে গোলাকার জলাধারের জলের উপর কেমন গোলাপি আভার ফেনাগুলো পাক খেতে খেতে সরে যাচ্ছে কেন্দ্র থেকে

দূরে। আরেকটু তার কাছে সরে দাঁড়াল অভী। শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লীনাকে দেখতে খুব ভালো লাগছিল তার।

এই জায়গাটায় ওদের মাথার উপরের সাদা পাথরের ছাদে লাল-গোলাপি চৌকো কাচ বসানো আছে; ফলে রোদটা এসে পড়ছে লালচে আলোর চতুষ্কোণ হয়ে। লীনার চুলগুলো থেকেও কেমন লাল আভা বেরোচ্ছে। কথাটা তাকে বলে হেসে ফেলল অভী।

লীনাও হাসল। “অভী, তোমাকেও এই আলোতে বেশ লাগছে কিন্তু।”

“সত্যি?”

“মিথ্যে বলবই বা কেন?”

“না, এমনি জানতে চাইছি। আজ অবধি কেউ তো কোনোদিন বলেনি।”

লীনা তার মাথায় চাঁটি মারল। “আসলে নিজের প্রশংসা শুনতে ভালো লাগছে, সেই কথাই বলো।”

“আচ্ছা, তাই নাইয় হল। লীনা, তোমাকেও...”

“আমাকে কী?”

কথা না বলে অভী হাত বাড়াল, লীনাও বাড়িয়ে দিল হাত। দু’জন দু’জনের হাত ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অভীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন অনাস্বাদিতপূর্ব খুশিতে ভরে উঠতে লাগল।

তারপর লীনা তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, “অভী, সত্যি?”

তার চোখের দিকে চেয়ে অভী বলল, “সত্যি।”

মিষ্টি করে হাসল লীনা। অভীও হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই নিতান্ত অকারণেই তার মনে পড়ে গেল দ্রষ্টাদেবীর সেই ভবিষ্যৎবাণী। “আমি তোমার মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। ভয়াবহ মৃত্যু।” দৃশ্যগুলো জেগে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। ওই অন্ধকার গুহা, সামান্য আলোকবৃত্তের মধ্যে ওরা দু’জন, দ্রষ্টাদেবীর উন্মত্ততা, আলোর বাইরে হিংস্র পশুর মতো ওত পেতে বসে থাকা জীবন্ত আঁধার – সব মিলিয়ে পুরো পরিবেশটার মধ্যে যে বুক কাঁপানো আতংকটা ছিল, সেটা যে তাকে ভেতরে ভেতরে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সেকথা সে কাউকে বলতে পারেনি। উর্মিকেও সে অনুরোধ করে রেখেছিল, উনি যেন তার মৃত্যুসংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণীর কথাগুলো কাউকে না বলেন। অভিজ্ঞতাটা মনে পড়তে নিজের অজান্তেই তার বুকটা একটু কেঁপে উঠল।

তার হাতটাতে একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল লীনা। “পায়ের শব্দ পাচ্ছি। কে যেন আসছে এদিকে।”

সত্যিই দু’জন লোক আসছে – স্বর্ণশেখর আর প্রফুল্ল। অভীকে দেখে স্বর্ণশেখর বলল, “অভী, চল একটু বেরনো যাক। পর্বত বা তার স্ত্রীকে নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। আমরা এবার একটু নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করতে পারি।”

প্রফুল্ল বলল, “প্রলয়যোদ্ধা, আপনাকে মহামন্ত্রী মরুময় স্মরণ করেছেন। তাঁর সংস্থা ‘ধারামান’-এ আপনাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। আপনি কি যেতে ইচ্ছুক?”

অভী আর লীনা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। মেঘ তৈরির কারখানায় ভ্রমণ! লীনা বলল, “মন্দ কী? নতুন অভিজ্ঞতা হবে। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। এরকম জিনিস আমিও কোনোদিন দেখিনি।”

স্বর্ণশেখর বলল, “অতি উত্তম। প্রফুল্ল, তুমি নিয়ে যাবে তো আমাদের?”

প্রফুল্ল বলল, “আমি আপনাদের নিয়ে যাব মহামন্ত্রী মরুময়ের কাছ পর্যন্ত। তারপর রাজকন্যা উর্মিমালার কাছে ফিরে আসতে হবে আমাকে। ওঁর যাবতীয় কাজকর্ম আমাকেই তত্ত্বাবধান করতে হয় তো। আমি না থাকলে ওঁর অসুবিধা হয়। মন্ত্রীমশাই নিজেই ব্যবস্থা করবেন আপনাদের নিয়ে যাওয়ার।”

অভী, লীনা আর স্বর্ণশেখর চলল প্রফুল্লের সঙ্গে প্রাসাদভবনের বাইরে। মহামন্ত্রী মরুময় ওদের দেখে স্মিতহাসি হেসে এগিয়ে এলেন। অভী লক্ষ্য করল, হাঁটার সময় একটু খুঁড়িয়ে চলছেন তিনি।

ওদের সামনে এসে নমস্কার করলেন তিনি। “প্রলয়যোদ্ধা অভী, সমরোত্তম স্বর্ণশেখর, যোদ্ধা লীনা, আপনাদের সকলকে আমি আমার ‘ধারান্নান’-এ নিয়ে যেতে চাই। এরকম মায়া-সংস্থা আপনারা সমরগরিমায় দেখেননি, আমি নিশ্চিত। ওখানে গেলে আপনাদের সময়টা যে মন্দ কাটবে না, এইটুকু কথা আমি আপনাদের দিতেই পারি।”

স্বর্ণশেখর বলল, “চলুন। আমরাও যাব বলেই এসেছি।”

অভী বলল, “কতদূরে আপনার ধারান্নান? আমরা যাব কীসে? জটায়ুতে চেপে?”

মরুময় হাসলেন। “না, পায়ে হেঁটেই যাওয়া যায়। মাল্যপর্বতের সবচেয়ে দামী জিনিস মায়াবলে তৈরি হয় ওখানে – বর্ষার মেঘ। কাজেই রাজপ্রাসাদ থেকে খুব একটা দূরে ইচ্ছা করেই তৈরি করিনি নির্মাণশালাটা। অভাবগ্রস্ত মানুষই হোক বা রাক্ষস – তাদের কখনও বিশ্বাস করতে নেই। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, শুনেছ নিশ্চয়ই কথাটা? বলা তো যায় না, কার মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপে, মহামন্ত্রী মরুময়ের মেঘ-নির্মাণশালায় জল পাওয়া যায়, তাহলে ওখানেই আক্রমণ করে জল লুট করা যাক। তাই রাজপ্রাসাদের কাছেই আছে ধারান্নান – রাজার সেনাবাহিনীর সুরক্ষা পাওয়া সহজ হয় তাতে।”

লোকটিকে অভীর আদৌ ভালো লাগছিল না। রাক্ষসদের বেশির ভাগের মধ্যেই একধরনের অনাবশ্যক হিংস্রতা আছে, যুদ্ধপ্রিয়তা আছে, এটা সে আগেও দেখেছে। কিন্তু এই মরুময় লোকটা যেন অন্যরকম। ভীষণ চতুর তো বটেই, অন্য রাক্ষসদের মতো নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নিতেও তাঁকে অতটা উৎসাহী মনে হয়না। কিন্তু এসব বাদ দিলেও তাঁর মধ্যে সাধারণ নাগরিকদের জীবনের প্রতি একটা অদ্ভুত উদাসীনতা আছে, যেন তারা বাঁচল কি মরল তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। নিজের চিন্তাতেই যেন তিনি বিভোর; অন্য কারও কথা ভাবার সময়টুকুও তাঁর নেই। যদিও অভী জানে, বাইরে থেকে মরুময়কে যতই নিষ্পৃহ দেখাক, সবদিকে নিশ্চিতভাবেই তাঁর কড়া নজর থাকে, নতুবা মাল্যপর্বতের মহামন্ত্রীর পদ অধিকার করে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

জলের মতো জীবনের অত্যাৱশ্যকীয় জিনিস নিয়ে যিনি ব্যাবসা করছেন, তাঁর যে বুদ্ধি এবং শক্তি কোনোটারই অভাব নেই, সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি অভীর আছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে অভীর কানের কাছে মুখ নিয়ে তিনি হঠাৎ বললেন, “তোমাদের অধিনায়ক বজ্রধরকে আমি চিনতাম। উনি বেঁচে থাকলে আবার দেখা হত নিশ্চয়।”

অভী এর উত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। একটু হেসে মাথা নাড়ল সে শুধু। মরুময় আবার বললেন, “সমরগরিমায় আমি গেছি আগে। আবার যাওয়ার ইচ্ছা আছে।”

অভী ভদ্রতা করে বলল, “অবশ্যই আসবেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব।”

রহস্যময় হাসি হেসে মরুময় বললেন, “যাব তো বটেই। তবে তোমরা আনন্দিত হবে কিনা... আচ্ছা, সে কথা এখন থাক। এই যে আমরা এসে পড়েছি।”

তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অভী খেয়াল করেনি, এখন বিশাল মেঘনির্মাণশালার প্রবেশফটকের সামনে এসে তার মুখ হাঁ হয়ে গেল। লীনা বলল, “আচ্ছা, এত বড়ো জায়গাটাকে আমরা যখন জটায়ুতে করে আসছিলাম তখন আকাশ থেকে দেখতে পাইনি কেন?”

মরুময় বললেন, “খুব গোপন জায়গা তো। রাজ্যের আয়ের একটা অন্যতম উৎস বলতে পারো এই মেঘ-নির্মাণশালাকে। হ্যাঁ, আমি যা উপার্জন করি, তার একটা মোটা অংশ কোষাগারেও যায়। সেই কারণেই সুরক্ষামায়া দিয়ে ঘেরা আছে জায়গাটা। যারা জানে না, তারা দেখতেও পায় না একে।”

সশস্ত্র প্রহরীরা ঘিরে রেখেছিল প্রবেশফটক। মরুময়ের চোখের ইশারায় তারা দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

টোকার আগে তার চোখে পড়ল ফটকের বাইরে একটা কাঠের খুঁটি থেকে ঝুলছে বিশাল একটা ধাতব ঘণ্টা। মরুময় সেদিকে তাকে তাকাতে দেখে বললেন, “ওটা বিপদঘণ্টা। এ জায়গা যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে এখানের রক্ষীরা ওই ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে রক্ষোপুরীর সব সেনা ছুটে আসবে এই নির্মাণশালা রক্ষা করার জন্য।”

ভেতরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এক এক করে ঢুকে পড়ল ওরা। ফটক আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সামনে বিরাট বিরাট ধূসর থামের মতো জিনিস দেখতে পাচ্ছিল অভী। তার মনে হচ্ছিল, এগুলো নির্ঘাত কোনো শক্ত পাথরের তৈরি ফাঁপা নলের মতো জিনিস হবে। সম্ভবত এদের মধ্য দিয়ে মায়াবলে জল প্রবাহিত করে মেঘ তৈরির কাজটা করেন মরুময়।

স্বর্ণশেখর বলল, “খুব বেশি লোকজন চোখে পড়ছে না তো, মহামন্ত্রী মরুময়।”

মরুময় বললেন, “দরকার নেই, তাই রাখিনি। এই বৃষ্টিনির্মাণ মায়া আমি ছাড়া আর কেউ জানেও না। আর মায়াবিদ্যা জানা থাকলে খুব বেশি শ্রমদানের লোকের দরকারও পড়ে না। যত কম লোক এই নির্মাণশালার মধ্যে ঢোকে, ততই ভালো, বুঝলেন না? মায়াবলে আমি বৃষ্টির জল তৈরি করতে পারি, কিন্তু কেউ যদি সে জল চুরি করতে চায়, তাকে তো আর মায়াবলে আটকে দিতে পারি না। তাই যে ক’জন লোক এখানে আছে, তারা সবাই সশস্ত্র প্রহরী।”

হাতির পায়ের চেয়েও মোটা থামগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা। এত উঁচু তাদের মাথা, মনে হচ্ছে যেন আকাশ ছুঁয়েছে। সেগুলোর চারপাশে দু'মানুষ উঁচু লোহার খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘেরা আছে। লীনা এসে দাঁড়িয়েছিল অতীর পাশে। সে ফিশফিশ করে বলল, “অতী, ভালো করে দেখো। থামগুলোর গায়ে আলো খেলছে, বুঝতে পারছ?”

লোহার প্রাকারের একদম কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। অতী এইবার প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠল।

যে থামগুলোকে সে কালচে ধূসর পাথরের তৈরি নলজাতীয় কিছু ভাবছিল, সেগুলো আসলে বিরাট বিরাট কালো ধোঁয়ার মতো কোনো একটা পদার্থের স্তম্ভ ছাড়া কিছু নয়। ধোঁয়াটা ঘুরছে স্তম্ভের মধ্যেই, আর তার মধ্যে লীনা যে আলো দেখেছিল সেটাও সে দেখতে পেল এবার।

সাধারণ আলো নয়, বিদ্যুৎ। আর এগুলো ধোঁয়ার স্তম্ভ নয়, এগুলো...!

মরুময় পাশ থেকে তৃপ্তস্বরে বললেন, “মেঘ। এদের ধরে রাখা হয়েছে এই জায়গায় বৃষ্টিনির্মাণ মায়ার দ্বারা।”

দানবিক মেঘস্তম্ভগুলোর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল ওরা। মাথা উঁচু করে তাকালেও কোথায় যে তাদের শেষ হয়েছে আকাশের গায়ে, এই এত নিচ থেকে বোঝাই যাচ্ছে না। মরুময় বললেন, “এরা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। যারা আমাকে যতখানি স্বর্ণমূল্য দান করে, তাদেরকে আমি ততখানি মেঘ থেকে বৃষ্টি দিই।”

সারা রাজ্যের জল-সরবরাহ কীভাবে তিনি হাতের মুঠোয় নিয়েছেন, এইবার বুঝতে পারছে অতী। এই বিপুল পরিমাণ জলের ভাণ্ডার দেখতে দেখতে সেই অর্ধরাক্ষস বৃদ্ধা স্নিগ্ধার কাতর মুখটা মনে পড়ে গেল তার।

স্বর্ণশেখর তার পাশে এসে ফিশফিশ করে বলল, “লোকটা বিপজ্জনক রে, অতী। এই পরিমাণে মেঘ বানিয়ে রাখতে গেলে যে অকল্পনীয় পরিমাণে জল লাগে, সেটা ও পেল কোথায়? একই সঙ্গে ভেবে দেখ, গোটা মাল্যপর্বতের প্রায় সব জলাশয় শুকিয়ে গেল কেন?”

অতী তাকাল তার দিকে। “রবিকাকা, তুমি বোধহয় ঠিকই ধরেছ। এইজন্যই রাজকন্যা উর্মি একে আড়ালে ‘জলপিশাচ’ বলেন।”

মরুময় একটি পাথরের উঁচু আসনে বসে আছেন; সম্ভবত বেশি হাঁটাহাঁটি করতে তাঁর কষ্ট হয় বলেই তিনি বসে পড়েছেন। সেখান থেকে ডেকে তিনি বললেন, “কেমন লাগছে আপনাদের এই মেঘনির্মাণশালা?”

স্বর্ণশেখরের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সে বলল, “নির্মাণশালার থেকে একে মেঘের গুদামঘর বলেই মনে হচ্ছে বেশি। এত মেঘ নিয়ে কী করেন আপনি?”

মরুময় বললেন, “উহু, মেঘ নয়, সমরোত্তম মহোদয়, এ হল স্বর্ণমুদ্রার খনি। এই মেঘ বিক্রি করে রাজকোষে কী বিরাট পরিমাণে আয় হয় তাবুন একবার।”

স্বর্ণশেখর বলল, “শুধু রাজকোষ নয়, আপনার ব্যক্তিগত কোষাগারও এতে যথেষ্টই পুষ্টি পায়, আন্দাজ করতে পারছি।”

মরুময় হাসলেন। “তাতে আপত্তি করছে না তো কেউ।”

অভী বলে ফেলল, “করলেই বা শুনছে কে?”

মরুময় অপমানটা যেন গায়েই মাখলেন না। “ঠিক, শোনার কেউ নেই। যাক, ওসব কথা ছাড়ো। কেমন লাগছে বলো জায়গাটা?”

লীনা বলল, “এই মেঘগুলোকে বন্দি করলেন কী করে?”

মরুময় বললেন, “তার জন্য বিশেষ ধরনের মায়া আছে। সেই মায়াপ্রয়োগে জলকে মেঘের আকারে আটকে রাখা হয়েছে এখানে। আমি না চাইলে মাল্যপর্বতে বৃষ্টি হয় না, জানো তো?”

অভী বলল, “কিন্তু আপনি চাইছেন না কেন? লোকগুলোর যে জলের ভীষণ অভাব।”

মরুময় অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন; তারপর বললেন, “প্রলয়যোদ্ধা, তুমি যুদ্ধবিদ্যা ভালোই জানো, কিন্তু রাজনীতি কীভাবে করতে হয়, তোমার বিশেষ জানা নেই। রাজ্যশাসন করতে গেলে প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করবে, বলো তো?”

“কীভাবে?”

“খুব সহজে। ওদের যা নেই, সেই জিনিসটি ওদের দেবার প্রতিশ্রুতি দাও। ওদের যে জিনিস দরকার অথচ পাচ্ছে না কিছুতেই – যে জিনিসের অভাব আছে ওদের, সেই জিনিস তুমি চাইলে ওদের দিতে পারো, এই কথাটুকু ওদের বুঝিয়ে দাও। ওরা পোষা কুকুরের মতো তোমার পায়ে পায়ে ঘুরতে থাকবে।”

শুনতে শুনতেই ঐশিকশ্রেষ্ঠের বলা কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল অভীর। এ তো সেই পুরোনো ঐশিক-ধ্যানধারণারই একটা নতুন রূপ! সাবধান হয়ে গেল সে। স্বর্ণশেখর ঠিকই বলেছিল। এ লোকটা বিপজ্জনক – এর চিন্তাধারার মধ্যেই একটা অশুভ ব্যাপার আছে।

মরুময় বলতে লাগলেন, “ক্ষমতা কাকে বলে, জানো? অন্যের কাজকর্মকে প্রভাবিত করতে পারার নামই ক্ষমতা। এই মেঘ আমাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে। স্বয়ং রাজা পুনর্বসুও জানেন, আমি যদি অসন্তুষ্ট হই, তাহলে গোটা রাজ্যের জল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। আমাকে হত্যা করেও লাভ নেই তাঁর, কারণ এই মায়া আর অন্য কেউ জানে না। আমি না থাকলে পুরো রাক্ষসের দেশ শুকিয়ে মরবে জল না পেয়ে। এইবার বুঝতে পারছ, আমার ক্ষমতা কতখানি?”

অভী চুপ করে রইল। স্বর্ণশেখর বলল, “রাক্ষসদের মধ্যে এতজন উত্তম মানের মায়াধর আছেন। কেউ তো চাইলেই আপনার এই মায়াকে চুরি করে নিজের কাজে লাগাতে পারেন।”

মরুময় বললেন, “মায়া অনেক রকম হয়, জানেন তো? মনুষ্যমায়া, রাক্ষসমায়া ইত্যাদি হল মাঝারি থেকে উত্তম মানের মায়া। কিন্তু এই বৃষ্টিনির্মাণ? এ হল সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে কঠিন ঐশিক মায়াগুলির একটি। একে কাজে লাগানোর ক্ষমতা মানুষ তো দূরের কথা, কোনো রাক্ষসসন্তানেরও নেই। এই বিশেষ ঐশিকমায়া আয়ত্তে থাকার সুবিধা অনেক, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়।”

কেউ কোনো উত্তর দিল না, যদিও বুঝতে সবাই পারছিল। অভী আরেকবার দেখল মেঘের স্তম্ভগুলোর দিকে। কালো ধোঁয়া পাক খাচ্ছে তাদের মধ্যে, ঝিলিক দিয়ে উঠছে আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের রেখা। মরুময় বললেন, “কী প্রলয়যোদ্ধা, আরেকটু কাছ থেকে দেখার ইচ্ছা আছে নাকি?”

অভীর বেশ কৌতূহল হচ্ছিল। সে মাথা নেড়ে বলল, “দেখতে পেলেন মন্দ হত না।”

মরুময় এগিয়ে এলেন। “সমরোত্তম স্বর্ণশেখর, আপনি যোদ্ধা লীনাকে নিয়ে এখানে থাকুন। আমি প্রলয়যোদ্ধাকে আরেকটু কাছ থেকে বন্দি মেঘের অবস্থাটা দেখিয়ে নিয়ে আসছি।”

লীনা বারণ করার জন্য মুখ খুলেছিল, স্বর্ণশেখরও ‘না’ বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অভী বলল, “ঠিক আছে, তোমরা থাকো। আমি এই সামনেই আছি। ভয়ের কিছু নেই।”

মরুময়ের সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে গেল সে লোহার খুঁটির বেড়া দিয়ে ঘেরা সুবিশাল স্তম্ভগুলোর দিকে। আর তারপরেই মেঘস্তম্ভগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল শেষমুখ।

তাকে দেখেই পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল স্বর্ণশেখর আর লীনা। “অভী, সাবধান! সাবধান!”

মরুময় মৃদু হাসলেন। “এই ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য খুব উৎসুক ছিলেন, অভী।”

অভী ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে আছে শেষমুখের দিকে। পেছন থেকে পাওয়া পায়ের আওয়াজে সে বুঝতে পারছে, দৌড়ে আসছে লীনা আর স্বর্ণশেখর। কিন্তু মরুময় অত বোকা নন নিশ্চয়ই। এই মেঘ তৈরির কারখানা দেখাতে আনার অজুহাতে তাকে শেষমুখের সামনে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁর আগে থেকেই করা ছিল। লীনাদের মতো অতিরিক্তদের আটকানোর ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই তিনি করে রেখেছেন।

কোমরে হাত চলে গেল অভ্যাসবশেই, এবং চমকে উঠতে হল তাকে। চন্দ্রহাস সঙ্গে নেই। কোনো অস্ত্রই সঙ্গে নেই তার। মুখোশধারী শেষমুখ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কোমরে হাত দিয়ে; তার অসহায়তা উপভোগ করছে সে।

পেছনে তাকাল অভী। স্বর্ণশেখর নিরস্ত্র। লীনার হাতে ধনুর্বাণ আছে বটে, কিন্তু...

ওদের দিকে হাত তুলে মায়াপ্রয়োগ করলেন মরুময়। একটা কাচের দেয়াল জেগে উঠল অভী আর লীনার মধ্যে। দেয়ালের এ পাশে তাঁর সঙ্গে রয়ে গেল অভী আর শেষমুখ, ও পাশে লীনা আর স্বর্ণশেখর। একটা তির ছুড়েছিল লীনা শেষমুখকে লক্ষ্য করে; সে তির মায়াকাচের দেয়ালে ঠেকে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

মরুময় শান্তকণ্ঠে বললেন, “এই শেষমুখ মানুষ মারতে বেশ পারদর্শী, তুমি জানো নিশ্চয়ই। ও আবার তোমার উপর খুব একটা প্রসন্ন নয়। আমাকে ও বলছিল, তোমার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের একটা সুযোগ করে দিতে, যাতে তোমার উপর ওর যা পুষে রাখা পুরোনো রাগ-টাগ আছে, সেগুলোর

একটা শোধবোধ করে নিতে পারে। আমি ভাবলাম, মন্দ কী? তোমাকে নিয়ে ঐশিকদের বিরাট সব পরিকল্পনা আছে, আমার কাছে সে সংবাদ এসেছে। কিন্তু যদি তার আগেই তুমি শেষমুখের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মরে-টরে যাও, তাহলে আর প্রলয় আসার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এই সব ভেবে আমিও রাজি হয়ে গেলাম ওর সঙ্গে তোমার একটা মুখোমুখি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে। এবার তোমরা তোমাদের হিসাব বুঝে নাও। আমি শুধু দর্শকাসন থেকে পুরো যুদ্ধটা দেখেই খুশি থাকব।”

অভী দারুণ অবাক হয়ে গেল। তার উপরে শেষমুখের পুরোনো রাগ পুষে রাখার কারণ কীই বা হতে পারে? সে তো লোকটাকে চেনেও না আজ পর্যন্ত।

শেষমুখের হাতে উঠে এল তরবারি। তার গায়ে ঝিলিক দিচ্ছে বেগুনি রঙের আলো। স্বর্ণশেখর বলল, “লীনা, ওই লোকটার দেহে অন্তর্লীন বজ্রমাণিক আছে। বেশ শক্তিশালী মায়াধর মনে হচ্ছে ওকে। ওর হাতের অস্ত্রে বজ্রমাণিকের ক্ষমতা দান করেছে ও। ওই তরবারির সামান্য আঁচড়ও কিন্তু দারুণ বিষাক্ত হতে পারে।”

লীনা তার পিঠের তূণীর থেকে একটা বিশেষ তির বার করে সংযোজন করল ধনুকে। অভী এই ভয়টাই পাচ্ছিল; সে বারবার তাকিয়ে দেখছিল এইদিকেই। লীনাকে এদিকে লক্ষ্যস্থির করতে দেখেই চিৎকার করে উঠল, “না, লীনা। একদম ওটা নয়! ওই বাণ খুলে নাও ধনুক থেকে! রবিকাকা, ওকে আটকাও!”

লীনা মাথা নাড়ল। স্বর্ণশেখর বলল, “লীনা, অভী এই বাণ নিষ্ক্ষেপ করতে তোমাকে নিষেধ করছে কেন?”

লীনা বলল, “এতে হৃদয়শর মায়া আছে।”

স্বর্ণশেখর চমকে উঠে বলল, “সে কী! আরে, থামো, থামো। অভীর উপর ভরসা রাখো। এই বাণ খুলে নাও, লীনা।”

লীনা কিন্তু লক্ষ্যস্থির করেই রইল। “অভীর উপর ভরসা আমার আছে। কিন্তু তবুও...”

শেষমুখ এগিয়ে আসছে অভীর দিকে। অভী জানে, এই যুদ্ধে যেভাবেই হোক তাকে জিততে হবেই – নিজের জন্য, লীনার জন্য।

এখানে মরলে চলবে না। এই হতভাগা মহামন্ত্রী মরুময়কেও উচিত শিক্ষা দিতে হবে যথাসময়ে।

শেষমুখ তরবারি হাতে নিয়ে প্রদক্ষিণ করা শুরু করেছে তাকে। অভীর হাতে একটা লাঠিও নেই। শেষমুখ চাপাগলায় বলে উঠল, “উর্মির এত কাছে সবসময় ঘেঁষে থাকো কেন, প্রলয়যোদ্ধা?”

অভী চমকে উঠল। এই তাহলে ব্যাপার?

তার মানে উর্মির সঙ্গে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক আছে এই শেষমুখ লোকটার? কিন্তু এ যে একেবারেই অসম্ভব। আর যাই হোক, একটা খুনে লোকের সঙ্গে সম্পর্ক জড়ানোর মতো মানুষ বলে তার মনে হয়নি রাজকন্যাকে। কিন্তু তা না হলে কেনই বা শেষমুখ তাকে...?

আর ভাবার আগেই তরবারি নিয়ে তেড়ে এল শত্রু। অভী কোনোক্রমে একপাশে সরে গিয়ে আঘাতটা এড়াতে পারল।

ওদের চারপাশে উঁচু হয়ে আছে মোটা মোটা মেঘের স্তম্ভগুলো। তাদের ফাঁক দিয়ে ছুটতে লাগল অভী শেষমুখকে এড়িয়ে। উদ্যত তরবারি হাতে শেষমুখ পিছু ধাওয়া করল তার। মরুময় একপাশে বসে বসে হাসতে লাগলেন।

ছুটতে ছুটতেই অভী বুঝতে পারছিল, তার মধ্যে ঘৃণা জাগছে। গরিব, অসহায় রাক্ষসদের পানীয় জলটুকু আটকে রেখে তা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য মরুময়ের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হচ্ছে তার। নিতান্ত অকারণেই তার সঙ্গে উর্মিকে জড়িয়ে একটা হত্যাকারী ধমক দিচ্ছে তাকে, সেজন্য শেষমুখের প্রতিও প্রচণ্ড ঘৃণা হচ্ছে তার। হাতগুলো ঠান্ডা হচ্ছে, নীল হয়ে যাচ্ছে হাতের তালুগুলো, জমে কঠিন হয়ে যাচ্ছে আঙুলগুলো। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল সে।

তার হাতে জেগে উঠেছে নীল বরফের সুদীর্ঘ একটা গদা।

জীবনে গদাযুদ্ধ করেনি অভী। কিন্তু সে বুঝতে পারছে, সবকিছুকে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দেবার প্রবল একটা ধ্বংসাত্মক ইচ্ছা তার হাতে জেগে উঠেছে বরফের ভারী গদা হয়ে। সমরগরিমার সংগ্রহশালায় দেখা ভীমের গদার মতো এটার গায়েও ঝুলছে বরফের ছোটো ছোটো ঘণ্টা। এই মুহূর্তে ভারী অস্ত্রটাকে তুলতে তার এতটুকুও কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু সে ভালো করেই জানে, এটা ব্যবহার করার পর সে বেশ কিছুক্ষণ আর নড়াচড়া করতেও পারবে না।

অভীর সারা শরীর ঢাকা পড়েছে বরফের বর্মে। সেই বর্মের উপর এসে পড়ল শেষমুখের তরবারির আঘাত। বরফ ছিটকে উঠল খানিকটা, অভী সেই আঘাতে গদা নিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে, কিন্তু তার বর্ম ভেদ করতে পারল না ওই তরবারি। লীনা চমকে উঠে তিরটা ছুড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বর্ণশেখর তাকে আটকে দিল। মরুময় হাততালি দিয়ে উঠলেন। “বাহবা! এত তীব্র হিমকুশলতা আমরা ঐশিক যুদ্ধদেবের মধ্যেও দেখিনি। ঘৃণাকে তুমি দুর্দান্ত অস্ত্র করে তুলেছ, অভী।”

শেষমুখ আবার তরবারি তুলছে। অভী গড়িয়ে গেল পাশের দিকে, আর পরক্ষণেই লাফ দিয়ে উঠে গদা ঘুরিয়ে আঘাত করল শেষমুখের মাথায়।

শেষমুখও কম যায় না; অভীর আঘাতটা এড়িয়ে গিয়ে তার হাতের বজ্রমাণিকের মায়া-তরবারি দিয়ে সে আঘাত করল গদার নীচের দিকে। গদার ভারী মস্তকভাগ কেটে গিয়ে সশব্দে এসে পড়ল মাটিতে, ভেঙে গেল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে।

“এইবার তোমায় বাগে পেয়েছি! রাক্ষস রাজকন্যাকে ভালোবাসার উপযুক্ত শাস্তি দেব তোমাকে!” চাপা গর্জন করে উঠল শেষমুখ।

ঘৃণাটা আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল অভীর মধ্যে। তার বরফ হয়ে যাওয়া হাতে গজিয়ে উঠল একটা বরফের দীর্ঘাকার তরবারি। শেষমুখ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠল।

“ওই নিয়ে আমার সঙ্গে লড়াই করতে পারবে তুমি?”

তার তরবারির আঘাতে অভীর হাতের অস্ত্রটাকে মুহূর্তের মধ্যে কেটে ফেলল সে। কিন্তু পরক্ষণেই অবাক হয়ে গেল শেষমুখ।

অভীর দু'হাতেই জেগে উঠছে তরবারি। আর শুধু হাতে নয়, তার সারা দেহ ভরে উঠছে খোঁচা খোঁচা ধারালো বরফের ছুরিতে। লীনা চমকে উঠে বলল, “কী ভয়ংকর লাগছে ওকে! যেন একটা সজারু!”

স্বর্ণশেখর বলল, “আমি ভেবেও ভয় পাচ্ছি, কী প্রবল ঘৃণা বুকের মধ্যে জমে আছে ওর! অতি ভয়াবহ ঘৃণা ভেতরে না থাকলে এতখানি হিমকুশলতার প্রকাশ অসম্ভব।”

কাচের দেয়ালের ওপারে বসে থাকা মরুময় হাততালি দিয়ে উঠলেন। “দারুণ, প্রলয়যোদ্ধা! এবার আমরা যুদ্ধের ফলাফল দেখতে চাই। দেখা যাক, কে শেষ পর্যন্ত বাঁচে আর কে মরে।”

বিশেষ কিছু না ভেবেই অভী এবার একটা কাজ করে বসল। শ্যামশ্রীর শেখানো মায়ানিক্ষেপ সে প্রয়োগ করল বিরাট মেঘের স্তম্ভগুলোর দিকে। পরক্ষণেই দেখে সে অবাক হয়ে গেল – মেঘের থামগুলো তার ইচ্ছামতো বেঁকে গেল একদিকে। সে শুনতে পেল, মরুময় বিড়বিড় করে বলছেন, “এ তো ঐশিকমায়া! তুমি কী করে...?”

ওইগুলোকে জমিয়ে শেষমুখটার উপর ছুড়ে মারতে পারলে বেশ হত। কিন্তু অভী জানে, অতখানি শক্তি একবার প্রয়োগ করলে তার শরীর সেই ধকল নিতে পারবে না। প্রতিপক্ষকে অন্য উপায়ে পরাস্ত করতে হবে। বাঁকানো মেঘস্তম্ভটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা দুলতে লাগল বিপজ্জনক ভাবে। অভী এসে দাঁড়াল তার নীচে।

শেষমুখ পাগলের মতো তরবারি চালাচ্ছে। তার আঘাতে কেটে পড়ে যাচ্ছে অভীর ছুরিগুলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার জেগে উঠছে তারা অভীর শরীর ভেদ করে। অনেক চেষ্টা করেও তার বিষাক্ত তরবারি ছুঁতে পারছে না অভীর চামড়া। মুখোশের আড়ালে মুখ দেখা না গেলেও মনে হচ্ছে, শেষমুখ ভয় পেয়েছে।

তীব্র ঘৃণায় অভীর মন অবশ হয়ে আসছে। সে যেন আর কিছু বুঝতে পারছে না; তার ইচ্ছা হচ্ছে, এই খুনী নরপশুটাকে শেষ করে ফেলতে। শেষমুখের হাতটা এসে পড়েছিল তার মুখের সামনে; সে-হাতের তালুতে জ্বলজ্বল করছে বজ্রমানিক। একটা বরফের ছুরি নিয়ে প্রতিপক্ষের হাতে আঘাত করল অভী।

আঘাতটা ঠিকমতো লাগল না; লাগলে শেষমুখের কবজি থেকে হাতটা দুটুকরো হয়ে যেতে পারত। কিন্তু যেটুকু আঁচড় লেগেছিল তার উন্মুক্ত ত্বকে, তাতেই গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। আর প্রতিপক্ষের সেইটুকু চমকে যাওয়ার সুযোগে তাকে পায়ে অতর্কিতে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার গলায় ছুরি ঠেকাল অভী।

“এইবার দেখা যাক, মুখোশের তলায় কোন মহাপুরুষ আছেন।”

শেষমুখ পড়ে আছে তার ছুরির তলায়; তার হাতের ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসছে রক্ত। অসহনীয় রাগে ফুঁসছে সে। কিন্তু তার যে আর কিছু করার নেই, সে ভালোই বুঝতে পারছে। অভীর হাতটা এগিয়ে যাচ্ছিল তার মুখোশের দিকে, কিন্তু আদেশের সুরে কণ্ঠস্বরটা বলে উঠল পেছন থেকে, “অভী, থামো।”

মরুময় এগিয়ে এসেছেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। “প্রলয়যোদ্ধা, তুমি জিতেছ, শেষমুখ হেরেছে। ব্যাস, যুদ্ধ এখানেই শেষ। কিন্তু ওর গোপনীয়তা ওর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ওখানে তোমার হাত দেওয়া নিষেধ।”

তাঁর হাতের ইঙ্গিতে মিলিয়ে গেল কাচের দেয়ালটা। লীনা আর স্বর্ণশেখর ছুটে আসছে। তাদের দিকে দেখার জন্য অভী মুখ তুলতেই তাকে ধাক্কা মেরে একপাশে সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে কোথায় যেন পালিয়ে গেল শেষমুখ।

বরফের বর্মটা মিলিয়ে যাচ্ছে অভীর বুক থেকে; মিলিয়ে যাচ্ছে বরফের ছুরিছোরাগুলো। সারা পৃথিবীর যত ক্লান্তি, সব যেন এসে গ্রাস করতে চাইছে তাকে। তাও ভালো, হিমকুশলতা প্রয়োগ করে তুষারস্রোত নিক্ষেপ করেনি সে আগের মতো। ওটা করলে আর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলতে হত না কারও সঙ্গে।

মরুময়ের দিকে ফিরল সে। “আপনি তাহলে জানেন শেষমুখ কে। তাহলে রাজাকে বলে দিচ্ছেন না কেন সত্যিটা?”

মরুময় বললেন, “আমি অনেক কিছুই জানি, অভী, যেসব কথা কেউ জানে না। কিন্তু তাই বলে কি আমি সব কথা রাজার কানে তুলে দেব?”

লীনা এগিয়ে এসেছে। রাগে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। “আপনি তো লোক ভালো নন দেখছি। এখানে এসে অভীকে ছেড়ে দিলেন শেষমুখের সামনে। আপনার অন্নদাতা রাজার রাজ্যে যে লোকটা ত্রাস ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তার পরিচয় জানার পরেও তাকে সুরক্ষা দিচ্ছেন আপনি। কী চান বলুন তো আপনি, মহামন্ত্রী? সিংহাসন?”

অভীরও এত রাগ হচ্ছিল যে সে লীনাকে থামতে বলল না। মরুময় কিন্তু হেসেই বললেন, “না না, সিংহাসন নিয়ে আমি কী করব? আসল কাজ তো সিংহাসনে বসা লোকটাকে চালানো। দেখো, তোমাদের একটা সত্যি কথা বলি। সিংহাসনে বসতে চায়, এমন লোকের অভাব মাল্যপর্বতে নেই, আর তাদের প্রতি আমার খুব একটা বিরাগও নেই। ক্ষমতা সবসময় নানা হাতে ঘোরা উচিত, নয়তো ও জিনিস পানা পুকুরের জলের মতো বদ্ধ হয়ে যায়।”

অভী পরিষ্কার বুঝতে পারল, রাজার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে মাল্যপর্বতে; এই মরুময় আর শেষমুখ সেই ষড়যন্ত্রের দুই অন্যতম ভাগীদার।

সে ভাবছিল, প্রজ্ঞা বা উর্মি এর কতটা জানেন।

স্বর্ণশেখর কড়াগলায় বলল, “বজ্রমাণিকের বিষ অঙ্গে স্পর্শ করলে প্রলয়যোদ্ধার মৃত্যু হতে পারে জেনেও আপনি এই কাজ করলেন?”

“হয়নি তো।” মরুময় হেসে উঠলেন। “বজ্রমাণিকের বিষ নানা মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, সমরোত্তম স্বর্ণশেখর। অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করলে মানুষকে পাগল করে দেওয়া যায়, বেশিমাাত্রায় করলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা যায়। নরকের আগুনও তো ওই বিষ দিয়েই তৈরি। খুব কাজের জিনিস শেষমুখের এই জন্মগত বজ্রমাণিক, জানেন তো? ওকে বলেছিলাম, মৃত্যু হবে এমন মাত্রার বিষ যেন আজ প্রয়োগ না করে। তবে হ্যাঁ, যদি সত্যিই কোনো বিষনিয়ন্তা বাস্তবে থাকতেন, তিনি পারতেন সব বিষের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে। তা যখন নেই, তখন শেষমুখের মতো লোকেদের বিষপ্রয়োগের মাত্রাভ্রান্তির উপর ভরসা করা ছাড়া উপায় কী, বলুন?”

স্বর্ণশেখর বলল, “আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কী, বলুন তো?”

মরুময় বললেন, “আমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে এখনও আপনাদের অনেক দেরি আছে, সমরোত্তম মহোদয়। তবে হ্যাঁ, এইটুকু বলতে পারি, অনেকের মতো আমিও চাই না, প্রলয় এসে সবকিছু ধ্বংস করে দিক। তাই প্রলয়কে আটকানোর জন্য যদি কিছু করতে পারি, আমি তাতে খুশিই হব।”

অভী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল।

একটা গরম ঝোড়ো হাওয়া এসে লাগল ওদের সবার গায়ে। সে হাওয়ার তাপ এত বেশি যে অভীর মনে হল, তার মুখটা যেন ঝলসে গেল। মেঘের যে বিরাট স্তম্ভগুলো ছিল, সেগুলো কাঁপতে লাগল, যেন ওদের ধরে কেউ খুব করে নাড়াচ্ছে।

তারপর শুরু হল ভূমিকম্প। পায়ের তলার মাটি কাঁপতে শুরু করল। অভী টলে পড়ে যেতে যেতে লীনাকে ধরে নিজেকে সামলাল। স্বর্ণশেখর বলল, “এসব কী হচ্ছে, মহামন্ত্রী মরুময়? নতুন কোনো মায়া প্রয়োগ করছেন নাকি আমাদের উপরে?”

মরুময়ের মুখ দেখে অবশ্য অভীর মনে হচ্ছিল, তিনি সত্যি সত্যিই ভয় পেয়েছেন। তিনি বললেন, “বিশ্বাস করুন, আমি কোনোভাবে আপনাদের বিপদে ফেললে তার কৃতিত্ব নিতে একমুহূর্তেরও দ্বিধা করতাম না। কিন্তু এসব যা হচ্ছে, আমি করছি না। এই ভূমিকম্প, আকাশের ওই লাল লাল মেঘ – এসবের কোনোটাই আমার করা নয়, এবং কেন যে হচ্ছে, তাও আমি বুঝতে পারছি না।”

গরম হাওয়ার বেগ বাড়ছে। সে হাওয়ায় ভর্তি ধুলোবালি – মুখে-চোখে বালি ঢুকে প্রবল অস্বস্তি শুরু হল ওদের। কোনোরকমে মুখে কাপড় জড়িয়ে স্বর্ণশেখর বলে উঠল, “চলো, এখান থেকে যেতে হবে আমাদের এবার। প্রাসাদে ঢুকে আশ্রয় নিতে হবে।”

মরুময় তখনও তাকিয়ে ছিলেন আকাশের রক্তাভ মেঘগুলোর দিকে। স্বগতোক্তির মতো তিনি বললেন, “এই মেঘ তো আমার নয়। এদের উপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। এই লাল মেঘ ধ্বংসের মেঘ, অভী। এই মেঘ আকাশে উঠলে তার নীচে অনেক ভালো জিনিস নষ্ট হয়ে যায়।”

গরম বাতাসের ঝড়ে আর তাকিয়ে থাকা মুশকিল হয়ে উঠছে। মরুময় বললেন, “আমার সারাজীবনে মাল্যপর্বতে এরকম ঝড় হয়নি কখনও। আজ হচ্ছেটা কী?”

কে যেন দূর থেকে ডাকছে, “অভী! অভী!”

সে তাকাল লীনার দিকে। লীনাও চিনতে পেরেছে গলাটা। “আলোকপর্ণ।”

সে এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। তার মুখ দেখে চমকে গেল অভী।

আলোকপর্ণের মুখে ভয়! এ দৃশ্য দেখবে, সে ভাবেনি কখনও। রীতিমতো হাঁপাচ্ছেও লোকটা।

“অভী, তোমাকে সেনানায়িকা প্রজ্ঞা এক্ষুণি একবার প্রাসাদে ডাকছেন। জরুরি দরকার। বাকিরা ধীরেসুস্থে আসুন; তুমি আমার সঙ্গে এসো এখুনি। কী হয়েছে, ওখানে গিয়ে শুনবে।”

সে “চলুন” বলতেই আলোকপর্ণ তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড় দিল।

সীমাপ্রাকার পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে অভীকে যখন সে রাজার সভাকক্ষে এনে নামাল, তখন অভীর চোখে পড়ল সেখানে অনেক গণ্যমান্য রাক্ষস জমায়েত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রাজা আর রাজকন্যাও আছেন। উর্মির মুখ ভয়ানক গম্ভীর; তাকে দেখে উনি হাসলেনও না; শুধু গম্ভীর গলায় বললেন, “সেনানায়িকা প্রজ্ঞা, আপনি অভীকে পাশের কক্ষে নিয়ে গিয়ে যা বলার বলুন।”

প্রজ্ঞা এগিয়ে এলেন। তাঁর চোখ বিস্ফারিত, মুখ প্রায় রক্তশূন্য। তাঁর সঙ্গে সভাকক্ষের পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল অভী। কিছু একটা মারাত্মক গণ্ডগোল হয়েছে, সে বুঝতে পারছিল। কিন্তু কী হয়েছে, সেটা সম্ভবত এইবার জানা যাবে।

প্রজ্ঞা বললেন, “অভী, আমাদের একটা উপকার করবে তুমি?”

“কী উপকার বলুন? কী হয়েছে?”

“সুতসোম। ওর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে।”

“মানে?”

“এই প্রাসাদের পেছনেই ওর জন্য একটা ছোট পাথরের ঘর তৈরি করা আছে। সেখানেই আছে ও। প্রকৃতিতে আজ যাকিছু অস্বাভাবিক দেখছ, সব ওর মৃত্যুযন্ত্রণার প্রকাশ।”

অভী হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কথাগুলো এতটাই অদ্ভুত, বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে তার।

প্রজ্ঞা বলে চললেন, “ও ছিল বৃহত্তম জন্মগত বজ্রমাণিকের ধারক। এই মৃত্যুকালে ওই মণি ওকে তীব্র যন্ত্রণা দিচ্ছে; না মরা পর্যন্ত ওর রেহাই নেই। ওর শক্তিতে প্রকৃতিতে এই ঝড়ঝঞ্ঝা দেখা দিচ্ছে। এইসময় ওর সামনে যে যাবে, তার মৃত্যু অনিবার্য। তুমি এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।”

“আমি কী করব?”

“এখন মাত্র দু’জন ব্যক্তি আছে, যারা ওর এই ভয়ংকর শক্তি বিকিরণ থেকে বাঁচতে পারে। একজন তুমি – তোমার হিমকুশলতা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে তুমি, আমার ধারণা। আর একজন আমি। আমি ওর মা। হয়তো আমাকে দেখলে ও নিজেকে কিছুটা সম্বরণ করতে পারে।”

“তাহলে আপনিই যান না। ওর যদি শেষ সময় এসে উপস্থিত হয়ে থাকে, তাহলে পাশে থাকতে পারবেন এই সময়টায়।”

“কী করে যাব, অভী? কী করে এই ছোরাটা বসিয়ে দেব ওর বুকে?”

প্রজ্ঞার হাতের ঝকঝকে হিরের ধারালো অস্ত্রটার দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল অভী। “কী বলতে চাইছেন আপনি?”

প্রজ্ঞা ধীরে ধীরে বললেন, “বলতে চাইছি, যেভাবেই হোক, ওকে মেরে ফেলতে হবে। ও যদি আর কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকে, তাহলে ওর শরীরের ওই যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ও এমন মায়াশক্তি বিকিরণ করতে থাকবে যে তার ধাক্কায় গোটা রাক্ষসরাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। ওর শরীরের মধ্যে বিরাট একটা বজ্রমাণিক আছে – ও মণি ধ্বংসের মণি, সর্বনাশের মণি। আর এখন এই অন্তিমকালে ওই মণির ক্ষমতার উপর ওর আর নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। তাই সারা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ওর এখন মরাই ভালো।”

অভী স্থির চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। প্রজ্ঞা তার হাতে ছোরাটা ধরিয়ে দিলেন। “এটা নাও। ওর শরীরে অন্য কোনো অস্ত্র কাজ করে না। তোমার চন্দ্রহাস হয়তো করত, কিন্তু সেটা আনার সময়ও এখন নেই, আর সেটাকে তোমার হাতে দেখলেই ও বুঝে যাবে, তুমি শত্রু হয়ে ওকে মারতে এসেছ। অবশ্য এই ছুরিটা নিয়ে গেলেও তোমার বিপদ পুরোপুরি কাটছে না। ও কিন্তু অসম্ভব ভালো মন পড়তে পারে। ওর দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ও বুঝতে পেরে যাবে, তুমি ওকে হত্যা করার জন্যই এসেছ।”

“সেই জন্যই আপনি নিজে যাচ্ছেন না? পাছে ও বুঝতে পেরে যায় আপনি ওকে মারতে চাইছেন?”

প্রজ্ঞা এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন; তারপর বললেন, “হ্যাঁ, এবং না। আমি ওর মা, তবুও আমি চাই ও নিজের ভালো-র জন্যই এবার মারা যাক। কিন্তু আমি গেলেই ও বুঝে যাবে আমি ওকে মারতে এসেছি। হয়তো ও আমাকে বাধা দেবে, হয়তো ও আমাকেও মেরে ফেলবে। ফেলতেই পারে; অসহ্য যন্ত্রণায় ওর সম্ভবত এখন মাথার ঠিক নেই। মরতে আমি ভয়ও পাই না। কিন্তু অভী! অভী! কী হবে যদি ও আমাকে বাধা না দেয়? আমি যখন ওর বুকে ছোরাটা বসাচ্ছি, ও যদি তখন চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে? কী হবে তখন?”

মহিলার চোখে অভী নিখাদ আতংক দেখতে পেল।

“আমি জানি, ওই দৃষ্টি আমি সহ্য করতে পারব না। আমার মন বলছে, ও আমাকে কাজটা করতে দেবে বিনা বাধায়। আমি কী করে তা করব, তুমি বলো।”

হঠাৎ ভীষণ করুণায় অভীর মনটা যেন গলে গেল। ছোরাটাকে শক্ত করে ধরল সে। “আমিই যাব। কিন্তু হঠাৎ এরকম ঘটল কেন?”

প্রজ্ঞা মাথা নীচু করলেন। “সেও ওর মায়েরই ভুলে।”

“মানে?”

“তোমরা মহাসর্পিণীর গুহা থেকে রক্তপদ্মরাগ এনেছিলে না? আমি শুনেছিলাম, ওতে পৃথিবীর সব রোগ সেরে যায়। আমি চেয়েছিলাম আমার ছেলেটার উপর ওই মণির মায়া প্রয়োগ করে ওকে সারিয়ে তুলতে। রাজকন্যা উর্মিকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি কিন্তু আমাকে নিষেধ করেছিলেন। আমি তো ওই মণি প্রয়োগের অনধিকারীও ছিলাম; যুদ্ধে কম প্রাণ নিয়েছি আমি আজ পর্যন্ত? তবু একপ্রকার মরিয়া হয়েই আমি ওই মণি প্রয়োগ করেছিলাম ওর উপর। তারপর...”

“তারপর?”

“বজ্রমাণিক নিজেই একটা রোগ, অভী; ও নিজেই একটা ভয়ানক বিষ। রক্তপদ্মরাগের প্রভাব ওর উপর উলটো হয়ে পড়ল। বজ্রমাণিককেই রোগ মনে করে রক্তপদ্মরাগের মায়া এখন ধ্বংস করে দিচ্ছে তার ধারকের শরীরটাকে। বলতে পারো, আমি মা হয়ে নিজের ছেলের রোগ সারাতে গিয়ে তার মৃত্যুকেই আরও দ্রুত কাছে ডেকে এনেছি।”

এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল প্রজ্ঞার চোখ থেকে। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু মুছে নিলেন।

অভী শুধু বলল, “আমি যাচ্ছি।”

প্রজ্ঞা বললেন, “যদি তুমি আজ জ্যান্ত ফিরে আসো, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, তোমার এই উপকার আমি মনে রাখব। আমি, রক্ষোপুরীর সেনানায়িকা, তোমার কাছে ঋণী রইলাম।”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অভী; তারপর এগিয়ে গেল সুতসোমের আবাসের দিকে। যাওয়ার পথে সে দেখতে পেল, উৎকণ্ঠিত চোখে চেয়ে আছেন উর্মি।

তার দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নেড়ে অভী এসে পৌঁছল সুতসোমের দ্বারের সামনে। দূর থেকে চেয়ে আছে বাকি রাক্ষসরা। তাদের কারও মুখে করুণা, কারও মুখে আতঙ্ক - তাদের অনেকেই সভয়ে চেয়ে দেখছে আকাশের রক্তমেঘের পিণ্ডপাকানো।

দরজার পাশ্চাদ্দুটো সে এসে দাঁড়াতেই খুলে গেল হাট হয়ে, যেন ভেতর থেকে কেউ এক ধাক্কাই খুলে দিল সে দুটো। সে ভেতরে ঢুকতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ঘরের মধ্যে তাল পাকাচ্ছে লাল রঙের মেঘ, গরম হাওয়া ঘুরছে ঘরের কোণে কোণে। অভীর যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

“তোমার দু’হাতেই নিয়তিলাঞ্ছন আছে না, অভী?”

কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল লাল মেঘপুঞ্জের ওপার থেকে। অভী মনে মনে ঠিক করে নিল, ভয় পাওয়া চলবে না। সুতসোম অন্তরের কথা জেনে যায়।

সে বলল, “আছে।”

“কেন আছে, জানো?”

“না।”

“নিয়তির খুব শক্তিশালী চিহ্ন ওই নিয়তিলাঞ্ছন। যার হাতে ওই চিহ্ন জেগে ওঠে, তাকে সমরগরিমায় যেতেই হয়। তোমার দু’হাতে ও চিহ্ন আছে মানে নিয়তির খুব বড়ো কিছু করানোর ইচ্ছা আছে তোমাকে দিয়ে। এরকম দু’হাতেই নিয়তির চিহ্ন সারা মায়াজগতে আর মাত্র একজনের হাতে ছিল।”

উর্মির বলা কথাটা মনে পড়ে গেল অভীর। সে বলল, “কার হাতে?”

নিজের দু’হাত মেলে ধরল সুতসোম। অভী দেখে চমকে উঠল - তার দু’হাতের তালুতেই গোল নীল চিহ্নদুটো প্রকট।

“তোমার তো যাওয়া উচিত ছিল সমরগরিমা আয়তনে।”

হা হা করে হাসল সুতসোম। “জানি, জানি। ওই নিয়তির চিহ্ন হাতে এসেছে মানে সমরগরিমা তাকে ডাক পাঠিয়েছে। আর সেই ডাকে সাড়া না দিলে ফল ভালো হয় না। শোনোনি কথাটা?”

শুনেছে অভী। তাকে আনতে আসার সময় মেঘবর্ণ বলেছিল। মাথা নাড়ল সে।

“আমারও ফল ভালো হয়নি। এই নিয়তির ডাক আসার পরেও আমার মা আমাকে যেতে দেয়নি শত্রুর দেশ সমরগরিমায়। তার ফলে আমার জন্মগত বিশাল বজ্রমাণিকটি হয়ে উঠেছে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী - যার জন্য দ্রষ্টাদেবী ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, আমার বয়স এগারো পেরোবে না। দেখো, কথাটা কতখানি সত্যি হল। আজ আমার শরীরে বাসা বেঁধে থাকা এই বজ্রমাণিকই অসহ্য যন্ত্রণাসহযোগে আমাকে ওপারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।”

কথা বলতে বলতেই সুতসোম যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল চারপাশ; বাড়ির ছাদ থেকে পাথরের চাঙড় খসে পড়ল অভীর মাথা থেকে একটু দূরেই।

তার শরীর থেকে বিকিরণ হওয়া প্রচণ্ড শক্তিকে অভী অনুভব করতে পারছিল। ওর কাছে এগিয়ে যেতেও বাধা পাচ্ছিল সে; এ যেন প্রবল নদীস্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটে চলার মতো অভিজ্ঞতা। পায়ের তলার মাটি আবার প্রবলভাবে কাঁপছে তার। ভূমিকম্প হচ্ছে। ধুলো ঝরে পড়ছে মাথার উপরের ছাদ থেকে। যদি একবার ভেঙে পড়ে...

“আমি না হোক, তুমি তো এসে পৌঁছেছ সমরগরিমায়। আমার নিয়তির ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি আজ মরছি এখানে নিতান্ত অগৌরবে। তুমি অন্তত প্রলয়ের মতো দুর্দান্ত ঘটনা ঘটিয়ে মরতে পারবে। হ্যাঁ, মরবে তুমি নিশ্চিত, আমি দেখতে পাচ্ছি। অতি ভয়ংকর কোনো অস্ত্রমোচন করে মৃত্যু হবে তোমার। কী অভী, ভয় পাচ্ছ নাকি?”

অভী জানে, মিথ্যা বলে লাভ নেই; ও ধরে ফেলবে। সে বলল, “একটু একটু পাচ্ছি বোধহয়।”

“আমি পাচ্ছি না। মৃত্যু এখন খুব সহজ বিষয় আমার কাছে। যবে থেকে জেনেছি আমার সময় বাঁধা, যবে থেকে জেনেছি স্বর্ণখেচরের পালক দিয়ে তৈরি উর্মিদির মহৌষধও আর আমার শরীরে কাজ করবে না, তবে থেকে মৃত্যুর ভয় আমার চলে গেছে। এখন এত যন্ত্রণা করছে, মনে হচ্ছে, সবকিছুকে ধ্বংস করে দিই। আমার শরীরের মধ্যে যে বিশাল বজ্রমাণিকটা আছে, তার থেকে বিষয়ন্ত্রণা গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। আর বেশিক্ষণ যদি বাঁচি, তাহলে গোটা রাজ্যটাই শেষ হয়ে যাবে ভূমিকম্পে আর ঝড়ে। মা তোমাকে সেই হিরের তৈরি সুন্দর জিনিসটা দিয়ে পাঠায়নি?”

এর কাছে কিছু লুকানোর উপায় নেই। অভী ছোরাটা বার করে দেখাল তাকে।

“মাকে বোলো, আর আমি যুদ্ধে জিতে আসতে পারব না। কিন্তু যদি ওপার বলে কিছু থাকে, আমি সেখান থেকেও তাকে ভালোই বাসব। তার উপর কোনো রাগ নেই আমার। এই যাওয়ার সময় আর ওসব রাগ-অভিমান নিয়ে যেতে চাই না আমি।”

সুতসোম ক্লান্তভাবে চোখ বন্ধ করল। তার শিশুসুলভ মুখটার গায়ে কালো কালো রেখা ফুটে উঠছে, কপাল থেকে গড়িয়ে নামছে ঘাম। একবার ঠোঁটের উপর জিভ বুলিয়ে নিল সে। শুকনো জিভ – ঠোঁট একটুও ভিজল না।

অভীর খুব কষ্ট হচ্ছিল। সুতসোম চোখ বন্ধ রেখেই বলল, “যে কাজ করতে এসেছ, সেরে নাও, অভী। আমি বাধা দেব না। আমি চাইলে তোমার মনের কথা পড়ে ফেলতে পারি। কিন্তু সারা জীবন ধরে অন্যের মনের কথা জানতে জানতে এখন আমার ওতে ঘেন্না ধরে গেছে। এই শেষ মুহূর্তে আর ভালো লাগছে না তোমার মনে কী চলছে জানতে। এসো, আমি চোখ বন্ধ করে রেখেছি। ঠিক কোন্ মুহূর্তে মৃত্যু আসছে, ওইটুকু আমার কাছে অজানাই থাক। এবার মুক্তি দাও আমাকে।”

ভাঙা পাথরের রাশি পড়ে আছে। তার উপর গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সুতসোম। অভীর হাতে ধরা আছে হিরের ছোরাটা। তাকিয়ে দেখছে সে মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেটার দিকে।

“কী হল, অভী? দেরি করছ কেন?”

ছোরাটা মাটিতে ফেলে দিল অভী। তার শব্দে সুতসোম চোখ মেলে তাকাল। নির্মল হাসিতে ভরে উঠল তার মুখ।

অভী এসে বসল তার পাশে। “মনে দয়ামায়া থাকাকে এখানে রাক্ষসরা দুর্বলতা বলে,” বলে উঠল সুতসোম। “কিন্তু তুমি রাক্ষস নও, কাজেই রাক্ষস হওয়ার দায়ও তোমার নেই। ...হাতটা দেবে একবার?”

অভী তার ডানহাত বাড়িয়ে দিল, সেই হাতটা ধরে একবার একটু চাপ দিল সে। “খুব ভালো মানুষ তুমি। মনে রেখো আমাকে।”

আরেকটা হাত দিয়ে অভী জড়িয়ে নিল বাচ্চা ছেলেটাকে। “রাখব।”

“ভালো মানুষদের খুব তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয় পৃথিবী থেকে। তোমাকেও হবে। তৈরি থেকো কিন্তু।”

“থাকব।”

সুতসোম মাটির দিকে হাত বাড়াল। হিরার ছোরাটা উড়ে এল তার হাতে।

“যাওয়ার আগে তোমাকে একটা উপহার দিয়ে যাব।”

নিজের বুকে ধারালো অস্ত্রটা বসিয়ে একটা গভীর ক্ষত তৈরি করল সুতসোম। তারপর সেই ক্ষতের সামনে হাতটা ধরতেই বেরিয়ে এল রক্তে মাখামাখি একটা উজ্জ্বল বেগুনি রঙের পাথর।

“মায়াজগতের সবচেয়ে বড়ো বজ্রমাণিক। আমার উপহার তোমাকে। এই দিয়ে শেষমুখের ওই ক্ষুদ্র বজ্রমাণিকের প্রভাব অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবে তুমি।”

গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে সুতসোমের বুকের ক্ষত থেকে। সেদিকে অভীকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে যন্ত্রণাক্লিষ্ট একটা হাসি হেসে সুতসোম বলল, “তুমি যে কাজ করতে এসেছিলে, কিন্তু পারলে না, সে কাজ আমিই সেরে দিলাম। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বুকটা ইতিমধ্যেই অসাড় হয়ে গেছে। আর বেশিক্ষণ নয়।”

অভীর চোখের সামনেই সুতসোমের দেহটা স্বচ্ছ স্ফটিকে রূপান্তরিত হয়ে যেতে লাগল। লাল রঙের মেঘগুলো পিণ্ড পাকাচ্ছে তার শরীরের উপরে। সুতসোম বলল, “খুব শক্তিশালী বজ্রমাণিকের আধারের মৃত্যু হলে এরকমই হয়। ভয় পেয়ো না।”

অভীর জামাকাপড় ভিজে যাচ্ছে সুতসোমের শরীরের রক্তে। তার চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই। মাটি কাঁপছে, দেয়াল কাঁপছে, যেন ঘরটা ধসে পড়বে এখনই।

জড়িয়ে জড়িয়ে সুতসোম বলল, “স্যামন্তক মণির নাম শুনেছ? ওই মণি ধারণ করে রাজা প্রসেন যখন যাচ্ছিলেন, লোকে মনে করেছিল, স্বয়ং সূর্য আসছেন। উর্মিদির শরীরে যে রক্তপদ্মরাগ মণি আছে, সেও অনেকটা ওইরকমই। বজ্রমাণিকের ঠিক উলটো প্রকৃতি ওই মণির। বজ্রমাণিক অন্ধকারের

মণি, রক্তপদ্মরাগ আলোর। আমার নিয়তি, আমি পেয়েছিলাম অন্ধকারের মালিকানা।”

অভী কিছু বলার অবস্থায় নেই; বলতে গেলেই জল চলে আসবে চোখে। সুতসোম আবার বলল, “অভী, অমন মেয়ে লাখে একটা হয়। তার ভালোবাসা সবাই পায় না, আর পেলো তাকে উপেক্ষা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয় – এইটুকু কথা শুধু এক মরতে বসা মায়াধরের কাছ থেকে তুমি জেনে রাখো।”

ধরধর করে কাঁপছে গোটা কক্ষ। সুতসোম চোখ বন্ধ করল, দু’ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল বন্ধ চোখের পাশ দিয়ে। “আর দেরি নেই। অভী, এই সময়টুকু শুধু আমাকে ছেড়ে যেও না ভাই, ধরে থাকো।”

“ধরে আছি। কোথাও যাইনি, ভাই।”

“মাকে বোলো, আমি সত্যিই তাকে ভালোবাসি।”

“বলব।”

অভীর হাতের মধ্যেই এলিয়ে পড়ে সুতসোম মারা গেল, তার বুকের ওঠানামা থেমে গেল। মাটির কাঁপন শান্ত হল, লাল মেঘগুলো মিলিয়ে গেল বাতাসে।

ভগ্নস্তূপের মধ্যে ক্লান্ত, অবসন্ন অভী ঠায় বসে রইল পুরোপুরি স্ফটিক হয়ে যাওয়া একটা বাচ্চা ছেলের মৃতদেহ নিয়ে।

মাথার মধ্যে তার ঘুরতে লাগল একটাই কথা।

মরার আগে এই ছেলেটা তাকে “ভাই” বলে ডেকেছিল!



॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ আকাশলোকের আমন্ত্রণ

দিঙ্‌নাগ নেমে এলেন সেবাকক্ষের শয্যা থেকে। কাঁধে এখনও ঔষধমিশ্রিত কাপড় জড়ানো আছে তাঁর, কিন্তু চলাফেরায় আর কোনো দুর্বলতা চোখে পড়ছে না। রক্ষোবৈদ্য তাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন, “একদম সেরে গেছেন আপনি। আর কোনো ভয় নেই। এবার নিশ্চিন্তে বাড়ি যান।”

বৃদ্ধ দিঙ্‌নাগ বললেন, “আপনি একজন মহান রাক্ষস, রক্ষোবৈদ্য। আপনার জন্যই আজ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারছি। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ইত্যাদি যদি জানানোর ইচ্ছা থাকে, তাহলে এই সমরোত্তম নীলাব্রকে জানান, দিঙ্‌নাগ। উনি না থাকলে আপনি এতক্ষণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই মারা যেতেন। আর সেদিন যে খুব বড়ো কোনো গুণগোল হয়নি, তার জন্যও উনিই সিংহভাগ কৃতিত্বের দাবিদার।”

দিঙ্‌নাগ যেভাবে নীলাব্রর দিকে তাকালেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, সমরগরিমার কোনো সমরোত্তমকে ধন্যবাদ জানানোর ইচ্ছা তাঁর আদৌ নেই।

তবু একটু কিছু-কিছু ভাব নিয়ে তাঁকে ইতস্তত করতে দেখে নীলাব্রই হেসে বিষয়টা সহজ করে নিল। “থাক, দিঙ্‌নাগ। আমাকে আর ধন্যবাদ জানিয়ে কাজ নেই আপনার। আপনার গল্পে তো আমি দুই লোক, তাই না? আমি আর আমার বন্ধু সমরোত্তমরা সবাই আপনাদের বিপ্লবের কাহিনিতে খুব খারাপ মানুষ, খুব দুষ্ট প্রতিপক্ষ। আসুন আপনি, ভালো থাকুন। আপনাদের বিপ্লব বেঁচে থাকুক।”

কোনো কথা না বলে ধন্যবাদ না জানিয়েই সেবাকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন নিধির বাবা। বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল নীপা। তাকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন আয়তন ছেড়ে।

রক্ষোবৈদ্য মন্তব্য করলেন, “যেসব বস্তু বা মানুষের নামের সঙ্গে ‘রাক্ষস’ শব্দটা লাগানো যায়না, তাদের প্রতি আমাদের দিগ্‌নাগের খুব একটা ভক্তি নেই।”

নীলাভ হেসে উঠল। “যেমন আমার সঙ্গে। পূর্ণ দূরে থাক, আমি তো ‘অর্ধ’ রাক্ষসও নই। কী করেই বা আমাকে ধন্যবাদ দেবেন উনি? আমিই তো অর্ধরাক্ষসদের উপর অত্যাচারীর প্রতিনিধি, তাই না?”

রক্ষোবৈদ্যও হাসলেন। “ঠিক, ঠিক। অত্যাচারী নীলাভ, নরকে যাও তুমি।”
“সেখান থেকেই তো আসছি।”

আবার হেসে উঠলেন দু’জন। তারপর নীলাভ বলল, “এবার একটা গম্ভীর কথা বলি। রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, আমার কিন্তু নিধিকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছে।”

“ত্রিশূলধর মায়ার কথা বলছ তো? আমিও দেখছিলাম ওর হাতটা। সত্যিই ভয়ের ব্যাপার।”

“এত জোরে ত্রিশূলটাকে ও ধরে ছিল যে ওর হাতের শিরাগুলো পর্যন্ত ফুটে উঠেছিল চামড়ার ভেতর দিয়ে, অথচ ও নিজে বুঝতেই পারছে না সেটা। দেখে মনে হচ্ছিল, হাতের সঙ্গে যেন ত্রিশূলটা জুড়ে গেছে ওর, যেন হাতেরই একটা অংশ হয়ে গেছে। রক্ষোবৈদ্য, এ লক্ষণ ভালো নয়, আপনি জানেন।”

“জানি। বেচারির জন্য খারাপ লাগছে আমার।”

“কী করতে পারি আমরা, বলুন না। ওকে বাঁচানোর কোনো উপায়ই কি নেই?”

রক্ষোবৈদ্য দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন। “নিয়তি যা চান, তা তো হবেই। তাকে টলানোর সাধ্য কারও নেই। আমরা শুধু এইটুকু করতে পারি, ওকে কোনোরকমের যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে দেওয়া চলবে না। আর হ্যাঁ, ত্রিশূলধর মায়ার সঙ্গে মৃত দেবতার নদীর একটা যোগ আছে – মৃত দেবতার অনুচর নীরসেনাদের হাতে ওই অস্ত্র থাকে, জানো বোধহয়। ও যেন কোনোভাবেই ওই নদীর ধারে না যায়, সেইটুকু নিশ্চিত করতে হবে।”

কথা বলতে বলতে নিধির আনা সেই খাতাটা হাতে তুলে নিয়ে আবার পাতা উল্টাচ্ছিলেন রক্ষোবৈদ্য। দেখতে দেখতে তিনি এসে থামলেন সেই পাতাটায়।

কিশোর সৌজন্যের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কমবয়সী উর্মির মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ তিনি। তারপর স্বগতোক্তির মতো করে বললেন, “কিন্তু এর মুখটাকে ঐভাবে ছুরি দিয়ে কেটেছে কেন সৌজন্য? রাগে? কিসের রাগ ওর?”

নীলাভ বলল, “রক্ষোবৈদ্য, সৌজন্য কিন্তু আমাদের বলেছিল, প্রতিশোধ-টতিশোধের মতো তুচ্ছ ব্যাপারে সে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু এই ছবিটা দেখার পর মনে হচ্ছে, ও হয় আমাদের মিথ্যেকথা বলেছিল, নতুবা ওর আরও গভীর কোনো উদ্দেশ্য আছে।”

রক্ষোবৈদ্য মাথা নেড়ে বললেন, “নীলাভ, ও যাই বলুক, এই যে আঘাতগুলো করা হয়েছে, এগুলো রাগের বহিঃপ্রকাশ। মনে মনে যার উপর প্রচণ্ড ক্রোধ জন্মেছে, কিন্তু তার ক্ষতিসাধন করা যাচ্ছে না, এই আঘাতগুলো সেই দমিয়ে

রাখা হিংস্র ক্রোধের ফল। কিন্তু কেন? মাল্যপর্বতের রাজকন্যার সঙ্গে এই ছবি ওর এল কোথা থেকে? আর এলই যদি, তাহলে এত রাগ কেন উর্মির উপরে?"

নীলাভ বলল, "এইটুকু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, সৌজন্য কোনো না কোনোভাবে মাল্যপর্বতের রাক্ষসদের সঙ্গে যুক্ত - সে শত্রুভাবেই হোক, বা মিত্রভাবে। কিন্তু যোগাযোগটা প্রমাণিত, আর এইজন্যই ও আমাদের ওর অতীত ইতিহাস জানতে দিতে রাজি নয়।"

"সমরোত্তম নীলাভ।"

ডাকটা এল দ্বারের সামনে থেকে। যে এসেছে তাকে দেখে নীলাভ একটু অবাকই হল।

সেই অসিত। নিয়ামক বিনীতেশের কার্যালয়ের সামনে বসে থাকে এ।

"ভেতরে এসো। কিছু বলবে?"

অসিত শুকনো মুখে বলল, "মাননীয় নিয়ামক মহোদয় আপনাকে একবার তাঁর কার্যালয়ে আসতে অনুরোধ করেছেন।"

"আমাকে?" নীলাভ বলল। "হঠাৎ কী ব্যাপার, অসিত?"

অসিত বলল, "আমি ঠিক জানি না। নিয়ামক মহোদয় আমাকে শুধু আহ্বানবার্তাটুকু পৌঁছে দিতে বলেছেন। এর বেশি কিছু আমার জানা নেই।"

রক্ষাবৈদ্য বললেন, "চলো নীলাভ, আমিও যাই তোমার সঙ্গে। এই লোকগুলোকে বিশ্বাস নেই। কী ফন্দি আঁটছে, কে জানে।"

"চলুন। ভালোই হয় তাহলে।"

অসিতের পেছন পেছন ওঁরা বেরিয়ে এলেন সেবাকক্ষ ছেড়ে। খোলা মাঠের উপর দিয়ে নিয়ামকের কার্যালয়ের দিকে যেতে যেতে নীলাভ ভাবতে লাগল, আজ হঠাৎ তাকে ডেকে পাঠানোর পেছনে নিয়ামকের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সুদক্ষিণসারিতে সেনা-অভিযানের অনুমতি নেওয়ার জন্য নিশ্চয় তাকে ডেকে পাঠানো হয়নি। তাহলে?

পুরো পথটা কোনো কথা না বলে ওঁরা এসে পৌঁছোলেন নিয়ামক বিনীতেশের কার্যালয়ে। অসিত একটু বিনীতভাবেই বলল, "আপনারা যান ওঁর কক্ষে। ওখানে মাননীয় নিয়ামক ও সহনিয়ামক মহোদয় আছেন।"

নিয়ামকের কক্ষে ঢুকে পড়ল নীলাভ, তাকে অনুসরণ করলেন রক্ষাবৈদ্য। নিয়ামক বসেছিলেন তাঁর নির্দিষ্ট আসনে, সৌজন্য দাঁড়িয়েছিল তাঁর ঠিক পেছনে। দৃশ্যটা পরিচিত লাগল নীলাভর, আর কেমন যেন অস্বস্তিও হল একটু। সৌজন্য ওই অদ্ভুত জায়গাটায় সবসময় দাঁড়িয়ে থাকে কেন?

তাদের প্রবেশ করতে দেখে অবশ্য সৌজন্য এগিয়ে এল। "আসুন সমরোত্তম নীলাভ, আসন গ্রহণ করুন। মাননীয় রক্ষাবৈদ্য মহোদয়ও এসেছেন দেখছি। আপনিও বসুন।"

ওরা বসল। নীলাভ বলল, "বলুন মাননীয় নিয়ামক, আমাকে স্মরণ করেছেন কেন?"

নিয়ামকের হয়ে সৌজন্যই বলল, "আমি আর নিয়ামক মহোদয় সুদক্ষিণসারির অর্ধরাক্ষস বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সেই আলোচনার পরেই আমরা একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। আমরা ঠিক করলাম, আমাদের পরবর্তী

কর্মপন্থা আপনার সঙ্গে আলোচনা করেই স্থির করব।”

মতলবটা বোঝা যাচ্ছে না এখনও। নীলাভ্র সতর্কভাবে বলল, “বলুন আপনাদের সিদ্ধান্ত কী হয়েছে?”

নিয়ামক বললেন, “আমি ভাবছিলাম, অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে একটা আলোচনায় বসে শুনব ওদের কী কী অভাব-অভিযোগ আছে।”

নীলাভ্র এত অবাক হয়ে গেল যে সে কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারল না। নিয়ামক বিনীতেশের মুখ থেকে আলোচনা-সমঝোতার প্রসঙ্গ আসছে, এ যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

নির্ঘাত এর মধ্যে কোনোরকমের চালাকি আছে।

সে বলল, “যদি আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনার বিরুদ্ধে ওদের যা যা অভিযোগ আছে, সেগুলো আপনি যদি ধৈর্য ধরে শুনে সমাধান করতে উদ্যোগী হন, তাহলে তার চেয়ে সাধু প্রস্তাব আর কিছু হতেই পারে না। সমরগরিমার নিয়ামক হিসাবে এ আপনার কর্তব্যও বটে।”

সৌজন্য নিরীহমুখে বলল, “হ্যাঁ, আমাদের মাননীয় নিয়ামক মহোদয় কর্তব্য পালনে সদাই অবিচল। তাই...”

রক্ষোবৈদ্য হঠাৎ সন্দেহজনকভাবে কাশতে শুরু করলেন। নিয়ামক জ্রকুঞ্চন করে বললেন, “কী হল?”

নীলাভ্র বুঝতে পেরেছে কারণটা। সে বলল, “রক্ষোবৈদ্য, জল খাবেন?”

রহস্যময়ভাবে তাঁর কাশিটা সেরেও গেল মুহূর্তের মধ্যে। তিনি বললেন, “না না, থাক। আমি ঠিক আছি। হ্যাঁ, সহনিয়ামক, বলো যা বলছিলে।”

সৌজন্য বলল, “বলছিলাম অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে একটা আলোচনায় বসার কথা। ওরা ইতিপূর্বে অনেক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়েছে। নিয়ামক-বিরোধী শ্লোগানও দিয়েছে। এ-কথা ওরা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ওরা আমাদের পছন্দ করে না।”

নীলাভ্র বলল, “আপনারাও ওদের পছন্দ করেন না। কাজেই বলা যেতে পারে, অপছন্দের অনুভূতিটা দু’তরফেই আছে।”

সৌজন্য বলল, “অস্বীকার করছি না। এইখানেই আপনার পরামর্শ আমাদের দরকার। দু’পক্ষকে আলোচনায় বসার জন্য মুখোমুখি তো হতে হবে। সেটা কোন্ জায়গায়? ওরা আমাদের অবিশ্বাস করে। ওরা আয়তনে আসবে বলে আমার মনে হয় না। আবার ওরা যদি আমাদের সুদক্ষিণসারিতে যেতে বলে, আমাদেরও রাজি হওয়ার প্রশ্ন নেই। অর্ধরাক্ষস এলাকায় আলোচনায় বসতে আমাদের মাননীয় নিয়ামক একটু ভয় পাচ্ছেন।”

নিয়ামক বললেন, “উঁহ্, উঁহ্, ভয় নয়। অস্বস্তি।”

সৌজন্য বলল, “ওই আর কি, অস্বস্তি। স্বয়ং নিয়ামক যে জায়গায় যেতে অস্বস্তি বোধ করেন, সেখানে আর যাই হোক, শান্তভাবে কোনো আলোচনা করা মুশকিল। তাই আমরা একটা মোটামুটি নিরপেক্ষ জায়গায় আলোচনাটা করার কথা ভাবছি।”

নীলাভ্র বলল, “এরকম কোনো নির্দিষ্ট জায়গার কথা ভেবেছ কি?”

সৌজন্য বলল, “আমি ভাবছিলাম ছায়াভবনের কথা। পীতপত্রবনের মধ্যে এই সরাইখানাতে অর্ধরাক্ষসরা প্রায় রোজই ভিড় জমায়। ওদের এখানে যেতে আপত্তি হওয়ার কথা নয়। আর গোটা পীতপত্রবন যেহেতু সমরগরিমার অধীনে, তাই ওখানে যেতে আমাদের নিয়ামক মহোদয়ও আপত্তি করছেন না। আপনি কী বলেন, সমরোত্তম নীলাভ?”

নীলাভ মানতে বাধ্য হল, “ছায়াভবন হলে মন্দ হয় না।”

একগাল হেসে সৌজন্য বলল, “বেশ, তাহলে ওই কথাই রইল। আমি সুদক্ষিণসারিতে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করছি, যেন নির্দিষ্ট সময়ে অর্ধরাক্ষস নেতারা ছায়াভবনে উপস্থিত হন। আমরাও যথাসময়ে পৌঁছে যাব।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “সৌজন্য, অন্য একটি বিষয়ে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে।”

সৌজন্য বলল, “হ্যাঁ, বলুন।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “জিজ্ঞাস্যটা মাননীয় নিয়ামকের কাছে। ওই লোকটা গোপনে আয়তনে এসে খোদ রক্ষীপ্রধানকেই হত্যা করে গেল, অথচ নিয়ামক মহোদয়, আপনার কোনো তাপ-উত্তাপ দেখছি না কেন? আপনি হত্যাকারীকে ধরার জন্য এখনও কোনো ব্যবস্থাই নেননি। আমার বেশ মনে আছে, গতবার যখন এই আয়তনে কল্পনাথের হত্যা হয়েছিল, তখন আপনি পরিবেশকে বিরাট উত্তপ্ত করে তুলেছিলেন। তাহলে এবার আপনি এত নিশ্চুপ কেন? কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনাদের এই নীরবতা আর চুপ করে বসে থাকা দেখে মনে হচ্ছে, রক্ষীপ্রধান এই খুনির হাতে মরতে আপনারা খুশিই হয়েছেন।”

এই প্রশ্ন রক্ষোবৈদ্যের কাছ থেকে আশা করেননি নিয়ামক। তিনি একটু থতমত খেয়ে বললেন, “তা নয়, তা নয়। রক্ষীপ্রধানকে কে মারল, আমিও জানতে চাই। কিন্তু যেটুকু শুনছি, এই খুনিটা একদম রহস্যময় লোক; কীভাবে আসে, কীভাবে যায়, কেউ জানতে পারে না।”

“কিন্তু জানাটা আপনাদের কাজ, তাই না?”

সৌজন্য এবার বলল, “হ্যাঁ, কিন্তু আমরাও এ রহস্যের কূলকিনারা পাচ্ছি না। ধরে নেওয়া হচ্ছে, এটা শেষমুখেরই কাজ। লোকটার আসল চেহারা আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। কেউ তাকে খুনটা করতেও দেখেনি। আমার কাছে খবর এসেছে, রক্ষোপুরীতেও এই লোক একইভাবে ঝামেলা পাকিয়ে চলেছে।”

নীলাভ মন্তব্য করল, “রক্ষোপুরীর ব্যাপারে তুমি অনেক কিছু জানো দেখছি।”

“জানতেই হয়। রাক্ষসরা সমরগরিমার শত্রু, তাই না সমরোত্তম নীলাভ? শত্রুর ব্যাপারে অনেক খবর রাখাটা ভালো জিনিস, এ কথা নিশ্চয় মানবেন আপনি?”

নীলাভর মুখে চলে এসেছিল, “শুধু খবর? ছবি নয়?” কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। জিজ্ঞাসা করতে তার ইচ্ছা করছিল, “রক্ষোপুরীর রাজকন্যা উর্মির সঙ্গে তোমার শত্রুতাটা ঠিক কীরকম?” কিন্তু সে চুপ করে রইল। এ ব্যাটাকে বুঝতে দেওয়া যাবে না, ওরা কতটা জেনেছে।

ওরা বেরিয়ে এল নিয়ামকের কার্যালয় থেকে। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “কী বুঝলে, নীলাভ? হঠাৎ এই সুমতির পেছনে কারণ কী?”

নীলাভ বলল, “বুঝতে পারছি না, আর সেটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে রাখছে। নিয়ামক আজ একবারের জন্যও উত্তেজিত হননি, গালাগাল করেননি, ‘দেখে নেব, দেখিয়ে দেব’ জাতীয় কথা বলেননি, খেয়াল করেছেন? আজকের এই ব্যবহারটা যেন ঠিক তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “হ্যাঁ, অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে আলোচনায় বসার ব্যাপারটাও তাই। নিয়ামক তাঁর পুরোনো সব রাগ, সব অপমান এত সহজে ভুলে যাবেন, এ হতেই পারে না। আর সৌজন্য? ওটাকে বুঝতে পারার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। ও যে কী চায়, কেন চায়, আর আমি ধরতে পারিনা।”

নীলাভও বলতে বাধ্য হল, “সৌজন্যকে আমিও ঠিকমতো বুঝতে পারিনা। কিন্তু এটুকু আমি নিশ্চিত, এর পেছনে ওর কিছু না কিছু স্বার্থ অবশ্যই আছে।”

রক্ষোবৈদ্যকে তাঁর সেবাকক্ষ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নীলাভ এসে বসল অনুশীলন মঞ্চে। তরবারি বার করে একা একাই আবার অনুশীলন করতে লাগল সে। শরীরটা রক্ষোবৈদ্যের দেওয়া ওষুধ খেয়ে আগের চেয়ে ভালো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও সেই পূর্বের মতো সপ্রতিভতা আসেনি। কোনোদিন আর আদৌ আসবে কিনা, কে জানে।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই সচেতনভাবে সেটাকে দূর করে দিল নীলাভ। এইসব হতাশামূলক কথাবার্তা সে মোটেই ভাববে না। তাতে শুধু মনটাই দুর্বল হয়ে যাবে।

বিরাট বড়ো পাখির ডানার ঝটপট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মুখ তুলে তাকাল সে। একটা জটায়ু নেমে আসছে আকাশ থেকে তার সামনে। তার ডানার হাওয়ার চুল উড়তে লাগল নীলাভর।

জটায়ুটাকে চিনতে অসুবিধা হল না। মেঘবর্ণের আহুদি। সকালের রোদ পড়েছে তার চকচকে পালকে। বাঁকানো ঠোঁটে ধরা আছে খামবন্ধ চিঠিটা।

মেঘবর্ণের চিঠি নির্ঘাত।

চিঠিটা তার সামনে ফেলে দিয়ে একটু দাঁড়িয়ে রইল শকুনটা। নীলাভ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিল।

খুশি হয়ে “কঁ-অ-অ” শব্দ করে মাথা নেড়ে আহুদি আবার উড়ে গেল আকাশে।

খাম খুলে চিঠিটা বার করে পড়তে লাগল নীলাভ।

নীল,

সুখবরটা আগে দিই। স্বর্ণশেখরকে পাওয়া গেছে অক্ষতদেহে। পর্বতের স্ত্রীকেও উদ্ধার করেছি আমরা। মহাসর্পিণীর ওহায় অভিযানে গিয়ে পর্বত একটু আহত হয়েছে বটে, কিন্তু আশা করছি, শীঘ্রই ঠিক হয়ে যাবে ও। এখানের রাজকন্যা উর্মি অতি উত্তম বৈদ্য। মেয়েটির চিকিৎসাশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান। তিনি বলেছেন, দু’জনেই সেরে উঠবে, যদিও উত্তরার কিছু বাড়তি সমস্যা হবার খুব সম্ভাবনা আছে। সেসব কথা সাক্ষাতে বলব।

আরেকটা সুখবর, অভী এখন সবচেয়ে বড়ো বজ্রমাণিকের মালিক। সুতসোম নামে এদের এক মহাক্ষমতাবান মায়াধর ছিল। ছেলেটি মারা যাওয়ার আগে তার অন্তর্লীন বজ্রমাণিক দান করে গেছে অভীকে। তারপর থেকেই অভীর মন খারাপ।

তবে একটা ব্যাপার আমার অদ্ভুত লেগেছে। শেষমুখ অভীকে আক্রমণ করেছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত সুবিধা করে উঠতে পারেনি। এখন এই বজ্রমাণিক হাতে আসার পর থেকে চিত্রটা বদলাচ্ছে বলেই আমার ধারণা। শেষমুখ যতই বাড়াবাড়ি করুক, তাকে যদি একবার এখন অভী মুখোমুখি পায়, তাহলে যুদ্ধজয় করতে আর খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই আমার মনে হয়। তাকে আমি বলেছিলাম না, অভীর হয়তো প্রথাগত যুদ্ধশিক্ষা খুব বেশি হয়নি, কিন্তু দরকারের সময় ও যেভাবেই হোক পরিস্থিতি ঠিক সামলে নেয়।

শ্যামশ্রী ভালো আছে, লীনাকে আগলে আগলে রাখছে। আমরা এইবার ফেরার তোড়জোড় করছি। পর্বত আর উত্তরা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই ফিরব সমরগরিমায়। কতকাল পরে স্বর্ণশেখরের সঙ্গে সবাই মিলে বসে গল্প করা হবে, ভাবতেই মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছে। অধিনায়ক বজ্রধরের কথা খুব মনে পড়ছে; স্বর্ণশেখরকে দেখলে উনি কী দারুণ খুশি হতেন, ভাবছি। পাঁচজনের একত্র হওয়াটা আর হয়ে উঠল না।

আরেকটা লোককে নিয়ে আমি বেশ চিন্তিত। সে এদের মহামন্ত্রী মরুময়। আমার যদি লোক চেনার ক্ষমতা এতটুকুও থেকে থাকে, তাহলে বলছি, এর মতো পেটে পেটে শয়তানি বুদ্ধি আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি। অভীর পেছনে শেষমুখকে লাগিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র এরই ছিল। অভীর কাছে শুনলাম, আমাদের পীতপত্রবন আর সমরগরিমায় বৃষ্টিপাত নিয়ে নাকি একসময় খোঁজখবর নিচ্ছিল লোকটা। মাথার মধ্যে কী শয়তানি বুদ্ধি খেলছে তার, কে জানে। অভীকে এ কথাও বলেছে সে, অধিনায়ক বজ্রধর নাকি তাকে চিনতেন। হতেও পারে। বজ্রধর মাল্যপর্বতের অনেক মহারথীকেই চিনতেন। এও হয়তো তাদেরই কেউ।

ওদিকে আমাদের নিয়ামক মহোদয় তাকে খুব একটা সমস্যায় ফেলছেন না, আশা করি। নিধির বাবা আহত হয়েছেন, শুনলাম। আমার আর লীনার দু'জনেরই ধারণা, অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই আঘাতটা খেয়েছেন উনি। যাই হোক, অর্ধরাক্ষস পরিস্থিতি খুব সাবধানে সামলাস, নীল। রাক্ষসদের সঙ্গে যদি আমাদের লড়াই বাধে, তখন অর্ধরাক্ষসরাই কিন্তু আমাদের পাশে দাঁড়াবে। নিয়ামক যেন অকারণে তাদের শত্রু বানিয়ে না তোলেন, সেদিকে খেয়াল রাখিস। আমরাও শীঘ্রই ফিরছি অবশ্য।

লতা নিশ্চয় ইতিমধ্যে তোর কাছে আমার খবরাখবর নিয়েছে। ওকে বলিস, আমার খুব মনে পড়ছে ওর কথা।

আপাতত শেষ করছি। সাবধানে থাকিস।

মেঘ

শেষাংশটা পড়তে পড়তে আপন মনেই একটু হেসে নিল নীলাভ। লতাকে দেখাতে হবে চিঠিটা। নয়তো শুধু শুধু সে ভাবতে থাকবে, মেঘবর্ণ তার কথা মনেই করেনা।

উঠে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল একবার লতাদেবীর কাছ থেকেই ঘুরে আসবে, এমন সময় একটা লোক এসে নমস্কার করে দাঁড়াল তার সামনে। “সমরোত্তম নীলাভ, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে আমার।”

সেই সঞ্জীব নামের অর্ধরাক্ষস। সেদিন দেখা হওয়ার পর থেকেই নীলাভ অনুমান করেছিল, এ আসবে তার কাছে।

প্রতিনমস্কার করে সে বলল, “হ্যাঁ, বলো কী বলবে।”

ভয়ে ভয়ে চারপাশটা দেখে নিল সঞ্জীব, তারপর বলল, “আপনি আমাকে চেনেন?”

“পরিচয় জানি। তুমি ছায়াভবনের দায়িত্বে আছ, তাই না?”

“হ্যাঁ। আপনি চঞ্চলকে চিনতেন না বোধহয়। ও আমার বন্ধু ছিল।”

চঞ্চলের নাম শুনে নীলাভর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। “সঞ্জীব, তোমার বন্ধু সমরগরিমার অধিনায়ককে পেছন থেকে আঘাত করে হত্যা করেছিল কাপুরুষের মতো, সে ইতিহাস আমি শুনেছি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে তোমার মৃত বন্ধুর গল্প শোনাতে আসোনি?”

সঞ্জীব বলল, “আজ্ঞে না। চঞ্চলের কথা বললাম এই জন্য যে আপনার কাছে আমি কিছু লুকোতে চাই না। এই সময় অন্য কার কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়া যেতে পারে, আমি জানি না। মনে হল, আপনাকে ভরসা করে সব কথা বলা যেতে পারে, তাই...”

“আচ্ছা, কী বলতে চাইছ, বলো।”

“আপনার কাছে স্বীকার করছি, গত শর্বরযুদ্ধের আগে আমি রাক্ষসদেরই সমর্থন করেছিলাম, কারণ মনে হয়েছিল, আমাদের অর্ধরাক্ষসদের উপর যা অবিচার হয়ে এসেছে এতদিন, তার বদলে এবার ন্যায় পাব আমরা শর্বর আর উর্গায়ুর কাছে। আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম, শর্বর জয়লাভ করুক। উর্গায়ু এমন কিছুর স্বপ্ন আমাদের দেখিয়েছিল বাস্তবে যা আমরা কোনোদিন পাইনি। কিন্তু কোথায় কী? যুদ্ধ শেষ হল। আমরাও দেখলাম, আমাদের অর্ধরাক্ষসদের স্রেফ দাবার বোড়ের মতো ব্যবহার করেছে ওরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ওরা যা চায়, ওরা দিব্যি বাগিয়ে নেবার চেষ্টায় থেকেছে; আমরা যা চাই, সেদিকে ফিরেও তাকায়নি কেউ।”

নীলাভ গুনতে লাগল। তার মনে হচ্ছিল, এ বেচারা কারও কাছে কোনোদিন মন খুলবার সুযোগ পায়নি। আজ যদি তাকে মনের কথাগুলো বলে একটু হালকা হয়, হোক না।

“সেই খেলা আবার শুরু হয়েছে, সমরোত্তম নীলাভ। আমি জানি, আপনাকে এগুলো বলছি মানে আমার প্রাণ নিয়ে যেকোনো মুহূর্তে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু না বললে আরও বহু প্রাণ নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি কি জানেন, ওই সহনিয়ামক লোকটা মানুষ নয়?”

নীলাভ অবাক হয়ে বলল, “মানুষ নয় তো কী?”

“ও মানুষ হতেই পারে না। ও রাক্ষস, জন্মগতভাবেই রাক্ষস। ও এমন সব মায়া জানে, যেগুলো কোনো মানুষের পক্ষে প্রয়োগ করা সম্ভবই নয়। আর ওই যে ছায়াভবনে সব অর্ধরাক্ষস নেতাকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা – ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছে ওসব।”

“কিন্তু তাতে ক্ষতি কী হল?” নীলাদ্র জানতে চাইল। “অর্ধরাক্ষসদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা হলে তো ভালোই হয়। তোমরা অর্ধরাক্ষসরাও তো অনেক দিন ধরে এটাই চাইছিলে।”

সঞ্জীবের গলার স্বর খাদে নেমে গেল। “সমরোত্তম নীলাদ্র, আমরা ঘোর বিপদের মধ্যে আছি। আমার জাতভাইরা, আমার জাতের নেতারা সবাই ঘোর বিপদের মধ্যে আছে। ওই ছায়াভবনে ওদের জন্য খুব খারাপ কিছু অপেক্ষা করে আছে। ওদের কাউকে বলতে পারছি না সাহস করে। কিন্তু আপনি দয়া করে কিছু করুন।”

নীলাদ্র বলল, “আমার যতটা সাধ্যে কুলোয়, আমি করব, কথা দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে বলো, সৌজন্যের দলবল কী মতলব পাকাচ্ছে।”

কী একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল সঞ্জীব। নীলাদ্র দেখল, তার মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল।

কে যেন আসছে তার পেছনে। সঞ্জীব দেখতে পেয়েছে তাকে।

মাথা ঘুরিয়ে তাকাল নীলাদ্র। সৌজন্য স্বয়ং আসছে।

সে বলল, “আরে, সহনিয়ামক নিজে এসেছেন আমার সন্ধানে। কী সৌভাগ্য আমার!”

সৌজন্যের হাতে ধরা ছিল একটা চিঠি। সে গম্ভীরমুখে বলল, “খুব জরুরি ব্যাপার না হলে আপনাকে এখন বিরক্ত করতাম না, সমরোত্তম নীলাদ্র। কিন্তু চিঠির উপরের চিহ্নটা দেখে মনে হল, এটা এক্ষুণি আপনার হাতে পৌঁছোনো দরকার।”

তার হাত থেকে খামটা নিয়েই চমকে গেল নীলাদ্র। খামের উপর একটা তরবারির ছবি, তার হাতলে জ্বলছে সূর্য। ঐশিকদের চিহ্ন!

সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে নীলাদ্র বলল, “সঞ্জীব, আমি দুঃখিত। আবার পরে কথা বলব তোমার সঙ্গে। আপাতত এই ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হবে এখনি।”

সঞ্জীবের চোখের হতাশভাবটা তার নজর এড়াল না। কিন্তু কিছু করার নেই তার। ঐশিকরা চিঠি পাঠিয়েছেন মানে ব্যাপার গুরুতর।

চলে যাওয়ার আগে সঞ্জীবের মুখের হতাশার সঙ্গে ভয়ের ভাবটাও যে প্রকট হয়ে উঠেছে, সে খেয়াল করল। কেন? সৌজন্য তাকে তার সঙ্গে দেখে ফেলেছে বলে?

মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিল সে। আশা করা যায়, তার সঙ্গে এইটুকু কথা বলার জন্য সৌজন্য নিশ্চয় শেষমুখকে লাগিয়ে সঞ্জীবকে খুন করাবে না।

কিন্তু ঐশিকেরা এখন কী চান তাদের কাছে? খামটা ভালোভাবে দেখল সে। ঐশিকদের তরবারি আর সূর্যের চিহ্নের নীচে লেখা আছে ‘সমরগরিমার সমরোত্তমদের প্রতি’, আর তার নীচে লেখা আছে ‘জরুরি’।

খাম খুলে চিঠিটা বার করে পড়তে শুরু করল নীলাভ। যখন সে পড়া শেষ করল, তখন একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুক দুরুদুরু করছে।

সমরগরিমার মাননীয় সমরোত্তমগণ,

অভী নামের যে ছেলেটিকে প্রলয়যোদ্ধা বলে মনে করা হচ্ছে, আমরা তার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। আমরা জানি, সে বর্তমানে সমরগরিমায় নেই। কিন্তু যেহেতু আমরা তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তাই আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হচ্ছে সমরগরিমাতেই। আমরা আশা রাখছি, যে সমরোত্তম এই পত্র পাবেন, তিনি সংবাদটি অভীর কাছে পৌঁছে দেবেন। আগামীকাল সকালে তাকে আমরা আশা করছি আকাশলোকে। আমাদের রথ তার জন্য যথাসময়ে উপস্থিত থাকবে মাল্যপর্বতের রাজপ্রাসাদে।

সঙ্গে দু'জন ব্যক্তিকে আনতে পারে সে, তবে কোনো সমরোত্তমকে আনা চলবে না, এবং প্রলয়যোদ্ধা অভী নিজে আসবে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়। সমরগরিমা তথা সমগ্র মায়াজগতের মঙ্গল বা অমঙ্গল হতে পারে, এমন বিষয়ে আমরা তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চাই।

ঐশিকবৃন্দ

নীলাভ বুঝতে পারছে, না গিয়ে অভীর উপায় নেই। কিন্তু ঐশিকদের উদ্দেশ্য কতটা সৎ, সে-বিষয়ে তার ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছে।



।। চতুর্দশ অধ্যায় ।।

হৃদয়শর

নীলাব্র চিঠিটা যখন রক্ষোপুরীতে এসে পৌঁছোল, তখন অভী কথা বলছিল রাজকন্যা উর্মির সঙ্গে।

জিজ্ঞাসা করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে বলেই ফেলল অভী।
“রাজকন্যা, আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার অনুমতি চাইছি।”

একটু অবাক হয়ে উর্মি বললেন, “বলো, কী বলবে।”

শেষমুখ উর্মিকে নিয়ে তাকে যে কথাগুলো বলেছিল, সেগুলো তাঁকে বলল অভী। শুনে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন।

“আমি সত্যি বলছি অভী, এই শেষমুখ লোকটা কে, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। কেনই বা সে তোমাকে এইসব অর্থহীন কথাবার্তা বলতে গেল?”

অভী সসংকোচে জিজ্ঞাসা করল, “মানে, আপনাকে মনে মনে পছন্দ করে, এমন কেউ আছে কি?”

উর্মি বললেন, “কে মনে মনে কী করে, সেটা আমি কী করেই বা জানব? কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কাউকে তো আমার নজরে পড়েনি। তাও আবার শেষমুখের মতো লোক!”

অভী বলল, “কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, শেষমুখ আমাকে তার প্রতিযোগী মনে করছে। আপনার প্রতি একটুও দুর্বলতা আছে, এরকম কারও কথা মনে পড়ছে না আপনার?”

“না, এরকম কেউ আমার জ্ঞানমতে নেই। হতে পারে, ইচ্ছে করেই এসব কথা বলে শেষমুখ তোমার নজর অন্যদিকে ঘোরাতে চাইছিল।”

“উহু, তা নয়। কথাটা বলার সময় মনে হচ্ছিল সত্যিকথাই বলছে ও। তাছাড়া আমার উপর ব্যক্তিগত রাগ না থাকলে সে হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করতে যাবেই বা কেন?”

উর্মি অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, “অভী, বিশ্বাস করো, আমি ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছি না। শেষমুখের মতো একটা খুনির তোমার প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ার কীই বা কারণ থাকতে পারে? তুমি তো আমাকে ভালোই বাসো না, তাই না?”

অভী চুপ করে রইল। রাজকন্যা একটু হেসে বললেন, “এ প্রসঙ্গ থাক। চলো, পর্বত কেমন আছেন, দেখে আসি।”

ওরা উঠতে যাবে, তখনই প্রফুল্ল এসে ঢুকল নীলাভ্রর সংবাদ নিয়ে। “রাজকন্যা, সমরগরিমা থেকে এই চিঠিটা এখুনি এল প্রলয়যোদ্ধার জন্য। ওপরে ‘জরুরি’ লেখা আছে, তাই তাড়াতাড়ি নিয়ে এলাম।”

চিঠি খুলে চোখ বুলিয়েই অভী বলে উঠল, “ব্যাপার সুবিধের ঠেকছে না। সবাইকে ডাকতে হবে। মা, মেঘবর্ণ, লীনা, রবিকাকা – সবার সঙ্গে আলোচনা করে এক্ষুণি একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।”

উর্মি বললেন, “কী হল?”

আকাশলোকের আমন্ত্রণের ব্যাপারটা তাঁকে জানাতেই উর্মি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। “তোমার সঙ্গে দু’জন সঙ্গী নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন ঐশিকরা? সমরোত্তমরা কেউ যখন যেতে পারছেন না, তাহলে একজন লীনা হবেই। আরেকজন আমি – আমি যাবই আকাশলোকে। ঐশিকদের সামনে যাওয়া – এ একটা অভিজ্ঞতা।”

অভী বলল, “আপনার পিতা মহারাজ অনুমতি দেবেন?”

“পিতার অনুমতি আদায় করতে চললাম আমি। তুমি সমরোত্তমদের অনুমতি জোগাড় করো আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। আমি শুনেছি, আকাশলোক হল মায়াজগতের অন্যতম অদ্ভুত এবং রহস্যময় জায়গা। আজ পর্যন্ত খুব বেশি মানুষ বা রাক্ষস ওখানে পা দেয়নি। কাজেই আমি এমন সুযোগ ছাড়ছি না।”

উর্মি বেরিয়ে গেলেন রাজসভার উদ্দেশে। অভী ডেকে আনল সমরগরিমার সবাইকে। মায়ের হাতে চিঠিটা দিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

শ্যামশ্রী চিঠি পড়ে চমকে উঠলেন। “অভী, তোকে ওরা ডাকছে কেন? আমার মন বলছে, ওদের উদ্দেশ্য ভালো নয়, হতে পারে না।”

চিঠির বিষয়বস্তু ইতিমধ্যেই অভী সবাইকে বলে দিয়েছিল। সকলেরই মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। স্বর্ণশেখর বলল, “আবার শর্তগুলো খেয়াল করো। অভী অস্ত্র নিয়ে যেতে পারবে না। মানে, ওদের ভয় পাচ্ছে অভী চন্দ্রহাস নিয়ে ওদের আক্রমণ করে বসে।”

শ্যামশ্রী বললেন, “সমরোত্তমদের কারও যাওয়া চলবে না। তার মানে আমাদের নিশ্চয় ওরা ভয় পাচ্ছে। নয়তো এরকম ঘোষণা করার কারণ কী?”

মেঘবর্ণ বলল, “এখন ভাবতে হবে, অভীর সঙ্গে কে কে যাবে। আমরা কেউ যেতে পারছি না ঐশিকদের দেওয়া শর্ত অনুযায়ী। লীনা, তুমি যাবে?”

শ্যামশ্রী বললেন, “কিন্তু লীনা, তোমার মা...”

লীনা বলে উঠল, “মা যাই বলুক, আমি যাব। নিরস্ত্র অভীকে একা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এখানে এসে পর্যন্ত কেবল নিরাপদে বসেই আছি ঘরের মধ্যে। এখন আকাশলোকে অভীকে আমি ছাড়া সুরক্ষা দেবে কে?”

শ্যামশ্রী বললেন, “আরেকজন কাকে পাই?”

অভী বলল, “রাজকন্যা উর্মি আমাদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।”

শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ একসঙ্গে বললেন, “তাহলে তো ভালোই হয়।”

স্বর্ণশেখর বলল, “রাজকন্যা ঠান্ডা মাথার মেয়ে। কিন্তু উনি যুদ্ধবিদ্যা জানেন না। ওখানে গিয়ে...”

মেঘবর্ণ বলল, “ওখানে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে কি? মনে তো হয় না। যুদ্ধ করতে হলে ঐশিকরা এইভাবে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাতেন না।”

শ্যামশ্রী বললেন, “চলো, রাজসভায় যাই। ওখানেই রাজা পুনর্বসুর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি।”

ওরা সবাই চললেন রাজসভার দিকে। যেতে যেতেই দেখতে পেলেন, বিরাট রথটা নেমে আসছে রক্ষোপুরীর বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠে।

অভী ইতিমধ্যে খেয়াল করেছিল, লীনা যেন একটু গম্ভীর হয়ে আছে। সে ভাবল, একটু ফাঁকা পেলে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, কী হয়েছে।

রথের দিকে এগিয়ে গেল অভী আর লীনা। আগাগোড়া সোনার তৈরি রথের কোনো ঘোড়া নেই। মন্দিরের চূড়ার মতো মাথার উপরে পতাকা লাগানো আছে, তাতে ঐশিকদের তরবারি আর সূর্যের চিহ্ন আঁকা। শ্যামশ্রী বললেন, “খুব শক্তিশালী ঐশিকমায়া বিকিরণ করছে রথটা। মায়াবলেই চলবে এটা; টানার জন্য কোনো জন্তু লাগবে না।”

বেশ কয়েকজন রাক্ষস এসে কৌতূহলভরে দেখছে জিনিসটাকে। ওঁরা এসে প্রবেশ করলেন রাজার সভাকক্ষে। যথারীতি রাজার দু’পাশে বিরাজমান মহামন্ত্রী মরুময় এবং সেনানায়িকা প্রজ্ঞা। মরুময়ের মুখে চতুর হাসি, প্রজ্ঞার মুখ বিষণ্ণ।

অভী ভেবেছিল, ছেলের মৃত্যুর পরে প্রজ্ঞা হয়তো কয়েকদিন রাজসভায় আসবেন না। আজ তাঁকে পূর্ববৎ বসে থাকতে দেখে সে একটু অবাকই হল।

উর্মি আগেই পৌঁছেছেন এখানে। ওঁদের আসতে দেখে রাজা বললেন, “সমরোত্তম সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রী, আমার কন্যা প্রলয়যোদ্ধা অভী ও যোদ্ধা লীনার সঙ্গে আকাশলোকে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। যেকোনো রাক্ষসের কাছে এ সুযোগ পাওয়া অসীম সম্মানের ব্যাপার। তবুও আমি একটু দ্বিধা করছি অনুমতি দিতে। আপনার কী মত এ ব্যাপারে?”

শ্যামশ্রী বললেন, “আমারও ইচ্ছা, রাজকন্যা আকাশলোকে যান অভীদের সঙ্গে। আপনি তাঁকে অনুমতি দিলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব।”

রাজা তাকালেন মরুময়ের দিকে। তিনি মাথা নাড়লেন। “রাজকন্যা যদি রক্ষোপুরীর পক্ষ থেকে আকাশলোকে যান, তাহলে তা আমাদের সবার কাছে গৌরবের বিষয় হবে।” বলে অভীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে এক চোখ টিপলেন তিনি। কী উদ্দেশ্যে, অভী বুঝতে পারল না।

রাজা পুনর্বসু বললেন, “তাই হোক। উর্মি, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম। যাও, আকাশলোক ভ্রমণ করে এসো সমরগরিমার অতিথিদের সঙ্গে।”

রাজার অনুমতি নিয়ে ওরা তিনজন বেরিয়ে এল সভাকক্ষ থেকে উন্মুক্ত

মাঠে। শ্যামশ্রী অভীর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, “অভী, খুব সাবধান কিন্তু। ঐশিকরা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য করতে পারেন না, হেন কাজ নেই।”

মেঘবর্ণও বলল, “ঐশিকমায়াকে লোকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে ঠিকই। কিন্তু আমি তোমাকে বলে রাখছি অভী, মায়াজগতের সবচেয়ে ক্ষতিকর মায়ামূল্যও ওদেরই আয়ত্তে আছে। তাই খুব সতর্ক থেকো।”

অভী মাথা নাড়ল। শ্যামশ্রী বললেন, “লীনা, তুমিও সাবধানে থেকো। তোমার দু'জন সঙ্গীই নিরস্ত্র। তাদের সামলে রেখো।”

লীনার পিঠে ধনুর্বাণ, কোমরে তরবারি। সে বলল, “আমি যথাসাধ্য করব, সমরোত্তম শ্যামশ্রী।”

যে রাক্ষসরা ঘিরে ছিল রথটাকে, তারা সরে গিয়ে পথ করে দিল। ওরা তিনজন এক এক করে উঠে পড়ল রথে। অদ্ভুত ব্যাপার, ওরা উঠতেই রথ অদৃশ্য হয়ে গেল।

অভীর মনে হচ্ছিল, ওরা তিনজন যেন বসে বসেই উঠে যাচ্ছে শূন্যে; গোটা রথটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। নীচের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, মানুষগুলো এইটুকু হয়ে যাচ্ছে। খেলাঘরের মতো হয়ে যাচ্ছে সুবিশাল রাক্ষসপ্রাসাদ। উর্মি বললেন, “কেউ নীচের দিকে তাকিও না এখন। মাথা ঘুরবে।”

উঠতে উঠতে হঠাৎ চারপাশ কালো হয়ে গেল। এরকম অভিজ্ঞতা অভীর আগে হয়েছে। সে বুঝতে পারল, আকাশের কোনো সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়েছে ঐশিকদের মায়ারথ।

আলো নেই, বাতাস নেই; কেমন যেন একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ। লীনা পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে অভীর হাতটা শক্ত করে ধরে রইল।

অভীরও কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল এই অন্ধকারে। সে তবু বলল, “ভয় নেই। একটু পরেই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে যাব আমরা।”

আরও বেশ কিছুক্ষণের দমচাপা অপেক্ষার পর আবার মুখে এসে লাগল একঝলক তাজা হাওয়া। খুশি হয়ে অভী বলতে যাচ্ছিল, “এই তো আমরা খোলা জায়গায় চলে এলাম,” কিন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

রথ ওদের আকাশে ভাসিয়ে রেখেছে বটে, কিন্তু নীচে কোনো শক্ত জমি নেই – অকূল সমুদ্রের উপর শূন্যে দুলছে ওরা।

নীচে যতদূর দৃষ্টি যায়, কালচে নীল সমুদ্রের জল। সেই জলের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে ঐশিকরথ। অবাক বিস্ময়ে, ভয়ে ওরা তিনজন কোনোক্রমে বসে রইল স্বচ্ছ রথের উপর। মনে হচ্ছে, একটু নড়াচড়া করতে গেলেই পড়ে যাবে ওই অন্তহীন জলরাশির মধ্যে।

আরও একটা ব্যাপার, রথ ওদের যেখানে নিয়ে এসেছে, সেখানে আলো বড়োই কম। সন্ধ্যার একটা হালকামতো অন্ধকার নেমে এসেছে যেন চারপাশে, যদিও দেখা যাচ্ছে সবই। সমুদ্রের উপর ঢেউ উঠছে; অনেক নীচের সেই চলমান, সফেন জল দেখতে দেখতে অভীর গা শিরশির করতে লাগল।

উর্মি বললেন, “আমার মনে হয়, এটা মায়া। ঐশিকরা আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটচ্ছেন।”

লীনা বলল, “আপনি সেটা বুঝতে পারছেন?”

উর্মি বললেন, “চিকিৎসাশাস্ত্রে মায়াদর্শন বলে একটা খুব কঠিন বিষয় আছে। আমি এখনও পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারিনি, কিন্তু একটা কমবেশি ধারণা আছে। বিষয়টা হল, যদি কোনো মানসিক রোগীর কোনো একটা বিশেষ দৃশ্য দেখলে মন শান্ত হয়, তাহলে তার চিকিৎসার জন্য সাময়িকভাবে সেই দৃশ্য দেখানো যেতে পারে। অত্যন্ত কঠিন মায়া, কিন্তু মায়াপ্রয়োগ যে হচ্ছে, তা চেনার উপায় হল, এই ধরনের মায়া খুব অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, আর একই দৃশ্য বারবার ফিরে ফিরে আসে।”

অভী বলল, “তাহলে ঢেউগুলো খেয়াল করে দেখা যাক, একই ধরনের ঢেউ ফিরে আসছে কিনা।”

রথটা খুব ধীরে ধীরে উড়ে চলেছে মৃদু আলোয় ভরা সমুদ্রের উপর দিয়ে। ওরা তাকিয়ে রইল জলের দিকে।

কিছুক্ষণ জলটাকে খেয়াল করে দেখার পর লীনা বলল, “রাজকন্যা উর্মি, আপনি ঠিকই বলেছেন মনে হচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউগুলোর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট নকশা আছে। একই নকশা বারবার আসছে।”

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে রথটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। প্রথমে থরথর করে কাঁপতে লাগল, যেন এখনই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে সে। আর তারপরেই কিছুটা বেঁকে গিয়ে সে প্রচণ্ডগতিতে ধেয়ে চলল সমুদ্রের দিকে।

অভী ভয়ে চোঁচিয়ে উঠল, “আমরা পড়ে যাচ্ছি! আমরা পড়ে যাচ্ছি!”

উর্মি আর লীনা দু'জনেরই মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবু উর্মি বললেন, “না, আমার মনে হচ্ছে, ঐশিকরা আমাদের পরীক্ষা করছেন।”

অভীর অবশ্য তা মনে হচ্ছিল না। সে দেখতে পাচ্ছে, বিশাল সমুদ্র যেন প্রবল গতিতে উঠে আসছে ওদের দিকে; তরঙ্গায়িত বিপুল জলরাশির উপর আছড়ে পড়তে চলেছে ওরা। এই অকূল সাগরে একবার পড়লে আর বেঁচে ফেরার কোনো আশা নেই।

একটা গমগমে কণ্ঠস্বর বলে উঠল, “আমরা ‘মায়া’ প্রদর্শন করছি বলে মনে হচ্ছে তোমাদের? এখনও মনে হচ্ছে?”

অভী বুঝতে পারল, এই রথে ওরা যা যা কথা বলেছে, সব শুনছিলেন ঐশিকরা। হয়তো স্বপ্ন-উপলের জোড়ার একটা এখানে এই রথের মধ্যে আছে, আর অন্যটা আছে ওঁদের কাছে।

উর্মি বলে উঠলেন, “তাই মনে হচ্ছে।”

কণ্ঠস্বরটা বলল, “প্রমাণ করতে পারবে? সে সাহস আছে?”

উর্মি একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন জলটার দিকে। তিনি বলে উঠলেন, “আছে। দেখবেন?”

“দেখাও। নয়তো রথ থেকে নামতে পারবে না বাকি দু'জন।”

ওদের দিকে ফিরে উর্মি বললেন, “অভী, আমি নিশ্চিত, এটা মায়া। এই মৃদু আলোই দরকার হয় এইধরনের দৃষ্টিবিভ্রম মায়া তৈরি করার জন্য। ঐশিকরা আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। এই সমুদ্র আসলে নেই বলেই আমার

ধারণা। তোমরা থাকো, আমি চললাম।”

অভী আর লীনা হাঁ-হাঁ করে উঠল; লীনা হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল তাঁকে। কিন্তু তার আগেই রথের অদৃশ্য বাধা পেরিয়ে উর্মি লাফ দিয়ে পড়লেন অস্পষ্ট, বিশাল সমুদ্রে। আর পরক্ষণেই তলিয়ে গেলেন।

স্তব্ধ আতঙ্ক দু'চোখে নিয়ে চেয়ে রইল ওরা।

হা হা করে একটা হাসি ভেসে এল ওদের কানে। ঐশিকরা হাসছেন। “এবার বিশ্বাস হল তো?”

রথটা পড়ছে সমুদ্রের দিকে, দুলভ ঢেউগুলোকে আরও ভয়ংকর লাগছে। কিন্তু সেই ঢেউয়ের মাঝখান থেকেই ভেসে এল উর্মির কণ্ঠস্বর। “অভী, লীনা, আমি বেঁচে আছি, শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, আমি কিন্তু তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। লাফ দাও, লাফ দাও। মাটি থেকে মাত্র কয়েক আঙুল উপরে আছ তোমরা।”

অভী আর লীনা পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর হাত ধরাধরি করে দু'জনে একসঙ্গে লাফ দিল অদৃশ্য রথ থেকে সমুদ্রের দিকে।

যতখানি উচ্চতা থেকে জলের উপর আছড়ে পড়বে ভেবেছিল, তার অনেক আগেই দড়াম করে মাটিতে এসে পড়ল ওরা। কোথায় মিলিয়ে গেল সেই অকূল জলরাশি, ঢেউয়ের মাথায় ভেসে চলা ফেনা। মাটির এত কাছেই যে ওরা আছে, রথ থেকে অভী ভাবতেই পারেনি।

সে দেখল, সমুদ্র মিলিয়ে গেছে; তারা এসে পড়েছে প্রচুর গাছপালাঘেরা একটা পথে। লাল রঙের পাথর দিয়ে তৈরি পথটা চলে গেছে একটা বিরাট ফটকের মধ্য দিয়ে।

সেই পথের উপরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন উর্মি; তাঁর মুখে বিজয়িনীর হাসি।

“কী বলেছিলাম?” বলে উঠলেন তিনি।

অভী বলল, “আপনার সাহস দেখে আমরা সত্যিই অবাক।”

“মায়াদর্শন ব্যাপারটা ভাগ্যিস জানা ছিল। নয়তো আমিও বুঝতে পারতাম না বিভ্রমটা,” রাজকন্যা বললেন। “যাই হোক, এবার এগোনো যাক। এই লাল পাথুরে পথটা ছাড়া তো আর অন্য কোনো যাওয়ার মতো রাস্তা তো দেখছি না।”

সেই পথেই হেঁটে চলল ওরা। পথটা খুব বেশি চওড়া নয়। দু'জন কোনোক্রমে পাশাপাশি চলতে পারে। চারপাশে ঘন বন; উঁচু উঁচু গাছের মধ্য দিয়ে রোদ এসে পড়ছে। অভীর জঙ্গলে ঘোরার অভিজ্ঞতা নেহাত কম নয়। বৈকালির জঙ্গল, পীতপত্রবন দুটো বনেই সে অনেকবার ঘুরেছে। কিন্তু এই বনটা যেন তার দেখা সব অরণ্যের চেয়ে আলাদা। একটা কারণ বোধহয়, এই বনে কোনো পাখি ডাকছে না। পুরো জায়গাটা কী অস্বাভাবিক ভাবে নিঃশব্দ!

অভী বলল, “এটাও মায়া নয়তো?”

উর্মি বললেন, “না, এটা আসল জায়গা। মায়াবিভ্রম হলে একই ধরনের গাছের সারি ফিরে ফিরে আসত। আর মায়াবিভ্রমে গন্ধ তৈরি করা যায় না। এখানে আমি রীতিমতো বুনো গন্ধ পাচ্ছি। অভী, এই জঙ্গলে হিংস্র জন্তু থাকার খুব সম্ভাবনা।”

“আপনি গন্ধ পাচ্ছেন?”

“মনে হচ্ছে, পাচ্ছি। খুব কাছেই সম্ভবত আছে জন্তুটা, যদিও কী জাতের জন্তু, আমি বুঝতে পারছি না। অবাক হওয়ার কিছু নেই, রাক্ষসদের ঘ্রাণশক্তি মানুষদের থেকে তীক্ষ্ণ হয়, জানো নিশ্চয়।”

অভী মাথা নাড়ল। তারপর তার খেয়াল হল, নেমে আসার পর থেকে লীনা একদম চুপ করে আছে।

তার দিকে তাকাল সে। লীনার মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর।

তার কী হয়েছে, জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় গোটা জঙ্গল কাঁপিয়ে তীব্র একটা জান্তব গর্জন ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে লীনা ধনুতে বাণ পরিয়ে সতর্কভাবে তাকিয়ে দেখে নিল চারদিক।

উর্মি ফিশফিশ করে বললেন, “ঐশিকরা সম্ভবত এখনও আমাদের পরীক্ষা করছেন।”

“বা, খেলছেন আমাদের নিয়ে,” মন্তব্য করল অভী। তার ভালো লাগছিল না ব্যাপারটা। আমন্ত্রণ করে এনে এ হেন ব্যবহারে রাগ হচ্ছিল তার। কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা আছে ঐশিকদের রাজত্বে। রাগ করে লাভ নেই; মাথা ঠান্ডা রেখে অক্ষতদেহে বেরিয়ে আসতে হবে এখান থেকে।

অভীর কাছে চন্দ্রহাস বা ময়ূরবজ্র তরবারি কোনো অস্ত্রই নেই। উর্মি তো অস্ত্রবিদ্যা জানেনই না। তাদের সুরক্ষা এখন নির্ভর করছে লীনার উপর।

অভী বলল, “লীনা, চোখ কান খোলা রেখে চলো। আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব কিনা, তোমার উপরেই নির্ভর করছে।”

লীনা এতক্ষণে কথা বলল। গম্ভীরমুখে বলল, “অভী, কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।”

সঙ্গে সঙ্গে অভী বুঝে ফেলল, লীনা কী ধরনের স্বপ্নের কথা বলছে। ওরা এগিয়ে যাচ্ছে লাল পাথরে তৈরি পথটা দিয়ে বিরাট প্রবেশদ্বারের দিকে। আরও অনেকটা যেতে হবে। অভী বলল, “রাজকন্যা উর্মি, আপনি একটু আমাদের আগে আগে হাঁটবেন? লীনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।”

উর্মি মাথা নেড়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে কিছুটা ব্যবধান রেখে হাঁটতে লাগল অভী আর লীনা।

একটা স্বপ্ন-উপল বার করে তাকে দেখাল লীনা। “এটা তোমার পোশাকের মধ্য থেকেই পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। আমি কাল রাতে এটা নিয়ে শুয়েছিলাম। অভী, আমি জানি আজ আমি এখান থেকে বেঁচে ফিরব না।”

অভী কী বলবে, বুঝতে পারল না; নীরবে সে তাকিয়ে রইল প্রিয় বান্ধবীর দিকে।

লীনা আবার বলল, “এই জায়গাটাই কাল স্বপ্নে দেখেছি – এই উঁচু গাছগুলোকে দেখেছি, এইরকম বন্য জন্তুর ডাক শুনেছি। আমার সময় হয়ে এসেছে, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কী দেখে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছি জানো? আরেকটা মৃত্যু।”

অভী জানত, কার মৃত্যু। তবু সে বলল, “কার?”

“নিধির। দেখলাম হাতে ত্রিশূল ধরে ও মরে পড়ে আছে মাটিতে। যেন ত্রিশূলটাই ওকে টেনে নিয়ে গেছে মৃত্যুর দিকে।”

অভী কথা বলতে পারছে না। তার দেখা স্বপ্নের স্মৃতিগুলো ভাসছে তার চোখের সামনে। লীনা বলল, “তুমিও এই স্বপ্ন দেখেছিলে, না? মিথ্যে বোলো না; বললে আমি বুঝতে পারব।”

অভী শুধু বলল, “আমি তোমার কিছু হতে দেব না, লীনা।”

লীনা মলিন হাসল। “নিয়তির ইচ্ছার সামনে তুমি কী করবে, বোকা?”

ওরা এসে পড়েছিল বিরাট প্রবেশদ্বারের সামনে। লোহার দ্বার খুলে গেল আপনা থেকেই। দ্বারের ওপারে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঐশিক...

ভেতরের দৃশ্য অতীব মনোহর। গাছপালা, সরোবরে সুসজ্জিত উদ্যান। কিন্তু ঐশিককে দেখে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করার দিকে আর মন গেল না ওদের।

ঐশিকের কাঁধের উপর জেগে রয়েছে পাঁচখানা মাথা। দেখেই রাবণের কথা মনে হল অভীর।

“স্বাগতম প্রলয়যোদ্ধা।” একসঙ্গে হেসে উঠল পাঁচটা মাথা।

অভীর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁকে দেখে। ঐশিক বললেন, “তোমার মনে প্রশ্ন জাগছে আমাদের চেহারা দেখে। আসলে আমরা পাঁচজন একই দেহে অবস্থান করছি বর্তমানে। এর ফলে কোনো সাধারণ অস্ত্রের দ্বারা আমরা অভেদ্য।”

অভী বলল, “আপনারা তো সাতজন ছিলেন জানতাম।”

“যুদ্ধদেব মারা গেছেন তোমার চোখের সামনে। আর একজন কিছু দরকারি কাজে বেশ কিছুদিন আকাশলোকের বাইরেই আছেন। তাই আপাতত এখানে আমরা পাঁচজনই আছি। আজ যাকিছু তোমাদের বলব, সব আমাদের পাঁচজনেরই কথা। এসো, বসা যাক।”

ঐশিকরা আবার বললেন, “উর্মি, তোমার বুদ্ধি আর সাহস দেখে আমরা খুশি হয়েছি। লীনা, আশা করছি শীঘ্রই তোমার বুদ্ধি আর সাহসের পরিচয়ও আমরা পাব। কিন্তু আজ শুধু অভীর সঙ্গে কথা বলার জন্যই তাকে ডেকে আনা। তোমাদের সঙ্গে যতক্ষণ না কথা বলা হচ্ছে, তোমরা কেউ কথা বোলো না।”

লীনা আর উর্মি পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু কেউ কিছু বললেন না।

সুন্দর বাগানটাতে সমান করে ঘাস ছাঁটা, গাছের উপর এসে পড়েছে রোদ, যদিও পাখির ডাক কোথাও শোনা যাচ্ছে না। সরোবরের জলে ফুটে আছে নাম-না-জানা সুন্দর নীল ফুল; কিন্তু হাওয়া দিচ্ছে না একটুও। ওরা এসে বসল শ্বেতপাথরের উঁচু বেদিতে।

বসার পর অভী বলল, “আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন, বলুন।”

ঐশিকদের পাঁচখানা মাথা তাকে দেখছে মন দিয়ে। দশজোড়া চোখের ওই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে অভীর ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল।

তারপর ঐশিকবৃন্দ হাসলেন। “কেন ডেকেছি বলো তো? তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য রক্ষোপুরীর বাইরে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের।”

“কেন? বাকিদের থেকে আমাকে আলাদা করে কী লাভ আপনাদের? আমাকে হত্যা করতে চান আপনারা?”

“না, অভী। আমরা তোমাকে হত্যা করতে চাই না - অন্তত নিজেদের হাতে নয়। নিজেদের হাত চট করে ময়লা করার ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা তোমাকে এখানে আনতে চেয়েছিলাম, যাতে সমরোত্তমদের থেকে তুমি দূরে থাকো বেশ কিছুক্ষণের জন্য।”

অভী অবাক হল। “আমাকে সমরোত্তমদের থেকে দূরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন আপনারা? কিন্তু তাতে লাভ? ওঁরা এক একজন মহাবীর। যেকোনো যুদ্ধের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করার ক্ষমতা রাখেন ওঁরা। আমি কাছে থাকলেও ওঁদের আমার সুরক্ষার দরকার কোনোদিনই ছিল না।”

“জানি, জানি। সেখানেই তো মজা। কিন্তু তোমার কাছে এখন মায়াজগতের বৃহত্তম বজ্রমাণিকটি আছে, না? ... আচ্ছা, আসছি সে কথায় একটু পরে। আপাতত অভী, তুমি একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। বেঁচে থাকার জন্য মানুষদের কী লাগে? মানে, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের বাইরে আর কী লাগে একটা সভ্যতার টিকে থাকার জন্য?”

অভী বুঝতে পারল না, ঐশিকবৃন্দ কী বলতে চাইছেন। সে বলল, “আপনি... মানে আপনারাই বলুন।”

“মানুষের সভ্যতা কী জন্য টিকে থাকে, জানো? তার শত্রুর জন্য। এই জাতি বলে, ‘ওরা আমাদের শত্রু’, আবার ওই জাতি বলে, ‘এরা আমাদের শত্রু’। শত্রু ছাড়া মানুষ বা রাক্ষসরা বেঁচে থাকতে পারে না। শত্রু ছাড়া বেচারারা যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে?”

অভী বলল, “আপনারা কী বলতে চান, যুদ্ধ না করলে আমরা টিকে থাকতে পারব না?”

“সেই কথাই তো বলছি। ‘সমরগরিমা’র কী হবে অভী, যদি ‘সমর’ বস্তুটাই না থাকে? যদি লড়াই করার মতো কোনো যুদ্ধক্ষেত্র না থাকে? আমাদের ঐশিকদের প্রয়োজন তো ঐটুকুই; আমরা চাই, তোমাদের মধ্যে লড়াই হোক। মানুষরা রাক্ষসদের গলা কাটুক, রাক্ষসরা মানুষদের মাথা ফাটুক, সবাই মিলে অর্ধরাক্ষসদের মার দিক, আর ওরাও একবার মানুষ আর একবার রাক্ষসের দলে ঢোকার চেষ্টা করুক। এই যে গোলমাল, এই যে লড়াই-ঝগড়া-মারামারি - এগুলো থেকে একটা বিশেষ ধরনের শক্তি উৎপন্ন হয়, জানো?”

“না। কী ধরনের শক্তি?”

“চরম বিশৃঙ্খলার শক্তি। সেই শক্তিই আমাদের অস্তিত্বের চাবিকাঠি, আমাদের বেঁচে থাকার রসদ। তোমরা যত মারামারি খুনোখুনি করো, ততই আমরা পুষ্ট হই। তোমাদের যুদ্ধ মানে আমাদের লাভ; যুদ্ধের হিংস্রতা, রক্তপাত, ঘৃণা, অন্যের ক্ষতিসাধনের তীব্র ইচ্ছা - এইগুলোই তো আমাদের লোভের জিনিস। তোমাদের দেশপ্রেম, তোমাদের সমরগরিমা - এসবের কোনো মূল্য আমাদের কাছে নেই, যতক্ষণ তোমরা একে অপরের গলা কাটতে ব্যস্ত থাকছ।”

অভীর গুনতে গুনতে ঘৃণায় সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে আসছিল। সে বলল, “এই কথাগুলো আমাদের বলছেন কেন আপনারা? আমরা যদি ফিরে গিয়ে

সবার কাছে প্রকাশ করে দিই?”

পাঁচটা মাথা একসঙ্গে হা হা করে হেসে উঠল। “কে বিশ্বাস করবে তোমাদের? এইসব কথা উপলব্ধির জিনিস; এ কি কারও মুখে শুনলে মানুষের বিশ্বাস হয়? দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করতে করতে ও তোমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। তোমরা মানুষরা আসলে কাপড়পরা জন্তুর বেশি কিছু নও; ধারালো নখ-দাঁত নেই, তাই আঁচড়-কামড় দিতে পারো না। যখনই নখ-দাঁতের পরিবর্তে তোমাদের হাতে অস্ত্র উঠেছে, তখনই ওই ভেতরের জন্তুগুলো বেরিয়ে এসেছে, বুঝলে অভী? চন্দ্রহাস হাতে নিয়ে একটা দানব হয়ে যেতে কেমন লাগে, তুমি জানো না?”

অভী চুপ করে রইল। কথাগুলোর উত্তর আসছে না তার মুখে। ঐশিকরা বললেন, “তাই দেবতা বলো আর দানব বলো, তোমাদের মতো মানুষগুলোর বেঁচে থাকার জন্য দু’জনকেই দরকার। যদি একজন না থাকে, মানুষ তাকে আগে আবিষ্কার করবে, আর তারপর হয় পূজো করবে, নয় যুদ্ধ করবে। আমাদের এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। তোমরা যত এইসব বিশৃঙ্খলা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আমরা ততই শাঁসেজলে বেড়ে উঠব।”

লীনা আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, “আপনাদের এতদিন ভক্তিশ্রদ্ধা করেছি বলে নিজের প্রতি ঘেন্না হচ্ছে।”

পাঁচটা মাথা ঘুরে গেল তার দিকে। “বলেছিলাম না, বলতে বলা না পর্যন্ত কথা বোলো না?”

লীনা একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল। তৃণীর থেকে সেই হৃদয়শর বার করে ধনুতে যোজনা করে ঐশিকদের শরীরের দিকে নিশানা করল সে। “অভী, এদেরকে যদি এখানেই শেষ করে দেওয়া যায়, তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয় কিনা বলো। আমি তো মরবই, কিন্তু তার সঙ্গে এগুলোকেও চিরতরে বিদায় করে দেওয়া যাবে।”

অভী চমকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে উর্মিও। লীনা যে এই কথা বলতে পারে, সে ভাবতে পারেনি। কিন্তু ঐশিকরা হেসে উঠলেন।

“লীনা, আমরা জানি তোমার কাছে হৃদয়শর আছে। ওই বাণ মোচন করার খুব ইচ্ছা তোমার, না? অপেক্ষা করো, সুযোগ আসবে। তুমি যে অভীর সঙ্গে আসবে, তাও আমরা জানতাম। তাই অভীকে চন্দ্রহাস আনতে না দিলেও তোমাকে ধনুর্বাণ নিয়ে আসতে আমরাই দিয়েছি। তোমার ওই হৃদয়শর কেবলমাত্র একটি লক্ষ্যবস্তুর উপর কাজ করে। কিন্তু আমরা ক’জন আছি এই শরীরে?”

এইবার অভী বুঝতে পারল, কেন এঁরা পাঁচজন একটা শরীরে মিলে অবস্থান করছেন। লীনার হৃদয়শরের সম্ভাব্য বিপদের কথাটাও ভেবে যথোপযুক্ত সুরক্ষা নিয়ে রেখেছেন এঁরা।

লীনা মুখ কালো করে বাণটা আবার ফিরিয়ে দিল তৃণীরে। ঐশিকরা বললেন, “অভী, এইবার বলি, ঠিক কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি আমরা। তোমার কাছে আমাদের একটা প্রস্তাব আছে।”

অভী বলল, “বলুন কী প্রস্তাব।”

“মন দিয়ে শোনো। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে তোমার বিরাট লাভ; না করলে এত বড়ো ক্ষতি হবে, যা তুমি সামলে উঠতে পারবে না। আর একবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান যদি করো, তাহলে সেই মুহূর্ত থেকেই তুমি আমাদের ঘোষিত শত্রু হয়ে যাবে।”

অভী একটু হাসল। “এখনই কম কী আছি? যাই হোক, বলুন আপনাদের প্রস্তাব।”

“আমরা চাই, তুমি একজন ঐশিক হয়ে আমাদের সমষ্টিতে যোগ দাও।”

অভী এত অবাক হয়ে গেল যে সে কয়েক মুহূর্ত বাক্যহারা হয়ে গেল। বন্ধুদের দিকে তাকাল সে; ওরাও একই রকম বিমূঢ় হয়ে গেছে কথাটা শুনে।

ঐশিকরা বুঝিয়ে বললেন, “অবাক লাগছে, না? তোমার শরীরে ঐশিকরক্ত আছে। আমাদের সপ্ত-ঐশিকমন্ডলীতে একটি আসন ফাঁকা হয়েছে যুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর। সেই আসনে তাঁর বংশধর বসলেই আমরা সবচেয়ে খুশি হব। তুমি ঐশিকত্ব বরণ করে নিলে আমাদের মতো অমিত মায়াক্ষমতার অধিকারী হবে তুমি। আর আমাদের স্বার্থ হল, তুমি ঐশিক হয়ে গেলে আর প্রলয়ের ভয় করতে হবে না আমাদের। প্রলয়যোদ্ধা তখন নিজের প্রাণরক্ষার তাগিদেই প্রলয় ঘটানো থেকে বিরত থাকবেন।”

অভীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সে বলল, “আপনাদের বক্তব্য শেষ হয়েছে?”

“হ্যাঁ। এইটুকুই শুধু বলার, প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করার আগে ভালো করে ভেবে দেখো। তুমি ঐশিকত্ব বরণ করে নিলে সারা সমরগরিমার উপর তোমার আধিপত্য চলবে। বজ্রধরের চেয়েও বড়ো অধিনায়ক হতে পারবে তুমি। সমরোত্তমরা সবাই তোমার আজ্ঞাবাহী হবেন। নিয়ামক বিনীতেশের অপশাসন আর সহ্য করতে হবে না। তুমি যা বলবে, তাই হবে আইন। ভেবে দেখো, অভী, এই সুবিশাল ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়বে মাল্যপর্বতেও। সেখানেও তোমার কথার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারবে না। চাইলেই সমরগরিমা যেকোনো দিন দখল করে নিতে পারবে মাল্যপর্বতের রাজপুরী। আর তুমি – তুমি হবে অমর; মৃত্যু তোমার কাছে আসবে না কোনোদিন।”

সে একবার তাকাল উর্মি আর লীনার দিকে। দু'জনের চোখের দৃষ্টি একই কথা বলছে। অভী বলল, “আপনাদের প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমার উত্তর হল ‘না’।”

পাঁচটা মাথার দশটা চোখ তীব্র অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। অভী বলল, “প্রস্তাব বলুন বা লোভদেখানো – আমি এতে সম্মত হতে পারছি না।

“তোমার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করো।”

“ব্যাখ্যা করার বিশেষ কিছু নেই, তাও আপনারা জানতে চাইছেন বলে বলছি। আমি অধিনায়ক বজ্রধরের চেয়ে বড়ো হতে চাই না। আমি সমরোত্তমদের আমার আজ্ঞাবহ করে রাখতে চাই না। আমি ওঁদের ছাত্র; ওঁদের প্রভু হওয়ার বাসনা আমার নেই। মাল্যপর্বত দখল করার কোনো ইচ্ছাও আমার কোনোদিন ছিল না। আর অমরত্বের কথা বলছেন? আপনারাই একটু আগে বললেন,

যুদ্ধ-বিশৃঙ্খলা এইসব আপনাদের বাঁচিয়ে রাখে, পুষ্টি জোগায়। আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু এইরকম রক্তচোষা অমরত্ব আমার চাই না।”

ঐশিকদের মুখগুলো যেন পাথরের মতো ভাবলেশহীন হয়ে উঠল। ওরা বুঝতে পারছে, তাঁরা প্রচণ্ড রেগেছেন। প্রত্যাঘাতটা কোন দিক থেকে আসে, সেটাই এখন দেখার।

কথা বলল পাঁচ মাথা একসঙ্গে। “তুমি জানতে চাইছিলে না, কেন তোমাকে সমরোত্তমদের থেকে দূরে সরিয়ে এনেছি আজ? এই দেখো তার কারণ।”

হাত দোলালেন তাঁরা। ঝলমলে আকাশজুড়ে জেগে উঠল একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

জায়গাটা মরুময়ের মেঘনির্মাণশালার ফটকের ঠিক সামনে। অনেক রাক্ষস মিলে জটলা পাকিয়েছে; সবার মুখেই একটা দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ হাসি। ওদের মাঝে একটা গোলাকার ফাঁকা জায়গা – সেটাই যুদ্ধমঞ্চ। সেই যুদ্ধমঞ্চে প্রাণপণে লড়াই করছে দু’জন যোদ্ধা।

ভয়ে, আতঙ্কে মুখে হাত চাপা দিল অভী। দু’জন যোদ্ধা – মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী!

উন্মত্তের মতো লড়াই করছেন তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে; পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে বিন্দুমাত্র হুঁশ নেই কারও। মেঘবর্ণ তরবারি ঘোরাচ্ছে হিংস্রভাবে; তার চোখে দয়া-মায়া-করুণার লেশমাত্র নেই। তার অস্ত্রের ফলক ঝলসে উঠছে বারবার; চেষ্টা করছে শ্যামশ্রীকে দু’টুকরো করে ফেলতে।

আর শ্যামশ্রীও পিছিয়ে নেই। একহাতে তরবারি দিয়ে তিনি আটকাচ্ছেন মেঘবর্ণের মারগুলো, আর অন্য হাতটা দিয়ে প্রয়োগ করছেন তীব্র মায়াশক্তি। সেই মায়া-আঘাতে ছিটকে পড়ছে মাটিতে মেঘবর্ণ; তার চোখেমুখে কালশিটে পড়ে গেছে, কিন্তু আবার সে লাফ দিয়ে উঠছে ধুলো ঝেড়ে, যেন এক্ষুনি কেটে ফালাফালা করে দেবে শত্রুকে।

দু’জনের সর্বাঙ্গ রক্তে মাখামাখি, আর দু’জনের চোখেই উন্মাদের দৃষ্টি। কেউ কাউকে চিনতে পারছেন না; মুখের কোণ দিয়ে ঝরে পড়ছে লাল। আর তালি দিয়ে হাসছে দর্শকরা। সেই দর্শকদের মধ্যে দুটো মুখকে দেখতে পেল অভী।

মরুময় আর শেষমুখ।

লীনা তার পাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে। তাদের অতি প্রিয় সমরোত্তমদের এই রূপ দেখতে হবে, সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

“বলেছিলাম না, মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেই ভেতরের জন্তুটা বেরিয়ে আসে? কেমন লাগছে অভী? দারুণ যোদ্ধা তো দু’জনই। কী মনে হয় তোমার? কে বেঁচে থাকবে শেষ পর্যন্ত?”

অভী রুদ্ধস্বরে বলল, “কেন এরকম করছেন আপনারা? ওঁদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছেনই বা কী করে?”

ঐশিকদের পাঁচটা মাথা হাসতে লাগল মৃদু মৃদু। “ভয় হচ্ছে, না? ভয় পাওয়া ভালো। শোনো অভী, শেষমুখ বজ্রমাণিকের আধার, জানো বোধহয়। ওর বজ্রমাণিকের বিষ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়েছে দু’জনের

উপরেই। বজ্রমাণিক তৈরি হয় নরকের বিষাক্ত আগুন দিয়ে, জানো তো? ওর সম্মোহন শক্তি অসাধারণ। এখন শেষমুখ ওঁদের যেমন নির্দেশ দিচ্ছে, ওঁরাও সেইরকম কাজ করছেন। আর শেষমুখ কাজ করছে আমাদের নির্দেশে। আমরা যেমন বলব, ও তেমনটিই করবে।”

“তাহলে ওকে বলুন ওঁদের থামাতে। সমরোত্তমরা আপনাদের কত শ্রদ্ধা করতেন। এই তার প্রতিদান দিচ্ছেন আপনারা?”

“শ্রদ্ধা নিয়ে কী হবে আমাদের? আমরা চাই যুদ্ধ, হিংসা, রক্তপাত। কিন্তু তুমি যখন বলছ ওঁদের থামাতে...”

ঐশিকরা তাকালেন শেষমুখের দিকে। গমগম করে উঠল তাঁদের কণ্ঠস্বর। “শেষমুখ, শুনতে পাচ্ছ আমাদের কথা?”

অভীরা দেখল, শেষমুখ দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়েই উত্তর দিচ্ছে, “পাচ্ছি।”

“তাহলে শোনো, মায়ার প্রয়োগ তীব্রতর করো। এই দুটো সমরোত্তমের মধ্যে অন্তত একটার লাশ আমরা আজ দেখতে চাই।”

হাসছে শেষমুখ, মাথা নাড়ছে। অভী চিৎকার করে উঠল, “হচ্ছেটা কী? মানে কী এসবের?”

“মানে আবার কী? খেলা। দুই প্রিয় বন্ধু নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরবে, যুদ্ধপ্রিয় রাক্ষসজাতির কাছে এর চেয়ে ভালো খেলা আর কীই বা হতে পারে? এই সমরোত্তমরা এক একজন মহাবীর; সাধারণ যোদ্ধাদের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে এরা দর্শকদের আনন্দ দেবে। তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি, অভী। যাও, ফিরে যাও। তোমার কাছে যে বৃহত্তর বজ্রমাণিক আছে, তার প্রভাবে তুমি ওঁদের আটকাতে পারবে, শেষমুখের সম্মোহন থেকে ওঁদের বার করে আনতে পারবে, যদি না তার আগেই ওরা একে অপরকে হত্যা করে বসে। তাই সময় তোমার হাতে খুবই কম। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। ওই বনপথ কিন্তু খুব একটা ভালো জায়গা নয়। ওই রাস্তা দিয়ে তোমরা সবাই নিরাপদে ফিরতে পারবে তো?”

অভীরা তাকিয়ে আছে ঐশিকদের দিকে। ফেরার পথে ফাঁদ পাতা আছে, বুঝতে পারছে ওরা।

লীনা বলে উঠল, “সমরোত্তমদের উপর কীসের প্রতিশোধ নিচ্ছেন আপনারা?”

“বুঝতে পারেনি, লীনা? এ প্রতিশোধ সমরোত্তমদের উপর নয়, এ প্রতিশোধ প্রলয়যোদ্ধার উপর। অভী, তুমি আজ চাইলে সবাইকে বাঁচাতে পারতে, সারা সমরগরিমার রাজা হতে পারতে, কিন্তু তুমি আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমাদের অপমান করেছে। আমাদের চিন্তাভাবনা খুব সহজ-সরল। তুমি আমাদের পক্ষে নেই, মানে তুমি আমাদের বিরুদ্ধপক্ষে আছ। তার শাস্তি তো তোমাকে পেতেই হবে।”

অভী বলল, “তাহলে আমাকে শাস্তি দিন, আমাকে মেরে ফেলুন। সমরোত্তমদের এর মাঝে টানছেন কেন?”

“আমরা তোমার মৃত্যু চাই, অভী। কিন্তু এখনই নয়। তোমাকে আমরা ভাঙতে চাই, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাই। তুমি যাদের ভালোবাসো, তাদের

সবাইকে এক এক করে আমরা কেড়ে নেব। তুমি মরবে – কিন্তু একদম একা হয়ে। আর তার সঙ্গে সমরগরিমার বিরুদ্ধেও আমরা প্রতিশোধ নেব তোমার মতো ঐশিকহস্তাকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে। তোমার জন্যই যুদ্ধদেব মারা গেছেন, সে অপমান আমরা ভুলিনি।”

লীনা বলল, “আপনাদের মনস্কামনা কোনোদিন পূর্ণ হবে না। প্রলয়যোদ্ধা যদি মারাও যায়, তাহলে সে মরবে আপনাদের অমরত্বকে ধ্বংস করে। শুধু আমরাই মরব, আর আপনারা রেহাই পেয়ে যাবেন, ভুলেও এ কথা ভাববেন না।”

ঐশিকবৃন্দ একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। “লীনা, মানুষকে জীবনে অনেক সময় কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। দেখা যাক, তুমি আজ সেরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারো কিনা।”

উর্মি এতক্ষণে মুখ খুললেন। “আমরা ফিরব কীসে?”

“আমাদের রথ আর তোমাদের নিয়ে যাবে না। জটায়ুর পিঠে চেপে তোমরা যেতে পারো। কিন্তু এই বনপথটুকুতে কোনো জটায়ু ঢুকতে পারবে না। এই পথ পেরিয়ে গেলে অবশ্য তোমাদের যেকোনো গৃধ্র নিয়ে যেতে পারবে।”

ওরা ফিরে চলল যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই দিকে। উদ্যান পেরিয়ে প্রধান প্রবেশদ্বার অতিক্রম করতেই পেছনে দ্বার বন্ধ হয়ে গেল।

হনহন করে হাঁটতে লাগল ওরা। সময় হাতে কমে আসছে। দুই সমরোত্তমের যুদ্ধের ফল যাই হোক, তা ভালো হতেই পারে না।

উর্মি বললেন, “অত বড়ো মাপের বীর যখন ওরকম উন্মাদের মতো যুদ্ধ করেন, তখন ওঁরা পরস্পরের শরীরে যে আঘাতগুলো করছেন, সেগুলো কিন্তু অত্যন্ত ভয়ানক হবেই।”

অভী বলল, “আমিও সেই ভয়টাই পাচ্ছি। আমি তো জানি ওরা কী ভয়ানক যোদ্ধা।”

লীনা আস্তে আস্তে বলল, “অভী!”

তার গলার স্বরে এমন কিছু একটা ছিল যে অভী আর উর্মি দু’জনকেই তাকাতে হল তার দিকে। আর তারপর দু’জনেই চমকে উঠলেন।

ওদের থেকে হাত দশেক দূরে তাল পাকাচ্ছে একটা ধোঁয়ার পিণ্ড। একটা গাছের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে আকৃতিটা।

দু’হাতে অভী আর উর্মিকে টেনে এনে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিল লীনা। “তোমাদের সঙ্গে অস্ত্র নেই। তোমরা পেছনে থাকো।”

ধোঁয়াটা জমাট বাঁধছে, একটা জন্তুর আকৃতি নিচ্ছে। উর্মি নীচুগলায় বললেন, “অভী, চারপাশে একটা ব্যাপার হচ্ছে, বুঝতে পারছ?”

তিনি বলতে অভীও খেয়াল করল বিষয়টা। ওরা দাঁড়িয়েছিল এক বিরাট অরণ্যের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া একটা লাল পাথরের তৈরি পথে। এখন দেখা যাচ্ছে, বনের গাছগুলো সরে এসেছে কাছাকাছি। তাদের ফাঁক দিয়ে একটা কুকুরও গলতে পারবে না, একটা মানুষ তো অনেক দূরের কথা। আর গাছগুলো যেন এগিয়ে এসেছে ওদের দিকে। দু’দিক থেকে গাছের সারি চেপে ধরেছে ওদের; একটা সরু গলির মধ্যে বন্ধ করে ফেলেছে ওদের তিনজনকে।

পায়ের নীচে লাল পাথুরে পথটা যেটুকু, ওইটুকুই প্রস্থ বরাবর নড়াচড়া করার জায়গা ওদের। গলির পেছনে বন্ধ দ্বার, সামনে ওই ভয়ানক জীবটা।

অভী বলল, “লীনা, সরে যাও। অস্ত্র না থাকলেও ওটাকে আমি হিমকুশলতা দিয়ে আটকাতে পারব।”

লীনা সরল না সামনে থেকে। “না, হিমকুশলতা ব্যবহার করলেই তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে এখানে। আর সমরোত্তমদের থামাতে গেলে তোমাকে শক্ত থাকতে হবে। অভী, আমি জানি কী হতে চলেছে। কাল রাতে এই দৃশ্য আমি দেখেছি।”

জন্তুর মুখ থেকে লীনা ঝরে পড়ছে। তার আকৃতিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা বিরাট নেকড়ে; আকারে তিনটে অভীর সমান হবে সে, তার মুখে অবর্ণনীয় হিংস্রতা, চোখগুলো থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে হলদে আলো, বেরিয়ে এসেছে ধারালো দাঁতগুলো। কয়েকটা তির ছুঁড়ল লীনা জন্তুর দিকে।

সবকটাই ওর গায়ে লেগে ছিটকে পড়ল মাটিতে। লীনা একটু স্নান হাসল অভীর দিকে তাকিয়ে।

অভী বুঝতে পারছে, সে কী করতে চাইছে। “লীনা, একদম নয়। আমি সামলাচ্ছি ওটাকে। সরে যাও তুমি।”

লীনা বলল, “রাজকন্যা উর্মি, আপনি ওকে ধরে রাখুন। আমার সামনে যেন ও না আসে।”

উর্মি অসহায়ভাবে একবার লীনা আর একবার অভীর মুখের দিকে দেখছেন। কী করবেন, তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না।

লীনা বলল, “অভী, আমার বাবাকে তো মনে পড়ে না। কিন্তু মেঘবর্ণকে পেয়ে মা যে খুশি, আমি বুঝতে পারি। তাকে আমি হারাতে দেব না। তোমাদেরকেও হারাতে চাই না আমি। তুমি যাও, সমরোত্তমদের থামাও। রাজকন্যা, আমার অবর্তমানে অভীর খেয়াল রাখবেন।”

জন্তুটা পায়ে পায়ে এগোচ্ছে ওদের দিকে; ওদের সঙ্গে তার ব্যবধান কমে এসেছে অনেকটাই। অভী লীনাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু পারল না। তার ধনুক ধরে টানাটানি করতে লাগল অভী।

“আমি তোমাকে কিছুতেই ওই তির ছুড়তে দেব না।”

গর্জন করে জন্তুটা লাফ দিল; অভীর টানে লীনার হাত থেকে ধনুক পড়ে গেল। লীনা সরে যেতে বাধ্য হল। দানবাকার নেকড়েটা এসে দাঁড়াল অভীর সামনে।

সরু পথটায় অভীর পেছনে উর্মি, সামনে নেকড়ে। নেকড়ের পেছনে রয়ে গেছে লীনা। অভী তার হাতটাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছে, বিশাল বরফের স্রোতটাকে একবার জাগিয়ে তুলতে পারলে...

“গরর” শব্দ করে লাফ দিল নেকড়েটা। প্রায় সে এসে পড়েছিল অভীর গায়ের উপরে। কোনোক্রমে সরে গিয়ে বাঁচল সে। ওই নখের আঁচড় একবার লাগলে আর দেখতে হত না, বুক ফুটো হয়ে যেত।

ভয়ে একপাশে গুটিয়ে থাকা উর্মির পায়ের কাছে এসে পড়েছিল সে। মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থাতেই সে দৃশ্যটা দেখতে পেল।

আবার উঠে ফিরে দাঁড়ানোর জন্য মাথা তুলছে হিংস্র জন্তুটা, আর তার ঠিক ওপাশেই ধনুতে শর যোজনা করে লক্ষ্যস্থির করে লীনা দাঁড়িয়ে আছে।

“না!” বলে আরেকটা চিৎকার করতে যাচ্ছিল অভী, তার আগেই টংকার শব্দে সে বুঝতে পারল, সব শেষ।

বাণ নিক্ষেপ করে ফেলেছে লীনা।

নেকড়েটার বুকে এসে লেগেছে তির। সে সঙ্গে সঙ্গে নিস্প্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আর ওদিকে লীনাও পড়ে গেল লাল পথটার উপর।

অভী যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এ কী হয়ে গেল?

উর্মি দৌড়ে গেলেন, ভূমিশায়ী লীনার কবজি হাতের মধ্যে নিলেন, নাকের কাছে হাত ঠেকালেন। তারপর করুণ মুখে ফিরে তাকালেন অভীর দিকে।

“অভী, লীনা আর বেঁচে নেই।”

থরথর করে কাঁপছে অভী। তার মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কী করবে, সে কিছু বুঝতে পারছে না। লীনা! নেই?

রাজকন্যা উর্মি বললেন, “অভী, শাঁখ বাজাও। তোমার মায়াগৃধ্রকে ডাকো। এখন বুদ্ধি হারানোর সময় নয়। আরও অনেকগুলো প্রাণ বাঁচাতে হবে তোমাকে। দেরি কোরো না।”

অমানুষিক শক্তিতে নিজেকে সামলে অভী তার নীল শঙ্খ বার করে ফুঁ দিল। কিন্তু বাজাতে পারছে না সে শাঁখটা। তার গলা শুকিয়ে গেছে, ঠোঁটও কাগজের মতো শুকনো। লীনা...!

হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে সে। ঝোড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতার মতো হাত কাঁপছে তার।

উর্মি চেষ্টা করে উঠলেন, “অভী, শাঁখটা বাজাও। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই।”

জিভটাকে ঠোঁটের উপর বুলিয়ে নিল অভী। একটু বোধহয় ভিজল ঠোঁট। কোনোক্রমে শাঁখটাকে আবার মুখের কাছে তুলে বাজাতে চেষ্টা করল সে।

এবার বাজল নীল দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। কাঁপা কাঁপা বিচ্ছিন্ন আওয়াজ, কিন্তু তার মহানীলগৃধ্র শুনতে পেয়েছে সেই আহ্বান।

ওই যে আসছে অপরাজিতা। এসে দাঁড়িয়েছে এই লাল পথটা যেখানে শেষ হচ্ছে, সেইখানে। লীনার নিস্পন্দ দেহটাকে ধরাধরি করে নিয়ে চলল ওরা দু'জন।

অভীর চোখ ফেটে জল আসছে, কিন্তু সে কোনোক্রমে আত্মসংবরণ করে রেখেছে। এখন কান্নাকাটি করা চলবে না। এখন বিহ্বল হওয়া চলবে না।

লীনার দেহটা নিয়ে অপরাজিতার পিঠে উঠে বসল ওরা। মহানীলগৃধ্র উড়ে চলল আকাশলোক থেকে মাল্যপর্বতের দিকে।

ফেরার পথে আর কোনো দৃষ্টিবিভ্রম নেই। অন্ধকার সুড়ঙ্গ পেরিয়ে ওরা মাল্যপর্বতের আকাশে এসে পড়ল।

মেঘনির্মাণশালার উপর থেকেই অভী দেখতে পেল দৃশ্যটা। তার প্রাকারের বাইরেই চলছে দুই সমরোত্তমের মরণপণ যুদ্ধ।

মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী দু'জনের শরীরই অজস্র আঘাতে ভর্তি হয়ে গেছে। তাঁদের মুখগুলো কালো হয়ে উঠেছে। দু'জনেই ক্লান্ত; লুটিয়ে পড়ে যাচ্ছেন মাটিতে, কিন্তু বজ্রমাণিকের প্রভাব তাঁদের পড়ে থাকতে দিচ্ছে না। দুর্বল হাতে আবার অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে পরস্পরের দিকে তেড়ে যাচ্ছেন তাঁরা। আর তাই দেখে হো হো করে হাসছে আর হাততালি দিচ্ছে, শিস দিচ্ছে রাক্ষসের দল। অভীর মাথা গরম হয়ে উঠল দৃশ্যটা দেখেই।

উর্মি বললেন, “অভী, তাড়াতাড়ি করো। বজ্রমাণিকের বিষ আর বেশিক্ষণ শরীরে থাকলে ওঁরা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যাবেন। ইতিমধ্যেই কতটা ক্ষতি হয়ে গেছে, বুঝতে পারছি না।”

অভীর ইঙ্গিতে বিশাল গৃধ্র অপরাজিতা মুখ নীচু করে ঝটপট শব্দে নামতে লাগল। এতক্ষণে সেই আওয়াজে মুখ তুলে উপরের দিকে তাকাল দর্শক রাক্ষসেরা।

“আপনি লীনাকে ধরে থাকুন, আমি নামছি,” বলে অভী লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

অপরাজিতা আরেকটু নীচে নামতেই তার পিঠ থেকে লাফিয়ে অভী নেমে এল দুই যুযুধান সমরোত্তমের দিকে। সুতসোমের দেওয়া বজ্রমাণিকটা তার হাতের মুঠোর মধ্যে গরম হয়ে উঠেছে। মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী দেখছেন তাকে; তাঁদের চোখের দৃষ্টি বলে দিচ্ছে, তাকে ওঁরা চিনতে পারছেন না।

দর্শক রাক্ষসরাও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে; তাদের ভাবখানা, “এ আবার আকাশ থেকে পড়ল কেন?” একটু দূরে মাটিতে নেমে এল অপরাজিতা।

মেঘবর্ণ ছুটে আসছে উদ্যত তরবারি নিয়ে; শ্যামশ্রীও আবার উঁচু করে ধরেছেন নিজের তরবারি। দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অভী দ্রুতগতিতে তার হাতের বজ্রমাণিকটা ধরে তুলে ধরল শূন্যে; গলা ফুলিয়ে সে চেষ্টা করে উঠল, “খামো তোমরা!”

অদ্ভুত একটা বেগুনি আলোয় ভরে গেল যুদ্ধক্ষেত্র; অভীর মুঠো থেকে বেরিয়ে সে আলো ঢেকে ফেলল চতুর্দিক। আর সেই আলোর স্পর্শ গায়ে লাগতেই মাটিতে পড়ে গেলেন শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ; অস্ত্রগুলো পড়ে গেল তাঁদের শিথিল হাত থেকে; সংজ্ঞাহীনের মতো নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইলেন তাঁরা; শুধু তাঁদের মুখ হাঁ হয়ে গিয়ে বুক এত জোরে ওঠানামা করতে লাগল যে মনে হচ্ছিল যেন তাঁদের খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

দর্শকদের মধ্য থেকে শেষমুখ বলে উঠল, “অভী, তুমি সব মজা মাটি করে দিলে।”

মরুময় বললেন, “হ্যাঁ, একটা যুদ্ধের মাঝপথে বাধা দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।”

এইবার এগিয়ে এলেন রাজকন্যা উর্মি। তাঁকে আসতে দেখেই ভিড়টা সরে গিয়ে তাঁর আসার পথ করে দিল।

উর্মি উচ্চকণ্ঠে বললেন, “যে রাক্ষসরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি। সম্মানিত অতিথিদের নিয়ে এই যুদ্ধ কার আয়োজন করা?”

আলোকপর্ণ এগিয়ে এল। “রাজকন্যা, এই ব্যাপারে আমারও মত ছিল না। কিন্তু আজ আবিষ্কার করলাম, এই মুখোশধারী খুনিটার সঙ্গে আমাদের মহামন্ত্রী খুব সখ্যতা। অতিথিদের নিয়ে এরকম অন্যায়যুদ্ধ করানোতে আমার সায় ছিল না। কিন্তু মহামন্ত্রী মরুময় আমার চেয়ে উচ্চ পদে আসীন। তাঁর আদেশে শুরু করা এই লড়াই আমি থামাতে পারিনি।”

উর্মি প্রচণ্ড রেগে গেছেন; তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। “আপনারা যাঁরা আজ এখানে মজা দেখতে এসেছেন, আপনারা রাক্ষসজাতির কলঙ্ক। আতিথ্যস্বীকারের অঙ্গপরীক্ষায় এই অতিথিরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর তারপরেও তাঁদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে বিষাক্ত বজ্রমাণিকের সম্মোহন মায়া প্রয়োগ করে। মায়াজগতের সর্বত্র যেকোনো জীবের উপরেই এই ঘৃণ্য মায়া প্রয়োগ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, আপনারা জানেন না? তাও আবার এই কাজ করা হয়েছে অতিথিদের উপরে। একজনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না? নিজেদের ‘রাক্ষস’ পরিচয় দিতে লজ্জা হওয়া উচিত আপনারদের।”

উপস্থিত লোকগুলো মাথা নীচু করে রইল। উর্মি তাকালেন শেষমুখের দিকে; বললেন, “শেষমুখ, তুমিই ওঁদের শরীরে বজ্রমাণিকের বিষ ঢুকিয়েছ, তাই না? মহামন্ত্রী মরুময়, এই রাষ্ট্রবিরোধী লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখছেন আপনি, আপনার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। আলোকপর্ণ, আমি রাজকন্যা – মহামন্ত্রী মরুময়ের পদমর্যাদার চেয়ে আমার মুখের কথার দাম বেশি। আমি আদেশ দিচ্ছি, খুনিটাকে এখনই বন্দি করো।”

রাক্ষসেরা কেউ একটা কথাও বলল না। কিন্তু আলোকপর্ণ নড়ার আগেই শেষমুখ বিদ্যুৎগতিতে পালাল ওখান থেকে। আলোকপর্ণ তার পেছনে ছুটল বটে, কিন্তু অতীর মনে হচ্ছিল, ও তাকে ধরতে পারবে না।

মরুময় এবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে এলেন সামনে। “রাজকন্যা, আপনার বয়স কম। গুরুজনদের সঙ্গে শ্রদ্ধা রক্ষা করে কথা বলা আপনাকে এখনও শিখতে হবে।”

উর্মির চোখ রাগে জ্বলে উঠল। তিনি বললেন, “শুধু বয়সে বড়ো বলেই কাউকে শ্রদ্ধা করা আমার আসে না, মহামন্ত্রী, যদি না সে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত হন। শ্রদ্ধা জিনিসটা তো আর বৃষ্টির মতো আকাশ থেকে পড়ে না; ওকে অর্জন করতে হয়।”

বৃষ্টির উল্লেখটা যে মরুময়কে খোঁচা দেওয়ার জন্যই করা হল, স্পষ্ট বুঝতে পারল অতী। মরুময় মুখ গম্ভীর করে স্থানত্যাগ করলেন।

কয়েকজন রাক্ষসের সহায়তায় লীনার মৃতদেহ আর দু’জন অচেতন সমরোত্তমের দেহ নিয়ে আসা হল উর্মির বৃহৎ সেবাকক্ষে। স্থির হয়ে থাকা প্রিয় মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অতীর চোখে জল এসে পড়ল।

স্বর্ণশেখর এসবের কিছুই জানত না। সে ছুটে এল। তাকে শান্ত করতে বেশ বেগ পেতে হল অতীকে।

স্বর্ণশেখর এত রেগে গেছে যে তার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। “এই ঘটনা ঘটল কেন, তার জবাবদিহি রাজা পুনর্বসূকে করতে হবে। অতী, তুমি থাক এখানে; আমি চললাম রাজসভায়।”

তাকে আটকানোর কোনো চেষ্টাই করল না অভী। যা খুশি করুক সে; লীনা তো আর ফিরবে না।

অচেতন সমরোত্তমদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে উর্মি এসে বসলেন অভীর পাশে; কোমল স্বরে বললেন, “অভী, তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে। এখনই লীনার সৎকার করে দিও না তোমরা।”

অভী বলল, “ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন আপনি?”

উর্মি মাথা নাড়লেন। “না, আমার তা মনে হয় না। যে মানুষের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে, তাকে আমরা মৃত বলতে পারি। কিন্তু হৃদয়শর মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় বস্তুটাই ওর শরীর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। একবার যদি... থাক, এত জটিল মায়া-চিকিৎসা বিদ্যা তুমি বুঝবে না। যাই হোক, এখানে আমরা মৃত্যুর তিন দিন না পেরোলে কোনো যোদ্ধার দেহই সৎকার করি না। ভয় নেই, দেহ পচবে না, সংরক্ষিত করা থাকবে। ওর মাকেও তো খবর দিয়ে আনতে হবে এখানে।”

“আর আমার মা? মেঘবর্ণ?”

“ওদের দেহ বিষে জর্জরিত হয়ে আছে। আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব বিষটাকে নিষ্কাশন করতে। কিন্তু সে কাজ মোটেই সহজ নয়, এবং কতটা সফল হওয়া যাবে, সে বিষয়েও একটা সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। এইধরনের রোগী এলে মনে হয়, বিষনিয়ন্তা যদি সত্যিই কেউ থাকতেন, ভালো হত।”

“বিষনিয়ন্তার কথা আগেও শুনেছি। কে তিনি?”

“কেউ না। গল্পকথার কাল্পনিক লোক। লোকে বলে, একদিন নাকি এমন একজন মানুষের দেখা পাওয়া যাবে, যিনি সবরকমের বিষ— এমনকি নরকবিষ থেকেও আরোগ্য করার উপায় জানেন। এ কাহিনি আমার জন্মের আগে থেকেই চলে আসছে। বাস্তবে ওরকম কেউ নেই।”

অভী কিছু না বলে চুপ করে রইল। তার বুকের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছে। লীনা নেই! মা আর মেঘবর্ণও না থাকারই মতো। সে যেন আর পারছে না সহ্য করতে।

তার মনের অবস্থা বুঝে উর্মি উঠে পড়লেন – তাকে একটু একা থাকতে দিলেন। উঠে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন অচেতন সমরোত্তমদের শয্যার পাশে; কয়েকটা ওষুধের পাত্র এনে মেশাতে লাগলেন কিছু জড়িবুটি। তারপর ডাকলেন, “প্রফুল্ল।”

প্রফুল্ল দ্বারের বাইরেই ছিল বোধহয়। সে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। “আদেশ করুন, রাজকন্যা।”

একমনে ওষুধ তৈরি করতে করতে উর্মি বললেন, “একবার যাও তো। আমার ঔষধকক্ষে মৃত দেবতার নদীর জলের একটা কাচের পাত্র আছে, সেটা নিয়ে এসো। আর তার সঙ্গে দুটো স্বর্ণখেচরের পালক।”

প্রফুল্ল বেরিয়ে গেল; ফিরেও এল একটু পরেই। “রাজকন্যা, নিয়ে এসেছি।”

“ওইখানে আপাতত রেখে দাও। আমি যাচ্ছি একটু পরে।” বলে অভীর পাশে ঔষধপাত্রে ঠাসাঠাসি একটা নাতিউচ্চ মর্মরবেদি দেখিয়ে দিলেন তিনি।

সেখানে জিনিসদুটো রেখে অভীর দিকে তাকিয়ে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে
বেরিয়ে গেল প্রফুল্ল। কিন্তু ততক্ষণে অভীর চোখে পড়ে গেছে দৃশ্যটা।
লোকটার ডানহাতের কবজিতে গভীর একটা টাটকা ক্ষতচিহ্ন।
বরফের ছুরি দিয়ে শেষমুখের হাতের ঠিক ওই জায়গাতেই আঘাতটা
করেছিল সে নিজে!



॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ যমদণ্ড

সম্মেলনকক্ষে গম্ভীর মুখে বসে নীলাদ্র ভাবছিল, “এর পেছনে ওদের নিশ্চয় কোনো বদ উদ্দেশ্য আছে। নয়তো সমরোত্তমদের যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা আরোপ করবে কেন ওরা?”

অভীর জন্য চিন্তায় ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল সে। শ্যামশ্রী বা মেঘবর্ণ – অন্তত একজনের তো এতক্ষণে তাকে চিঠি লিখে ওদিকের অগ্রগতি জানানো উচিত ছিল।

কে যেন ডাকছে। উঠে গেল নীলাদ্র।

দরজা খুলতেই রীতিমতো চমকে গেল সে। “অভী, তুই?”

প্রতিবর্ত ক্রিয়াতেই ছেলেকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরল সে। “তুই ঠিক আছিস তো বাবা?”

অভী তার আলিঙ্গনমুগ্ধ হয়ে বলল, “আমি ঠিক আছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন একজন। তাঁকে নিয়ে এসেছি।”

স্বর্ণশেখরকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল নীলাদ্র। স্বর্ণশেখর হাসল। “চিনতে পারছ, নীলাদ্র?”

তার হাত ধরে নীলাদ্র বলল, “তোমাকে চিনতে পারব না? তুমি আমার ছেলের জন্য যা করেছ, আমি কোনোদিন ভুলব না, স্বর্ণশেখর।”

পাশে দাঁড়ানো অভীর মাথায় হাত বুলিয়ে চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে স্বর্ণশেখর বলল, “অভী আমারও সন্তানের মতো। এতগুলো বছর ধরে ওকে বড়ো করলাম; এখন ওকে ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হয়।”

অভীর দিকে ফিরে সে বলল, “আমার বাঁশের লাঠিটা কোথায় রে?”

“সংগ্রহশালায় আছে।”

নীলাভ চাবি দিল তার হাতে। “যা, নিয়ে চলে আয়।”

এক দৌড়ে গিয়ে লাঠিটা নিয়ে ফিরে এল অভী। ততক্ষণে নীলাভ আর স্বর্ণশেখর জমিয়ে গল্প করা শুরু করেছে। তার হাত থেকে লাঠি নিয়ে স্বর্ণশেখর উঠে দাঁড়াল।

“এতদিন সাধারণ মানুষের জগতে ছিলাম, মায়াগুলোর প্রয়োগ দু’একটা বাদে মনে ছিল না কিছুই। কিন্তু ওই রক্তপদ্মরাগ আমার স্মৃতির উপর যা ময়লা জমেছিল, সব পরিষ্কার করে দিয়েছে।”

সে লাঠিটা একবার শূন্যে ঘোরাল। সঙ্গে সঙ্গে লাঠির উপরের বাঁশের আকৃতির ছদ্মবেশটা মিলিয়ে গেল। অভী দেখল, একটা কালো রঙের দীর্ঘ, ধাতব দণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্বর্ণশেখর। দণ্ডটা তার হাতে ঘুরতে লাগল, আর তার গা থেকে ছিটকে পড়তে লাগল আগুনের ফুলকি।

তারপর সে নামিয়ে রাখল অস্ত্রটা। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফিরে এল তার আগের সাধারণ বাঁশের লাঠির রূপে। নীলাভ হাততালি দিয়ে উঠল।

“কতকাল পরে এই দৃশ্য দেখলাম, স্বর্ণশেখর। মনটা ভালো হয়ে গেল।”

স্বর্ণশেখর বলল, “এবার কয়েকটা খারাপ খবরও তোমাকে দেওয়ার আছে, নীলাভ। মন দিয়ে শোনো।”

মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রীর সঙ্গে কী হয়েছে, অল্প কথায় তাকে বলে দিল স্বর্ণশেখর। শুনতে শুনতে নীলাভর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

“কেমন আছে এখন ওরা?” সে জানতে চাইল।

অভী বলল, “প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু জ্ঞান আসেনি এখনও। রাজকন্যা উর্মি বলছেন, জ্ঞান না আসা পর্যন্ত বোঝা যাবে না কতটা ক্ষতি হয়েছে। পর্বতদা অবশ্য সুস্থ হয়ে গেছে। তাকেই পাহারায় থাকতে বলে এসেছি। যত বড়ো বদমাশই হোক, তাকে পেরিয়ে চট করে কেউ আর অজ্ঞান অবস্থায় ওদের ক্ষতি করতে পারবে না। শেষমুখের ব্যাপারে যেটুকু জানতে পেরেছি, রাজকন্যা উর্মিকে জানিয়ে এসেছি। তিনিও কড়া নজর রাখছেন।”

স্বর্ণশেখর বলল, “রাজা পুনর্বসু নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন, কিন্তু মরুময় যেহেতু ওদের জলের নিয়ন্ত্রক, তাই এর জন্য ওর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে যে তিনি অপারগ, সে কথাও আমাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নীলাভ, আরও একটা খারাপ খবর আছে।”

অভী বুঝতে পারছিল, এবার কার কথা আসতে চলেছে। হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফেলল সে।

সে দৃশ্য দেখে নীলাভ আঁচ করে ফেলল। “সবার কথা হল, লীনার কথা কেউ বললে না কেন? স্বর্ণশেখর...?”

স্বর্ণশেখর আস্তে আস্তে বলল, “লীনা মারা গেছে।”

ভয়ানকভাবে চমকে উঠল নীলাভ। “সে কী! কী করে?”

“ঐশিকদের ষড়যন্ত্র।”

অভীর কাছে সে যেমন শুনেছিল, তেমনটিই সে শোনাল নীলাভকে। অভী আর কথা বলতে পারছে না। তার মুখ ঢেকে রেখেছে দুই হাত; হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে নামছে জল।

ওরা তিনজনেই নীরবে বসে রইল কিছুক্ষণ। নীলাভ এসে বসল অভীর পাশে; তার পিঠে হাত রাখল। বাবার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল অভী।

“বাবা, আমার জন্যই...”

আর বলতে পারল না সে; এতক্ষণের চেপে রাখা কান্নার উচ্ছ্বাস কথাগুলোকে বেরোতে দিল না।

নীলাভ আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে একবার স্বর্ণশেখরের দিকে তাকাল সে। “লতার মুখোমুখি দাঁড়াব কী করে, সেই কথাই ভাবছি এখন।”

বেশ কিছুক্ষণ পর অভী একটু শান্ত হলে স্বর্ণশেখর বলল, “অভী, দেখ বাবা, যে গেছে, সে তো আর ফিরবে না। কিন্তু আমাদের সামনে এখন অনেক বড়ো বিপদ। ঐশিকরা তোকে শাসিয়েছে। শেষমুখের সঙ্গে তাদের যোগ আছে, তুই নিজের চোখে দেখে এসেছিস। আবার ওই খুনিটার সঙ্গে রাক্ষসদের প্রভাবশালী মহামন্ত্রী মরুময়েরও যোগ আছে। তার মানে মরুময়ের সঙ্গেও ঐশিকদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। ওরা তোকে বিব্রত করতে চায়, সেই সুযোগ ওদের দিস না। এই অবস্থায় তোকে তো ভেঙে পড়লে চলবে না রে।”

অভী কিছু না বলে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন খালি খালি লাগছে; ভালো লাগছে না কিছুই।

স্বর্ণশেখর বলল, “ইতিমধ্যে আমার একটা জিনিস দেখানোর আছে তোমাদের।”

পোশাকের মধ্য থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করল সে। “কাল অভীরা যখন আকাশলোকে গিয়েছিল, তখন মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রীকে ডেকে নিয়ে যায় মরুময়। পরে জানলাম, ওদের উপর বজ্রমাণিকের সম্মোহন মায়া প্রয়োগ করে আমরণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিয়েছিল সে। কিন্তু ওর অনুপস্থিতিতে আমি একটা কাজ করেছি।”

নীলাভ কৌতূহলী হয়ে দেখতে লাগল মোড়কটাকে। অভীও চোখের জল মুছে তাকিয়ে রইল।

স্বর্ণশেখর বলল, “মেঘবর্ণ আমাকে আগেই বলে রেখেছিল, মরুময় লোকটা সুবিধার নয়। আমি ওর অনুপস্থিতিতে ওর জিনিসপত্রে খানাতল্লাশি চালিয়েছিলাম। সেখানে এই বস্তুটা আমার এতটাই কৌতূহল উদ্বেক করল যে আমি জিনিসটা চুপি চুপি নিয়ে এসেছি।”

মোড়কটা নীলাভর হাতে দিল সে। উপরের লেখাটা পড়েই চমকে গেল নীলাভ। অভীও হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

“সমরগরিমার বজ্রধরের বিদায় উপহার মরুময়কে।”

নীলাভ বলল, “এ তো অধিনায়কের নিজের হাতের লেখা! এ লেখার টান আমি খুব ভালো করেই চিনি।”

স্বর্ণশেখর বলল, “এখন একটা কথাই ভাবছি। ওই হতভাগা শয়তান মরুময়ের সঙ্গে আমাদের অধিনায়ক বজ্রধরের কী সূত্রে আলাপ হয়েছিল?”

মোড়ক খুলতে বেরিয়ে এল একটা স্বপ্ন-উপল। অভী বলল, “এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য বা শব্দ ধরে রাখা আছে।”

জিনিসটা হাতে নিয়ে স্বর্ণশেখর মায়াপ্রয়োগ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দৃশ্য ফুটে উঠল শূন্যের গায়ে।

অধিনায়ক বজ্রধর।

অভী তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বজ্রধরের এই অল্পবয়স্ক চেহারা তার কল্পনাতেই আসেনি। কতই বা বয়স হবে তাঁর এই দৃশ্যে – বড়োজোর কুড়ি-বাইশ। তাঁর মুখে সেই দাড়ি নেই, নেই মাথার একরাশ কাঁচাপাকা চুল। কিন্তু বয়স কম হলেও চোয়ালের দৃঢ়কঠিন ভাব ইতিমধ্যেই চলে এসেছে। আর দু’চোখে শান্ত আত্মপ্রত্যয় – এই বয়সের কারও মুখে এতখানি পরিণত আত্মবিশ্বাসের ছাপ অভী কখনও দেখেনি।

বজ্রধরের সামনে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছেন যিনি, তাঁকেও চিনতে অসুবিধা হল না। মরুময়। তাঁর চেহারার মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই; তখন যেমন ছিলেন, এখনও তেমনই আছেন – খুব একটা বুড়ো হয়ে যাননি। অভী খেয়াল করে দেখল, মরুময় স্বাভাবিক ছন্দেই হাঁটছেন – খোঁড়াচ্ছেন না।

মরুময় বললেন, “বজ্রধর, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। এই সুযোগ আর তুমি পাবে না।”

বজ্রধর বললেন, “যাই বলুন আপনি, এই ব্যবস্থায় আমি রাজি নই। আপনি রেগে যাচ্ছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার কিছু করার নেই।”

দেখতে দেখতে নীলাভ্র মন্তব্য করল, “এসব ঘটনার কথা উনি আমাদের কিছু বলেননি কখনও। বোঝাই যাচ্ছে, আমরা আয়তনে আসার আগের ঘটনা।”

বজ্রধরের কথা শুনে মরুময়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন, “বজ্রধর, তোমার কি মনে হয়, আমি যদি তোমার বিরুদ্ধে যাই, তুমি দাঁড়াতে পারবে? আমার শক্তির সামনে তোমার ক্ষমতা কতটুকু? তোমার যেটুকু পার্থিব অস্ত্রবিদ্যা, সেটুকু যুদ্ধদেবের দান। যুদ্ধদেব নিজে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না, আমাকে জানিয়েছেন, কারণ তুমি তাঁর প্রিয় শিক্ষার্থী। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি তোমার সঙ্গে আমার সংঘাত লাগে, তিনি তোমাকে রক্ষাও করবেন না, সে কথাও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমি চাইলে তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি, সেই সত্যটা ভুলো না। ওই অরণ্যকে কেটে পুড়িয়ে সাফ করে ফেলো, যদি নিজের ভালো চাও।”

বজ্রধর বললেন, “পীতপত্রবন সাধারণ অরণ্য নয়; ওর গাছে গাছে বৃষ্টি-আকর্ষণ মায়া আছে। ওই বন না থাকলে সমরগরিমায় বৃষ্টি হবে না। আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন অন্তত ওর একটা গাছেও আপনাকে হাত দিতে দেব না।”

“তাহলে তোমার মৃতদেহের উপর দিয়ে এ কাজ হবে। দেখি তোমার কত ক্ষমতা?”

অভী ভাবছিল, “এই মরুময়টা আসলে কে? বজ্রধরের মত মহাবীরকে মুখের উপর এইভাবে ভয় দেখাচ্ছে কী করে লোকটা?”

তখনই স্বপ্ন-উপলের দৃশ্যে দেখা গেল মরুময়ের হাতটা। বাহুর উপরে সেই পরিচিত চিহ্ন – তরবারি আর তার হাতলে সূর্য। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। সে বলে উঠল, “ঐশিকরা আমাকে বলেছিলেন, তাঁদের একজন আকাশলোকের বাইরে জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন। এই মরুময়ই সেই ঐশিক – ওদের দলের ষষ্ঠজন।”

নীলাভ্র বলল, “তাই এর এত সাহস – বজ্রধরের মতো লোককেও ভয় দেখাচ্ছে। ‘জল’ নিয়ে এই শয়তানটা একটু বেশিই ভাবে দেখছি। বাকি ঐশিকদের মধ্যে এই ব্যাপারটা কখনও চোখে পড়েনি।”

দৃশ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। বজ্রধর বসে আছেন মৃত দেবতার নদীর তীরে। তাঁর চোখ বন্ধ, কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ।

তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে চললেন জলের দিকে। নদীর হলদেটে জলে স্রোত ভালোই আছে। স্বগতোক্তি করলেন তিনি, “আপনার দেখা যদি না পাই, মৃত্যুই আমার কাম্য।”

নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বজ্রধর। অভী হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ওই নদীর জল মারাত্মক বিষাক্ত, সে জানে। স্পর্শে সারা শরীর পুড়ে যাবে, ফোসকা হয়ে যাবে। আর পেটে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত।

বজ্রধরের পা স্পর্শ করতে যাচ্ছে নদীর জল, এমন সময় আলোড়ন উঠল জলতলের উপর। বজ্রধর থমকে গেলেন।

মাথায় শিং, গায়ে আঁশ, হাতে ত্রিশূল নিয়ে উঠে আসছে একজন নীরসেনা। বজ্রধর অবাক হয়ে দেখছেন তাকে। সম্ভবত প্রথম দেখছেন তিনি এই জাতীয় জীবদের, তাঁর মুখের বিস্ময় দেখে আন্দাজ করল অভী।

নীরসেনা বলল, “প্রভু তোমার উপর প্রীত হয়েছেন, বজ্রধর। তোমাকে সুরক্ষাবলয় দিয়েছেন তিনি। এসো আমার সঙ্গে।”

বজ্রধর নদীর জলে ডুব দিলেন জীবটার পেছন পেছন। দৃশ্যটা বদলে গেল আবার।

এবার দেখা যাচ্ছে, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একটা খোলা জানালার সামনে। ঘরটা অন্ধকার, কিন্তু অতি উজ্জ্বল আলো আসছে জানালা দিয়ে, কিন্তু ওপারে কী আছে, দেখা যাচ্ছে না। সেই আলো এতটাই তীব্র যে বজ্রধরকে হাত তুলে নিজের চোখ ঢাকতে হচ্ছে।

আলোক-উৎসের মধ্য থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, “এই অস্ত্রে কোনো সাধারণ মানুষের অধিকার নেই। এ হেন অসীম শক্তিশালী অস্ত্র কোনো মানুষের হাতে পড়লে তার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। তুমি কেন চাও এই অস্ত্র, বজ্রধর? আর আমিই বা কেন দেব তোমাকে এর ব্যবহারের অধিকার?”

গলাটা অভী চিনতে পারল। মৃত দেবতা! সে আগে একাধিকবার শুনেছে এই কণ্ঠস্বর।

বজ্রধর হাতজোড় করে রেখেছেন, মাথা নত। তিনি বললেন, “হে দেবতা, এই অস্ত্র আমি আমার জন্য চাই না। কিন্তু পীতপত্রবন দগ্ধ করার কথা ভাবছেন

ঐশিক মরুময়। অসংখ্য জন্তুজানোয়ার, পাখি, কীটপতঙ্গ তো বটেই, কয়েক হাজার গাছও পুড়ে মরবে যদি একবার ওই নরকাগ্নিকে মুক্ত করে দেওয়া হয় ওই অরণ্যের মধ্যে। ওই গাছগুলো আছে বলে সমরগরিমায় বৃষ্টি হয়। ওরা না থাকলে পানীয় জলের প্রতিটি ফোঁটার জন্য সমরগরিমাকে দাসত্ব করতে হবে মরুময়ের কাছে। ওই ভয়ানক ব্যবসায়ীর হাত থেকে আমি আমার সমরগরিমার মানুষ আর অর্ধরাক্ষসদের বাঁচাতে চাই।”

“কীভাবে বাঁচাবে তুমি তাদের?”

“মরুময় আমাকে যুদ্ধের ভয় দেখিয়েছেন। এই মুহূর্তে না আছে আমার অস্ত্রবল, না আছে লোকবল। ভবিষ্যতে এখানে হয়তো উপযুক্ত যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করে নিতে পারব, কিন্তু এই মুহূর্তে মরুময়ের প্রচণ্ড শক্তিশালী ঐশিকমায়াকে ঠেকাতে হলে আমার ওই অস্ত্র প্রয়োজন। নয়তো বহু সহস্র প্রাণের অকালমৃত্যু আটকানো যাবে না।”

জানালার আলোটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠল, তার তীব্রতা কমে গিয়ে কিছুটা সহনশীল হয়ে উঠল। দৃশ্যটা দেখে অভীর মনে হল, বজ্রধরের উত্তর শুনে দেবতা প্রসন্ন হয়েছেন।

দেবতা বললেন, “বজ্রধর, এই অস্ত্রের উপযুক্ত ধারক যদি এই মুহূর্তে কেউ থাকে নশ্বর জগতে, তাহলে সেরকম একমাত্র ব্যক্তি তুমিই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মরুময়ের সেনাবাহিনীর উপর তুমি যদি এই অস্ত্র প্রয়োগ করো, তাহলে যে বিশাল পাপ তোমার হবে, তার ভার নিতে তুমি প্রস্তুত তো?”

বজ্রধর মাথা উঁচু করে তাকালেন আলোটার দিকে; বললেন, “নিরীহ, নির্দোষের জীবনরক্ষা করার জন্য আমাকে যদি সহস্রবারও নরকে যেতে হয়, তার জন্য আমি প্রস্তুত।”

নীলাভ বলে উঠল, “এই তো আমার অধিনায়কের মতো কথা!”

দেবতা যখন এবার কথা বললেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রসন্নতার আভাস পাওয়া গেল। “তোমার প্রার্থনা আমি পূরণ করব। যমদণ্ডের অকল্পনীয় শক্তি তোমার লাগবে না; সেই শক্তির একটা অংশ আমি তোমার এই লৌহদণ্ডে প্রদান করছি, একে ধারণ করো। তুমি ছাড়া এই মুহূর্তে এই অস্ত্র ব্যবহার করার যোগ্যতাও আর কারও নেই, বজ্রধর। তোমার উদ্দেশ্য অতি সাধু, তাই তুমি একে ব্যবহার করার যোগ্য হতে পারলে।”

বজ্রধরের হাতে যে দণ্ডটা আবির্ভূত হল, সেটা ওরা সবাই চেনে। এখনও বস্তুটা রাখা আছে সংগ্রহশালায়।

দেবতা আবার বললেন, “এই যুদ্ধে তুমি জয়লাভ করবে; অরণ্যসহ ওই নিরীহ প্রাণগুলোকে রক্ষা করতে সফল হবে। কিন্তু মনে রেখো বজ্রধর, তোমার মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রেই অপেক্ষা করছে অদূর ভবিষ্যতে। এই দণ্ড তোমাকে সেদিন রক্ষা করবে না, এবং যত দিন যাবে, এর শক্তি কমতে থাকবে। যাই হোক, বীরের মৃত্যুই বরণ করবে তুমি। আর তারপরেও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “মৃত্যুর পরে বজ্রধরের সঙ্গে কী কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটছে?”

স্বর্ণশেখর বলল, “সে-কথা আমাদের জানার কোনো উপায় নেই।”

“অভী, ফিরে এসেছ? কখন ফিরলে?”

কথাটা শুনে ওরা চমকে ফিরে তাকাল। নিধি এসে ঢুকেছে কক্ষের মধ্যে। আর ঢুকেই স্বপ্ন-উপল থেকে বেরিয়ে আসা দৃশ্যটা দেখে হাঁ হয়ে গেছে।

অভী একটু হাসল। “এই একটু আগে এলাম।”

নিধি বলল, “সমরোত্তম নীলাভ, একটা খবর এনেছিলাম। কিন্তু আগে এটা দেখে নিই, তারপর বলছি খবরটা। এ তো অধিনায়ক বজ্রধর!”

এতক্ষণ ওরা যা দেখেছিল, তাকে সংক্ষেপে বলে দিল অভী। তারপর আবার চালু হল দৃশ্যটা।

তরুণ বজ্রধর দাঁড়িয়ে আছেন যমদণ্ডের অংশশক্তিসম্পন্ন অস্ত্রহাতে। জানালা দিয়ে আসা আলোটা মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে আসছে। নীরসেনা এসে দাঁড়াল। “চলো, এবার ফিরতে হবে।”

দৃশ্যটা বদলে গেল আবার। বিরাট রাক্ষস সেনাবাহিনী এসে দাঁড়িয়েছে মৃত দেবতার নদীর তীরে। সারি সারি রাক্ষস নৌকা দাঁড়িয়ে আছে নদীর তীর বরাবর। একজন নীরসেনা কথা বলছে তরবারিধারী মরুময়ের সঙ্গে। বজ্রধর আছেন একটু দূরে, পীতপত্রবনের প্রান্তদেশে।

নীরসেনা মরুময়কে বলছে, “এই নদীতীরে অস্ত্র নিয়ে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তোমরা দেবতার নিষেধ অমান্য করেছ। তোমরা শাস্তি পাবে।”

মরুময় ক্রোধে অন্ধ হয়ে বামহাত ছুড়লেন। মায়া প্রয়োগ করলেন, বোঝা গেল, কারণ সঙ্গে সঙ্গে নীরসেনা তিনহাত দূরে ছিটকে পড়ল।

অভীরা চমকে উঠল। একজন নীরসেনাকে আঘাত করা – এ তারা অতি বড়ো দুঃসাহসেও ভাবতে পারে না।

মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল নীরসেনা, তার ত্রিশূল তাক করল মরুময়ের দিকে। কিন্তু তারপর সে নিজেকে সামলে নিল। “না, আমার হাতে তোমার মৃত্যু লেখেনি নিয়তি।”

বজ্রধরের দিকে ফিরে সে বলে উঠল, “বজ্রধর, তোমার যমদণ্ড প্রয়োগ করো। যারা যারা অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ আজ বেঁচে ফিরবে না।”

“যমদণ্ড?” মরুময় হতবাক হয়ে গেলেন।

বজ্রধর হাতের দণ্ড উঁচু করে ধরেছেন, ‘মার-মার’ শব্দে তাঁর দিকে ছুটে আসছে রাক্ষসরা। তাদের কারও হাতে তরবারি, কারও হাতে গদা, কারও হাতে মুষল। বজ্রধর শুধু একবার হাত নাড়লেন।

তাঁর অস্ত্রটা থেকে একটা লাল আলোর ঢেউ খেলে গেল শত্রুসৈন্যের দিকে। এক মুহূর্তও লাগল না। প্রত্যেকটি রাক্ষস সৈন্য নিস্প্রাণ হয়ে পড়ে গেল নদীর তীরে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! বজ্রধর দাঁড়িয়ে আছেন দণ্ড হাতে, আর দাঁড়িয়ে আছে ত্রিশূলধারী, শিংওয়ালা নীরসেনা। আর অত বিশাল নদীর তীরজুড়ে শুধু রাক্ষসের লাশ আর লাশ।

মরুময় নড়ে উঠলেন সেই মৃতদেহের স্তূপের মধ্য থেকে। অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে বজ্রধর দণ্ড উঁচু করার সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। দণ্ডের প্রাণহরণ-মায়াকে যেহেতু শুধু অস্ত্রধারীদের প্রাণ বিনাশ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তাই বেঁচে গেছেন তিনি।

এগিয়ে গেলেন বজ্রধর তাঁর দিকে। “মরুময়, আপনি এবার যেতে পারেন। সমরগরিমায় আর আপনাকে কোনোদিন দেখতে না পেলেই খুশি হব।”

“থামো।”

পরাজিত মরুময় পিছু ফিরে হাঁটা শুরু করেছিলেন, এমন সময় আদেশটা এল নীরসেনার কাছ থেকে। মরুময় ফ্যাকাশে মুখে ফিরে তাকালেন। ত্রিশূলটা সামনে ধরে এগিয়ে এল নীরসেনা।

“তুমি আমার উপর আঘাত করার উদ্দেশ্যে মায়া প্রয়োগ করেছিলে। আজ বুদ্ধি করে হাতের অস্ত্রটা ফেলে দিলে বলে বেঁচে গেলে, নয়তো যমদণ্ডের সামনে তোমার অমরত্বের বর্মের সুরক্ষা কাজ করত না। তোমাদের ঐশিকদের এই অমরত্বের বিনাশ ঘটানোর দায়িত্ব নিয়তি অন্য লোকের উপর দেবেন, আমি জানি। কিন্তু একজন নীরসেনাকে আঘাত করার প্রতিফল তোমাকে পেতে হবেই।”

হাতের ত্রিশূল দিয়ে সে আঘাত করল মরুময়ের ডান উরুতে; যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে তিনি বসে পড়লেন মাটিতে।

টেনে অস্ত্রটা আবার বার করে আনল নীরসেনা। ক্ষতটা থেকে গলগলিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত।

বজ্রধর বললেন, “মরুময়, এবার ফিরে যান। আমাদের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা আর আপনাকে করতে হবে না।”

বিষভিত্ত দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে একবার তাকালেন আহত মরুময়। তারপর কোনো কথা না বলে গিয়ে উঠলেন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকশত খালি নৌকার একটাতে।

দৃশ্যটা পুরোপুরি মিলিয়ে গেল।

নিধি বলে উঠল, “এবার বোঝা গেল, লোকটা এখনও খুঁড়িয়ে চলে কেন।”

অভী বুঝতে পারছে, এইভাবে ঐশিকরা, বা তাঁদের বকলমে মরুময়, দখল করতে চান সমরগরিমাকে। মাল্যপর্বতের জলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেছেন তিনি; সমরগরিমাকেও আনতে চেয়েছিলেন তার বৃষ্টিডাকা অরণ্যকে ধ্বংস করে, বজ্রধরের জন্য পারেননি।

মৃত অধিনায়কের প্রতি শ্রদ্ধাটা তার যেন এই মুহূর্ত থেকে আরও বেড়ে গেল।

স্বর্ণশেখর বলল, “বজ্রধরের মারাত্মক রসিকতা। এই দৃশ্যগুলোকে স্বপ্ন-উপলে ভরে ওকে উপহার দিয়েছিলেন তিনি। ভাগ্যিস দিয়েছিলেন। তাই এত বছর পর এই ইতিহাস আমরা জানতে পারলাম।”

একটু হেসে নীলাভ বলল, “নিধি, এবার বলো, তুমি কী সংবাদ এনেছিলে।”

নিধি বলল, “দুটো খবর আছে, যদিও একটাকে ঠিক খবর বলা যায় কিনা বলতে পারছি না। তবে প্রথমেটা তো বিরাট বড়ো খবর অবশ্যই। নিয়ামক

বিনীতেশ আজ রাতে ছায়াভবনে অর্ধরাক্ষস আন্দোলনের সব নেতা এবং যারা যারা এই আন্দোলন নিয়ে উৎসাহী – সবাইকে যেতে বলেছেন। তাঁর লোকেরা বাড়ি বাড়ি আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দিয়ে গেছে। রথীনকাকা, সুহাসকাকা, নির্মলদা সবাই পেয়েছে একটা করে চিঠি। আমার বাবাও পেয়েছে। অর্ধরাক্ষসদের কথা শোনার জন্য সভা ডাকছেন নিয়ামক, এরকম ঘটনা সমরগরিমার ইতিহাসে কোনোদিন হয়নি। সুহাসকাকা আর আমার বাবা বলাবলি করছিল, এ হচ্ছে তাদের নৈতিক জয়।”

নীলাভ বলল, “আর দ্বিতীয় খবরটা কী?”

“এটা খবর কীনা জানি না, তবে ছায়াভবনে কাজ করত সঞ্জীব নামে একজন অর্ধরাক্ষস।”

অভী বলল, “হ্যাঁ, আমি চিনি। দেখেছি তাকে গতবার।”

নিধি বলল, “লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”

অভী লক্ষ্য করল, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখটা কীরকম যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। নীলাভ বলল, “অভী, তুই নিধির সঙ্গে কথা বল। আমি স্বর্ণশেখরকে নিয়ে একবার রক্ষোবৈদ্যের কাছে যাচ্ছি। অনেকদিন পর ওকে দেখে উনিও খুশি হবেন, আর আমারও এই সঞ্জীবের ব্যাপারে কিছু আলোচনা আছে ওঁর সঙ্গে।”

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর নিধি প্রথম প্রশ্নটাই করল, “লীনা কোথায়?”

অভী মাথা নিচু করল। নিধি আবার বলল, “অভী, লীনা কোথায়? সে আসেনি?”

অভী মাথা নাড়ল। “লীনা মারা গেছে, নিধি।”

নিধি পাথরের মূর্তির মতো তাকিয়ে রইল তার দিকে।

অভী মুখ তুলে তাকাতে পারছে না তার দিকে। নিধির দু’চোখে চূড়ান্ত অবিশ্বাস; কিন্তু সে বুঝতে পারছে, অভী সত্যি কথা বলছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দু’জনেই। তারপর নিধি অনুচ্চস্বরে বলল, “কাকিমাকে কী বলব?”

অভী উত্তর দিতে পারল না। এই একই প্রশ্ন তাকেও ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে খাচ্ছে।

নিধি অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল। “আর এখানে থাকতে পারছি না, দম বন্ধ হয়ে আসছে। চলো, একটু বাইরে খোলা মাঠে যাই।”

ওরা দু’জন বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে। আয়তনের অলিন্দপথে বিনা কথায় হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পৌঁছল সমরগরিমার মাঠে।

নিধির দিকে তাকাল অভী। তার চোখের কোণে জল চিকমিক করছে, দেখতে পেল সে।

দূর থেকে দুটো ছেলে-মেয়ে আসছে। অভীকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়ছে তারা। উষসী আর সন্দীপ।

অভী বলল, “নিধি, এদের কাছে লীনার ব্যাপারে আমরা কিছু বলব না। কাকিমাকেও বলছি না কিছু আমরা। যাকে যা বলার, সমরোত্তমরাই বলবেন।”

নিধি নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। অভী বুঝতে পারছে, না কাঁদার প্রবল চেষ্টা করছে সে।

উষসী এসেই জানতে চাইল, “কখন ফিরলে, অভী? লীনা কই?”

অভী মিথ্যা বলল, “লীনা আছে ওখানে সমরোত্তম শ্যামশ্রীর কাছে। পরে ফিরবে।”

সন্দীপ প্রসঙ্গটাকে নিয়ামকের সভার দিকে ঘুরিয়ে দিতে স্বস্তি পেল অভী। সন্দীপ বলল, “দেখো, আমার কিন্তু মনে হয় না, নিয়ামক অর্ধরাক্ষসদের দাবিদাওয়াগুলো নিয়ে খুব ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ নেবেন।”

উষসী বলল, “মৃগেন্দ্র বলছিল, ওর বাবা নাকি বলেছেন, সভার ফল যাই হোক, এতদিনে যে অর্ধরাক্ষসদের কণ্ঠও পৌঁছোচ্ছে শাসকের কান পর্যন্ত, এটা একটা ভালো লক্ষণ।”

অভী আর নিধি শুধু মাথা নাড়ছিল। একটু অবাক হয়ে উষসী বলল, “কী ব্যাপার, নিধি? অর্ধরাক্ষসদের অধিকার আদায় নিয়ে কথা হচ্ছে, আর তুমি চুপচাপ – এ তো বড়ো কম অদ্ভুত ব্যাপার নয়?”

নিধি জোর করে একটু হাসল। “ও কিছু নয়, উষসীদি। এমনিই আজ একটু চুপ করে আছি।”

সন্দীপ জানতে চাইল, “নিধি, মন খারাপ কেন? কী হয়েছে?”

“কিছু না। তোমরা কথা বলো, আমি শুনছি।”

উষসী আর সন্দীপ পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। নিধির ব্যবহারের অস্বাভাবিকতা তাদের নজর এড়ায়নি। সন্দীপ বলল, “ওই যে লতাকাকিমা যাচ্ছেন আয়তনের দিকে। সম্ভবত সমরোত্তম নীলাভ্রের কাছে সংবাদ নিতে যাচ্ছেন রক্ষোপুরীর।”

উষসী বলল, “তার আর কী দরকার? অভী, তুমি তো এই একটু আগেই ফিরলে ওখানে থেকে। তোমার কাছ থেকেই মাল্যপর্বতের টাটকা খবর পেয়ে যাবেন উনি।”

অভী নিষেধ করার আগেই সে চিৎকার করে ডাকল, “কাকিমা, এদিকে আসুন। অভী ফিরেছে।”

চমকে উঠে অভী আর নিধি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল। অভীর দু’চোখে অসহায় ভয় ফুটে উঠল। কী বলবে সে লীনার মাকে?

তিনি তাকালেন ওদের দিকে। অভীকে দেখে তাঁর মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। দ্রুত হাঁটা শুরু করলেন তিনি।

অভী বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল।

লতাদেবী এসে বললেন, “অভী, ভালো আছ?”

অভী মাথা নাড়ল। তারপরেই এল সেই অনিবার্য প্রশ্ন। “লীনা কোথায়?”

অভী মুখ নিচু করে রইল, নিধি তাকিয়ে রইল একটু দূরের অনুশীলন মঞ্চের দিকে। তিনি আবার বললেন, “লীনা কই, অভী?”

অভী চুপ। লতাদেবীর জ্র কুঁচকে উঠল।

উষসী বলল, “ও আমাদের এখুনি বলেছে, কাকিমা, লীনা মাল্যপর্বতে আছে সমরোত্তম শ্যামশ্রীর কাছে।”

লতাদেবীর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। “না, থামো তোমরা। লীনা ওকে ছেড়ে কোথাও রয়ে যাওয়ার পাত্রী নয়। অভী, লীনা তোমার সঙ্গে নেই কেন? কেন ও থেকে গেছে মাল্যপর্বতে? আমার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দাও, অভী। সত্যি কথা বলো।”

অভী মুখ তুলল; তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা। পাশ থেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নিধি।

এতক্ষণে সত্যিটা অনুধাবন করে মুখে হাত চাপা দিল উষসী; সন্দীপ অভীর দিকে তাকিয়ে রইল চরম অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে।

লতাদেবীকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি একটা পাথরের মূর্তি হয়ে গেছেন।

দীর্ঘক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর তিনি বললেন, “অভী, এইটুকু বলো, লীনা বীরের মতো মারা গেছে তো?”

অভী বলল, “হ্যাঁ, কাকিমা। ও একা হাতে আমার আর আরও একজনের জীবন বাঁচিয়েছে। আমাকে বাঁচানোর জন্য ও...! কাকিমা, আমি... আমারই ওখানে মরা উচিত ছিল, কিন্তু...”

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন লতাদেবী; চোখের কোল থেকে মুছে নিলেন জল; একবার হাত রাখলেন তার মাথায়। “আমি জানি, ও তোমাকে কতটা ভালোবাসত। তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে ও যদি নিজের জীবন দিয়ে থাকে, তাহলে ওর সেই সিদ্ধান্তকে তোমার সম্মান করা উচিত। নিধি, কেঁদো না, মা। আমার মেয়ে যা করেছে, তার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে না, তা নয়, কিন্তু একই সঙ্গে আমি ভীষণ গর্বিতও বোধ করছি। সমরগরিমার কাছে সে তার ঋণ শোধ করে দিয়ে গেছে।”

ধীর পদক্ষেপে স্থানত্যাগ করলেন তিনি। উষসী আর সন্দীপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ওরাও চলে গেল।

বাম হাতে মুখ চেপে নিধি কাঁদছে একটুও শব্দ না করে। অভী আর কাঁদতে পারছে না; তার ভীষণ অবসন্ন লাগছে। নিধির দিকে বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে।

আর তখনই সে দেখল, নিধির ডান হাতটা কী অমানুষিক দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে ত্রিশূলটাকে; মুঠো করা হাতের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে তার, নিধির হুঁশ নেই।

স্বপ্নে দেখা মৃত দেবতার নদীর তীরে বিষে নীল হয়ে যাওয়া নিধির নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকার দৃশ্যটা মনে পড়তেই সর্বান্তঃকরণে কেঁপে উঠল অভী।



॥ ষোড়শ অধ্যায় ॥ অগ্নিহিম

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে পীতপত্রবনের মধ্যে। ছায়াভবনের ভেতরে আলো জ্বলছে। সেই হলদেটে আলোর চৌকো টুকরো দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। অর্ধরাক্ষসরা একে একে আসছে; এসে ঢুকছে সরাইখানাটার মধ্যে। তাদের হৈ-হুন্সার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বাইরে থেকে।

ছায়াভবনের সামনে মশাল জ্বলছে বেশ কয়েকটা। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বক্তৃতামঞ্চ। এই মঞ্চেই গতবার উর্গায়ুকে বক্তব্য রাখতে গুনেছিল অভী। লীনাও সঙ্গে ছিল সেবার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অভী। সে আর নিধি দাঁড়িয়েছিল ছায়াভবনের বাইরে। সমরোত্তমরা বলে দিয়েছেন, এখানে আজ ঘোরতর গওগোল বাধার আশঙ্কা আছে। সেরকম কিছু হলে পরিস্থিতি সামলাতে হবে।

বাকি শিক্ষার্থীরাও আসছে; সমরোত্তমরাও এসে পৌঁছোবেন একটু পরেই। নিয়ামক বা সহনিয়ামকও এখনও আসেননি। এলে তাঁদের বক্তৃতা শোনা যাবে এই বাইরে থেকেই।

অভী চন্দ্রহাস নিয়ে এসেছে আজ। নিধির হাতে ত্রিশূল। ওরা খেয়াল করল, বিনীতেশের সেনারা এসে হাজির হয়েছে অনেকক্ষণ। তাদের হাতে ধনুক, পিঠে তুণীর, কোমরে তরবারি - যেন যুদ্ধে যাওয়ার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। ইতিমধ্যে তারা প্রায় ঘিরে ফেলেছে ছায়াভবনকে।

মহামান্য নিয়ামকের সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাদের কাঁধে!

ছায়াভবনের বাইরে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মশা কামড়াচ্ছে, পায়ের উপর কী যেন একটা পোকা সরসর করে হাঁটছে। অভীর হঠাৎ মনে হল, একটা মৃদু কিন্তু অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছে যেন সে এখানে।

নিধিকে কথাটা বলতে সেও বলল, “হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত গন্ধ আমার নাকেও আসছে, এবং গন্ধটা মৃদু নয় মোটেই। হয়তো আমার নাকটা তোমার চেয়ে ভালো বলে গন্ধটা আমি একটু জোরালো ভাবেই পাচ্ছি। কিন্তু এ যে কীসের গন্ধ, আমি ধরতে পারছি না।”

ওই যে আসছেন রক্ষীপরিবৃত নিয়ামক বিনীতেশ। তাঁর পাশেই আছে উন্মুক্ত তরবারি হাতে চক্রবাক। মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছে, নিয়ামকের ঠোঁটদুটো বেঁকে আছে একটা ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যপূর্ণ হাসিতে। সেই দেখে নিধি চাপাগলায় মন্তব্য করল, “মুখটা দেখো একবার। ওই মুখ দেখে আদৌ মনে হচ্ছে, লোকটা অর্ধরাক্ষসদের সমস্যা সমাধান করার সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সবার বক্তব্য শুনতে আসছে? ঘোড়ার ডিম! আমি বলে দিচ্ছি অভী, এই সভার পেছনে অন্য কোনো মতলব আছে ওর।”

নিয়ামক ঢুকলেন ছায়াভবনের ভেতরে। সবাই উঠে দাঁড়াল। তিনি আসীন হলেন বক্তৃতামঞ্চের সামনে, তাঁর পাশে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে রইল চক্রবাক।

অভীর বারবার মনে পড়ছে লীনার কথা। গতবার এইরকম অন্ধকারে সে ছায়াভবনে এসেছিল লীনার সঙ্গে; লীনার মুখে লাগানো ছিল নকল গোঁফ আর একটা আঁচিল। তাই নিয়ে কত হাসাহাসি করেছিল ওরা। আর নিধির সেই অর্ধরাক্ষস-সুগন্ধীর বিচ্ছিরি গন্ধ!

মনে পড়তে এত দুঃখের মধ্যেও একটু হাসল সে। ভেতরে তখন অর্ধরাক্ষস বক্তারা একে একে মঞ্চের উপর উঠে বলছেন। সামনের দর্শকাসনে বসে আছেন নিয়ামক; তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট। বারবার অস্থিরভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছেন তিনি। নিধি বলল, “দেখে মনে হচ্ছে, উনি যেন কারও প্রতীক্ষা করছেন, তাই না?”

অভী মাথা নাড়ল। “হুঁ। কিন্তু কে এখন আসবে ওঁর কাছে? মুখ দেখে তো মোটেই মনে হচ্ছে না, বক্তাদের কথাগুলো উনি মন দিয়ে শুনছেন। তাহলে এই সভাটা ডাকার দরকার কী ছিল?”

এইবার ছায়াভবনের বক্তৃতামঞ্চে বলতে উঠছেন রথীন্দ্র। অর্ধরাক্ষসরা করতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাল।

অভীর মাথায় ফিরে এল আবার লীনার কথা। তার ঠান্ডা হয়ে যাওয়া শরীরটা কেমন নির্বিবাদে শুয়ে আছে রক্ষোপুরীতে! একটা মানুষের সঙ্গে এত হাসি, এত কথা, এত গল্প, রাগ-অভিমান-বন্ধুত্ব – মৃত্যুর পরেই কেমন হঠাৎ এক নিমেষে সব ‘নেই’ হয়ে যায়! বুকের ভেতরটা তার যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে চাইছে। ওই হাসি, ওই হাতধরার স্মৃতি সব ফিরে ফিরে আসছে ঢেউয়ের মতো।

জোর করে মনটাকে অন্যদিকে সরাতে চাইল অভী। ছায়াভবনের জানালা দিয়ে শোনা যাচ্ছে রথীন্দ্রের বক্তৃতা। সেই দিকে মন দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল সে।

কারা যেন আসছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। তাদেরই বন্ধুরা এসে পড়েছে – সন্দীপ, উষসী, দেবদত্ত, তরুণ, মৃগেন্দ্র। ওদের আসতে দেখে অভী তাড়াতাড়ি মুখচোখ মুছে নিল।

সন্দীপ বলল, “অভী, লতাকাকিমার সঙ্গে আবার দেখা হল। একদম পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গেছেন উনি, কোনো কথা বলছেন না।”

অভী কোনো উত্তর দিল না। উষসী একটু বিরক্ত স্বরে বলল, “এসব কথা অভীকে এখন শোনাচ্ছ কেন, সন্দীপ? এই মুহূর্তে ওই খবরটা না জানলেও তো ওর চলত।”

ওরা নীচু গলায় কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। নিধি ওদের থেকে একটু সরে এসে দাঁড়াল অভীর পাশে। ভেতরে তখন রথীন্দ্র বলছেন, “আমাদের সঙ্গে আপনাদের যেটুকু পার্থক্য, সেটা নিতান্তই বহিরঙ্গের। আমাদের সব খাদ্য আপনারা খান না, আমাদের সব আচার-আচরণ আপনারা মেনে চলেন না, আবার উলটো দিক থেকেও কথাগুলো সত্যি। কিন্তু ভেবে বলুন নিয়ামক মহোদয়, শুধু এইটুকুর জন্যই আপনারা ভালো আর আমরা খারাপ?”

নিধি ফিশফিশ করে অভীকে বলল, “নিয়ামকের কাছে বৃথা বলা এতকিছু। মুখটা দেখো শুধু। রথীনকাকা অরণ্যে রোদন করছে।”

অভী বলল, “তা বটে। কিন্তু আমি এখন ভাবছি, সমরোত্তমরা কোথায়? বাবা আর রবিকাকা আসতে এত দেরি করছে কেন? এর পরে নিয়ামকের বক্তৃতা শুরু হলেই কিন্তু ঘোরতর ঝামেলা বাধার আশঙ্কা। এত দেরি তো ওদের হওয়ার কথা নয়।”

রথীন্দ্র তখন আবেগমগ্নিত স্বরে বলছেন, “অল্প কিছু মায়াগত পার্থক্য বাদ দিলে আপনাদের সঙ্গে আমাদের ফারাক কোথায়, বলুন? আপনারা তরবারির কোপ মারলে আমাদের রক্ত পড়ে না? আপনাদের মতো আমাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা থাকতে নেই? আপনারা আমাদের সঙ্গে অন্যায় করলে তার প্রতিকার করার অধিকার নেই আমাদের? অতি সামান্য ভুলত্রুটির জন্য কঠোর শাস্তি জোটে না আমাদের কপালে? অর্ধরাক্ষস মানেই হিংস্র, অর্ধরাক্ষস মানেই বিশ্বাসঘাতক, এই চূড়ান্ত মিথ্যেকথাগুলো কেন প্রচার করেন আপনারা? সমরগরিমা আমাদের জন্মভূমি; এর উপর আমাদের ভালোবাসা নেই, কে বলল আপনাকে? আর হিংসার কথাই যদি বলেন, এই হিংসার পথ কে দেখিয়েছে আমাদের? অন্যায়ের পর অন্যায়, অবহেলার পর অবহেলা করে কে বাধ্য করেছে আমাদের প্রতিবাদের পথ বেছে নিতে? সে তো আপনারাই করেছেন, নিয়ামক মহোদয়। আমরা যতটা না আপনাদের থেকে আলাদা, তার চেয়ে অনেক বেশি আপনাদের মতোই। বেঁচে থাকার অধিকার আপনাদের যতটা আছে, আমাদের তার চেয়ে কম কিছু নেই।”

হাততালিতে ভরে উঠল ছায়াভবন। রথীন্দ্র নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। আসন ছেড়ে নিয়ামক উঠে দাঁড়ালেন।

বাইরে শিক্ষার্থীরা উৎসুক হয়ে রইল নিয়ামকের বক্তব্য শোনার জন্য।

মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন নিয়ামক বিনীতেশ। তাঁর প্রথম কথাই হল, “অর্ধরাক্ষসরা হচ্ছে বেইমানের জাত।”

বাইরে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েগুলো ভয়ানকভাবে চমকে উঠল। সন্দীপ বলে উঠল, “আরে, বলে কী লোকটা?”

অভী দেখল, ছায়াভবনের ভেতরে বসে থাকা অর্ধরাক্ষসরাও এই অকস্মাৎ

আঘাতে কয়েক মুহূর্তের জন্য বাক্যহারা হয়ে গেছে। নিয়ামক বলতে লাগলেন, “অর্ধরাক্ষসরা সব সময় নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। যখন যেখানে স্বার্থের গন্ধ পায়, সেইখানেই লেজ নাড়তে নাড়তে গিয়ে হাজির হয়। এই ছায়াভবনেই শর্বরের জন্য জমায়েত হতে তোমরা, আমি জানি না ভেবেছ? সুদক্ষিণসারির প্রত্যেকটি মিছিলে, সভায় আমাকে গালিগালাজ করা হয়, আমি খবর পাইনি? প্রথম সারির বিশ্বাসঘাতক বলতে যা বোঝায়, অর্ধরাক্ষসরা তাই। কে মেরেছিল বজ্রধরকে? একজন অর্ধরাক্ষস। আমি যা বলছি, তা একদম সত্যি কথা – সমরগরিমার কলঙ্ক এই জাতটা।”

অভী হাঁ হয়ে গেছে। সে বলল, “নিধি, অর্ধরাক্ষসদের সভায় ডেকে এনে নিয়ামক এসব কী বকছেন?”

নিধিও হতবুদ্ধি হয়ে গেছে বাকিদের মতোই। “আমি মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।”

ছায়াভবনের ভেতরে অর্ধরাক্ষসদের মধ্যে উত্তেজিত চিৎকার চোঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। তারা ক্ষোভে, রাগে ফেটে পড়ছে নিয়ামকের বিরুদ্ধে। রথীদের গলা পাওয়া যাচ্ছে, যদিও তিনি যে কী বলছেন, তা চাপা পড়ে যাচ্ছে অন্যান্য অর্ধরাক্ষসদের ক্রুদ্ধ গর্জনে। এমন সময় ওরা সবাই দেখল, অন্ধকার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কারা যেন ছুটতে ছুটতে আসছে।

নীলাভ আর স্বর্ণশেখর।

নীলাভ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, “শিক্ষার্থীরা, একটুও নষ্ট করার মতো সময় নেই। সঞ্জীবের সঙ্গে এক্ষুনি কথা হয়েছে আমাদের। সবাইকে বার করে আনতে হবে ছায়াভবন থেকে। এখানে থাকলে কেউ বাঁচবে না।”

তখনই নিধি চোঁচিয়ে উঠল, “আরে, মঞ্চের নিয়ামকের পাশে ওটা কে উঠেছে?”

সবাই ঘুরে তাকাল জানালার দিকে। ভেতরের দৃশ্যটা দেখে অভী এক মুহূর্তের জন্য যেন জমে গেল।

শেষমুখ!

অভী বলল, “নিয়ামকের সঙ্গে কী করছে ও? আর এইটুকু সময়ের মধ্যে ও সবার নজর এড়িয়ে সমরগরিমায় এলই বা কী করে?”

নিয়ামক বললেন, “অর্ধরাক্ষসরা, ঐকে চেনো? ইনিই আজ তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করবেন।”

শেষমুখের মুখ দেখা যাচ্ছে না মুখোশের আড়ালে, কিন্তু সে যে হাসছে, তা বোঝা যাচ্ছে তার শরীরের কম্পনে। “অর্ধরাক্ষসগণ, তোমাদের মতো বিশ্বাসঘাতকদের জন্য একটাই উপদেশ আছে আমার কাছে। নরকান্নিতে পুড়ে মরো তোমরা।”

এক ঝটকায় নিয়ামককে টেনে নিয়ে সে বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে। ভেতরে অর্ধরাক্ষসরা প্রবল গুণ্ডগোল করছে। নিয়ামকের সৈন্যরা ছায়াভবনের দরজা বাইরে থেকে লাগিয়ে দিল।

নীলাভ বলল, “বিপদ ঘটতে চলেছে। আমরা এই একটু আগে সঞ্জীবকে উদ্ধার করেছি। শেষমুখ তাকে বন্দি করে রেখেছিল সৌজন্যের আবাসস্থলে।

আমার সন্দেহ হওয়ায় রক্ষাবৈদ্যের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়ামক আর সহনিয়ামকের অনুপস্থিতিতে ওদের সবকটা ভবনে অভিযান চালিয়ে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেছি তাকে। সঞ্জীবকেও হয়তো মেরেই ফেলা হত, আর দোষ চাপত অন্য অর্ধরাক্ষসদের ঘাড়ে, কিন্তু সম্ভবত সময়ভাবে ওরা সে কাজ করতে পারেনি। এর পেছনে সৌজন্যের মদত কতটা আছে, বা সে আদৌ এই বিষয়টা জানত কিনা, তা অবশ্য এখনও পরিষ্কার নয়। কিন্তু এইটুকু বুঝতে অসুবিধা নেই, পাছে সঞ্জীব আমাদের কাছে সব ফাঁস করে দেয়, সেই ভয়ে ওকে গুম করেছিল শেষমুখ। “

উষসী বলল, “ফাঁস করবে মানে? কী ফাঁস করবে সঞ্জীব?”

স্বর্ণশেখর বলল, “ছায়াভবন এখন পুরোপুরি একটি নতুন ধরনের জতুগৃহ। বাড়িটা এমনিতেই কাঠের তৈরি। তার উপর প্রচুর মোম আর পশুর চর্বি মাখানো হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে। ভেতরের দেয়ালগুলোতে লাক্ষার পালিশ করা হয়েছে। নিয়ামক অনেকদিন ধরেই পরিকল্পনা করছিলেন এসবের। যারা ভেতরে আছে, এফুনি বার করে আনতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।”

দেবদত্ত ভয়ে চিৎকার করে উঠল, “ধনুকে তির পরিয়ে তাতে আগুন দিচ্ছে ওই মুখোশপরা লোকটা!”

নিয়ামকের সেনারা সরে এসেছে বন্ধ দরজার সামনে থেকে। ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে অর্ধরাক্ষসরা। কিন্তু ওই ভারী কাঠের দরজা শুধু ধাক্কা মেরে ভেঙে ফেলা অসম্ভব।

শেষমুখ ধনুতে বাণ যোজনা করেছে। বাণের মুখে জড়ানো আছে কাপড়ের পরত, সেটা নিশ্চিতভাবেই ভেজানো আছে কোনো দাহ্য পদার্থে। তাতে অগ্নিসংযোগ করল সে; তিরের অগ্রভাগ জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

সামনে অর্ধরাক্ষসে পরিপূর্ণ ছায়াভবন – পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়।

জানালা দিয়ে অর্ধরাক্ষসদের কেউ কেউ দেখতে পাচ্ছে বাইরের দৃশ্য – অসম্ভব ভয়ে চিৎকার করছে তারা। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলেছে কেউ কেউ; আতঙ্কে পাগলের মতো আচরণ করছে। বন্ধ দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা পড়ছে। কারা যেন ভেতর থেকে চিৎকার করে বলছে, “আমাদের যেতে দিন, নিয়ামক। আমাদের বাড়িতে বউ-বাচ্চা আছে। দয়া করুন, দয়া করুন। আমাদের কথা আমরা ফিরিয়ে নিচ্ছি। নিয়ামক, শুনতে পাচ্ছেন? আপনি যা বলবেন, তাই হবে। আমাদের যেতে দিন।”

শেষমুখের জ্বলন্ত তিরের অগ্রভাগ থেকে উঠে আসা দাউ দাউ অগ্নিশিখায় দেখা যাচ্ছে, তার মুখোশপরা মুখটা স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বন্ধ ছায়াভবনের দিকে, যেন অর্ধরাক্ষসদের এই কাতর মিনতিগুলো খুব উপভোগ করছে সে।

নিধি আর মৃগেন্দ্র ছটফট করছে। “আমাদের বাবারা আছেন ওখানে!”

নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে শেষমুখ ধনুক তুলে নিশানা করছে ছায়াভবনের দিকে। কালক্ষেপ না করে অতী ছুটল। “ওকে থামাতে হবে।”

অসম্ভব দ্রুতগতিতে দৌড়ে গিয়ে সে পেছন থেকে ধাক্কা মারল লোকটাকে। টাল সামলাতে না পেরে হোঁচট খেল শেষমুখ; তার হাত থেকে ধনুর্বাণ ছিটকে পড়ল মাটিতে।

নিধি আর বাকিরা ছুটেছে ছায়াভবনের দরজা খুলে দিতে। বিনীতেশের সৈন্যরা তাদের পথ আটকাল। নীলাভ্র আর স্বর্ণশেখর ঝাঁপিয়ে পড়ল শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে।

শেষমুখ অভীর সঙ্গে লড়াইতে গেল না। সে দ্রুত সরে গেল এক পাশে, আর অভী বুঝে ওঠার আগেই মাটি থেকে ধনুর্বাণ কুড়িয়ে নিল। মাটিতে পড়ে গিয়ে তিরের অগ্রভাগের আগুনটা মৃদু হয়েছে বটে, কিন্তু নেভেনি এখনও। অভী আবার ছুটে আসছে তার দিকে। মাটিতে একপাক গড়িয়ে গিয়ে শুয়ে শুয়েই নিশানা করে শেষমুখ অগ্নিবাণ মোচন করল।

অভী আতঙ্কিত চোখে দেখতে লাগল, আগুনমুখো তিরটা উড়ে যাচ্ছে মারণ জড়ুগৃহের দিকে।

স্বর্ণশেখর আর বাকি ছাত্রছাত্রীরা ততক্ষণে সেনাদের সরিয়ে পথ করে দিয়েছে। সেই মুহূর্তেই নীলাভ্র আর নিধি এসে পৌঁছে গেল ছায়াভবনের দরজার সামনে; দু'জনে মিলে যখন দরজাটা খুলছে, তখনই অভী প্রাণপণে গলা ফাটিয়ে চৈঁচাতে লাগল, “সরে যাও, সরে যাও।”

তিরটা এসে পড়ল ছায়াভবনের ছাদে।

দরজা খুলতেই বাঁধভাঙা জলের মতো বেরিয়ে আসছিল বন্দি অর্ধরাক্ষসরা। আগুন ধরে গেছে বাড়িটাতে। বন্দিদের আটকানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে বিনীতেশের সেনারাও ছুটে পালাল ওখান থেকে।

ভয়ংকরভাবে জ্বলে উঠেছে বাড়িটা। সবাই বেরিয়ে এসেছে, নিধির বাবা বাদে। তিনি রয়ে গেছেন ভেতরে। বৃদ্ধ মানুষ বাকিদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে বেরোতে পারেননি।

বাড়ির ছাদ থেকে তখন গর্জন করে উঠেছে আগুন। লেলিহান শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলছে ছায়াভবন। নিধি চিৎকার করে উঠল, “বাবা!”

ছুটে ঢুকতে যাচ্ছিল সে জ্বলন্ত বাড়িটার মধ্যে, নীলাভ্র তাকে আটকে দিল। “না, তুমি না। কেউ যদি ওখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারে তো সে আমি। সন্দীপ, একে সরাও।”

সন্দীপ আর তরুণ নিধিকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল। কয়েকজন অর্ধরাক্ষস ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জায়গায় পুড়ে গেছেন। ছায়াভবন জ্বলছে ভয়ানক ভাবে। নীলাভ্র নিজের সারা শরীর হিমকুশলতায় শীতল করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

অভী তাকিয়ে রইল আতঙ্কিত চোখে। তার পাশ থেকে শেষমুখ ততক্ষণে উঠে পালিয়েছে – সম্ভবত আত্মগোপন করেছে অন্ধকার পীতপত্রবনের মধ্যে।

দিগ্‌নাগকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে জ্বলন্ত বাড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এল নীলাভ্র। আশ্চর্য বলতে হবে, তিনি খুব বেশি আহত হননি, তবে ভয় পেয়েছেন মারাত্মক। সামান্য ছাঁকা যে দু'একটা লেগেছে তাঁর, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

আহতদের নিয়ে যেতে হবে রক্ষাবৈদ্যের কাছে। অভী আর তার বন্ধুরা সেই চেষ্টাই করছিল। প্রচণ্ড ধোঁয়ায় অর্ধরাক্ষসদের অনেকেরই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু নতুন করে আরেকটা ঝামেলা শুরু হল।

জ্বলন্ত বাড়িটা থেকে ওরা সরে এসেছিল অনেক দূরে। অভী কথা বলছিল

রথীন্দ্র আর মৃগেন্দ্রর সঙ্গে, এমন সময় তার ঠিক কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা তির।

মৃগেন্দ্র চিৎকার করে উঠল, “সবাই গাছের আড়ালে লুকোও। ওরা আমাদের লক্ষ্য করে তির ছুড়ছে।”

নিয়ামক আর শেষমুখের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। আজ এখান থেকে কাউকে তাঁরা জ্যান্ত ফিরতে দেবেন না।

একটা তির তুলে নিয়ে স্বর্ণশেখর চিৎকার করে উঠল। “এই তিরগুলোর ফলকে বজ্রমাণিকের বিষ মাখানো আছে; তাই বেগুনি রঙের দেখাচ্ছে এদের। খুব সাবধান সবাই। একটু আঁচড়ও যদি গায়ে লাগে, সব শেষ হয়ে যাবে।”

বজ্রমাণিকের বিষটা যে কে জোগান দিয়েছে, বুঝতে অভীর অসুবিধা হল না।

নীলাভ্র বলল, “স্বর্ণশেখর, ফুলঝুরির সময় হয়ে গেছে।”

স্বর্ণশেখর মাথা নাড়ল। “সে আর বলতে হবে না আমাকে।”

অভী দেখতে পাচ্ছিল তাকে। তার হাতের বাঁশের লাঠিটা পলকের মধ্যে দীর্ঘ ধাতব দণ্ডে পরিণত হল। সেই লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে গাছের আড়াল থেকে সামনে বেরিয়ে এল সে।

লাঠি ঘুরছে বনবন করে। নিয়ামকের সৈন্যরা তাকে লক্ষ্য করে যে ক’টা তির ছুড়ল, সবই ওই ঘুরন্ত লাঠির প্রাচীরে আটকে গিয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। তারপর ওই ঘূর্ণায়মান লাঠিটা জ্বলতে লাগল তীব্র সাদা আলোয়; তার থেকে ছিটকে ছিটকে বেরোতে লাগল আগুনের ফুলকি। অভী অবাক হয়ে দেখল, সেই আগুনের ফুলকিগুলো গিয়ে আঘাত করছে গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকা ধনুর্ধর সেনাদের বুকে, মাথায়, আর তারা সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে।

নীলাভ্র হাসল অভীর দিকে তাকিয়ে। “স্বর্ণশেখরের এই বিশেষ যুদ্ধটাকে আমরা ‘ফুলঝুরি’ বলতাম। ওই অদ্ভুত অস্ত্রটি ব্যবহার করার দক্ষতা ও ছাড়া কারও নেই।”

অল্পক্ষণের মধ্যেই নিয়ামকের সেনারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল পীতপত্রবনের মাটিতে। হাঁপাতে হাঁপাতে স্বর্ণশেখর বলল, “ব্যস, আর কোনো চিন্তা নেই। এবার চলো সবাই, আহতদের নিয়ে যেতে হবে আয়তনের সেবাকক্ষে।”

অভীর মনে একটা সন্দেহ হচ্ছিল, “শেষমুখও কি রবিকাকার এই অস্ত্রের আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বনের কোথাও?”

না বলেই মনে হয়। ধূতটী নিশ্চয়ই আত্মগোপন করেছে এই ফুলঝুরির আক্রমণ শুরু হতেই। খুব সম্ভবত সে পালিয়েছে।

এখনও ভয়ংকর ভাবে জ্বলছে ছায়াভবন। নীলাভ্র বলল, “আশা করি, আগুন ছড়িয়ে পড়বে না বনের গাছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সরাইখানাটার একদম লাগোয়া কোনো গাছ নেই, আর আজ হাওয়াও একদম দিচ্ছে না।”

আহতদের নিয়ে ওরা চলল বনের মধ্য দিয়ে। অর্ধরাক্ষসদের কাতর শব্দে ভরে উঠল রাতের অরণ্য। অনেকেরই চামড়ার নানা জায়গা পুড়ে গেছে। নিধির বাবাসহ যারা বিশেষ আহত হয়নি, তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সুদক্ষিণসারি। বাকিদের নিয়ে নীলাভ্র আর স্বর্ণশেখর এগিয়ে গেছে অনেকটা দূরে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে মৃগেন্দ্র, তরুণ আর উষসী হাঁটছিল অভীর আগে। বাকিরা এগিয়ে গেছে সমরোত্তমদের সঙ্গে। অভী আর নিধি আসছিল সবার শেষে; ওরা আলোচনা করছিল নিয়ামকের নিখাদ শয়তানি নিয়ে। এমন সময় একটা যন্ত্রণাকাতর “উঃ” শব্দ করে নিধি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

চরম আতঙ্কিত চোখে অভী দেখল, একটা তির এসে বিদ্ধ করেছে নিধির বাম কাঁধ।

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে নিধি নিজেই টেনে বার করল তিরটা। জ্বলন্ত ছায়াভবনের আলোয় আলো হয়ে আছে জঙ্গল। সেই আলোয় অভী দেখল, তিরের ফলার মুখটার রং কেমন যেন কালচে বেগুনি রঙের।

শেষমুখের কণ্ঠস্বর ভেসে এল দূর থেকে। “অভী, লীনার পর তোমার জন্য দ্বিতীয় উপহার ঐশিকদের তরফ থেকে।”

অভী অসহায় ভাবে তাকাল অন্ধকার জঙ্গলের দিকে। এখন লোকটাকে খুঁজে বার করা অসম্ভব। আর তারও আগে দরকার নিধির চিকিৎসা।

বাকি তিনজন শিক্ষার্থী ছুটে এসেছে, ঘিরে দাঁড়িয়েছে মাটিতে পড়ে থাকা নিধিকে। নিধি জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, “অভী, আমি... আমি শ্বাস নিতে পারছি না।”

অভীর দু’চোখে নিখাদ আতঙ্ক। কী করবে, সে বুঝতে পারছে না।

উষসী বলল, “এখনই একে নিয়ে যেতে হবে আয়তনে। রক্ষোবৈদ্য হয়তো কিছু করতে পারবেন।”

“চলো তাহলে, দেরি কোরো না।” অভীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

মৃগেন্দ্রর চেহারাটাই ওদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তপোক্ত। সে নিধিকে কাঁধে তুলে নিল, আর তারপর যতটা সম্ভব দ্রুত চলল আয়তনের দিকে।

নিধির স্থির হয়ে যাওয়া চোখদুটো খোলা, সে চোখে দৃষ্টি নেই আর। মৃগেন্দ্রর কাঁধ থেকে ঝুলছে তার অবশ হয়ে যাওয়া হাতদুটো।

তরুণ বলল, “ওর মুখের পাশ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে মনে হচ্ছে।”

অভী দেখল, নিধির হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের পাশে জমেছে একরাশ সাদা ফেনা। এত অসহায় লাগছে, কী করবে সে বুঝে উঠতে পারছে না।

আয়তনে শেষ পর্যন্ত ওরা পৌঁছল ঠিকই, কিন্তু নিধির নাড়ি ধরতেই রক্ষোবৈদ্যের মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো গম্ভীর হয়ে উঠল।

“অভী, অনেক দেরি হয়ে গেছে। বজ্রমাণিকের বিষ প্রচুর পরিমাণে মিশে গেছে ওর রক্তে – ওর লক্ষণ তাই বলছে।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “রক্ষোবৈদ্য, আপনি... আপনি চিকিৎসা জানেন না এরকম রোগ নেই। আপনি কিছু করতে পারবেন না?”

রক্ষোবৈদ্য ম্লান হাসলেন। “পারলে কি আমি করতাম না? কিন্তু আমি সামান্য বৈদ্য, অভী; আমি তো ঈশ্বর নই। বজ্রমাণিকের বিষ যদি বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তার কোনো চিকিৎসা নেই। নিধির প্রাণ এখনও দেহ ছেড়ে যায়নি, কিন্তু ওকে ফেরানোর আর কোনো উপায়ও চিকিৎসাশাস্ত্রে নেই। আমি দুঃখিত, অভী।”

পাশ থেকে তরুণ বলল, “অভী, ওকে এই শেষ মুহূর্তে ওর বাড়িতে নিয়ে চলো। নীপা...”

অভীর মাথা কাজ করছে না। সে যন্ত্রচালিতের মতো মাথা নাড়ল।

নীলাভ্র আর স্বর্ণশেখর সংগ্রহশালায় ছিল, তারা এসবের কিছু জানতেই পারল না। ঊষসী বলল, “রক্ষোবৈদ্য মহোদয়, আমরা নিধিকে নিয়ে সুদক্ষিণসারি যাচ্ছি। আপনি দয়া করে সমরোত্তমদের জানিয়ে দেবেন, কী ঘটেছে।”

রক্ষোবৈদ্য স্নান মুখে মাথা নাড়লেন।

একটা ঘোড়ার গাড়িতে নিধিকে তুলে ওরা নিয়ে চলল সুদক্ষিণসারি। কিন্তু সেখানে গিয়ে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল, তা ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

দরজা খুলেছিলেন নিধির বাবা, আর আঘাতটা এল তাঁর কাছ থেকেই। স্পষ্ট বলে দিলেন তিনি, “ওকে আমরা চিনি না। আর তোমাদের কাউকে আমি এ বাড়ির চৌকাঠ পেরোতে দেব না।”

অভী নির্বাক হয়ে রইল। ঊষসী আর তরুণ তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু অন্যদের প্রাণরক্ষা করে নিধি মৃত্যুবরণ করেছে শুনে তিনি আরও রেগে গেলেন।

নিধির মা কাঁদছেন দরজায় দাঁড়িয়ে; ছুটে দিদির মৃতদেহের কাছে এসে তার বুকে মাথা রেখে কাঁদছে নীপা। কিন্তু দিঙ্‌নাগ অটল; তাঁর একটাই কথা “ওকে তোমরা নিয়ে যাও। আমি ওকে আর ঘরে ঢুকতে দেব না। নীপা, ভেতরে আয়।”

অভী কথা বলার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে। ঊষসী বলল, “কেন এরকম করছেন আপনি? নিধি আপনার বড়ো মেয়ে, আপনি সেকথা অস্বীকার করতে পারেন?”

দিঙ্‌নাগ বললেন, “আজ তোমরা আমার বড়ো মেয়ের মৃতদেহ এনে বলছ সে নাকি অন্যদের জীবন বাঁচিয়ে নিজে মারা গেছে। কাল তোমরাই বলবে, আমার মেয়ে ছিল অর্ধরাক্ষস, আর অর্ধরাক্ষসরা সবাই বিশ্বাসঘাতক হয়। তোমরা মানুষরা যা বলো, আমি আর তার একটা কথাও বিশ্বাস করি না। চলে যাও তোমরা একে নিয়ে; এ আমার মেয়ে নয়, এ আমার কেউ নয়।”

অভী যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। নীপা ফোঁস করে উঠল, “বাবা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?”

“তুই চুপ কর। তুই ছোটো মেয়ে, তুই এসব বড়োদের ব্যাপার কতটুকু বুঝিস? শোনো সমরগরিমা আয়তনের শিক্ষার্থীরা, তোমাদের সঙ্গে মিশেই তো মারা গেছে নিধি, তাই না? এরপর একদিন তোমরাই হয়তো এসে বলবে, আমার এই ছোটো মেয়েটাও তোমাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, আর ওকেও তোমরা মেরে ফেলবে। তোমরা এই মেয়েকে নিয়ে যাও; আমরা ওকে চিনি না, ও আমাদের কেউ নয়।”

নীপাকে হাত ধরে টেনে ঘরে ঢুকিয়ে তিনি দরজা লাগিয়ে দিলেন; তার মা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তিনি তাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিলেন।

নিধির নিধিকে নিয়ে তার হতবাক বন্ধুরা দাঁড়িয়ে রইল তার বন্ধ দরজার সামনে। এই আঘাত ওরা কেউ প্রত্যাশা করেনি।

সন্দীপ বিকৃত মুখে একটা কটুক্তি করল। “বুড়োটা একটা...!”

অভী এতক্ষণের বিমূঢ়ভাবটা একটু কাটিয়ে উঠেছে। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল স্বপ্নে দেখা দৃশ্যটা।

স্বপ্ন-উপল তাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তাতে সে নিধিকে পড়ে থাকতে দেখেছিল মৃত দেবতার নদীর তীরে। কেন দেখা পেয়েছিল সে নীরসেনার? ওখানে কি ওকে বাঁচানোর কোনো উপায় আছে? নয়তো স্বপ্ন-উপল তাকে ওই দৃশ্য দেখাল কেন? কিন্তু রক্ষাবৈদ্য যে বললেন...?

তবু সে বন্ধুদের বলল তার স্বপ্নটার কথা। শুনে মৃগেন্দ্র বলল, “আর তো কিছু করবারও নেই আমাদের। শেষ চেষ্টা হিসাবে একবার ওখানে যেতে ক্ষতি কী?”

নিধিকে নিয়ে আবার পীতপত্রবনের মধ্য দিয়ে ওরা চলল নদীর দিকে। আশ্চর্যের বিষয়, অচেতন নিধির হাতে এখনও ধরা আছে ত্রিশূলটা; যেন সেই ত্রিশূল থেকে তাকে আর আলাদা করাই যাবে না।

পীতপত্রবনের গাছগুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে হালকা হলুদ আভা। চলতে চলতে অভীর মনে হচ্ছিল, সে যেন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলছে – একটা অসম্ভব রাগ, দুঃখ, ক্লান্তি আর ঘৃণার মিশ্রণ যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে তার স্বাভাবিক চিন্তাধারা।

বন পেরিয়ে ওরা এসে পৌঁছল নদীতীরে। কিন্তু কীভাবে আহ্বান করা যাবে নীরসেনাদের?

বজ্রধরকে যেভাবে সে দেখেছিল নদীর জলের দিকে এগিয়ে যেতে, সেটাকেই অনুসরণ করল অভী। তরুণ পেছন থেকে বলল, “অভী, যেও না। ওই জল ছুঁলেই বিপদ।”

সে কথায় কান না দিয়ে অভী নামতে উদ্যত হল জলে। আর তখনই জলটার উপরিতলে শুরু হল আলোড়ন, যেন একটা তীব্র ঘূর্ণির টানে জল ঘুরতে শুরু করেছে প্রবল বেগে। ওরা দেখল, সেই আন্দোলনের মধ্যে থেকে উঠে আসছে বিরাট চেহারার শিংওয়ালা নীরসেনা; তার গায়ের আঁশ চকচক করছে চাঁদের আলোতে।

জল থেকে উঠে এসে সে দাঁড়াল অভীর সামনে। “মৃতকে এখানে নিয়ে এসেছ তুমি। কী চাও?”

অভী সঙ্গে সঙ্গে বলল, “ওকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে পেতে চাই।”

নীরসেনা মাথা নাড়ল। “তা আর সম্ভব নয়। বজ্রমাণিকের বিষ ওর রক্তে মিশে গেছে। বজ্রমাণিকে কী থাকে, জানো না? নরকের আগুন জমাট বেঁধে তৈরি হয় ওই বিষাক্ত মায়ামণি। যাদের দিয়ে নিয়তির ধ্বংসের কাজ করানোর থাকে, তারা কেউ কেউ ওই মণি শরীরে নিয়ে জন্মায়। আর এখন একে বাঁচানো সম্ভব নয়।”

অভী ব্যগ্রভাবে বলল, “আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো বজ্রমাণিক আছে। এটা দিয়ে কিছু করা যাবে না?” মণিটা বার করে দেখাল সে।

“না। ওই মণি তুমি জন্মসূত্রে পাওনি, ওকে তুমি ‘ধারণ’ করোনি নিজের শরীরে। ওই মণি তোমার বহিরঙ্গের জিনিস, তোমার শরীরের অংশ নয়। কিন্তু শেষমুখ বা সুতসোম – এরা নিজের শরীরের মধ্যে এর বিষকে স্বীকার করে নিয়েই ধারণ করেছে। আর হ্যাঁ, তুমি যদি বজ্রমাণিকের আধার হতেও,

তাহলেও খুব একটা লাভ হত না। একমাত্র কোনো বিষ-নিয়ন্তা ছাড়া রক্তের এই দূষণ কাটানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়।।”

“কোথায় পাব তাঁকে?”

“কোথাও পাবে না। বিষনিয়ন্তা বলে কেউ নেই; আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি পৃথিবীর সব বিষের অধীশ্বর হয়ে উঠতে। তাই এখন তোমাদের বন্ধুর উপকারের জন্য তোমরা একটা জিনিসই করতে পারো। তাতে অন্তত ও মরবে না; অন্যরকমভাবে হলেও বেঁচে থাকবে।”

“কী?” সবাই একসঙ্গে জানতে চাইল।

“ওকে নীরসেনা হতে দাও। আমরা যেকোনো ধরনের আঘাত, যেকোনো ধরনের বিষ সহ্য করেও বেঁচে থাকতে পারি। তোমরা যদি চাও, আমি এখনও ওর যেটুকু প্রাণ আছে, সেইটুকুকে দেহের মধ্যে আটকে রেখে ওকে নীরসেনায় রূপান্তরিত করতে পারি। তার ফলে বিষ শরীরে থাকলেও ও মরবে না।”

“মরবে না?”

“না, অভী। ও বেঁচে থাকবে যতদিন না মৃত দেবতা স্বয়ং ওকে মুক্তি দিচ্ছেন, অথবা ও নিজেই মুক্তিদায়ী মৃত্যু চাইছে, অথবা কোনো বিষনিয়ন্তা এসে ওকে বিষমুক্ত করছেন। এই শেষেরটি অবশ্য ঘটবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কাজেই চট করে সিদ্ধান্ত নাও। ওর জীবন কিন্তু শেষ হয়ে আসছে।”

নিধি পড়ে আছে ঠিক সেই স্বপ্নে দেখা দৃশ্যটার মতো নিষ্পন্দ হয়ে। অভী সবার দিকে একবার তাকাল। মুখগুলো দেখে বন্ধুদের মনের ইচ্ছা অনুমান করে নিতে অসুবিধা হল না তার। সে বলল, “তাই করুন। ওকে নীরসেনা বানিয়ে দিন; যেভাবেই হোক, অন্তত বেঁচে থাকুক ও।”

“তাই হোক তবে।” নীরসেনা তার ত্রিশূলের অগ্রভাগ বিদ্ধ করল নিধির কপালে; নিধির নিশ্চল দেহটা একবার কেঁপে উঠল থরথর করে। অভীরা নিঃশব্দ বিস্ময় চোখে নিয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। দেখতে দেখতে মনে হল, নিধির মুখটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

নীরসেনা এখনও গেঁথে রেখেছে তার ত্রিশূল; নিধির দেহের খোলা অংশগুলোতে প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে গজিয়ে উঠছে চকচকে, বড়ো বড়ো আঁশ, তার চুল ভেদ করে মাথার দু’দিকে জেগে উঠছে দুটো শিং। নীরসেনা খুলে নিল ত্রিশূল; নিধি স্বপ্নগ্রস্তের মতো উঠে দাঁড়াল।

তার পরনের পোশাক আপনা থেকে খুলে পড়ে গেল; তার সর্বাস্ত্র ততক্ষণে ঢেকে ফেলেছে আঁশগুলো। চোখ মেলে তাকাল সে বন্ধুদের দিকে – সে চোখে আর নিধিসুলভ আবেগ নেই, উষ্ণতা নেই – কেমন যেন মরা মাছের মতো ঠান্ডা, স্থির দৃষ্টি তার দু’চোখে। সে দৃশ্য দেখে অভীর বুকের ভেতরটা কষ্টে মোচড় দিয়ে উঠল।

তার হাতের ত্রিশূলটাকে সে ধরে রেখেছে খুব শক্ত করে। অভী রুদ্ধকণ্ঠে বলল, “নিধি!”

নিধি উত্তর না দিয়ে অনুসরণ করল নীরসেনাকে। ওরা নেমে যাচ্ছে মৃত দেবতার নদীর হলদেটে জলে। আঁশওয়ালা, শিংওয়ালা দুটো প্রাণী – যাদের একজনকে অভী একসময় খুব ভালো করে চিনত।

নিধি ডুবে যাওয়ার আগে একবার ফিরে তাকাল অভীর দিকে; একদম অচেনা একটা গলায় বলল, “অভী, মনে রেখো, ঘৃণার চেয়ে বড়ো বিষ পৃথিবীতে আর কিছু নেই।”

নিমজ্জিত হয়ে গেল সে পুরোপুরি ওই জলে। চাঁদের আলোয় নদী বয়ে যাচ্ছে তার নিশ্চিন্ত গতিতে। সবহারানো একটা পাগলের মতো অভী কিছুক্ষণ বসে রইল স্তব্ধ হয়ে নদীতীরে, ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সন্দীপ এসে পাশে বসল তার, হাত রাখল কাঁধে – অভী বুঝতেও পারল না। জীবনে প্রথমবার এতখানি একা লাগছে তার। লীনা চলে গেছে, নিধিও চলে গেল!

ঐশিকদের প্রতিহিংসা কী ভয়ানক, সে বুঝতে পারছে এখন।

কিন্তু আজকের কাজটা তো করল শেষমুখ, তাও নিয়ামকের সাহায্য এবং সম্মতি দুই-ই নিয়ে।

সুতীর ঘৃণা উঠে আসছে ভেতর থেকে – প্লাবিত করে দিচ্ছে তার সর্বসত্তাকে। পাশে বন্ধুরা কীসব যেন বলছে, অভী শুনতে পাচ্ছে না। কী বলে গেল নিধি? “ঘৃণার চেয়ে বড়ো বিষ পৃথিবীতে আর কিছু নেই।” ঠিক! সেই বিষ যেন ছেয়ে ফেলছে তার অন্তর, যেন ভেতরে একটা তেতো অনুভূতির ফোয়ারা খুলে দিয়েছে কে। জ্বালা করছে ভেতরটা, কিন্তু ভালোও লাগতে শুরু করেছে এই জ্বালাটাকে। ঘৃণা বিষ তো বটেই, কিন্তু বড়ো সুন্দর বিষ। যত এর স্বাদ নেওয়া যায়, ততই আরও বেশি করে নিতে ইচ্ছা করে। কার প্রতি এত ঘৃণা জাগছে তার? কে আছে যার উপর এই ঘৃণা উগরে দিতে পারে সে? কে আবার? নিয়ামক বিনীতেশ!

ওই লোকটা আজকের এই সভা ডাকার ভণ্ডামি না করলে নিধি এখনও বেঁচে থাকত।

সন্দীপ পাশ থেকে আত্ননাদ করে উঠল, “আঃ, অভী! কী হচ্ছে? থামো!”

অভীর নিজের অজান্তেই তার শুধু হাত নয়, সারা শরীর ঢেকে গেছে নীল রঙের বরফে। সন্দীপের হাত ছিল তার কাঁধে – প্রচণ্ড ঠান্ডায় সন্দীপের মনে হচ্ছিল যেন হাতটা যন্ত্রণায় অবশ হয়ে যাচ্ছে। চমকে উঠে হাত সরিয়ে নিল সে।

অভী উঠে দাঁড়াল, মুখ ফেরাল পীতপত্রবনের দিকে।

তরুণ জিজ্ঞাসা করল, “অভী, কোথায় যাচ্ছ?”

অভীর গলার স্বর কেমন অস্বাভাবিক শোনালা বাকিদের কাছে, যেন সে আর প্রকৃতিস্থ নেই। “নিয়ামক বিনীতেশ যা করেছেন, তার মূল্য দিতে হবে না ওঁকে?”

সন্দীপ বলল, “অভী, শান্ত হও। চন্দ্রহাস দিয়ে নিশ্চয় তুমি সমরগরিমার নিয়ামককে হত্যা করার কথা ভাবছ না?”

ভূতগ্রস্তের মতো অভী উত্তর দিল, “চন্দ্রহাস আমার লাগবে না।”

দ্রুত পদক্ষেপে সে হেঁটে চলল বনের পথ দিয়ে। সন্দীপ, উষসী, তরুণ, মৃগেন্দ্ররা দেখতে পেল, ছোটো-ছোটো বরফের কুচি ঝরে পড়ছে অভীর শরীর থেকে; তার সারা গা ঢেকে যাচ্ছে বরফের আবরণে; তার পা যেখানে পড়ছে, ঘাস মরে যাচ্ছে।

অভী আর যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে। একটা অসহনীয় রাগ আর ঘৃণা তাকে তড়িয়ে নিয়ে চলল বিনীতেশের কার্যালয়ের দিকে।

উষসী বলে উঠল, “হে ভগবান! সর্বনাশ হতে চলেছে। ওকে কেউ আটকাও তোমরা!”

মৃগেন্দ্র বলল, “আজ অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে নিয়ামক যা করেছেন, তাতে আমি অন্তত অভীকে এখন সমর্থন করতে পারলেই খুশি হতাম। কিন্তু ওই ঘৃণ্য লোকটাকে মেরে অভীর মতো ভালো ছেলে হাত নোংরা করুক, এ আমি চাই না। কিন্তু ওকে আটকাব কী করে? আমাদের কথা তো ওর কান পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছেই না।”

তরুণ বলল, “ভুলেও অভীর সামনে কেউ যেও না। ওর মাথার ঠিক নেই এখন। যে-ই ওকে থামাতে যাবে, তাকে ও জমিয়ে মেরে ফেলবে। ওর রাগ বলো বা ঘৃণা, সে জিনিস কেমন হয়, আমার অল্প কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমি অন্তত যাচ্ছি না এখন ওর মুখামুখি হতে।”

সন্দীপ তখনও নিজের হাতে হাত ঘষে হাতটাকে গরম করার চেষ্টা করছে। সে বলল, “তাহলে জলদি চলো। সমরোত্তমদের খবর দিতে হবে এখনি, নয়তো বিরাট বড়ো অঘটন ঘটে যাবে।”

ওরা ছুটল আয়তনের দিকে। অভী ততক্ষণে দুর্বীর গতিতে বাঁক নিয়েছে নিয়ামকের কার্যালয় লক্ষ্য করে।

অসিত ছিল না আজ সামনের কক্ষে; থাকলে তার কপালে দুর্ভোগ ছিল। অভী সোজা দরজা খুলে ঢুকে গেল নিয়ামকের কক্ষে। টেবিলের ওপারে বসেছিলেন নিয়ামক, তাঁর দু’পাশে ছিল সৌজন্য আর চক্রবাক। সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা ক্রুদ্ধ অভীকে ঢুকতে দেখে নিয়ামক চমকে উঠলেন; তাঁর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল।

একটুও দেরি না করে অভী যতখানি শক্তি আহ্বান করতে পারল, ততখানি প্রয়োগ করে তার হাত থেকে হিমস্রোত নিক্ষেপ করল ওই তিনজনের উদ্দেশে। সে চাইছিল, বিরাট একটা বরফের পাহাড় ভেঙে পড়ুক এই ঘৃণ্য তিনটে লোকের মাথায় – তার তলায় চাপা পড়ে মরে যাক ওরা – মরে যাক, মরে যাক, মরে যাক!

অভী পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেল – আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। তার চোখমুখ নীলচে হয়ে গেছে ঘৃণাহিমে।

সৌজন্য একদম শেষ মুহূর্তে টেবিলটা উলটে দিয়ে বাকি দু’জনকে টেনে তার তলায় ঢুকিয়ে নিয়েছিল বলে ওই বরফের প্রবল ধাক্কা তাদের একচুলের জন্য স্পর্শ করল না। ক্রুদ্ধ বরফের আঘাতটা গিয়ে লাগল টেবিলের উপর; অত বড়ো ভারী শালকাঠের টেবিলটাও ভয়ংকর ভাবে পিছিয়ে যেতে থাকল দেয়ালের দিকে। টেবিলের আড়ালে থাকায় বরফ তাদের অঙ্গস্পর্শ করতে পারল না বটে, কিন্তু মাথা মুখ ঠোকাঠুকি হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল তিনজনেরই।

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ওদের। দরজার সামনে দাঁড়ানো অভীর হাত থেকে বেরিয়ে আসছে তীব্র বরফের স্রোত। টেবিলটার জন্য এখনও গায়ে

লাগেনি বটে বরফ, কিন্তু এবার ওদের সামনে বরফজমা টেবিল, পেছনে দেয়াল, আর মাথার উপর দিয়ে চলছে বরফ বর্ষণ। ফাঁদে পড়ে গেছেন নিয়ামক, সহনিয়ামকেরা। মাথার উপরে জমছে বরফের ছাদ; এখানে আর বেশিক্ষণ থাকলে বাক্সবন্দি হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়েই মরতে হবে।

“অভী, থাম!”

শিক্ষার্থীদের কাছে সংবাদ পেয়ে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে আসছে নীলাভ। অভীর কানে গেল না বাবার কথা।

তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে তার হাতে সাময়িকভাবে হিমকুশলতা বন্ধ করার মায়া প্রয়োগ করল হিমকুশল নীলাভ। বরফ নির্গমন থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণার অনুভূতিটা চলে গিয়ে অমানুষিক ক্লান্তি আর অবসন্নতায় অভী মরার মতো অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল বাবার বুকের উপর।

অন্যান্য শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়েছে নিয়ামকের কক্ষের প্রবেশদ্বারের সামনে, যদিও ভেতরে ঢোকেনি কেউই। ততক্ষণে টেবিলের পেছন থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারছেন তিন মূর্তি। অভীকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে একটু নিশ্চিত হয়ে বরফের সুবিশাল স্তূপ ঠেলে বেরনোর চেষ্টা করতে করতে নিয়ামক বললেন, “কী ভয়ংকর কাণ্ড! এসব কী হল, সমরোত্তম নীলাভ?”

নীলাভ মুখ বিকৃত করে বলল, “আপনাদের যা প্রাপ্য ছিল, এ তার চেয়ে কিছু কমই হল, নিয়ামক মহোদয়।”

কথাটা বলে ওঁদের সাহায্য করার জন্য আর ওখানে দাঁড়াল না সে। বাকি শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অজ্ঞান, অসাড় অভীকে সে নিয়ে এল রক্ষোবৈদ্যের সেবাকক্ষে; সারা রাত বসে রইল ছেলের জ্ঞানহীন দেহের পাশে।

অভীর চিকিৎসা চলল পুরো রাত্রি জুড়ে। এত বেশি ঘৃণা, এত বেশি ধ্বংসাত্মক শক্তিকে সে চালনা করেছে নিজের শরীর দিয়ে যে এখন আর তার শরীর স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতেই পারছে না; বুকের ওঠানামা অনিয়মিত হয়ে গেছে তার। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “নীলাভ, তোমার পৌঁছোতে যদি আর একটু দেরি হত, তাহলে অভীকে আর বাঁচানো যেত না।”

“ও বাঁচবে তো, রক্ষোবৈদ্য?” ব্যাকুলভাবে জানতে চাইল নীলাভ।

“বাঁচবে। হিমকুশলদের মধ্যে যেকোনো শারীরিক আঘাত থেকে দ্রুত সেরে ওঠার একটা প্রবণতা থাকে। অভীও সেরে যাবে, ভয় নেই।”

সারা রাত অভী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রইল সেবাকক্ষের শয়্যায়। নীলাভ পাশে বসে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার মাথায়, বুকে।

সকালে যখন সে চোখ খুলল, প্রথমটা তার দৃষ্টি বড্ড ঝাপসা লাগছিল। বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে শুয়ে থাকার পর স্বাভাবিক দেখার ক্ষমতা ফিরে এল বটে, কিন্তু তার বুকের ভেতরটা কেমন খালি খালি লাগছে। একটা অসহায় কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অবসন্নভাবে বিছানায় পড়ে রইল অভী। আর নড়াচড়া করতেও ভালো লাগছে না, দুর্বল লাগছে খুব। একফোঁটা জল গড়িয়ে নেমে এল তার চোখের কোণ থেকে।

ততক্ষণে সকালের রোদ উঠেছে। গলে গেছে নিয়ামকের কার্যালয়ে জমে থাকা বিপুল বরফ; প্রাঙ্গণটা থইথই করছে জলে।



॥ সপ্তদশ অধ্যায় ॥ অকালবর্ষণ

অভী ভাবছিল, প্রফুল্লের পক্ষে কাল রাতে এখানে থাকা সম্ভব ছিল না। রাজকন্যাকে ছেড়ে এখানে আসার পাত্র সে নয়। কিন্তু তাহলে শেষমুখ এখানে এল কী করে?

যে এসেছিল, সেই যে শেষমুখ, এতে কোনো সন্দেহ নেই; নতুবা বজ্রমাণিকের বিষ আর কে জোগান দেবে?

সে চোখ খুলতে নীলাভ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাকাল। তার মুখচোখের শুকনো ভাব দেখে অভী বুঝতে পারল, বাবা কাল রাতে একটুও ঘুমোয়নি।

“অভী, এখন কেমন লাগছে শরীরটা?”

“ভালো লাগছে, বাবা। যাও, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও এবার।”

“আর ‘ঘুমিয়ে নাও’! একটু আগে স্বর্ণশেখর এসেছিল তোর শরীরের খবরাখবর নিতে। সে জানিয়ে গেল আরেকটি অদ্ভুত সংবাদ। কাল নিয়ামকের কার্যালয়ে ওই কাণ্ড হওয়ার পর থেকে সৌজন্যকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।”

অভীর একটু সময় লাগল খবরটা হজম করতে। “ও আবার কোথায় গেল? ওকে কেউ গুম করল নাকি?”

নীলাভ বলল, “আমার তা মনে হয় না রে। ও ব্যাটা যমের অরুচি। ওকে গুম করে কার কী লাভ, বল? আমার তো মনে হচ্ছে, ও-ই কোনো ফন্দি করে গা-ঢাকা দিয়েছে।”

অভী চুপ করে রইল। তার চোখের সামনে তখন ভাসছে মৃত দেবতার নদীর জলের মধ্যে একটু একটু করে নিধির ডুবে যাওয়ার দৃশ্য।

তার পরের ঘটনাগুলোও তার মনে পড়ছে আবছা ভাবে। তখনকার ওই প্রচণ্ড ঘৃণার অনুভূতিটা ভাবতেই শিউরে উঠল সে।

সে বলল, “বাবা, একটা কথা বলব?”

নীলাভ্র সচকিত হয়ে বলল, “হ্যাঁ, বল না।”

অভী বলল, “আমি একটা ব্যাপার খেয়াল করছি – যত দিন যাচ্ছে, এই ঘৃণা, এই হিমকুশলতার ক্ষমতাটা ততই শক্তিশালী হয়ে উঠছে আমার মধ্যে। এটা যখন জাগছে, তখন আমি যেন আর আমাতে থাকছি না, একটা দানব হয়ে যাচ্ছি – তখন মনে হচ্ছে, সব ধ্বংস করে ফেলি। আমি কী করব, কিছু বুঝতে পারছি না, বাবা। আমি তো এইরকম ঘৃণাসর্বস্ব একটা মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। আমি ঐশিকদের মতো হতে চাই না। কিন্তু একে আটকাব কী করে, আমি তার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।”

নীলাভ্র বলল, “দেখ, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে তোর মা তোকে যে কথা বলত, তার চেয়ে বড়ো সমাধান আর কিছু নেই। নিজের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতেই হবে তোকে। এটা তোর হয়ে কেউ করে দিতে পারবে না; তোকে নিজেকেই চেষ্টা করে অর্জন করতে হবে। ভেবে দেখ অভী, তোর দু’হাতে নিয়তিলাঞ্ছন আছে। মানে, নিয়তি বিরাট কোনো কাজ করানোর জন্য তোকে বেছে নিয়েছেন। সেই জন্য তোকে বিরাট কিছু শক্তিও দিয়েছেন। আমার বা ঐশিকশ্রেষ্ঠের চেয়েও তুই অনেক শক্তিশালী হিমকুশল। অতখানি শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু মুখের কথা নয়।”

অভী চুপ করে রইল। নীলাভ্র আবার বলল, “একটা কথা ভেবে দেখিস। প্রবল ঘৃণা আর প্রবল ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য কিন্তু খুব বেশি নেই। দুটোই মানুষকে প্রচুর শক্তি দেয়। এইটুকু শুধু ফারাক – যে ঘৃণা করে, সে শুধু ধ্বংস করে, আর যে ভালোবাসে, সে রক্ষা করে। এবার তুই কোন্ কাজে নিজের শক্তিকে ব্যবহার করবি, সেটা তোকেই ঠিক করতে হবে। তার জন্য নিজের অন্ধ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করাটা সবার আগে দরকার।”

অভী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর শয্যা ছেড়ে উঠে বসল। মাথাটা একটু ঘুরে গেল তার, কিন্তু সে কথা সে বাবাকে বুঝতে দিল না। তার মাথায় এখন এখন একটাই কথা ঘুরছে, রক্ষোপুরীতে ফিরে যেতে হবে তাকে। ওখানে মা আছে, মেঘবর্ণ আছে – দু’জনেই অসুস্থ। শয়তান মরুময় শেষমুখের সঙ্গে মিলে কী ফন্দি আঁটছে, কে জানে! ঐশিকদের প্রতিহিংসার আঁচ, সে যতটা বুঝেছে, এর পরে সমরোত্তমদের উপর পড়তে চলেছে।

তার যে শরীরটা এখনও বেশ দুর্বল লাগছে, বাবাকে তা বুঝতে দেওয়া যাবে না। তাহলে বাবা তাকে কিছুতেই ফিরে যেতে দেবে না ওখানে। এখানে বাবা আর একা নেই; রবিকাকা চলে এসেছে। এবার নিরাপদে মা আর মেঘবর্ণকে এখানে ফিরিয়ে আনতে পারলে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে ফিরে এসে সে যাকে দেখল, তার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল।

মিত্রমাসি!

ঘরের মধ্যে এসে তিনি বসলেন অভীর পাশে, তার হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন। “কী হয়ে গেল, অভী! এসব কী হয়ে গেল!”

অভী বুঝতে পারছে, তিনি লীনা আর নিধি দু’জনের খবরই শুনেছেন। কী

বলে যে সাস্থনা দেবে এই প্রৌড়াকে, সে বুঝতে পারল না। ওদের দু'জনকে তিনি কতটা ভালোবাসতেন, সে তো স্বচক্ষে দেখেছে।

কিছুক্ষণ পরে নীলাভ এসে তাঁর হাত ধরে তুলল। “আসুন আপনি, সুমিত্রাদেবী। নিজেকে শান্ত করুন। যারা গেছে, তারা আর ফিরবে না। কিন্তু যারা এখনও আছে, তাদের কথা তো আমাদের ভাবতেই হবে। আপনি আপাতত ফিরে যান, অভীর এখানে কিছু কাজ আছে। সেগুলো সারা হলে অভী যাবে আপনার কাছে।”

চোখ মুছতে মুছতে মিত্রমাসি চলে গেলেন। তাঁর সেই যাওয়া দেখতে দেখতে অভীর মনে হচ্ছিল, এই সব ঘটনাপ্রবাহের সামনে মিত্রমাসির মতো মহিলারা, যাঁরা যুদ্ধের কিছুই বোঝেন না অথচ অষ্টপ্রহর যুদ্ধ নিয়েই ঘর করতে হয় – তাঁরা কী অসহায়! ঠিক নিধির মা, লীনার মায়ের মতো।

তাঁকে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে এল নীলাভ; অভীর দিকে তাকিয়ে স্নান হাসল। রক্ষোবৈদ্য এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কী অভী? শরীর ঝরঝরে লাগছে তো?”

রক্ষোবৈদ্যের হাতে গরম দুধের বাটি। নিজেই নিয়ে এসেছেন তিনি রোগীর জন্য।

টক টক করে দুধটা খেয়ে নিয়ে অভী মাথা নাড়ল। “হ্যাঁ, ভালো লাগছে। আচ্ছা, নিয়ামক ঠিক আছেন তো?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “হ্যাঁ, আমি ওঁর শরীর কেমন আছে, তা দেখতেও গিয়েছিলাম। মেজাজ খুব গম্ভীর দেখলাম; আমাকে কাছে আসতে দিলেন না, শুধু বললেন, ‘আমি ঠিক আছি, আপনি আসুন।’ ব্যাপার কী, বুঝলাম না, কিন্তু আমি যদি একটুও চিকিৎসাবিদ্যা জেনে থাকি, তার জোরেই বলছি, ওঁর চোখ বলে দিচ্ছিল, উনি ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই।”

নীলাভ কী একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দৌড়ে ভেতরে এসে ঢুকল স্বর্ণশেখর। “নীলাভ, সর্বনাশ হয়ে গেছে!”

সবাই চমকে উঠল। নীলাভ বলল, “কী হয়েছে? কী হয়েছে?”

স্বর্ণশেখর বলল, “যে খবরটা এনেছে, তার মুখ থেকেই শোনো।”

পর্বত এসে ঢুকল সেবাকক্ষে। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, খুব খারাপ খবর এনেছে সে। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “পর্বত, কী হয়েছে?”

পর্বত উত্তেজিতভাবে বলল, “মহারাজ পুনর্বসু একটু আগে সমরগরিমার চিঠি পেয়েছেন। তার ভাষা অতি জঘন্য রকমের অপমানজনক, এবং তার বক্তব্য হল, সমরগরিমার নিয়ামক আনুষ্ঠানিকভাবে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন। চিঠির নিচে সইটাও দেখে এলাম। জাল নয়, নিয়ামক মহোদয়ের আসল স্বাক্ষরই জ্বলজ্বল করছে সেখানে। মরুময়ের অনুরোধে রাজা ভরা সভার মাঝখানে চিঠিটা সবাইকে পড়ে শোনালেন।”

সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য হাঁ হয়ে গেল। নীলাভ বলল, “সে কী? পর্বত, তুমি নিশ্চিত, চিঠিটা জাল নয়?”

“আমি একশো ভাগ নিশ্চিত। সমরগরিমার সরকারি কাগজে লেখা চিঠি; নিয়ামকের অটুট সিলমোহরসহ ও জিনিস পৌঁছেছে রাজার হাতে। জাল হওয়ার প্রশ্নই নেই।”

রক্ষাবৈদ্য বললেন, “রাজা চিঠিটা জোরে জোরে পড়লেন? তারপর বাকি রাক্ষসদের প্রতিক্রিয়া কী?”

পর্বত আক্ষেপের সুরে মাথা নেড়ে বললেন, “আমাদের জাতকে তো চেনেন আপনি ভালো করেই। এমনিতে বিমোহক আর পত্রতিলকদের মধ্যে কলহের অন্ত নেই, কিন্তু সমরগরিমা হল সবার পছন্দের শত্রু। সেই সমরগরিমা থেকে এমন চিঠি এসে হাজির হওয়ায় এখন দুই গোষ্ঠীই ভাই ভাই হয়ে দাবি করছে, অবিলম্বে সেনা অভিযান করতে হবে। অবশ্য তাতে আমি অন্যায্যও দেখছি না। যে কদর্য ভাষায় চিঠিটা লেখা হয়েছে, তারপর যদি রাজা সমরগরিমার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা না নেন, তাহলে মাল্যপর্বতের সব রাক্ষস মিলে তাঁকে টেনে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে।”

নীলাদ্র বলল, “আমি বলছি, নিয়ামক কোনো কারণে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছেন। কাল ছায়াভবনে ওঁর ওই বক্তৃতা, তারপর অর্ধরাক্ষসদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা, আজ রক্ষোপুরীতে এই চিঠি পাঠানো – এগুলো যেন ঠিক ওঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। উনি বদমেজাজি, উনি অর্ধরাক্ষসদের সহ্য করতে পারেন না, উনি নিজেকে সমরগরিমার রাজা ভাবেন, এসবই সত্যি। কিন্তু যাই হোক, মানুষটা আসলে ভীতু প্রকৃতির। এইরকম পাগলের মতো একটার পর একটা কাণ্ড ঘটচ্ছেন কেন উনি, তার ব্যাখ্যা কিন্তু আমি পাচ্ছি না।”

স্বর্ণশেখর বলল, “যাই হোক, এবারের কাণ্ডটা একটু বেশিই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মাল্যপর্বতের রাক্ষসদের আমিও চিনি, তোমরাও চেনো। ওরা এই অপমান মুখ বুজে মেনে নেবে না। এরই মধ্যে সম্ভবত প্রজ্ঞা আর আলোকপর্ণ সেনাবাহিনীকে তৈরি করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।”

অভী বলল, “তবু একবার নিয়ামকের কাছে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা জানলে হয়না?”

রক্ষাবৈদ্য মাথা নাড়লেন। “আমারও তাই মনে হয়। একটা প্রস্তাব আমি দিতে পারি। বলব?”

সবাই ‘হ্যাঁ’ বলতে রক্ষাবৈদ্য বললেন, “এসব কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে, আমি নিজেই ভাবতে পারছি না। কিন্তু নিয়ামকের এই আচরণ একদম উন্মাদের লক্ষণ। তাই সমরগরিমার মঙ্গলের জন্যই আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, সবাই মিলে চলো তাঁর কার্যালয়ে। সেখানে গিয়ে তোমরা ওঁকে জোর করে চেপে ধরবে, আর আমি ওঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। আমার দৃঢ় ধারণা, উনি মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এবং ওঁর আশু চিকিৎসা দরকার। অবশ্য তার আগে তোমরা তোমাদের যা যা জানবার, জেনে নিও।”

স্বর্ণশেখর আর নীলাদ্র দু’জনেই বলল, “অতি সাধু প্রস্তাব।”

অভীও মাথা নাড়ল। প্রস্তাবটা বেশ ভালো লেগেছে তার। পর্বত বলল, “তাহলে চলুন, আর দেরি না করে যাওয়া যাক।”

তাড়াতাড়ি দলটা চলল মাঠের উপর দিয়ে নিয়ামকের কার্যালয়ের দিকে। দূর থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থী তাদের ঐভাবে যেতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কার্যালয়ের সামনেটা জলে জলময়। সেই জলে পা দিয়ে অভী বুঝতে পারছিল, এখনও বেশ ঠান্ডা রয়েছে। মনে মনে একটু সঙ্কুচিত বোধ করছিল সে।

অসিত আজও নেই। সম্ভবত কাল থেকেই সে অনুপস্থিত। কোথায় গেল লোকটা, কে জানে?

ঘরের মধ্যে সবার আগে ঢুকেছিল পর্বত। ঢুকেই সে চোঁচিয়ে উঠল, “আরে, এ কী!”

বাকিদের সঙ্গে হুড়মুড় করে ভেতরে এসে অভীও চমকে গেল। নিয়ামক বিনীতেশ স্থির হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে উপুড় হয়ে। মরে গেল নাকি লোকটা?

রক্ষোবৈদ্য তাড়াতাড়ি গিয়ে নাড়ি ধরলেন তাঁর। “না, বেঁচে আছেন নিয়ামক, তবে নাড়ি খুব দুর্বল।”

সবাই মিলে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল সেবাকক্ষে। সেখানে অভীর শয্যাতেই তাঁকে শোয়ানো হল। নিয়ামক মড়ার মতো পড়ে রইলেন।

নীলাভ বলল, “কিন্তু ইনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন কেন? সন্ধ্যাস রোগের আক্রমণ নাকি, রক্ষোবৈদ্য?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “একটু সময় দাও আমাকে। দেখছি।”

পর্বত বলল, “এ তো বেশ ঝামেলায় পড়া গেল। যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে এখন আসল লোকই অজ্ঞান হয়ে রইলেন।”

অভী বলল, “পর্বতদা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, যুদ্ধ লাগানোটা পুরোপুরি ঐঁর কাণ্ড নয়। নিয়ামক অহংকারী ছিলেন, একসময় ‘যুদ্ধ যুদ্ধ’ করে গলা ফাটিয়েছেন, সবই ঠিক। কিন্তু কিছু সেনা পাঠিয়ে সুদক্ষিণসারিতে অর্ধরাক্ষস পেটানো আর মাল্যপর্বতের রাক্ষসদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধে নামা যে এক জিনিস নয়, সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি ওঁর ছিল। তাছাড়া শর্বর-কাণ্ড হওয়ার পর থেকে উনি কিন্তু মাল্যপর্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার কথা বড়ো একটা বলতেন না।”

নীলাভ বলল, “আমিও একই কথা ভাবছি। কিন্তু এই যে অসম্ভব কাণ্ডটা উনি ঘটালেন, তার পেছনে আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য কোনো ব্যাখ্যা আছে কি?”

রক্ষোবৈদ্য বলে উঠলেন, “আছে।”

সবাই সচকিত হয়ে তাকাল তাঁর দিকে। তিনি বললেন, “এদিকে এসো সবাই, একটা জিনিস দেখাব তোমাদের।”

নিয়ামকের অচেতন শরীরটাকে উপুড় করে শোয়ানো হয়েছে। তাঁর ঘাড়ের কাছে কয়েকটা খুব ছোটো ছোটো বিন্দুর মতো কালচে দাগের দিকে তিনি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

“এই দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ? কীসের দাগ বলো তো এগুলো? সূচের। আর এই যে দাগগুলোর পাশে চামড়াটা বেগুনি রঙের পোড়ার মতো লাগছে, এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, সূচে করে বজ্রমাণিকের বিষ দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে ঢোকানো হয়েছিল তাঁর শরীরে।”

ওরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। রক্ষোবৈদ্য বললেন, “বজ্রমাণিকের বিষ যে কে জোগান দিচ্ছিল, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। শেষমুখকে

তো কাল দেখাই গেছে নিয়ামকের সঙ্গে, যদিও অর্ধরাক্ষসদের পুড়িয়ে মেরে খুনিটার কী লাভ হত, আমি বুঝতে পারছি না। এই বিষপ্রয়োগ করে সম্মোহন মায়ার সাহায্যে শেষমুখই সম্ভবত নিয়ামককে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে চিঠিটা। নীতিবোধ কতটা নীচে নামলে এইরকম নিষিদ্ধ মায়াবিষ প্রয়োগ করে একটা মানুষকে দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে নিতে পারে একটা লোক, আমি তাই শুধু ভাবছি।”

পর্বত বলল, “নিয়ামক প্রাণে বেঁচে যাবেন তো?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “আশা করতে দোষ নেই, কিন্তু এই বিষ খুব বেশি পরিমাণে রক্তে ঢুকলে রক্ত দূষিত হয়ে যায়। নিয়ামকের ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া কতখানি ছড়িয়েছে, এখনই বুঝতে পারছি না। খুব বেশি বিষ ঢুকে থাকলে তার আর কোনো চিকিৎসা হবে না; তখন উনি হয় আজীবন শেষমুখের আচ্ছাদিত হয়ে রয়ে যাবেন, অথবা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যাবেন। ওঁর স্বরযন্ত্রের উপরেও এই বিষের খুব খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। আবার হতে পারে, হয়তো উনি পুরোপুরি সেরে গেলেন, কিন্তু বোবা হয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না।”

পর্বতের স্ত্রী উত্তরার কথা মনে পড়ল অভীর। পর্বত কি জানে, তার স্ত্রী বোবা হয়ে গেছে? নিশ্চয় জানে; ও এখানে আসার আগে তার সঙ্গে দেখা করে এসেছে নিশ্চয়।

স্বর্ণশেখর বলল, “রক্ষোবৈদ্য, আমি মায়াবিদ্যা যতটুকু জানি, তাতে আমার জ্ঞানমতে এই বজ্রমাণিকের মায়া প্রয়োগ কিন্তু রাক্ষসমায়া। শরীরে রাক্ষসরক্ত নেই, এমন কেউ এ মায়া প্রয়োগ করতে পারে না, এই বিষকে নিয়ন্ত্রণ করতেও পারে না। অর্ধরাক্ষসরা অবশ্য চেষ্টা করলে পারতেও পারে, কিন্তু মানুষেরা পারবে না। আমি ধরে নিলাম, এই বিষের জোগান দিয়েছে শেষমুখ। কিন্তু শেষমুখ নিশ্চয় সবসময় ওঁর কাছাকাছি থাকত না; তাকে বহুবার মাল্যপর্বতে দেখা গেছে। আপনি বলছেন, এই বিষ দীর্ঘদিন নিয়ামককে দেওয়া হচ্ছে; এদিকে নিয়ামক তো অন্য কোনো রাক্ষস বা অর্ধরাক্ষসের সংস্পর্শেই আসেননি। তাহলে এই বিষ ওঁর শরীরে ঢুকল কী করে?”

নীলাভ বলে উঠল, “সৌজন্য।”

অভী তাকাল তার দিকে। নীলাভ বলল, “সৌজন্য নিজে একজন রাক্ষস। সঞ্জীব আমাকে বলেছে, সৌজন্য রাক্ষসমায়া জানে। আর মাল্যপর্বতের রাজপুরীর সঙ্গেও ওঁর একটা গোপন যোগাযোগ আছে। হতে পারে, ওই চিঠি সৌজন্যই লিখিয়েছে। নয়তো লোকটা আজ হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাবে কেন?”

অভী বলল, “কিন্তু সমরগরিমার সঙ্গে মাল্যপর্বতের যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে সৌজন্যের কী লাভ?”

“এটা দেখ,” বলে নীলাভ পোশাকের মধ্য থেকে সৌজন্য আর উর্মির ছবিটা বার করে তার হাতে দিল।

দেখে অভী অবাক হয়ে গেল। সে বলল, “আরে, উর্মির সঙ্গে কী করছে এ?”

“সেটাই তো বলছি। সৌজন্যকে বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যায়, সেইটুকুই যে সব নয়, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। আর ওঁর মাথার মধ্যে যে কখন

কী পরিকল্পনা চলছে, বোঝা অসম্ভব।”

অভী বলল, “বাবা, আমি এটা রাখছি। উর্মিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করব।”

নীলাভ্র মাথা নাড়ল। “রাখ। কিন্তু রাজকন্যাকে দেখাবি কী করে?”

অভী বলল, “আমি ভাবছি, আজই যাব একবার ওখানে।”

নীলাভ্র বলল, “আমার চিন্তা হচ্ছে শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণের জন্য। যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে। এখন তো রাজা ওদের সরাসরি ‘শত্রু’ ঘোষণা করবেন। ওদের যত শীঘ্র সম্ভব সমরগরিমায় ফিরিয়ে আনতে হবে।”

স্বর্ণশেখর বলল, “কিন্তু ওরা কি ফিরে আসবার মতো অবস্থায় আছে? আর যদি থাকেও, রাজা কি ওদের ফিরে আসতে দেবেন? বজ্রধরহীন সমরগরিমার দু’জন সমরোত্তমকে আটকে রাখা মানে যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একটা বিরাট সুবিধা পাওয়া, এটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধি লাগেনা।”

নীলাভ্র বলল, “অভী, তোকেও হাতে পেলে ওরা কি ছেড়ে দেবে? ভাবতেই আমার ভয় করছে। কিন্তু শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণকে আমরা তো শত্রুপুরীতে ফেলে রাখতে পারিনা।”

অভী বলল, “রাজকন্যা উর্মির উপর ওইটুকু ভরসা আমার আছে যে তিনি তাঁর সেবাক্ষেত্র মধ্যে রাজনীতি ঢুকতে দেবেন না, এবং স্বয়ং রাজা বা মরুময়েরও ক্ষমতা নেই তাঁর চিকিৎসাধীন রোগীদের গায়ে হাত দেওয়ার। আমি যাচ্ছি; উর্মি আমার বন্ধু এবং অত্যন্ত মহৎ হৃদয়ের মেয়ে। তাঁকে অনুরোধ করব মাকে আর মেঘবর্ণকে ছেড়ে দিতে।”

রক্ষোবৈদ্য একটু গর্বিত হাসি হাসলেন। পর্বত বলল, “ঠিক বলেছ, অভী। রাজকন্যা উর্মির মতো মেয়ে গোটা রাক্ষসসমাজে বিরল। তুমি যাও; উত্তরা এখন একটু ভালো আছে, ওকে আমি তোমার কথা বলেছি। ও তোমাকে সাহায্য করবে। তোমাদের অতিথিভবনের যে কক্ষে লীনা আর নিধি থাকত, ও আপাতত সেইখানেই আছে।”

বাইরে এসে অভী কোমরে শক্ত করে বেঁধে নিল চন্দ্রহাসকে, তারপর ফুঁ দিল নীলশঙ্খের। নীলাভ্র, স্বর্ণশেখর আর পর্বত এসে দাঁড়াল তার পাশে।

অভী বলল, “বাবা, দুটো কাজ করবে?”

“বল।”

“মিত্রমাসিকে বোলো, আমি ভালো আছি, একটা দরকারি কাজে মাল্যপর্বতে গেছি, তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। নয়তো উনি খুব চিন্তা করবেন।”

একটু হাসল নীলাভ্র। “বলব। আর কী বল?”

“একবার লতাকা কিম্বার সঙ্গে দেখা কোরো পারলে। লীনা চলে যাওয়ার পর থেকে উনি কীরকম যেন হয়ে গেছেন শুনলাম। তবে মেঘবর্ণের যে অত বাড়াবাড়ি রকমের অসুস্থতা, সেসব কথা বলতে যেও না কিন্তু। আর নিধির বাড়িতে... না, থাক।”

নীলাভ্র ফিরল স্বর্ণশেখরের দিকে। “তুমি তো ছেলেটাকে এইটুকু বয়স থেকে এতদিন মানুষ করেছে। এ এত বড়ো কবে থেকে হয়ে গেল, বোলো তো?”

অভী লজ্জা পেল। পর্বত হেসে পিঠে থাবড়ে দিল তার আদর করে; ব্যথায় অভী ‘উঃ’ করে উঠল। পর্বত প্রশংসার সুরে বলল, “চিরকাল তোমাদের খোকা

হয়ে থাকবে নাকি ও? অভী, চিন্তা কোরো না। নীলাভ্র যাক লীনার বাড়িতে, আমি একবার নিধির বাড়ি ঘুরে আসব, ওর মা আর বোন কেমন আছে, খোঁজ নিয়ে আসব। আমি তো রাক্ষস; আশা করি, দিঙনাগ আমাকে অন্তত ঘরের ভেতরে ঢুকতে দেবেন।”

বিশাল ডানা ছড়িয়ে নেমে আসছে অপরাজিতা। অভী উঠে পড়ল তার পিঠে।

স্বর্ণশেখর সাবধান করে দিল, “অভী, এখন কিন্তু তুই ঘোষিত শত্রুর দেশের লোক। কাজেই আকাশপথে তোকে ঢুকতে দেখলে ওরা তির ছুড়বেই। আমার পরামর্শ হচ্ছে, প্রাকারের বাইরে মরুময়ের মেঘনির্মাণশালার কাছাকাছি নামিস। যেহেতু এখন তুই ওটার অবস্থান জানিস, তাই ওর অদৃশ্য থাকার মায়া তোর কাছে আর কাজ করবে না। আকাশ থেকে জায়গাটা দেখতে পেলে চুপ করে ওইখানে নেমে পড়িস। ওখান থেকে তোর রক্ষোপুরীর ভেতরে ঢোকাটা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।”

অভী মাথা নাড়ল। রবিকাকা বুদ্ধিটা ভালোই দিয়েছে।

অপরাজিতা তাকে নিয়ে চলল পীতপত্রবন, মৃত দেবতার নদী পেরিয়ে মাল্যপর্বতের উপর দিয়ে। বেলা পড়ে এসেছে; দুপুর শেষ হয়ে আসছে। সশব্দে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হাওয়া, চুলগুলো আবার উড়ছে এলোমেলোভাবে। অভীর মনে পড়ল, গতবার যখন সে এসেছিল এই পথ দিয়ে, তখন দুই প্রিয় বন্ধুই ছিল তার সঙ্গে, আর আজ...

নীচে মাল্যপর্বতের ধূসর চূড়াগুলোর মাথায় বেলাশেষের রোদ এসে পড়েছে। দেখতে ভালো লাগছে বটে, কিন্তু সেই রুক্ষ সৌন্দর্যের মধ্যে কেমন যেন একটা মনখারাপ করে দেওয়া বিষণ্ণতা আছে। অভী নীরবে বসে রইল অপরাজিতার পিঠে। তার মন বলছে, আরও অনেক খারাপ ঘটনা ঘটতে চলেছে।

অপরাজিতা তাকে নামিয়ে দিল মরুময়ের মেঘনির্মাণশালার থেকেও বেশ কিছুটা দূরে। মেঘনির্মাণশালার একেবারে সামনে না নামাটাই অভী বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল; ওখানে প্রধান ফটকের সামনে সবসময় প্রহরী থাকে। তাছাড়া জায়গাটা রাক্ষসপুরীর দুর্গপ্রাকার থেকে এতটাই কাছে যে এখানে নামলেও প্রাকাররক্ষীদের চোখে ঠিক পড়ে যাবেই। মরুময়ের কারখানা থেকে বেশ কিছুটা আগেই নেমে পড়ল সে; অপরাজিতার মাথায়, গলায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়ে বলল, “আমি যদি আর ফিরে না আসি, তুমি কি আমার কথা মনে রাখবে?”

বলতেই পাখিটা বিরক্তভাবে তার মাথায় ঠুকরে দিল। অভী বুঝতে পারল, অপরাজিতা তার কথা শুনে রেগে গেছে।

একটু হেসে সে তার মাথায় আবার হাত বুলিয়ে দিল, তার বিরাট বাঁকানো ঠোঁটে নিজের গাল ঘষে দিল। “আসব, আসব, ফিরে আসব ঠিক। অনেক কাজ বাকি আছে এখনও।”

অপরাজিতা উড়ে গেল। অভী ভাবতে লাগল, কীভাবে সে ঢুকবে প্রাকার পেরিয়ে।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে মরুময়ের মেঘনির্মাণশালার প্রধান প্রবেশদ্বার, আর সেই দরজা পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশছোঁয়া মেঘস্তম্ভগুলোকে। প্রবেশদ্বারের সামনে পাহারায় আছে জনা চারেক অস্ত্রধারী প্রহরী। তাদের পাশেই ঝুলছে বিশাল ধাতব বিপদঘণ্টা।

এই গোটা জায়গাটার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন মরুময়, আর তাঁর অধীনে প্রচুর রাক্ষস প্রহরী আছে। এখানে একটা গুপ্তগোল তৈরি করতে পারলে প্রাকার পেরিয়ে ভেতরে ঢোকা সহজ হবে।

মেঘের স্তম্ভগুলোকে দেখতে দেখতেই তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। গতবারে সে যখন এসেছিল এখানে, তার মায়ানিক্ষেপের ফলে স্তম্ভগুলো দুলছিল না? এখন যদি ওগুলোকে কোনোভাবে আবার...

প্রধান ফটকের সামনে প্রহরীদের এড়িয়ে মেঘগুলোর কাছে যাওয়া মুশকিল। যেখানে সে লুকিয়ে আছে, সেখান থেকে কি সম্ভব হবে মেঘের থামগুলোকে প্রভাবিত করা?

অভী হাত নেড়ে মায়া প্রয়োগ করার চেষ্টা করল। কিন্তু মায়াবলে এত দূরের জিনিস নড়িয়ে দেওয়ার মতো শক্তিশালী মায়াধর সে এখনও হতে পারেনি। মেঘস্তম্ভগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আগের মতোই।

অভী বুঝে গেল, ভেতরে ঢুকতে হবে তাকে। নয়তো তার মায়ানিক্ষেপের নাগালের মধ্যে আসবে না মেঘস্তম্ভগুলো। কিন্তু রক্ষীগুলোকে এড়িয়ে ভেতরে ঢোকা যাবে কীভাবে?

কোনোভাবেই কোনো বুদ্ধি মাথায় আসছে না তার। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে।

হঠাৎ মনে হল, “মেঘবর্ণের তো খুব বুদ্ধি। ও যদি এখানে থাকত, তাহলে কী করত?”

মেঘবর্ণের মতো করে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল সে। এমন একটা উপায় বার করতে হবে, যেখানে কার্যোদ্ধার করতে হবে কথা দিয়ে, হিংসাত্মক উপায় ব্যবহার না করে। চাইলে সে এই প্রহরীদের বিরুদ্ধে চন্দ্রহাস নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়তেই পারে, কিন্তু তার দুটো অসুবিধা আছে। এরা আক্রান্ত হলেই ওই বিরাট ঘণ্টা বাজিয়ে বাকিদের খবর দিয়ে দেবে, আর তখনই রক্ষোপুরী থেকে রাশি রাশি সেনা ছুটে আসবে এখানে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল, যদি ঘণ্টা বাজানোর আগে কোনোভাবে সে এদের চারজনকেই কারু করে ফেলতে পারে। কিন্তু রক্ষোপুরীর মধ্যে নিঃশব্দে ঢোকাটাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য; তার জন্য প্রহরীদের হত্যা করার ইচ্ছা তার একেবারেই নেই।

একটা বুদ্ধি মাথায় আসছে। কিন্তু এতে কাজ হবে কি?

একবার চেষ্টা করে তো দেখতেই হবে। এদিকে যত দেরি হবে, ততই ওদিকে দেরি হবে মা আর মেঘবর্ণের কাছে পৌঁছোতে।

অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল সে; ধীর, নিশ্চিত পদক্ষেপে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলল মেঘনির্মাণশালার প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সশস্ত্র প্রহরীদের দিকে। অনিশ্চিত একটা আশঙ্কায় বুক দুরুদুরু করছে বটে, কিন্তু মুখে তার প্রকাশ করা যাবে না কোনোভাবেই।

তাকে আসতে দেখে প্রহরীগুলো প্রথমটা এতই হকচকিয়ে গেল যে তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য অস্ত্র বার করতেই ভুলে গেল। তারপর যার হাতে ধনুক ছিল, সে তাড়াতাড়ি বাণ পরিয়ে হুংকার দিল, “খবর্দার! এই ফটকের কাছে আসা নিষেধ!”

অভী তার দু’হাত তুলে দিল শূন্যে। “আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।”

একজন প্রহরী চিনতে পেরেছে, সে কে। “তুমি প্রলয়যোদ্ধা অভী, না? তোমার কোমরে ওটা কি চন্দ্রহাস?”

“হ্যাঁ, আমি অভী, আর এটা চন্দ্রহাসই বটে।”

এবার বাকি তিনজনও তরবারি বার করল। ধনুর্ধারী বলল, “প্রলয়যোদ্ধা, তুমি যদি আর এক পা-ও এগোও, তাহলে আমরা তোমার উপর অস্ত্রনিষ্ক্ষেপ করতে বাধ্য হব। সমরগরিমা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহারাজ পুনর্বসুর আদেশে আজ থেকে সমরগরিমার প্রত্যেকটি লোক আমাদের শত্রু।”

অভী বলল, “আমি কিন্তু তোমাদের ভালো-র জন্যই বলছিলাম। আমার কথা শুনে তোমাদেরই লাভ হত। আমি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়ার প্রস্তাব দিতে এসেছিলাম। ঠিক আছে, তোমরা যখন চাও না, আমি চলেই যাচ্ছি।”

চারজন প্রহরী মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। “জল দেওয়ার প্রস্তাব মানে?”

অভী মনে মনে হাসল। মরুময়ের উপদেশ তার বিরুদ্ধেই কাজে লাগাচ্ছে সে। “ওদের যে জিনিস দরকার অথচ পাচ্ছে না কিছুতেই – যে জিনিসের অভাব আছে ওদের, সেই জিনিস তুমি চাইলে ওদের দিতে পারো, এই কথাটুকু ওদের বুঝিয়ে দাও।”

সে বলল, “মানে, আমাকে যদি এই ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দাও, তাহলে আমি একটা অকালবৃষ্টির ব্যবস্থা করে দিতে পারি তোমাদের জন্য।”

চরম অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে রাক্ষস প্রহরীরা তাকিয়ে রইল তার দিকে। “অসম্ভব। মহামন্ত্রী মরুময় ছাড়া কেউ পারে না বৃষ্টি আনতে। আর কারও অধিকারে ওই মায়া নেই।”

“আমার আছে। ত্রিরক্তসম্পন্ন প্রলয়যোদ্ধাকে নিয়ে যে ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিল, শোনোনি কেউ? আমার শরীরে ঐশিকরক্ত আছে; ওই মায়া আমি প্রয়োগ করতে পারি।”

“তুমি শত্রুদেশের লোক। তোমরা আজই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছ। কেন আমরা বিশ্বাস করব তোমাকে, প্রলয়যোদ্ধা? আর প্রহরী হয়ে আমরাই জল চুরি করব, এ কী করে হয়? ধরা পড়লে মহামন্ত্রী আমাদের গর্দান নেবেন।”

অভী বলল, “আমার কথা চোখ-কান বন্ধ করে বিশ্বাস করতে বলছি না তোমাদের। তোমরা আমার সঙ্গে ভেতরে চলো। আমি চন্দ্রহাস আমার থেকে দূরে মাটিতে নামিয়ে রাখব। যদি আমি বৃষ্টি আনতে না পারি, তোমরা আমাকে দূর থেকে তির ছুড়েই হত্যা করতে পারবে। আর যদি পারি, তাহলেও এই অকালবর্ষণের জন্য তোমাদের কেউ দায়ী করতে পারবে না। কারণ তোমরা

রাক্ষস; এই ঐশিকমায়া যে তোমরা জানো না এবং প্রয়োগ করতে পারো না, এ কথা তো আর নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। আর চুরি করার কথা বলছ? মাল্যপর্বতের জল তো সবার সম্পত্তি; তাতে কেনই বা সব রাক্ষসের সমান অধিকার নেই? মরুময় কি তোমাদের সবার জীবনের মালিক হয়ে গেলেন নাকি?”

নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কীসব আলোচনা করতে লাগল চারজন রাক্ষস। অভী তাকিয়ে রইল। তার মন বলছে, এতখানি জল বিনামূল্যে পাবার লোভ এরা সামলাতে পারবে না।

আলোচনা শেষ করে ধনুর্ধারী বলল, “ঠিক আছে, চলো ভেতরে। কোনোরকম গুণ্ডগোল হলে কিন্তু তুমি আর এখান থেকে জ্যান্ত ফিরবে না, প্রলয়যোদ্ধা অভী।”

অভী মাথা নাড়ল। অবশেষে যে ফটকের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া গেছে, এতেই সে খুশি।

তবু একজন আবার জিজ্ঞাসা করল, “আমাদের জল দেওয়ার পেছনে তোমার তো কিছু একটা স্বার্থ নিশ্চয় আছে। সেটা কী?”

অভী বলল, “আমার স্বার্থ? সামান্য একটু গায়ের ঝাল মেটানো বলতে পারো। না না, রাক্ষসদের উপরে নয়, শুধু তোমাদের মহামন্ত্রীর উপরে। আমাকে এখানে ভুলিয়ে এনে তিনি শেষমুখের সামনে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমার অস্ত্রগুরু দু’জন সমরোত্তমকে অন্যায়ভাবে মায়াবিষ প্রয়োগ করে অসুস্থ করে দিয়েছেন, তোমরা জানো নিশ্চয়। এইটুকু না করলে ওঁর উপযুক্ত শাস্তি হবে না। তোমরা তো বীরের জাত, তোমরাই বলো?”

মাথা নেড়ে সায় দিল প্রহরীরা। “ঠিক আছে, ঠিক আছে। মহামন্ত্রী মরুময় রাজার কাছে প্রিয় হতে পারেন, কিন্তু আমাদের কাছে খুব একটা নন। তাঁর উপর তোমার এই প্রতিশোধে আমাদের যদি বিনাপয়সায় জলের মতো দামি জিনিস লাভ হয়, আমরা ‘না’ বলতে যাবই বা কেন?”

সে ঢুকল, তার পেছনে উদ্যত তরবারি হাতে দু’জন রক্ষী চলল। তাদের থেকে আরও দশ পা পেছনে চলল ধনুর্ধারী আর চতুর্থ রক্ষী। হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে দাঁড়াল সেই বিরাট মেঘস্তুম্বগুলোর সামনে।

অভী বলল, “একটা কথা বলব?”

“বলো।”

“জলের অভাব তো সকলেরই আছে, তাই না? আমি যতদূর জানি, শুধু রাজপ্রাসাদেই জলের ছড়াছড়ি, আর অন্য সব জায়গাতেই চড়াদামে জল কিনতে হয়।”

“খুব একটা ভুল বলোনি। কিন্তু বক্তব্যটা কী তোমার?”

“তোমাদের একজন যদি গিয়ে দুর্গপ্রাকারের রক্ষীদের চুপিচুপি খবর দিয়ে দাও যে বৃষ্টি আসতে চলেছে, তাহলে ওরাও যতটা সম্ভব জলটাকে ধরে রাখার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে।”

রাক্ষস প্রহরীরা নিজেদের মধ্যে আরেকবার কথা বলে নিল। একজন বলল, “হ্যাঁ, আমার ভাইও তো আছে প্রাকারে। ওকে আগাম খবর দিয়ে রাখলে

ও-ও এখুনি বাড়ি গিয়ে জল ধরার একটা ব্যবস্থা করতে পারে। আর পাড়ার বাকিরাও...”

আরেকজন বলল, “কথাটা মন্দ বলেনি কিন্তু। প্রলয়যোদ্ধা এর আগে নরক থেকে উঠে আসার মতো অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছে। তার কথা আমার বিশ্বাস হয়েছে – সে যদি চায়, তাহলে এই মেঘ থেকে খানিকটা বৃষ্টি করিয়ে দেওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। এই জলটা ধরে রাখতে পারলে অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা ধারাস্থানকে দেওয়ার বদলে সাশ্রয় করা যাবে। তোমাদের মতো রাক্ষসদের সঙ্গে তবু কিছুটা ভালো করে বললেও কিন্তু মরুময় বড্ড তুচ্ছতাচ্ছল্য আর অপমান করে কথা বলেন আমাদের মতো অর্ধরাক্ষসদের সঙ্গে। ওই অহংকারী লোকটার অত বিশাল মেঘের পাহাড় থেকে দু’চার ফোঁটা যদি গরিব রাক্ষস-অর্ধরাক্ষসদের কাজে লাগে, তাহলে আমার অন্তত কোনো আপত্তি নেই।”

ওরা অভীকেই জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কী করতে বলছ বলো।”

অভী বলল, “একজন বা দু’জন চলে যাও না প্রাকাররক্ষীদের কাছে। আমার সমরগরিমার দিব্যি, বৃষ্টি না এনে আমি পালাব না। আর পালাতে চাইলে তোমাদের হাতে অস্ত্র তো আছেই। তোমরা গিয়ে বাকিদের খবর দাও। ওরাও যদি এই জলটাকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে, অনেকদিনের জন্য জলকষ্টও থাকবে না, আর অনেক টাকাও বেঁচে যাবে তোমাদের সকলের। আর মরুময়ের বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা লোকসান হলে আমারও আনন্দ।”

রক্ষীরা হেসে উঠল। “তুমি শত্রুদেশের লোক হলেও এই এক জায়গায় আমাদের মধ্যে মিল আছে, প্রলয়যোদ্ধা – আমরা কেউই রক্ষোপুরীর মহামন্ত্রীকে পছন্দ করিনা।”

অভীও হাসল তাদের সঙ্গে। তারপর দু’জন প্রহরী বেরিয়ে গেল ফটক দিয়ে – বাকিদের বৃষ্টি আসার সুসংবাদটা দিতে।

ধনুর্ধারী বলল, “ওরা এফুনি খবর পেয়ে যাবে। তুমি তোমার কাজ শুরু করতে পারো।”

সুবিশাল মেঘস্তুম্বগুলো দাঁড়িয়ে আছে আকাশছোঁয়া উচ্চতা নিয়ে। অভী এগিয়ে গেল তাদের সবার সামনেরটার দিকে।

গতবার সে যখন এসেছিল এখানে, তখন সে মায়াপ্রয়োগ করতেই একটা স্তুম্ব বেঁকে গিয়েছিল, তার মনে আছে। মরুময়ও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সেই দৃশ্য দেখে। অভী ভাবছিল, এসে তো পড়েছে সে এখানে; এখন এই বিপুল মেঘসমষ্টির কিছুটা ব্যবহার করে বৃষ্টি আনতে সে পারবে তো?

চন্দ্রহাস সে কোমর থেকে খুলে নামিয়ে রেখেছে কিছুটা দূরে। ধনুর্ধারী প্রহরী ধনুতে বাণ আরোপ করে তাক করে আছে তার দিকে। কোনো বেচাল দেখলেই তার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে। অভী মনঃসংযোগ করল মেঘস্তুম্বটার উপরে।

বিরাট মোটা ধূসর স্তুম্বটার গায়ে খেলছে বিদ্যুতের রেখা। সে হাত তুলল; শ্যামশ্রীর শিক্ষামতো মনের শক্তি প্রয়োগ করল ওটার উপর।

দূলে উঠল স্তুম্বটা; দূরে দাঁড়ানো রক্ষীরা হতবাক হয়ে গেল। একজন আরেকজনকে বলল, “দেখলে তো? আমি বলেছিলাম কিনা, ও সত্যিকথা বলছে?”

অভীর ভেতরে তার প্রবৃত্তি তাকে বলে দিচ্ছে এবার কী করতে হবে। মনে মনে সে শক্তিপ্রয়োগ করল, স্তম্ভের মাথা থেকে বিরাট একখণ্ড বাদলমেঘ ছাতার মতো কেটে বেরিয়ে এল। রক্ষী দু'জন হর্ষধ্বনি করে উঠল।

তার হাতের ইঙ্গিতে জমে থাকা মেঘ মুক্তি পেতেই ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল মাল্যপর্বতের উপরে। আকাশ ঢেকে গেল মত্ত হাতির মতো মেঘে; বইতে শুরু করল শীতল বাতাস, কড়কড় শব্দে সদ্যমুক্ত মেঘের মধ্যে ডেকে উঠল বজ্র।

অভী বুঝতে পারছে, আর তাকে কিছু করতে হবে না; নিজের ধর্ম অনুযায়ী মেঘই এবার যা করার করবে। রক্ষোপুরীর দুর্গপ্রাকার থেকে প্রবল হৈহট্টগোল ভেসে আসছে। রাক্ষসরা এই অকালবর্ষণের মেঘ দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। তাঁর অনুমতি ছাড়া আকাশে বৃষ্টির মেঘ উঠল কীভাবে, ভাবতে গিয়ে মরুময়ের মুখের অবস্থা কীরকম হবে, কল্পনা করেও তৃপ্তি হচ্ছিল অভীর।

রাক্ষস প্রহরীরা বাচ্চা ছেলের মতো লাফাচ্ছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। ছোটবেলায় সে যখন থাকত রবিকাকার কাছে, তখন ঘোর গ্রীষ্মের পর বর্ষার মেঘ উঠলে সেও এমন খুশি হয়ে উঠত। এখনও হয়। মেঘ দেখলে নিজের নাড়ির মধ্যে অদ্ভুত একটা স্পন্দন অনুভব করতে পারে সে, যেন সে-ই ওই মেঘ হয়ে মিশে যেতে চায় উড়ন্ত জলকণাদের মধ্যে।

আজও সেই বিচিত্র অনুভূতিটা হচ্ছিল তার আকাশের গায়ে ঘন হয়ে আসা মেঘ দেখে। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল।

বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল; প্রথমে এক ফোঁটা, দু'ফোঁটা, তারপর মুষলধারে। অভী চন্দ্রহাস কুড়িয়ে নিল। ধনুর্ধারী রক্ষী ধনুক নামাল।

“প্রলয়যোদ্ধা, তুমি তোমার কথা রেখেছ। আমরাও আমাদের কথা রাখব। চলে যাও, তোমাকে আমরা আটকাব না।”

অভী একটু হেসে বেরিয়ে এল ফটক দিয়ে। প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে, যদিও অভী জানে, এই বৃষ্টি থেমে যাবে একটু পরেই। কিন্তু ততক্ষণে তার কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।

দুর্গপ্রাকারের রক্ষীরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিরাট বিরাট গামলা, বালতি, কলসিতে জল ভরতে। প্রধান প্রবেশদ্বার খোলা; সেখানে যারা থাকত, তারাও ব্যস্ত জলসংগ্রহের কাজে। এইসময় যে কেউ আসতে পারে, তাদের সেদিকে খেয়াল নেই। বহু রাক্ষস নেমে এসেছে প্রাকার থেকে, অনেকে আকাশে দু'হাত তুলে ভিজছে, নাচছে, আনন্দ করছে। অকালের এই বৃষ্টি যেন তাদের ছেলেমানুষ করে দিয়েছে। দুর্গপ্রাকারের সামনে জুটেছে বহু রাক্ষস ছেলেবুড়ো; তারা গান করছে, হা হা হি হি করে হাসছে, হাত পা ছুড়ছে, আর আকাশ থেকে অঝোর শান্তিধারা নেমে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে তাদের রুম্মশুষ্ক হাত-পা-মাথা। এই ভিড়ের মধ্য দিয়ে চুপ করে ভেতরে ঢুকে গেল অভী, কেউ টেরই পেল না।

ভেতরের বিরাট সবুজ মাঠের ঘাসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে জল জমেছে। সেগুলো পেরিয়ে অভী দ্রুত চলল অতিথিভবনের দিকে। উত্তরার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আর তারপর কথা বলতে হবে উর্মির সঙ্গে। তার বিশ্বাস আছে, যদি কেউ মা আর মেঘবর্ণকে মুক্ত করতে আন্তরিক উদ্যোগ নিতে পারে, সে উর্মি।

অতিথিভবনে যেতে যেতে সে ভাবল, যদি প্রফুল্লের সামনে পড়ে যায়, তাহলে বিপদ আছে।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, চেনামুখ কারও সঙ্গেই দেখা হল না। প্রফুল্ল নেই; যারা আছে, তারা খোলা অঙ্গনে নেমে এসেছে বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দটুকু নেওয়ার জন্য। রাজপ্রাসাদে জলের অভাব নেই ঠিকই, কিন্তু বৃষ্টিতে ভেজার সুখ তো আর সহজে পাওয়া যায় না।

অভী সোজা এসে পৌঁছোল অতিথিভবনে। সেখানে লীনারা যে কক্ষে থাকত, তার দ্বারের সামনে আসতেই সে দেখতে পেল, ভেতর থেকে উঁকি মেরে একজন মহিলা তাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

চিনতে পারল সে তাকে। উত্তরা - পর্বতের স্ত্রী।

কক্ষের মধ্যে এসে ঢুকল অভী। উত্তরার মুখে চোখে উত্তেজনা।

তাকে জাগ্রত অবস্থায় এই প্রথম দেখল সে। এই নিরীহমুখের অর্ধরাক্ষস মহিলাই এতদিন ছিলেন মহাসপিণীর মতো ওই ভয়ংকর আকৃতি নিয়ে, ভাবতেই অবাক লাগল তার।

সে বলল, “বৌদি, আমি অভী; পর্বতদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল।”

উত্তরা হাত তুলে তাকে থামতে ইশারা করে একটুকরো কাগজে খসখস করে কী যেন লিখল। অভীর মনে পড়ল, উর্মি বলেছিলেন, উত্তরা বাকশক্তি হারিয়েছে।

কাগজটা সে তুলে ধরল তার সামনে। “অভী, তোমার সামনে ঘোর বিপদ। এরা তোমাকে একবার ধরতে পারলে শত্রুপক্ষের চর হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দেবে। পর্বত আমাকে বলেছে, সমরোত্তমদের এখান থেকে নিয়ে যেতে আমি যেন তোমাকে সাহায্য করি।”

অভী বলল, “উর্মি কোথায়?”

উত্তরা আবার লিখতে শুরু করল। তারপর অভীকে দেখাল লেখাটা। “রাজকন্যা উর্মিমালার অবস্থা সংকটজনক। বাঁচবেন কিনা জানি না। তাঁকে বিষ দেওয়া হয়েছে।”

অভী চমকে উঠল। “বিষ দেওয়া হয়েছে মানে? কে দিল? কেমন আছেন তিনি?”

উত্তরা কাগজে লিখতে গিয়েও থেমে গেল। তাকিয়ে আছে সে অভীর দিকে, না, অভীর পেছনে যে এসে দাঁড়িয়েছে তার দিকে; ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে।

একটা তীক্ষ্ণ, শক্ত বস্তু ফুটল অভীর পিঠের বামদিকে। আলোকপর্ণ বলল, “অভী, যদি চন্দ্রহাসের দিকে হাত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো, বা হিমকুশলতা দিয়ে আমাকে আঘাত করার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিতে আমার হাত একটুও কাঁপবে না।”

অভী দু’হাত শূন্যে তুলল। সে বুঝতে পারছে, সে ধরা পড়ে গেছে, এবং খুব বিশ্রীধরনের ঝামেলায় ফেঁসে গেছে।

“শত্রুপক্ষের চর হিসাবে রাজপুরীতে ঢোকা এবং মেঘসুস্তের মতো সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অপরাধে আমি তোমাকে বন্দি করছি। আর উত্তরা, বিশ্বাসঘাতকতা জিনিসটা তোমার মতো অর্ধরাক্ষসের রক্তে মিশে আছে, আমি জানি। এই কাগজটাও আমি নিচ্ছি – শত্রুর কাছে তুমি যে আমাদের ভেতরের খবর পাচার করছিলে, সেটা প্রমাণ করতে আর অসুবিধা হবে না।”

অভী দাঁতে দাঁত ঘষল। আলোকপর্ণ বলল, “এবার রাজসভায় চলো। মরুময় আর মহারাজ ওখানেই অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য; অপরাধীরা হাতেনাতে ধরা পড়েছে দেখলে তাঁরা ভীষণ খুশি হবেন। এই দেশদ্রোহিতা আর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কী, তাও জেনে রাখো। শিরশ্ছেদ।”

অভী চুপ করে রইল। সে বুঝতে পারছে, সব শেষ হয়ে গেছে – এখন আর তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই এই শত্রুপুরীতে।

মা, মেঘবর্ণ, উর্মি – কারও সঙ্গেই শেষ দেখা হল না।

নিজের অন্তিম মুহূর্তটা কেমন হবে, তা নিয়ে অনেকবার ভেবেছে সে; কিন্তু মৃত্যু যে এইরকম অগৌরবের সঙ্গে আসবে, সে কখনও কল্পনা করতে পারেনি।

মরিয়া হয়ে গিয়ে অভী ভাবল, “দেখি একবার এদের বিচারের দৌড়। তারপর যদি মরি তো যতগুলোকে পারি, মেরে মরব।”

রাজসভা পর্যন্ত যাওয়া অবশ্য তার আর হয়ে উঠল না।

সেনানায়িকা প্রজ্ঞা এসে ঢুকলেন কক্ষে; আলোকপর্ণকে দেখে তিনি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, “এসব কী ব্যাপার?”

আলোকপর্ণ তাঁকে এই অতিথিশালায় দেখতে পাবে, আশা করেনি। সে একটু থতমত খেয়ে বলল, “অভী লুকিয়ে এসে ঢুকেছে আমাদের প্রাসাদে। মহারাজ সমরগরিমার সঙ্গে যাবতীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এই অবস্থায় গুপ্তচর হিসাবে অভী ধরা পড়েছে এখানে, এবং আসার আগে আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতিও করেছে। আর এই ব্যাপারে যথারীতি সাহায্য করেছে তাকে আমার দাদার স্ত্রী। এই নিন প্রমাণ।”

উত্তরার লেখা কাগজটা তাঁর হাতে তুলে দিল আলোকপর্ণ। উত্তরা তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। অভীর মনে হল, সে বোধহয় আবার ওইরকম কোনো ভয়ংকর অভিশাপের ভয় পাচ্ছে।

একবার লেখাটা পড়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন প্রজ্ঞা। “এই কাগজের দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না। আর অভীকে ছেড়ে দাও, আলোকপর্ণ। আমার দৃঢ় ধারণা, দুই পক্ষের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষার সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই অভী নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও এখানে এসেছে।”

কাগজটা ছিঁড়ে ফেলায় আলোকপর্ণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু প্রজ্ঞার মুখের উপর খুব বেশি তর্ক করার সাহস তার নেই। তবু সে বলল, “কী করে আপনি বলছেন কথাটা? যুদ্ধের সময় শত্রুর চর যদি ধরা পড়ে, তাহলে রাজসমীপে তাকে উপস্থিত করে তার বিচার করা এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে শিরশ্ছেদ করাটাই আমাদের আইন।”

প্রজ্ঞা অধীরভাবে বললেন, “আলোকপর্ণ, সারা জীবনে যদি আমাকে একবারের জন্যও গুরু বলে মেনে থাকো, তাহলে বলছি, আমার উপর অন্তত

এইবারের জন্য বিশ্বাস রাখো। অভীকে এইসবের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এখন আমাদের দরকার। আমি জানি, অভী যা সিদ্ধান্ত নেবে, তাতে আমাদের সকলের মঙ্গল করার চেষ্টাই থাকবে।”

একটা পাকানো কাগজ বার করে তিনি ধরিয়ে দিলেন আলোকপর্ণের হাতে। “এটা নাও, পড়ো। এটা আমার কাছে দিয়ে গেছে বটে বাহক জটায়ুটা, কিন্তু এ চিঠি লেখা হয়েছে আসলে অভীকে উদ্দেশ্য করে। পড়ে দেখো আলোকপর্ণ, আর তারপর আমাকে বলো, আমার এখন অভীকে ছেড়ে দেওয়া উচিত কিনা।”

অভী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। “আমাকে লেখা চিঠি?”

আলোকপর্ণ চুপ করে কাগজটা পড়ল। তারপর সেটা প্রজ্ঞাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, “হ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দিচ্ছি আমি।”

বিনা বাক্যব্যয়ে তরবারি নামিয়ে নিল সে।

প্রজ্ঞা চিঠিটা বাড়িয়ে দিলেন অভীর দিকে। অভী পড়ল, “সেনানায়িকা প্রজ্ঞা, এই অনাবশ্যক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ যদি থামাতে চান, তাহলে আজ অভীকে বলুন উর্মিকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার পর দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে আসতে। ওকে বলে দেবেন, মৃত্যুর আগে ওর জন্য একটা উপহার আমি তুলে রেখেছি- আমার আসল মুখ।”

চিঠির নীচে লেখকের স্বাক্ষরটাও জ্বলজ্বল করছে- ‘শেষমুখ’।



।। অষ্টাদশ অধ্যায় ।। শেষমুখ

আলোকপর্ণ চলে যাচ্ছিল। যাওয়ার আগে প্রজ্ঞা তাকে বললেন, “এসব কথা মহারাজ বা মহামন্ত্রী মরুময়কে বলবে না, আলোকপর্ণ। আমার ধারণা, অতী যদি ওই গুহায় যায় এবং শেষমুখের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে ফিরে আসতে পারে, তাহলে হয়তো যুদ্ধটা এড়ানো যেতেও পারে।”

“যুদ্ধ এড়াতে চাইছেনই বা কেন আপনি? সমরগরিমাকে কীসের ভয় আপনার?”

প্রজ্ঞা মুখ শক্ত করে বললেন, “সমরগরিমাকে কেনই বা ভয় পেতে যাব? অধিনায়ক বজ্রধরের অনুপস্থিতিতে ওদের ভয় পাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই, যদিও উপযুক্ত শত্রু হিসাবে সমীহ করার দরকার আছে। কিন্তু একটা কথা আমি বারবার ভাবছি গত কয়েকদিন ধরে, জানি না তুমি বুঝবে কিনা। সুতসোম চলে যাওয়ার পর থেকেই এই চিন্তাগুলো ফিরে ফিরে আসছে আমার মাথার মধ্যে। যুদ্ধ লাগলে ওদের অনেকে মরবে, আমাদেরও অনেকে মরবে। যারা মরবে, তাদেরও তো বাড়িতেও নিশ্চয় মা আছে, অন্যান্য প্রিয়জন আছে। তারা মরে গেলে তাদের মা-দেরও কি আমার মতোই কষ্ট হবে না?”

আলোকপর্ণ মুখ বিকৃত করে বলল, “আমরা রাক্ষসরা কোনোদিন এইসব মানুষসুলভ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিইনি, সেনানায়িকা। এইধরনের কথা আপনার মতো পদস্থ ব্যক্তির মুখে মানায় না।”

প্রজ্ঞা মাথা নাড়লেন। “ঠিকই বলেছ তুমি। আমি একটু বেশিই উলটো পালটা ভাবছি কদিন। যাক গে, তুমিও জানো আর আমিও জানি, যুদ্ধক্ষেত্রে

একবার অস্ত্রহাতে নেমে পড়লে আমি এসব ক্ষণিকের আবেগের কথা মনে রাখব না। কিন্তু তা হলেও আমাদের পক্ষেও যে বিপুল সেনাক্ষয় হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর তাই এ যুদ্ধ যদি এড়ানো যায়, তাতেই রাক্ষসদের সার্বিক মঙ্গল। যাই হোক, আমার আদেশ স্মরণে রেখো। অভীর এই ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না। মনে থাকবে?”

“থাকবে।” আলোকপর্ণ মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

উত্তরার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন প্রজ্ঞা। “ভয় নেই। তোমার উপর আর কোনো অভিশাপ পড়বে না। পর্বত যা করেছিল, আমি মনে মনে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এতদিনে। আর তোমার উপরেও আমার কোনো রাগ নেই।”

উত্তরা মাথা নীচু করে রইল, কিন্তু অভী দেখতে পেল, দৃঢ়ভাবে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে। অভীর মনে হল, প্রজ্ঞার দিক থেকে হয়তো আর রাগ নেই, কিন্তু উত্তরার দিক থেকে সে রাগ পুরোমাত্রায় বজায় আছে – তার উপর হওয়া অন্যায়গুলো সে ভোলেনি।

অভী বলল, “সেনানায়িকা প্রজ্ঞা, একবার রাজকন্যা উর্মির সঙ্গে দেখা করা যায়? কেমন আছেন উনি?”

প্রজ্ঞা বললেন, “ভালো আছেন। ওঁকে যেই বিষ দিয়ে থাকুক, বিষের মাত্রাটা খুব কম ছিল। প্রাণের আশঙ্কা নেই বললেই চলে। নিজের তৈরি ওষুধেই উনি বেশ সেরে উঠেছেন ইতিমধ্যে। তোমার সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় উনি দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরে যেতে পারবেন, আশা করি। চলে যাও এই সোজা; উনি নিজের সেবাকক্ষেই আছেন।”

অভী বলল, “আজ আপনি আমার জন্য যা করলেন, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। মরুময় আমাকে বাগে পেলে কোনোমতেই জ্যান্ত ছাড়তেন না।”

প্রজ্ঞা একটু চুপ করে থেকে বললেন, “অভী, একদিন তুমি আমার একটা উপকার করেছিলে; আজ আমি সে উপকার শোধ করে দিলাম। এবার দু’জনেই সমান সমান – কেউ আর কারও কাছে কিছু ধারি না। আজ যদি তুমি ওই মন্দির থেকে বেঁচে ফিরে আসো, আর তারপর যদি আমাদের দু’জনকে মুখোমুখি হতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন আমরা কেউই যুদ্ধ করতে গিয়ে নিজেদের গুটিয়ে রাখব না; ঠিক আছে?”

অভী মাথা নাড়ল। “ঠিক আছে।”

প্রজ্ঞা চলে গেলেন। উত্তরাকে এখানে রেখে অভী চলল উর্মির সেবাকক্ষের দিকে।

আধশোয়া হয়ে শয্যায় শুয়ে ছিলেন তিনি; তাঁকে ঘিরে ছিল দু’জন সেবিকা। তাকে ঢুকতে দেখে উর্মির মুখে নিখাদ খুশির হাসি ফুটে উঠল।

“আরে এসো, এসো। অনেকদিন বাঁচবে। তোমার কথাই ভাবছিলাম।”

অভী এসে দাঁড়াল তাঁর শয্যার সামনে। উর্মির ইঙ্গিতে একজন সেবিকা একটা কাষ্ঠাসন এনে সামনে রাখল। রোগকষ্টে তাঁর চোখের কোলে কালি পড়েছে, কিন্তু মুখের হাসিটি অম্লান। “বোসো, অভী।”

অভী বসল। “কেমন আছেন এখন? কী করে ঘটল এসব?”

উর্মি বললেন, “তোমরা একটু বাইরে যাও তো।”

সেবিকাদের বিদায় করে নীচু গলায় তিনি বললেন, “একটু ভালো আছি। আমার সেই রাতের আহারে বিষ মিশিয়েছিল কেউ। কিন্তু আমি ভাবছি, কেউ যদি আমাকে প্রাণে মারতেই চাইত, তাহলে তো তার পক্ষে প্রাণঘাতী মাত্রার বিষ দেওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। তাহলে বিষটা এত কম পরিমাণে দিল কেন?”

অভী বলল, “হয়তো আপনাকে মারতে চায়নি, শুধু অল্প কিছু সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু লোকটা যেই হোক, সে আপনার খাবার পর্যন্ত পৌঁছোল কী করে? কার পক্ষে সম্ভব ছিল এ কাজ করা, সেটা ভেবে দেখেছেন?”

উর্মি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, “একজনের কথাই মনে আসছে।”

“কে?”

“প্রফুল্লের কথা বলছি। ভাবতে গেলে ও ছাড়া আর কারও নাম মাথায় আসছে না। কিন্তু আমাকে বিষ খাইয়ে ওর কী লাভ?”

অভী উত্তেজিত ভাবে বলল, “সে কথা সামনাসামনি জিজ্ঞাসা করলেই হয়। আমিও জানতে চাইব, ওর হাতে ওই কাটা দাগটা কোথা থেকে এল। এখন কোথায় আছে ও, জানেন?”

উর্মি বললেন, “সেটাই তো রহস্য। ওকে বহুক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যেন বেমালুম হাওয়ায় মিশে গেছে লোকটা।”

অভী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, “আপনাদের এখানে একজন সন্দেহজনক লোক হাওয়া হয়ে গেছে, আর সমরগরিমাতেও আরেকজন সন্দেহজনক লোক এইরকমভাবেই হাওয়া হয়ে গেছে। দেখুন তো একবার, এই ছবির ছেলেটাকে আপনি চেনেন কিনা।”

নীলাভ্রর দেওয়া ছবিটা সে বাড়িয়ে দিল রাজকন্যার দিকে। তিনি একবার ওটার উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, “আমিই তো নিধিকে দিয়েছিলাম এই ছবির খাতাটা। হ্যাঁ, কেন চিনব না? কিন্তু অভী, এই ছবিতে আমার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে তো আর বেঁচে নেই।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “মানে?”

“মানে, এ অনেক দিন আগেই মারা গেছে। এ আমার মামাতো দাদা ছিল; একটা দুঃখজনক ঘটনায় এর মৃত্যু হয় এই ছবিটা আঁকার কয়েক মাস পরেই। এই ছেলে তোমাদের সমরগরিমায় গেছে বলছ?”

অভী মাথা নাড়ল। “ইনি আমাদের সহনিয়ামক, এবং বেশ গোলমালে লোক। অনেক অশান্তি পাকিয়েছেন ইনি ওখানে। কাল একটা বড়ো রকমের গুণ্ডগোল হওয়ার পর আজ থেকে ভদ্রলোক নিরুদ্দেশ।”

উর্মি বললেন, “হতেই পারে না। ঐর মৃত্যুর সময় আমি নিজে পাশে ছিলাম। স্বচক্ষে মরতে দেখেছি লোকটাকে। সেও আজ কত বছর আগেকার কথা।”

অভী বলল, “আচ্ছা, এর কোনো যমজ ভাই-টাই ছিল নাকি?”

“না, এই দাদা আমার মামার একমাত্র সন্তান ছিল। অভী, হতে পারে

যিনি তোমাদের ওখানের সহনিয়ামক হয়েছেন, তিনি হয়তো কাকতালীয়ভাবেই অনেকটা আমার এই দাদার মতো দেখতে, কিন্তু এ বহুদিন মারা গেছে। এতকাল পরে হঠাৎ করে সমরগরিমায় এর উদয় হওয়া একান্তই অসম্ভব।”

অভী চুপ করে ভাবতে লাগল। সৌজন্যের ব্যাপারটা তাহলে কী? লোকটার রহস্যটা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না কেন?

ছবিটা দেখতে দেখতে উর্মি বললেন, “নিধি কেমন আছে?”

অভীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তা দেখে উর্মি একটু অবাক হয়ে বললেন, “কী হল?”

নিধির যে কী হয়েছে, অভী তাঁকে সংক্ষেপে বলে দিল। শুনে তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কোমল স্বরে বললেন, “অভী, আমি সত্যিই দুঃখিত। নিধি বড়ো ভালো মেয়ে ছিল, স্পষ্টবক্তা ছিল। আমার সঙ্গে বেশিদিনের আলাপ হয়তো ছিল না, কিন্তু এই অল্প সময়েই ওকে খুব ভালো লেগেছিল আমার।”

অভী বলল, “লীনা কোথায়?”

উর্মি বললেন, “সেইখানেই আছে। সংরক্ষণ করার জন্য ওর শরীরে কিছু ওষুধ মাখানো হয়েছে।”

“একবার যাওয়া যায়?”

উর্মি বললেন, “যেতে পারো, তবে আমার মতে না গেলেই ভালো। শুধু শুধু কষ্ট বাড়িয়ে লাভ আছে কিছু?”

অভী ভাবল কিছুক্ষণ। নাঃ, লীনার ওই স্তব্ধ হয়ে যাওয়া, প্রাণহীন মুখটা সে এই মুহূর্তে আর দেখতে চায় না। তাকে নিয়ে যে ভালো স্মৃতিগুলো আছে, সেগুলো নিয়েই সে কাটিয়ে দেবে। সে বলল, “থাক, যাব না। কিন্তু আমাদের সমরোত্তমরা কোথায়? কেমন আছেন তাঁরা?”

উর্মি একটু গম্ভীরভাবে বললেন, “আমি তোমাকে সত্যি কথা বলব, অভী। ওঁদের অবস্থা আমি খুব একটা ভালো বুঝছি না। দু’জনেই মহাবীর এবং দু’জনেই দু’জনের উপর বেশ কিছু ভয়ংকর শারীরিক আঘাত করেছেন বজ্রমাণিকের প্রভাবে। কিন্তু সে আঘাত সেরে যাবে; সময় লাগবে, কিন্তু সেরে যাবে। আমি ভয় পাচ্ছি অন্য একটা ব্যাপারে।”

তাঁর মুখ দেখে অভী ভয় পেয়ে গেল। “কী ব্যাপারে?”

“চলো একবার। তোমাকে আমি দেখা করাতে চাই ওঁদের সঙ্গে।”

যে সেবাকক্ষে সমরোত্তমরা ছিলেন, সেখানে এসে দাঁড়ালেন ওরা দু’জন। তাঁদের দেখে অভী চমকে উঠল।

শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ দু’জনেরই চোখের কোলে গভীর কালি পড়েছে; হঠাৎ দেখলে মনে হচ্ছে, চোখদুটোকে ঘিরে কালো রং মেখেছেন তাঁরা। দু’জনেরই মাথা ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে, দৃষ্টিহীন চোখে তাঁরা তাকিয়ে আছেন নিজেদের শয্যার দিকে। শ্যামশ্রীর মুখের তেজ, মেঘবর্ণের ঠোঁটে সবসময় লেগে থাকা বুদ্ধিদীপ্ত হাসি কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়ে তার জায়গা নিয়েছে কী অপরিসীম ক্লান্তির চিহ্ন। দেখে অভীর বুকের ভেতরটা কষ্টে মুচড়ে উঠল।

“মা, আমি এসেছি,” অভী ডাকল।

শ্যামশ্রী মুখ তুলেও তাকালেন না, একমনে শয্যার উপরে আঙুল দিয়ে হিজিবিজি কাটতে লাগলেন। অভীর চোখে জল চলে এল।

“মেঘবর্ণ, আমাকে চিনতে পারছ?”

সে মুখ তুলল বটে, কিন্তু অভীকে চিনতে পেরেছে, এমন মনে হল না। তার চোখের ভেতর লাল লাল শিরাগুলো যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। সেই দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা অপ্রকৃতিস্থতা ছিল যে অভী ভয় পেয়ে গেল। সে বলে উঠল, “তোমরা আমাকে কেউ চিনতে পারছ না? আমি অভী, আমি অভী!”

‘অভী’ নামটা শুনে শ্যামশ্রী একবার মুখ তুলে তাকালেন তার দিকে, কী যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভুলে গেলেন। বিছানার চাদরে আবার আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে লাগলেন তিনি।

মেঘবর্ণ একবার বলল, “অভী! নীল কেমন আছে?”

“বাবা ভালো আছে, মেঘবর্ণ। সে তোমার জন্য খুব চিন্তা করছে।” অভী একটু খুশি হয়ে উঠল। যাক, মেঘবর্ণের তাহলে তার নাম শুনে প্রিয় বন্ধুর কথা মনে পড়েছে।

আর কোনো উত্তর দিল না মেঘবর্ণ। উর্মি বললেন, “ওঁদের স্মৃতির উপরে একটা পর্দা পড়ে গেছে। বজ্রমাণিকের বিষ এতটা বেশি পরিমাণে মিশে গেছে ওঁদের রক্তে যে এখন বাস্তব আর কল্পনা গুলিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে।”

অভী ব্যাকুল ভাবে বলল, “আপনি তো অনেক রকম ওষুধ জানেন। দেখুন না যদি কিছু করা যায়। রক্তপদ্মরাগ দিয়ে তো শুনেছি সব রোগ ভালো করা যায়, তাই না?”

উর্মি বললেন, “সাহস হচ্ছে না রক্তপদ্মরাগ ব্যবহার করার। আসলে এই ধরনের বিষক্রিয়া তো আর সাধারণ রোগের মধ্যে পড়ে না; এর সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও নেই। সুতসোমের সঙ্গে যা হল, তারপর বজ্রমাণিকের বিষক্রিয়ায় ওষুধ হিসাবে রক্তপদ্মরাগ ব্যবহার করতে ভরসা পাচ্ছি না – যদি হিতে বিপরীত হয়! আমি আমার জ্ঞানমতো ওষুধ দিচ্ছি, তাতে এঁদের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতিও হয়েছে। কিন্তু মস্তিষ্কের এই জড়তা, এই বিভ্রম কাটানোর পদ্ধতি আমার জানা নেই।”

অভীর কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে। সে বলল, “তাহলে কি কোনো উপায় নেই?”

“যেটা আছে, সেটা কোনো উপায় নয়, অভী।”

“কী উপায়, বলুন আমাকে। আমার যদি সাধ্যে কুলোয়, আমি করব।”

উর্মি স্নান হাসলেন। “না, তোমার সাধ্যে কুলোবে না। চিকিৎসাশাস্ত্রে একজন কাল্পনিক মায়াধরের কথা বলা হয়েছে, যিনি পৃথিবীর যেকোনো বিষকে নিজের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তাঁকে বলা হয়েছে ‘বিষনিয়ন্তা’। কিন্তু আজ পর্যন্ত এরকম কোনো মানুষ আসেননি অভী। কাজেই এটাকে শাস্ত্রলেখকদের কল্পনা ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।”

“তাহলে মা আর মেঘবর্ণের কী হবে?”

“শরীরটা মোটামুটি সুস্থ হয়ে যাবে, কিন্তু রক্তের মধ্যে বজ্রমাণিক মিশে ওঁদের রক্ত দূষিত করে দিয়েছে। তার ফলে বিষের একটা ক্রিয়া চলতেই

থাকবে ওঁদের রক্তের মধ্যে, আর এই অপ্রকৃতিস্থতাও চলতে থাকবে। আমি চেষ্টা করছি সেটা অন্য কিছু ওষুধ দিয়ে সারানোর, কিন্তু আমি তো আর বিষনিয়ন্তা নই – ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমার উপায় নেই।”

সন্ধ্যা যখন নেমে আসছে, তখন ওরা যাত্রা করল দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরের উদ্দেশে। রাজাকে জানানো হয়নি এর কথা, মরুময়কেও নয়। প্রজ্ঞা চুপিচুপি এসে এগিয়ে দিয়ে গেলেন ওদের কিছুটা।

আবার সেই অসমান পাহাড়ের খাঁজ ধরে ধরে এগোনো। আজও অন্ধকার হয়ে আসছে মাথার উপরে। খুব সাবধানে পা ফেলছে অভী, নজর রাখছে উর্মির উপর। আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নীচের দিকে তাকাবে না কিছুতেই। তাকালেই মাথা ঘুরে যাবে।

একটা বিশ্রী অন্ধকার অস্তিত্ব যেন ঘিরে ফেলছে ওদের; আবার গতবারের মতো দম আটকে আসতে চাইছে অভীর। ওঁদের মতো কী যেন জড়িয়ে ওদের পিষে ফেলতে চাইছে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী অস্তিত্ব। উর্মি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, “অভী, ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকছে না কিন্তু।”

“কী ব্যাপার?”

“এই মন্দিরে আমি আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি। আজ এই জীবন্ত আঁধার যেরকম আচরণ করছে, তেমনটা করতে একে আগে দেখিনি। আজ যেন এটাকে একটু বেশিই হিংস্র, একটু বেশিই অপ্রতিরোধ্য লাগছে।”

অভী বলল, “কোনো কারণ বুঝতে পারছেন?”

“এখনও পারছি না। দেখি মন্দিরের ভেতরে গিয়ে দেবীর সঙ্গে দেখা করলে কিছু বোঝা যায় কিনা।”

অভী ভাবছে, উর্মি বলেছিলেন, দ্রষ্টাদেবীর সঙ্গে শেষমুখের কিছু একটা গোপন সংযোগ আছে। কী হতে পারে সেটা? দেবীর কাছে ওই অত সাদা রেশমি রুমাল ছিল কেন? শেষমুখের ব্যাপারে সে যখন জিজ্ঞাসা করেছিল, দেবী তখন স্পষ্ট কোনো উত্তর দিলেন না কেন?

ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকারটা, যেন হঠাৎ খুব শীত করছে তার। মন্দিরের সামনে পৌঁছোতে পৌঁছোতে তাদের মাথার উপরের আকাশে তারাগুলো ঢাকা পড়ে গেছে আষ্টেপৃষ্ঠে মুড়ে ফেলা ভারি কালো চাদরে। ভয় ভয় ভাবটা অভীকে যেন আবার গ্রাস করে নিতে চাইছে; বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধকধক করছে জোরে জোরে। সে ডাকল, “রাজকন্যা, আলো জ্বলে নিন। আর সহ্য করা যাচ্ছে না এই অন্ধকার।”

উর্মির হাতে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল সাদা আলোটা। সেই আলোতে পিছিয়ে যেতে থাকল জীবন্ত আঁধারের কালো ওঁড়গুলো; অভী একবার বুক ভরে শ্বাস নিল।

ভাঙা, জরাজীর্ণ মন্দিরদ্বারের সামনে পড়ে থাকা জিনিসটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন উর্মি। “অভী, ওই দেখো।”

আলোটা জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটা অভীরও চোখে পড়েছিল। একটা কী যেন পড়ে আছে মন্দিরে প্রবেশপথের ঠিক সামনে। কী ওটা? একটা... একটা

দেহ... একটুও নড়ছে না!

উর্মির পাশে পাশে অভী এগিয়ে গেল। একটা মৃতদেহই বটে। গভীর অন্ধকার এতক্ষণ ঢেকে রেখেছিল একে; উর্মির আলোটা এগিয়ে আসতে অন্ধকারটা যেন অনিচ্ছাসহকারে পিছিয়ে ঢুকে গেল শুকনো শ্যাওলামাথা মন্দিরের চৌকোনা দরজার মধ্যে। দেহটা দেখে উর্মি গলার মধ্যে একটা ভয়-বিস্ময় মেশানো শব্দ করলেন।

“প্রফুল্ল!”

দু’জনে হাঁটু গেড়ে বসলেন দেহটার দু’পাশে। উর্মি হাত রাখলেন তার গায়ে। “এখনও গরম। তার মানে, বেশিক্ষণ আগে মারা যায়নি।”

অভী প্রফুল্লের নিখর দেহটার জামার হাতা গুটিয়ে তুলল উপর দিকে। তার দেওয়া বরফের ছুরির কাটা দাগটা প্রত্যাশামতোই পাওয়া গেল মৃতের কবজিতে। অভী বলল, “এই তো। এই লোকই সেদিন মরুময়ের মেঘনির্মাণশালায় আক্রমণ করেছিল আমাকে। কিন্তু তাহলে...”

উর্মি বললেন, “প্রফুল্লই যে শেষমুখ, তুমি সন্দেহ করেছিলে আগেই। কিন্তু তাহলে আমাদের এখানে ডাকল কেন ও, আর ওকে মারলই বা কে?”

কার যেন পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরের মধ্য থেকে। উর্মি অবাক হয়ে বললেন, “আলো ছাড়া ও মন্দিরে ঢুকল কে? কে আসছে ওখান থেকে?”

কোমর থেকে চন্দ্রহাস নিষ্কাশন করে উর্মিকে আড়াল করে দাঁড়াল অভী। “রাজকন্যা উর্মি, আপনি আমার পেছনে দাঁড়ান।”

“কেন?”

“যা বলছি, শুনুন। যে লোকটা ভেতর থেকে আসছে, তার উদ্দেশ্য ভালো হতে পারেনা। আমার অনেক প্রিয়বন্ধুকে হারিয়েছি আমি। আপনাকেও হারাতে চাইনা।”

উর্মি হাসলেন। “সত্যি?”

শুধা থেকে বেরিয়ে এল শেষমুখ; এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।

অভী চন্দ্রহাস তুলে ধরল। “কে তুমি?”

মুখোশটা খুলে ফেলে হাসল সে। “এত বোকা তুমি, অভী? আমি ভেবেছিলাম, তুমি অনেক আগেই বুঝতে পেরে যাবে।”

অভী তাকিয়ে রইল তার দিকে। “সৌজন্য!”

“হ্যাঁ, কিন্তু তোমার তাতে এত অবাক হওয়ার কী আছে? তোমার থেকে অনেক বেশি অবাক আমার এই ছোটো বোনটি হয়েছে, বুঝতে পারছ না?”

উর্মিও স্তম্ভিত। “দাদা, তুমি? আমি ভেবেছিলাম, তুমি...”

“মরে গেছি? ভাগ্যিস ভেবেছিলে, নয়তো তোমার পিতাশ্রী আবার ধরে এনে মারতেন। এবার আর নিজের হাতে বিষ খাওয়াতেন না, মাথাটাই কেটে ফেলতেন।”

অভী অবাক হয়ে বলল, “তোমাকেই বিষ খাইয়েছিলেন রাজা?”

সৌজন্য বলল, “বিশ্বাস হল না? আমার বোনটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। রাক্ষসরাজ পুনর্বসু নিজের হাতে আমাকে খাইয়েছিলেন ওই বিষ। আমার বোন

অবশ্য তাতে আপত্তি করেনি। করবেই বা কেন? নিজের ভবিষ্যৎ সিংহাসন সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা হচ্ছে দেখলে আপত্তি করে কোন্ মূর্খ?”

উর্মি বললেন, “একদম বাজে কথা বোলো না। পিতা তোমাকে বিষ খাইয়েছিলেন, তাতে আমার কোনো সায় ছিল না; আমি তখন নিতান্তই ছোটো ছিলাম, আর এসব ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য পিতা শুনতেনও না। আর তুমিও তো নেহাত নিষ্পাপ শিশুটি ছিলে না। বিমোহকদের খেপিয়ে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলে। পরাজয়ের পরিণাম আমাদের রাক্ষস আইনে কী হয়, তা কি তুমি জানতে না? এই ব্যাপারটাতে পিতা তোমার সঙ্গে যা করেছিলেন, সেটা নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু বেআইনি নয়। তুমি যদি বিদ্রোহে সফল হতে, তুমিও পিতার জন্য একই ব্যবস্থা করতে – হয়তো আমার জন্যেও।”

হাসল সৌজন্য। “মামাতো দাদার প্রতি এইটুকু ভরসাও নেই দেখছি তোমার, উর্মি। ভালো কথা, অভী, চন্দ্রহাসটা কোমরে গুঁজে নাও আবার। মাটিতে ফেলে দিতেই বলতাম, কিন্তু আমি চাইনা পরে কেউ এখানে এসে খোঁজ করে জানতে পারুক, তোমরা এখানে এসেছিলে।”

অভী অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরল। “কীসের দুঃখে চন্দ্রহাস কোমরে গুঁজে রাখতে যাব? এই মুহূর্তেই কেন তোমার মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করে দেব না, তার একটাও কারণ দেখাতে পারবে তুমি?”

“পারব। সেই জন্যই কথাটা বললাম।” সৌজন্য হাসল। “আমার শরীরে রক্তপদ্মরাগ না থাক, বজ্রমাণিক আছে। প্রফুল্লের শরীরেও ছিল। বজ্রমাণিক শরীরের মধ্যে থাকলে জীবন্ত আঁধার তাকে খুঁজে পায় না, তাই আমরা নিশ্চিন্তে যাতায়াত করতাম এই মন্দিরে। এই মুহূর্তে মন্দিরের মধ্যে দ্রষ্টাদেবী স্বয়ং জীবন্ত আঁধারের কবলে আছেন; হ্যাঁ, তাঁর নিজের মাথা থেকে বেরনো উন্মত্ত অন্ধকার তাঁকে গিলে খেতে চলেছে, আর আমি যদি গিয়ে আমার বজ্রমাণিক দিয়ে তাঁকে উদ্ধার না করি, তাহলে বুঝতেই পারছ তাঁর জন্য কী পরিণাম অপেক্ষা করছে। তোমরা যদি কোনোরকম গন্ডগোল পাকাও, তাহলে উনি আর জীবন্ত থাকবেন না।”

অভী চন্দ্রহাসকে আবার গুঁজে নিল কোমরে। উর্মি বললেন, “ঠিক এই বিষাক্ত স্বভাবের জন্যই ভরসা করার মতো লোক তুমি ছিলে না কোনোদিনই। আমাদের পরিবার তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে বড়ো করেছিল, আর আমাদের বিরুদ্ধেই তুমি ষড়যন্ত্র করেছিলে। বাবার দেওয়া বিষটা থেকে কী করে বাঁচলে, সেটা অবশ্য এবার বুঝতে পারছি। শরীরে বজ্রমাণিক ছিল বলে ওই বিষ কাজ করেনি তোমার উপর। তুমিও খুব চালাক – তুমি যে বজ্রমাণিকের আধার, এ কথাটা কাউকে জানতে দাওনি এতদিন।”

“দিলে কি আর আজ তোমার আমার এই সুন্দর সাক্ষাৎকারটা সম্ভব হত, বোন? অবশ্য আমি সদ্যই চেয়েছিলাম তোমাকে পরপারে পাঠাতে; রাজা পুনর্বসু আমাকে যেভাবে মারতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতেই তাঁর নিজের মেয়েকে খতম করতে পারলে ন্যায়বিচারই হত। কিন্তু হতভাগা অর্ধরাক্ষস প্রফুল্লটা ভালোবেসে ফেলেছিল তোমাকে। তুমি উপস্থিত থাকতে দুই

সমরোত্তমকে বজ্রমাণিকের বিষটা দ্বিতীয়বার দেওয়া যাচ্ছিল না। তাই প্রফুল্লকে বললাম, তোমাকে বিষ দিতে। আমার আদেশ ও ফেলতে পারেনি পুরোপুরি, তাই তোমার খাবারে বিষটা মিশিয়েছিল বটে, কিন্তু ইচ্ছা করেই মাত্রাটা কম দিয়েছিল।”

অভী বলল, “তোমরা দু’জনে মিলে শেষমুখের অভিনয় করছিলে, না?”

সৌজন্য দাঁত বার করে হেসে উঠল। “চমৎকার বুদ্ধিটা, বলো? শেষমুখ যে কী করে দু’জায়গাতেই একসঙ্গে কাজ করছে, সেটা কেউ ধরতেই পারেনি। আমি নিয়েছিলাম সমরগরিমার দায়িত্ব, আর ওকে দিয়েছিলাম মাল্যপর্বত। আমার পুরোপুরি আজ্ঞাবহ ছিল ও – আমি ছিলাম রাক্ষস রাজবংশের ছেলে, আর ও বেচারী গরিব অর্ধরাক্ষস; একটাই মিল ছিল দু’জনের মধ্যে – একটা অদ্ভুত মিল। আমরা দু’জনেই ছিলাম অন্তর্লীন বজ্রমাণিকের অধিকারী। সুতসোমের মতো অত বিশাল মাপে না হলেও দু’জনেই রীতিমতো সক্ষম ছিলাম আমাদের শরীরে নিয়তির দেওয়া এই উপহারটির সদ্ব্যবহার করতে।”

অভী খেয়াল করে দেখল, এরও হাতের মধ্যে এখন জ্বলজ্বল করছে বজ্রমাণিকের বেগুনি আলো। উর্মি বললেন, “প্রফুল্ল ভালো ছেলে ছিল। তোমার পাল্লায় পড়ে ও শেষ হয়ে গেল।”

“আমার পাল্লায় পড়ে?” মুখ বিকৃত করল সৌজন্য। “নিজেদের দোষগুলো এবার অন্যের স্কন্ধে চাপানোর অভ্যাসটা তোমাদের বন্ধ করতে হবে, উর্মি। এ কথা ঠিক, প্রফুল্লকে আমি লোভ দেখিয়েছিলাম, আমার কথা শুনে শেষমুখের কাজ – মানে, মাঝে মধ্যে লুকিয়ে দু’চারটে খুচরো খুনখারাপি – করে চললে রাজপ্রাসাদে সুখে থাকা এবং অটেল সুখাদ্য এবং জলের সুবিধা ও পাবে। তার সঙ্গে উপরি পাওনা, রাজকন্যার সান্নিধ্য। ওর যে তোমার প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল, আমি জানতাম, এবং আমি তার সুযোগ নিয়েছিলাম। মরুময়কে ধরে রাজকন্যার দেহরক্ষী ও সর্বক্ষণের সহচর হিসাবে একটা কাজ ওকে জুটিয়ে দিতে আমার অসুবিধা হয়নি। মরুময় আমার কথা শোনে, কারণ ওঁর অনেক আইনবহির্ভূত কাজ আমি করে দিই। কিন্তু প্রফুল্লের এই অবস্থা ঘটানোর পেছনে দায়ী কে? তোমরা – তোমরা পত্রতিলক রাজবংশ – বা, আরও পরিষ্কার করে বললে, তোমার পিতা মহারাজ পুনর্বসু – আর কেউ নয়।”

উর্মি ভ্রুকুটি করে বললেন, “মানে?”

“মানেটা বলছি আরেকটু পরে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকলে দেখবে তোমাদের জন্য আরেকটা চমক অপেক্ষা করছে। মানেটা তখনই বুঝবে।”

“প্রফুল্লকে মারলে কেন?”

“সেও তোমারই জন্য, বোন আমার। প্রফুল্ল কাজের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসাকে গুলিয়ে ফেলছিল। ওর মতিগতি যে ঠিক নেই, আমি বুঝতে পারলাম যখন আমার অনুমতি ছাড়াই শেষমুখের বেশে ও অভীকে আক্রমণ করে বসল। তখনই বুঝেছিলাম, ব্যাটার মন অন্যদিকে ঘুরেছে। তারপর ওকে আদেশ দিলাম, তোমার খাবারে বিষ মেশাতে। আন্দাজ করেছিলাম, ও তোমাকে মারতে পারবে না। তাই হল। তখনই বুঝে গেলাম, এবার ওকে ছুটি দেওয়ার সময় এসে গেছে। এখানে ডেকে আনলাম ওকে, আর পেছন থেকে ছুরি মেরে খতম

করে দিলাম। অবশ্য আমার যা পরিকল্পনা ছিল, তাতে ওকে শেষমেশ মরতেই হত। আজ শুধু শুভকাজটা দেরি না করে সেরে ফেললাম।”

অভী বলল, “কিন্তু আমাদের সমরগরিমায় তুমি গিয়ে উদয় হলে কেন?”

সৌজন্য অলসভাবে হাত নাড়ার একটা ভঙ্গি করল। “সমরগরিমা আমার জন্য বেশি নিরাপদ ছিল। ওখানে যাওয়ার আগে অবশ্য আমি এই মাল্যপর্বতেই ছিলাম অনেক দিন লুকিয়ে; মরুময় আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ছদ্মবেশে রাক্ষস বাহিনীতে বেশ কিছুদিন রীতিমতো যুদ্ধবিদ্যার প্রশিক্ষণও নিয়েছি আমি। কিন্তু সমরগরিমায় না গেলে অর্ধরাক্ষসদের বিরুদ্ধে কাজটা শুরু করতে পারছিলাম না। অভী, আমি অপেক্ষা করছিলাম উপযুক্ত সময়ের। শর্বর যে সমরগরিমার বিরুদ্ধে একটা অভিযান করতে চলেছে, সেদিকে আমার নজর ছিল। সে মরার পরেই আমি আর দেরি করিনি। ঐশিকরাও ক্রুদ্ধ হয়েই ছিলেন যুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর থেকে। তাঁরা চাইছিলেন প্রলয়যোদ্ধার মৃত্যু; আর এদিকে আমিও চাইছিলাম আমার সিংহাসনের কাঁটা দূর করতে। তাঁরা তোমাকে ধ্বংস করার জন্য আমার সাহায্য চেয়েছিলেন, আর তার বদলে আমাকে কথা দেওয়া হয়েছে, রক্ষোপুরীর সিংহাসন আমার হবে। উর্মি, আমার শত্রুতা যা কিছু আছে, তা শুধু তোমার সঙ্গে। তুমিই ছিলে বরাবর আমার আসল লক্ষ্য; অভী তো উপলক্ষ্য মাত্র।”

অভী আর উর্মি পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। সৌজন্য ভালোমতোই ফাঁদে ফেলেছে তাঁদের।

অভী প্রশ্ন করল, “কিন্তু অর্ধরাক্ষসদের উপর এত রাগ কেন তোমার?”

সৌজন্য বলল, “আরে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে কিছু সাধারণ সৈনিকের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় বৈকি। ওরা সেই দাবার বোড়ে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। দু’চারটে অর্ধরাক্ষস মরলে তো বেশ মজাই লাগে।”

“শুধু তার জন্য এত?”

“না, শুধু তার জন্য নয়,” সৌজন্যের গলা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। “অভী, আমি যখন গতবার মহারাজ পুনর্বসুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম, তখন মাল্যপর্বত তো বটেই, সমরগরিমার অর্ধরাক্ষসরাও ওখান থেকে সমর্থন করেছিল তাঁকে। তাদের ধারণা ছিল, আমি নাকি অযোগ্য শাসক, এবং আমি সিংহাসনে বসলেই নাকি সমরগরিমা আক্রমণ করব। এই ধারণা অবশ্য রাজা পুনর্বসুই ছড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন প্রতিবেশী দেশে – অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সমরোত্তমদের প্রসন্ন রাখতে, যাতে তাঁরা এক কিশোরকে বিষ খাইয়ে মারার ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ না করেন।”

একটু থেমে সে আবার বলল, “বজ্রধরের নির্দেশে সমরগরিমা আমাদের মাল্যপর্বতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলায়নি। এখানে রাজা আমাকে বিষ খাওয়ানোর পর সুদক্ষিণসারিতে উৎসব পালন করা হয়েছিল এই জন্যে যে তারা নাকি একটা বিরাট আক্রমণ থেকে বেঁচে গেল। ওই জাতটার বিরুদ্ধে নিয়ামককে দিয়ে আমি যা যা করিয়েছি, তার পুরোটাই ওদের প্রাপ্য। না, আমি প্রতিশোধে বিশ্বাসী নই, এখনও বলব। ওরা আগুনে হাত দিয়েছিল, তাই হাত পোড়াটা ওদের ন্যায্য পাওনাই ছিল।”

অভী বলল, “কিন্তু তোমার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। অর্ধরাক্ষস নেতারা সবাই বেঁচে গেছেন।”

হা হা করে হেসে উঠল সৌজন্য। “তাই নাকি? তাই নাকি? বড্ড বোকা তুমি, অভী। শুধু অর্ধরাক্ষস নয়, আমার নিশানা যে পুরো সমরগরিমা। দু’চারটে তুচ্ছ অর্ধরাক্ষসকে মারার চেয়েও বড়ো পরিকল্পনা আছে আমার। এখন সমরগরিমার অবস্থা জানো? অর্ধরাক্ষসরা কেউ আর নিয়ামককে পছন্দ করেনা। এদিকে বজ্রমাগিকের প্রভাবে নিয়ামককে দিয়ে লেখানো সেই যুদ্ধঘোষণার চিঠি আমি পৌঁছে দিয়েছি রাক্ষসসভায়। যেকোনো মুহূর্তে যুদ্ধ লাগবে। তখন অর্ধরাক্ষসরা আর কেউ নিয়ামকের হয়ে তাঁর সেনাদলের সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ করবে ভেবেছ? এখন সমরগরিমার শক্তি বলতে কিছু মানুষ সৈন্য আর শিক্ষার্থীরা। দু’জন সমরোত্তম এখানে আছেন, তাঁরা সহজে আর ফিরছেন না ওখানে। বাকি দু’জন সমরোত্তম কতটুকুই বা সামলাতে পারবেন আমাদের বিপুল রাক্ষসসেনাকে? সমরগরিমার পতন অনিবার্য, আর ঐশিকরা তাতে ভীষণ খুশি হবেন।”

উর্মি ভয়ানক ভ্রুকুটি করে গুনছিলেন। তিনি এতক্ষণে বললেন, “কিন্তু এত কিছু করার তো দরকার ছিল না। আমাকে হত্যা করা এতই কি কঠিন ছিল তোমার কাছে?”

সৌজন্য গরগর করে বলল, “না, খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বোকা-বোকা আইনটার জন্যই তো এতদিন অপেক্ষা করতে হল। আইনে পরিষ্কার বলা আছে, রাজার সন্তান রাজা হবে। তোমার বাবার পরে তুমি বসবে সিংহাসনে; পত্রতিলকদের গোষ্ঠীই রয়ে যাবে ক্ষমতায়। আমি তোমার মামাতো দাদা এবং জাতিতে বিমোহক। সিংহাসনে বসার কোনো উপায়ই আমার আইনত নেই। কিন্তু তুমি বা তোমার অপদার্থ পিতার তুলনায় আমি অনেক ভালো রাজ্যশাসন করতে পারতাম।”

উর্মি চাপা গর্জন করলেন। “মুখ সামলে, দাদা!”

“শুধু মুখ কেন, সবকিছুই তো এতদিন সামলে চলেছি, বোন। খুব সামলেই তো বিনীতেশকে একটু একটু করে বিষ দিয়ে অর্ধরাক্ষসদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা কাজ করিয়ে নিয়েছি। খুব সাবধানেই জতুগৃহ তৈরি করিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অর্ধরাক্ষস নেতাদের ওখানে নিয়ে যাওয়ার পথ প্রস্তুত করেছি। ওরা মরলেই আমি খুশি হতাম, কিন্তু এখন আমাকে রাজা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সমরগরিমার অর্ধরাক্ষসদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। লীনাকে হত্যা করার বুদ্ধিটা ঐশিকদের আমিই দিয়েছিলাম। আর অন্ধকার পীতপত্রবনের মধ্যে নিধির দিকে কে ছুড়েছিল বজ্রমাগিকের বিষমাখানো তিরটা? উঁহঁ অভী, এখানে হিমকুশলতা প্রয়োগ করতে যেও না। বিপদ তোমাদেরই। বোনটি, অভীকে একটু কারণটা বুঝিয়ে দেবে?”

উর্মি একবার চারপাশের অন্ধকারটাকে দেখে নিলেন, তারপর বললেন, “অভী, আমরা এখন জীবন্ত আঁধারের এলাকায় আছি। এটা কী করে, বলেছিলাম তো তোমাকে – যাবতীয় আলো আর শুভচিন্তাকে গিলে খায় এই অন্ধকার। এখানে যদি হিমকুশলতা প্রয়োগ করো, তাহলে ওই ঠান্ডার লোভে ও ছুটে

আসবে এই আলো অগ্রাহ্য করে, আর পলকের মধ্যে তোমাকে গ্রাস করবে।”

অভী চুপ করে রইল। সৌজন্য ছদ্ম-বিনয়ে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানাল। “অনেক ধন্যবাদ, উর্মি। অভী, আমার গল্পটা তোমাকে বলতে ইচ্ছা করছে খুব। কীভাবে ঘটনাগুলো ঘটল, পরপর ভেবে দেখো। তোমার রবিকাকাকে আক্রমণ করে দৃশ্যগুলো স্বপ্ন-উপলে ধরে রেখে সেটা পাঠিয়ে দিলাম তোমাদের আয়তনে, কারণ জানতাম, তুমি তোমার কাকার খোঁজে ঠিক আসবে। তুমি চলে যেতেই নিয়ামক বিনীতেশের কাছে গিয়ে তাঁকে বজ্রমাণিকের সম্মোহন মায়া প্রয়োগ করে আমাকে সহনিয়ামক পদে নিযুক্ত করতে বাধ্য করলাম। নিয়ামক তোমাদের এখানে আসবার অনুমতি দিতে চাননি, কিন্তু মনে আছে নিশ্চয়, আমিই তোমাদের অনুমতিপত্র জোগাড় করে দিয়েছিলাম? তোমার চন্দ্রহাস জড়বস্তুর উপর কতটা কাজ করে, সেটাও দেখতে চেয়েছিলাম আমি। কেন? সে রহস্য আপাতত রহস্যই থাক। তারপর অভী, তোমার মিথ্যা অসুস্থতার কথা লিখে সমরগরিমায় চিঠি দিলাম, যাতে সমরোত্তম শ্যামশ্রী সমরগরিমাকে অসুস্থ নীলাভ্রর হাতে রেখে এখানে চলে আসেন।”

অভী বলল, “তাতে তোমার লাভ কী হল? বাবা ওখানে সবকিছুই ঠিকমতো সামলেছে।”

“আরে, আমার কাজ তো ছিল এখানে। দুই সুস্থসবল মহাযোদ্ধা – সমরোত্তম মেঘবর্ণ আর সমরোত্তম শ্যামশ্রী – এই দু’জনকে এখানে আনাই ছিল আমার লক্ষ্য। এঁদের নিয়ে আরও বিরাট কিছু করার পরিকল্পনা আছে আমার। কিন্তু সেসব শুনে আর তোমার কাজ নেই, অভী, কারণ পরিকল্পনার সেই অংশ যখন শুরু হবে, তখন তুমি আর বেঁচে থাকবে না। অবশ্য তার কিছুটা তুমি নিজের চোখেই দেখেছ। ওঁরা দু’জন বিষের প্রভাবে কীরকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করছেন, খেয়াল করেছ নিশ্চয়?”

ভয়ে অভী কেঁপে উঠল। শয়তানটা অসুস্থ মা আর মেঘবর্ণকে নিয়ে কী করতে চায়?

উর্মি ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, “এসব করে তোমার কী স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে? যুদ্ধ বাধলে তোমার কী লাভ?”

সৌজন্য হেসে বলল, “আমারই তো লাভ। প্রথমত, যাঁদের হয়ে আমি অনেক কাজ করি এবং যাঁরা আমার উপর বেশ প্রসন্ন, সেই ঐশিকরা একটা যুদ্ধ চান। একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধলে তাঁদের পুষ্টি। আর যুদ্ধে যে পক্ষই জিতুক, আমারই লাভ। যদি সমরগরিমা জেতে, রাক্ষস আইন রাজা পুনর্বসুর বিপক্ষে যাবে। মাল্যপর্বতের রাজকীয় উত্তরাধিকার আইনে স্পষ্ট বলা আছে, একজন রাজাকে তখনই সিংহাসনচ্যুত এবং পরিবর্তনযোগ্য ধরা হবে, যদি তিনি মারা যান বা বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হন।

“আর যদি রাক্ষসরা জেতে, তাতেও আমার আপত্তি নেই। তখন রাক্ষসরাই দখল নেবে সমরগরিমার। তখনও আমারই লাভ, কারণ উর্মি, আজ তুমি আর ফিরছ না এই মন্দির থেকে, আর ওদিকে তোমার পিতা মহারাজকে মহামন্ত্রী মরুময় রোজ অল্প অল্প বিষ দিয়ে চলেছেন তাঁর খাদ্যে। মহারাজের চোখের কোলে কালি পড়েছে, খেয়াল করেছ হয়তো। হাতের শিরাগুলোও ফুটে উঠছে

চামড়া ভেদ করে। আর মাসখানেক এই কাণ্ড চালাতে পারলেই উনিও পাড়ি দেবেন ওপারে। তখন সমরগরিমা আর মাল্যপর্বত - একসঙ্গে দুটো রাজ্যের রাজা হয়ে বসতে আমার আর কোনো বাধা থাকছে না - কারণ গোটা রাক্ষস রাজবংশের একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী আমিই থাকছি।”

অভী আর উর্মি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কী প্রচণ্ড শয়তানি চাল চলেছে লোকটা!

সৌজন্য ডাকল, “এসো, এবার মন্দিরের মধ্যে এসো। একটা দারুণ জিনিস দেখে যাও।”

চৌকো দরজা পেরিয়ে ওরা ঢুকল মন্দিরের মধ্যে। এখানে অন্ধকারটা আরও ভয়ানক হয়ে উঠেছে - যেন ভারি, কালো কাদার একটা স্রোত - তাকে ঠেলে ঠেলে এগোতে হচ্ছে। উর্মির হাতের আলোটা না থাকলে এই প্রচণ্ড কালো অস্তিত্বটা ওদের দম চেপে মেরে ফেলত এতক্ষণ। অভীর মনে হল, অন্ধকারটা যেন ফিশফিশ করে কীসব অসংলগ্ন কথা বলছে তার কানে।

সৌজন্য বলল, “উর্মি, তোমার আলোটা এইদিকে একবার দেখাও তো।”

মন্দিরগৃহের অনেকটা ভেতরে ঢুকে এসেছে ওরা। উর্মি তার কণ্ঠস্বর শুনে সেই দিকে আলো ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন তিনি।

অভীও কম অবাক হয়নি।

দ্রষ্টাদেবী পড়ে আছেন মাটিতে; তাঁর চোখ খোলা, সে চোখ স্থির হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। একবার দেখলেই বোঝা যায়, দেহে প্রাণ নেই।

অভী বলল, “তুমি যে বলেছিলে, উনি বেঁচে আছেন - জীবন্ত আঁধারের কবলে আছেন?”

সৌজন্য বলল, “মিথ্যে বলেছিলাম। এইটুকুতে কী আর এমন অন্যায় হল? আগে ছেলেকে মেরেছি বাইরে, তারপর ভেতরে ঢুকে মেরেছি মা-কে।”

অভীর চোখের বিস্ময় দেখে হেসে উঠল সে। “জানতে না, না? দ্রষ্টাদেবী বিবাহ করেছিলেন, তাঁর স্বামীকে রাজা পুনর্বসু হত্যা করেন, এসব গল্প শোনোনি আগে? সেই বিবাহের পরে একটি সন্তান হয়েছিল - সে-ই প্রফুল্ল। আমি যখন তাকে বললাম, রাজা পুনর্বসুর সর্বনাশ করার জন্য তার সাহায্য চাই, সেই ছেলে মহানন্দে রাজি হবে না? প্রফুল্লকে তোমরাই অপরাধী হওয়ার জমি তৈরি করে দিয়েছিলে, উর্মি; আমি শুধু বীজটি বুনে দিতেই সে শেষমুখের অর্ধাংশ হয়ে উঠেছিল।”

উর্মি চুপ করে রইলেন। সৌজন্য আবার বলল, “দ্রষ্টাদেবী আমাদের ভালো মানের সাদা রুমাল সেলাই করে দিতেন। শেষমুখের অস্তিত্বটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে তৈরি করার জন্য ও জিনিসটা খুব কাজে দিয়েছিল।”

অভীর মনে পড়ছিল শেষমুখের কথা জানতে চাওয়ায় দ্রষ্টাদেবীর শেষ উত্তর। “অন্ধ কি আর দেখতে পায়? যে জিনিস আমি দেখতেই পাই না, তার সম্বন্ধে বলব কী করে?”

ভালোবাসা অন্ধ করে রেখেছিল তাঁকে। তাই নিজের ছেলের সম্বন্ধে আর কিছু তিনি বলতে চাননি।

নিজের নিয়তিও যে তাঁকে টানছে মৃত্যুর দিকে, এত বড়ো দ্রষ্টা হয়েও

জানতে পারেননি তিনি।

সৌজন্য যখন কথা বলল, তখন তার গলাটা ভেসে এল দূর থেকে। “এবার আমার বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমি বেরিয়ে এসেছি দরজার বাইরে। উর্মি, যেটুকু আলো তোমার কাছে আছে, ও দিয়ে আর বেশিক্ষণ তুমি এই অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। মন্দিরের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছি মায়া দিয়ে। সেই মায়া ভঙ্গ করে দ্বার খুলতে পারা যাবে না, এমন কথা বলছি না। কিন্তু ওতে যতটা সময় লাগবে, ততক্ষণ তোমরা টিকবে না। এখান থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে তোমাদের ফেরার পথটাও আমি ধ্বংস করে দিয়ে যাচ্ছি।”

অভী চন্দ্রহাস নিয়ে লাফ দিয়ে উঠল। “সৌজন্য, আমাদের এখানে রেখে তুমি ফিরতে পারবে, এমনটা ভুলেও ভেবো না।”

সৌজন্য হেসে উঠল। “তাই? উর্মির হাত থেকে যে আলোটুকু বেরোচ্ছে, তার এলাকার বাইরে এসে দেখো তো, কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারো এই জীবন্ত আঁধারকে এড়িয়ে? না, সুতসোমের দেওয়া বজ্রমাণিক এক্ষেত্রে কাজ করবে না। বাহ্যিকভাবে কারও উপর অন্য কোনো বজ্রমাণিকের মায়া প্রযুক্ত হলে তুমি তাকে সাময়িক ভাবে খণ্ডন করতে পারবে ওটা দিয়ে; কিন্তু তুমি ওই মণির ধারক ছিলে না কখনও। জীবন্ত আঁধারকে ও দিয়ে বোকা বানাতে পারবে না। আর একটা ব্যাপার জানো কি? সুতসোম নিজেই আসতে পারত না এই মন্দিরে। ওর শরীরে থাকা অবস্থায় ওর ওই বজ্রমাণিকটা এত জোরালো বিকিরণ করত যে জীবন্ত আঁধার এই মন্দির থেকে ছাড়া পেয়ে গোটা রাক্ষসরাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারত। দ্রষ্টাদেবীই নিষেধ করে দিয়েছিলেন, ও যেন কখনও এখানে না আসে। তাই যতটুকু পারো, ওই আলোর সীমার মধ্যে থাকো।”

তার জামার কোণ ধরে উর্মি টানলেন। “ও ঠিকই বলছে, অভী। কাছাকাছি থাকো। এই আলোকবৃত্তের বাইরে যেয়ো না।”

অভী বলল, “আপনিও চলুন। আমাকে ঘিরে রাখুন আলো দিয়ে; আমি ওর সব শয়তানি বার করে দিচ্ছি।”

ম্লান হাসলেন উর্মি। “আমি তোমাদের মতো যোদ্ধা নই, অভী। এত দৌড়ঝাঁপ আমার দ্বারা হবে না। তার উপর প্রফুল্লের দেওয়া বিষ আমাকে শারীরিক ভাবে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। আর আমরা ওকে ধরার আগেই ও পালাবে। সব দিক ভেবেই ও আজ আমাদের ডেকেছে এখানে, বুঝতে পারছ না?”

বাইরে থেকে হেসে উঠল সৌজন্য। “এই জন্যই তোমাকে এত পছন্দ করি, বোন। পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে, বুঝে নিতে তোমার জুড়ি নেই। অভী, তুমি বেশ বোকাসোকাগোছের ছেলে বলেই তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি এবার কী হতে চলেছে। খেয়াল করলে দেখবে, দ্রষ্টাদেবীর শরীরটার উপরে অন্ধকারটা একটু বেশিই ঘন হয়ে এসেছে, তাই না?”

অভী আবার ফিরে তাকাল মৃতদেহটার দিকে। ঠিকই বলেছে সৌজন্য। একটা মিশকালো মেঘের মতো জিনিস যেন ঘিরে ফেলেছে দ্রষ্টাদেবীর দেহটাকে, পাকিয়ে পাকিয়ে ধরছে ধোঁয়ার তৈরি কুণ্ডলীর মধ্যে।

“জীবন্ত আঁধারের উৎস যিনি ছিলেন, তিনিই আর নেই,” সৌজন্য বলে উঠল। “তাই ওই নিয়ন্ত্রণহীন ভয়ানক জিনিসটা যে তাকে সৃষ্টি করেছিল, তাকেই খাচ্ছে লোভীর মতো। কিন্তু ওর খিদে খুব মারাত্মক, অভী। এতকাল পরে ও জ্যান্ত প্রাণীর স্বাদ পেয়েছে; দেখতে পাবে, অল্পক্ষণের মধ্যেই দেবীর শরীরে যতটুকু উত্তাপ আছে, সব ও চেটেপুটে খেয়ে শেষ করবে, আর পড়ে থাকবে একটা শুকনো হয়ে যাওয়া দেহ।”

সত্যিই তাই। কালো অন্ধকারটা পাকে পাকে জড়িয়ে নিচ্ছিল দ্রষ্টাদেবীকে; মুখটুকু শুধু দেখা যাচ্ছে তাঁর। সে মুখ ইতিমধ্যেই কেমন যেন ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য হয়ে এসেছে। অভী একবার নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল।

“দেবীকে খেয়ে ও নজর দেবে তোমাদের দিকে। উর্মি, যতটুকু সময় ওই অসুস্থ শরীর নিয়ে তুমি রক্তপদ্মরাগের আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারো, ততক্ষণই তোমাদের আয়ু। তারপর আর ওকে থামানোর কোনো উপায় নেই। না, চন্দ্রহাস দিয়েও কাজ হবে না, অভী। জীবন্ত আঁধার তো আর কোনো জ্যান্ত প্রাণী নয় যে তাকে তুমি ওই দৈব অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে পারো।”

ভীষণ অসহায় লাগছে অভীর। কী করবে, সে বুঝতে পারছে না। সৌজন্য বলে চলেছে, “ওর কাজ সারা হলে তোমাদের মৃতদেহগুলো যাতে এখানে আবিষ্কৃত না হয়, তার ব্যবস্থাও করে রেখেছি। অভী, তুমি একবার জ্যান্ত অবস্থায় পড়েছিলে নরকগহ্বরে, তাই ওখান থেকেও বেঁচে ফিরে এসেছিলে। এবার আমি আর সে ঝুঁকি নিইনি। তোমরা জীবন্ত আঁধারের হাতে মরার পর এখানে নরকগহ্বর খুলে যাবে। তোমাদের দেহগুলো সোজা গিয়ে পড়বে সেই নরকে, আর সঙ্গে সঙ্গেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমি যে এর সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত ছিলাম, তার আর কোনো প্রমাণ থাকবে না।”

অভী বলল, “তুমি এখন কী করবে, সৌজন্য?”

“আমি? আমি প্রফুল্লের দেহটা নিয়ে ফিরে যাব সমরগরিমায়; বলব, ‘দেখুন, এই হচ্ছে শেষমুখ; এ আমাকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু আমি একে মেরে ফেলেছি’। প্রফুল্লের শরীরে অন্তর্লীন বজ্রমাণিক আছে। তাই, ও-ই যে শেষমুখ, এটা কাউকে বিশ্বাস করাতে আমার অসুবিধা হবে না।”

“তারপর?”

“তোমরা তো মরেই যাবে, তাই এইটুকু কৌতূহল মেটানোয় কোনো দোষ দেখছি না। তারপর আমি ওর দেহটা চুপিচুপি নিয়ে যাব পীতপত্রবনে। ততক্ষণে যুদ্ধ লেগে যাবে; আমি কোথায় আছি, কী করছি, কেউ খোঁজ রাখবে না। ওখানে আমি একটা নরকগহ্বর আহ্বান করব। নরকগহ্বরের আগুনকে ঠিকমতো ডাক পাঠালে সে আগুন মাটির উপরেও উঠে আসে, তবে তার জন্য বজ্রমাণিক লাগে। ওই একই আগুন দিয়েই তো তৈরি হয় ওই মণি, তাই ও জিনিস নরকের আগুনকে তীব্র আকর্ষণ করতে পারে। তোমাদের সমরগরিমার গ্রন্থাগারেই এই বিষয়ে কত ভালো ভালো বইপত্র আছে। কম গবেষণা করেছি এই বিষ নিয়ে এতদিন?”

“প্রফুল্লের শরীরে যে বজ্রমাণিক আছে, তাই দিয়ে টেনে আনা হবে নরকের আগুনকে। ওই বিষাক্ত আগুন যদি একবার উঠে আসে, তাহলে সমরগরিমায়

বৃষ্টি-আকর্ষণকারী পীতপত্রবন জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। ওই আগুন থামানোর মতো, বজ্রমাণিকের বিষাক্ত আগুন নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো বিষনিয়ন্তাও আজ পর্যন্ত জন্মায়নি। তার ফলে ওই বনে সব গাছ, সব পশুপাখি পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। বুড়ো মরুময় খুশি হবেন। বজ্রধরের কাছে গতবার বেদম মার খাওয়ার পর থেকেই তাঁর ইচ্ছা, একদিন ওই বন তিনি ধ্বংস করে দেবেন, যাতে সমরগরিমা তাঁর কাছে একফোঁটা জলের জন্য নতজানু হয়ে ভিক্ষা চায়। ওঁর সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটাই এরকম – উনি আমার শত্রুকে নাশ করবেন, আর আমি ওঁর শত্রুকে। না অভী, ওই জঙ্গলে কত বন্য প্রাণী পুড়ে মরবে – ঐসব বাজে কথা আমাকে শুনিও না। তোমাদের প্রিয় অধিনায়ক বজ্রধরের মতো অবান্তর জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছা বা সময় কোনোটাই আমার নেই।”

অভী বলল, “তুমি চাইলেই নরকের আগুনকে টেনে আনতে পারো পীতপত্রবনে? এত বড়ো মায়াধর তুমি?”

সৌজন্য বলল, “এই বিষয়টা নিয়েই তো দীর্ঘদিন প্রচুর পড়াশুনা করেছি। নরকে গলন্ত আগুনের নদী দেখেছিলে না তুমি? কোথায় ওই নদীর উৎস জানো? বললে বিশ্বাস করবে না, ওটি বেরিয়েছে নরকের এক পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত একটি ছোট্ট শাঁখ থেকে। যদিও ওটার কাছে কেউ যেতে পারে না; এত তীব্র তাপ বিকিরণ করে ওই বিষনদীর উৎস যে, কেউ যদি ওর কয়েক হাতের মধ্যেও যায়, সে নীল হয়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। ওই বিষনদীর তরলই তো জমে তৈরি হয় বজ্রমাণিক, আর নিয়তির ইচ্ছায় আমাদের মতো রাক্ষসদের কেউ কেউ ওই একই উপাদান জন্মের সময়েই শরীরের মধ্যে নিয়ে জন্মাই। শরীরে বজ্রমাণিক আছে, এমন কেউ চাইলে ওই আগুনকে গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান করতে পারে। সেই কাজটাই আমি করব প্রফুল্লের শরীরটাকে ব্যবহার করে। ওই আগুন উঠে এলে শুধু পীতপত্রবন নয়, সমরগরিমারও অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে।”

অভী বলল, “কিন্তু তখন তো যুদ্ধ লেগে যাবে। অনেক রাক্ষসও তো মারা যাবে ওই আগুনে।”

সৌজন্যের হাসির শব্দ ভেসে এল অন্ধকারের ওপার থেকে। “যাক না। তাতে আমার কী? প্রজ্ঞা আর আলোকপর্ণ দু'জনেই রাজা পুনর্বসুর কাছের লোক। ওরা বা ওদের অনুগত সেনারা মরলে আমার কীসের ক্ষতি? মরুময়কে কথা দিয়েছি, পীতপত্রবন আমি ধ্বংস করে দেব। সে কাজ করতে গিয়ে যদি রাক্ষসপক্ষেরও কিছু লোক মরে, তাতে আমি অন্তত খুব একটা দুঃখিত হব না। যারা সময় থাকতে জটায়ু ডেকে আকাশে উঠে পড়তে পারবে, তারা বেঁচে যাবে, যদিও জটায়ু ডাকার সময় কতজন পাবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।”

উর্মি ঘৃণাভরে বলে উঠলেন, “মানুষ বা অর্ধরাক্ষসদের কথা ছেড়েই দিলাম; তুমি নিজে তো রাক্ষস। তবু রাক্ষসদের জীবনের এতটুকু দাম নেই তোমার কাছে? কেন করছ এরকম তুমি?”

সৌজন্য উত্তর দিল, “কেন করছি বলো তো? সত্যি কথা বলতে, ওই

মরুময়কেও আমি খুব একটা পছন্দ করি না। নিজে একজন ঐশিক, তার উপর আবার রাজাকে নানা ধরনের পরামর্শ দিতে ও খুব ভালোবাসে। ও এমন লোক, যে নিজে রাজা হতে চায় না, কিন্তু রাজা কী করবেন আর কী করবেন না, তার প্রতিটি বিষয়ে ওর বক্তব্য থাকা চাই। এই ধরনের লোকগুলো রাজার পক্ষে বিপজ্জনক। আমি সিংহাসনে বসলে ওর ডানা ছাঁটার অগ্রিম ব্যবস্থা করে রাখছি; তখন ওকে দায়ী করব এতগুলো রাক্ষসের মৃত্যুর জন্য।”

অভীর হাত ভীষণ ঠান্ডা হয়ে এসেছে; লোকটার প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। কিন্তু অবস্থা এমনই, হিমকুশলতা প্রয়োগ করার কোনো উপায়ই তার নেই। অসহায়ভাবে ঠোঁট কামড়াল সে।

উর্মি তার অবস্থাটা বুঝতে পারছিলেন। তিনি জোর গলায় বললেন, “তোমার বক্তৃতা বোধহয় শেষ হয়েছে, দাদা। এবার তুমি আসতে পারো।”

সৌজন্যের ব্যঙ্গমেশা হাসি ভেসে এল বাইরের অন্ধকার থেকে। “প্রফুল্লের সঙ্গে যা করতে হল, তার জন্য আমি দুঃখিত, বোন। জীবনে সে অনেক অন্যায় করেছে বটে, কিন্তু ছেলেটা সত্যিই তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসত। অভী, চললাম। জীবনের যে ক’টা মুহূর্ত বাকি আছে, এই অসামান্য মেয়েটির সঙ্গে উপভোগ করে নাও।”

সৌজন্যের পদশব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। অভী তাকাল উর্মির দিকে। তাঁর চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। অভী বুঝতে পারছে, আর বেশিক্ষণ এই আলো তিনি জ্বালিয়ে রাখতে পারবেন না।

উর্মি চুপ করে আছেন; কী যেন ভাবছেন। অন্ধকারটা যেন নেমে আসছে ছাদ থেকে ওদের মাথার উপরে; ঝুলছে একটা দানবিক মাকড়সা-জাতীয় কোনো প্রাণীর মতো অপেক্ষা করছে সঠিক সময়ের।

কে যেন ফিশফিশ করে উঠল অভীর কানে। “এসো, অভী, আমার কাছে এসো। সরে এসো এই অন্ধকারে।”

চমকে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। “কে? কে কথা বলছে?”

কোনো সাড়া নেই। অন্ধকারটা চুপ করে তাকে দেখছে।

উর্মি বললেন, “কী হল, অভী?”

“কে যেন আমাকে ডাকল!”

“কেউ ডাকেনি। এখানে ডাকার মতো কেউ নেই। যা শুনেছ, সব তোমার মাথার মধ্যে হচ্ছে। জীবন্ত অন্ধকার তোমাকে ওসব শুনতে বাধ্য করছে। ভুলেও ওতে কান দিও না।”

সেই স্বরটা আবার বলে উঠল, “অভী, তুমিও বরাবর এই অন্ধকারেরই অংশ ছিলে, এখনও আছ। আর আমিও তোমার অস্তিত্বের অংশ। এই যে তোমার মধ্যে এত ঘৃণা, এত শীতলতা – এ তো আমিই আছি তোমার মধ্যে। বেরিয়ে এসো ওই আলোর মধ্য থেকে; এসো আমরা এক হয়ে যাই।”

অভীর ভয় করছে। সে চন্দ্রহাসটাকে জড়িয়ে ধরে একটু সাহস পেতে চাইল, কিন্তু পারল না। হঠাৎ তার ভীষণ দুর্বল লাগছে। উর্মির হাতের আলোটাও যেন ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে।

উর্মি তার অবস্থা দেখে বললেন, “আমার এই ক্ষীণ আলো আর বেশিক্ষণ

নয়, অভী। দুর্বল লাগছে তো? আমারও লাগছে। অঙ্ককারটা একটু একটু করে আমাদের গ্রাস করে নিতে চাইছে। তার জন্য আমাদের মস্তিষ্কে ও এই ধারণা পাঠাচ্ছে যে আমরা দুর্বল, ওর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।”

অভীর কানে তখন অঙ্ককারটা ফিশফিশিয়ে বলছে, “অভী, তুমি তো আমিই। আমার মতোই তোমারও মধ্যে শুধু শীতলতা আছে। তীব্র ঘৃণার বিষ নিয়ে তুমিও তো ঠান্ডা হয়ে আছ। এত শীতলতা তোমার ভেতরে – তুমি আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না কোনোমতেই।”

উর্মি তার মুখের বিহ্বল অবস্থা দেখে আঁচ করে নিলেন ব্যাপারটা। “জীবন্ত আঁধার তোমাকে বাগে পাওয়ার জন্য অনেক মিথ্যে কথা বলবে, অভী। খবরদার ওর কথায় কান দেবে না। ও তোমাকে যাই বলুক, মিথ্যেই বলছে, নিশ্চিত থাকো।”

অভী জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, “না, মিথ্যে বলছে না তো। আমার মধ্যে প্রবল ঘৃণাই তো আছে।”

উর্মি বললেন, “তাহলে তো তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মায়াবিদ্যা অর্জন করতে পারো। ওই ঘৃণাকে ভালোবাসায় পরিণত করা যায়, কারণ ওই দুটো আবেগের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য। তা যদি করতে পারো, তাহলে সারা মায়াজগতের সবচেয়ে আশ্চর্য মায়া সৃষ্টি করার গৌরব তোমার হবে।”

অভী হতাশ সুরে বলল, “আমি জানি না ওইসব কঠিন মায়া কীভাবে করতে হয়। এই অঙ্ককারটা আমাকে ভেতর থেকে যেন শূন্য করে দিচ্ছে।”

উর্মি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “অভী, এখান থেকে বেরনোর একটা উপায় আছে।”

“কী?”

“আমার হাতে যেটুকু আলো তৈরি করতে পারছি, এইটুকুকে অগ্রাহ্য করে ইতিমধ্যেই জীবন্ত আঁধার আমাদের দুর্বল করে দিতে কিছুটা সক্ষম হয়েছে। এই প্রচণ্ড হিংস্র শক্তিকে যদি আটকাতে হয়, তাহলে আমাদের আরও আলো চাই।”

“কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? চন্দ্রহাস থেকে একটা আলো বেরোয় বটে, কিন্তু তাতে আদৌ কাজ হবে কিনা জানি না। আর এদিকে আমি অঙ্গটাকে তুলতেই পারছি না – আমার হাত অবশ্য হয়ে আসছে।”

উর্মি আরও কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত সুন্দর – জল টলটল করছে প্রান্তদুটিতে। অভীর মনে হল, কী যেন বলতে গিয়ে ইতস্তত করছেন তিনি; বলবেন কিনা ভাবছেন। অকারণেই তার বুকটা একবার ‘ধক’ করে উঠল ওই চাহনি দেখে।

তারপর তিনি বললেন, “তোমাকে একটা কথা বলার ছিল আমার, অভী। অনেকবার বলব বলে ভেবেছি, কিন্তু প্রতিবারই নিজেকে থামিয়ে দিয়েছি। আজকের এই অবস্থায় না পড়লে এই কথাগুলো কোনোদিনই হয়তো বলতাম না। কিন্তু আজ যেহেতু আমার পথ এইখানেই শেষ হচ্ছে...”

অভী বাধা দিয়ে বলল, “‘আমার’ বলছেন কেন? ‘আমাদের’ বলুন।”

“না, শুধু ‘আমার’। তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমার খুব ভালো লেগেছিল তোমাকে। মনে মনে ‘ভালোবেসে ফেলেছিলাম’ বলাই বোধহয় ভালো হবে। তোমার হৃদয়ে আমি আর্তের জন্য করুণা দেখেছিলাম, দুর্জয় সাহস দেখেছিলাম, এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম, অস্বীকার করতে চাই না। কিন্তু লীনার কথা জানার পর থেকে আমি আর এগোইনি। আমার জন্য কেউ আঘাত পাক, এ আমি চাইনি, অভী। আমি বৈদ্য; আমার গর্ব এই যে আমি ক্ষত সৃষ্টি করি না, নিরাময় করি।”

অভী চুপ করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। উর্মি বললেন, “একবার হাতটা ধরবে আমার? একবার শুধু?”

অভী হাত বাড়িয়ে তাঁর বামহাতটা ধরে রইল নিজের হাতের মধ্যে। তার হাতটা আলতো করে মুখের কাছে তুলে ধরে তার উপর চুম্বন করলেন তিনি; একটু হেসে বললেন, “যাওয়ার আগে এইটুকু আমার দরকার ছিল।”

ডানহাতে নিজের পোশাকের মধ্যে থেকে একটা ছুরি বার করলেন তিনি। জিনিসটা দেখেই অভী চিনতে পারল। সুতসোম এই হিরার তৈরি ছুরি দিয়েই আত্মহত্যা করেছিল।

তাকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে উর্মি বললেন, “রাক্ষস শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই ছুরি। এটা দিয়ে এত নিপুণভাবে চামড়া কাটা যায় যে দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।”

অভী ধরা গলায় বলল, “কী বলতে চাইছেন আপনি?”

অন্ধকারটা ঘিরে ধরছে ওদের, যেন জমিয়ে মেরে ফেলতে চাইছে। বদ্ধ মন্দিরগৃহে অপার্থিব ফিশফিশানিগুলো তীব্র হয়ে উঠেছে ওদের চারপাশে। একটু একটু করে কীটের মতো ওদের জীবনীশক্তি গুণে নিতে শুরু করেছে জীবন্ত আঁধার। দম আটকানোর অনুভূতিটা তীব্র হয়ে উঠছে।

উত্তর না দিয়ে নিজের বুকে ছুরিবিদ্ধ করলেন উর্মি। “আমার হাতটা ধরে রাখো তোমার হাতের মধ্যে।”

রক্তাক্ত ছুরিটা টেনে বার করে পাশে নামিয়ে রেখে ক্ষতস্থানের সামনে হাত রাখলেন তিনি; অভীর মনে হল, সে যেন সুতসোমের মৃত্যুদৃশ্যের পুনরাবৃত্তি দেখতে চলেছে। একটা উজ্জ্বল মণি বেরিয়ে এল তাঁর হাতে। “অভী, এই তোমার আর লীনার জন্য আমার উপহার। আসল রক্তপদ্মরাগ – সর্বশ্রেষ্ঠ মায়ামণি। এই দিয়ে হয়তো লীনাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন রক্ষোবৈদ্য।”

তাঁর হাতটা সজোরে চেপে ধরে অভী কেঁদে উঠল, “কেন আপনি এরকম করলেন?”

উর্মি হাসলেন। “আমার যা ভালো মনে হয়, করেছি। আমার মৃত্যুতে যদি আমি যে ছেলেটিকে ভালোবাসি আর সেই ছেলেটি যাকে ভালোবাসে, দুজনেরই প্রাণ বাঁচে, তাহলে মরতে আমার কোনো আফশোস নেই।”

অভীর গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। “আমি আপনাকে মরতে দিতে চাই না।”

“মানুষ যা চায়, সবসময় কি তা পায়? তোমাকে নিয়তি বেছে নিয়েছেন অনেক বড়ো কোনো কাজ করানোর জন্য। তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

তার জন্য এই জীবন্ত আঁধারকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। নিয়তি যে আমাকে আজ এই কাজ করার জন্য বেছে নিলেন, তাতে আমি খুশি। তোমাদের রক্ষাবৈদ্যের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে আমার প্রণাম দিও।”

অভী কথা বলতে পারছে না আর। উর্মির বুকের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে গলগল করে। তিনি বললেন, “সবচেয়ে খারাপ অন্ধকারকে দূর করার জন্য সবচেয়ে বিশুদ্ধ আলো দরকার। এই রক্তপদ্মরাগকে আমি আমার শরীরে ধারণ করেছি আজন্ম। এর শক্তি মিশে আছে আমার সারা দেহে। আমার হাত থেকে যেটুকু আলো বেরোচ্ছে, তাতে এই অন্ধকারের কিছু হচ্ছে না বটে, কিন্তু আমার সর্বসত্তা দিয়ে যদি আমি আলো ছড়াই, তাহলে ও সেই আলো সহ্য করতে পারবে না।”

অভী তাকিয়ে আছে নিম্পলক চোখে তাঁর দিকে। বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট হচ্ছে তার। আর যেন কথা আসছে না মুখে।

“আমার জন্য কেঁদো না; জগতে অনেক দুঃখ, অনেক জ্বালা। পারলে তার যতটুকু সম্ভব নিরাময় করার চেষ্টা কোরো।”

উর্মির সারা দেহ উজ্জ্বল হয়ে উঠল লালচে সাদা আলোতে। তিনি আবার বললেন, “ভালো থেকো। বিদায়।”

অভী অবাক হয়ে দেখছে রাজকন্যাকে; তাঁর দেহ থেকে অদ্ভুত প্রভা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে; সেই আলোতে কেঁপে কেঁপে পিছিয়ে যাচ্ছে জীবন্ত আঁধার। সে আবার শ্বাস নিতে পারছে। উর্মির দেহের আলোতে ঝকঝক করে উঠেছে অন্ধকার মন্দিরগৃহ।

“রাজকন্যা, আপনি... আপনি কী?”

উর্মির বুক থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত; এই আলোয় সে রক্তের রং কালচে দেখাচ্ছে। তিনি বিজয়িনীর মতো হাসলেন। “আমি আলো, অভী।”

উর্মির সারা দেহ ফেটে পড়ল এক শব্দহীন, অতুজ্জ্বল সাদা আলোর বিস্ফোরণে। এত তীব্র সে আলোর ঝলক যে অভী চোখ বন্ধ করে ফেলল। যে অন্ধকার তাদের ঘিরে ছিল এতক্ষণ, সেটা যে কোথায় হারিয়ে মিলিয়ে গেল, আর তার কোনো উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। বেশ কিছুক্ষণ সে চোখদুটো বন্ধ করে রইল।

তারপর চোখ খুলে সে বুঝতে পারল, যে উষ্ণ কোমল হাতটা সে ধরে রেখেছিল এতক্ষণ, সেটাও যেন তার হাতের মধ্য থেকে কোন্ শূন্যে মিলিয়ে গেছে।

এখন তার চারদিকে কী বিপুল সর্বপ্লাবী শূন্যতা!

অভী বুঝতে পারছে, তারও সংজ্ঞা লুপ্ত হয়ে আসছে। এতক্ষণ ধরে চলা জীবন্ত আঁধারের সঙ্গে সংঘাত তার মস্তিষ্কে দুর্বল করে দিয়েছে। অপরিসীম ক্লান্তিতে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পড়ে থাকতে থাকতেই তার চোখে পড়ল দুটো জিনিস। তার মুখের সামনেই পড়ে আছে উর্মির সেই ছুরিটা; আর সেটার থেকে হাত তিনেক দূরে মাটির উপরে খুলে যাচ্ছে একটা গহ্বরের মুখ – তার ভেতরে দেখা যাচ্ছে একটা কমলা আগুনের আভা। এখান থেকেই তাপটা এসে লাগল তার মুখে।

হাত বাড়িয়ে উর্মির ফেলে যাওয়া ছুরিটাকে এনে নিজের পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল অভী। নরকগহ্বরটা বড়ো হচ্ছে - ঠিক সৌজন্য যেমনটি বলে গিয়েছিল। বাড়তে বাড়তে পুরো মেঝেটাকেই খেয়ে ফেলছে আগুনের গোলাকার গর্তটা। তার গায়ের একদম কাছে এসে পড়েছে গর্তের কিনারা। গায়ে লাগছে প্রচণ্ড তাপ, কিন্তু অভী আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না ক্লান্তিতে, অবসন্নতায়। উঠে লাভও নেই অবশ্য। অগ্নিগহ্বর যেরকম দ্রুতগতিতে বড়ো হচ্ছে, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব।

গহ্বর গ্রাস করে নিল তার শরীরের তলার মাটি। সেও পড়তে লাগল হলদে কমলা আগুনের আভায় পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ গহ্বরের মধ্যে। তার পাশেই নীচের দিকে পড়ছে দ্রষ্টাদেবীর ভীষণ শুকনো দেহটা। দেখতে দেখতে চোখের সামনেই ছাই হয়ে গেল দেহটা নীচে পৌঁছোনোর আগেই, হয়তো খুব শুষ্ক বলেই।

অসহনীয় তাপ। অভীর জ্ঞান লুপ্ত হয়ে এল।

সংজ্ঞা হারানোর আগে একবার তার মনে হল, সে যেন নরকের প্রেতদের আর্ত চিৎকার আর উল্লাসধ্বনি একসঙ্গে শুনতে পাচ্ছে।

আর ওটা... ওটা কে? সত্যি, না কল্পনা?

না, উর্মি আর নেই, আর কোনোদিন আসবেন না। এসব তার মনের ভ্রম।

চোখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া জলটুকু মুহূর্তের মধ্যে বাষ্প হয়ে উবে গেল নরকের অমানুষিক, অকল্পনীয় উত্তাপে।



॥ উনবিংশ অধ্যায় ॥ নরকবিষ

সকালে নিয়ামক বিনীতেশ একটু সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন তিনি যুদ্ধঘোষণা করে আক্রমণাত্মক ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছেন মাল্যপর্বতে, কিন্তু তিনি বললেন, “কই, আমি তো কোনো চিঠিই লিখিনি রাক্ষসদের!”

নীলাভ বলল, “আপনি লেখেননি? আপনার সহি আছে চিঠিতে।”

একটু অবাক হয়েই তিনি বললেন, “আমার তো মনে পড়ছে না।”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “ছেড়ে দাও, নীলাভ। বজ্রমাণিকের বিষের প্রভাবে উনি ও-কাজ করেছেন। এখন আর সে কথা মনে না পড়াই স্বাভাবিক।”

স্বর্ণশেখর একটু নীচু গলায় বলল, “আচ্ছা, ওঁর কথাগুলো কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে না?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “বিষের কুপ্রভাব। ওঁর ভাগ্য ভালো বলতে হবে, উনি জড়িয়ে জড়িয়ে হলেও কথা বলতে পারছেন। এই বিষের উলটোপালটা প্রভাবে মানুষের বোবা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। সে রোগ সারানোর উপায় চিকিৎসাশাস্ত্রে নেই।”

পর্বতের মুখটা শুকনো হয়ে গেল।

স্বর্ণশেখর বলল, “আপনি অর্ধরাক্ষসদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে কথা আপনার মনে আছে?”

নিয়ামকের মুখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি এক মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, “কই, না তো।”

কক্ষের বাকিরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। নীলাভ বুঝতে পারছে, বিপাকে পড়ে নিয়ামক এখন যদি কিছু মনে পড়েও, সেসব কাণ্ডকে বজ্রমাণিকের বিষের ঘাড়ে চাপাবেন।

রক্ষোবৈদ্য নীচু স্বরে বললেন, “কতটা উনি সত্যি বলছেন, তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করে এই মুহূর্তে লাভ নেই। বিষের প্রভাব পুরোপুরি যদি কাটানো যায়, তাহলে হয়তো ওঁর পেট থেকে সত্যিকথাগুলো বার করা যেতে পারে।”

নিয়ামককে সেবাকক্ষে রেখে ওঁরা এসে বসলেন সম্মেলন কক্ষে। নীলাভর মাথায় একটা দৃষ্টিভ্রান্তি চলছিল; কথাটা সে সবার সামনে বলেই ফেলল।

“এইরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি, অথচ মেঘবর্ণ বা শ্যামশ্রী কেউ ফিরে আসছে না কেন? অভী যে গেল, সেও চুপচাপ। অন্ততপক্ষে ওদের কেউ একটা চিঠিও তো লিখতে পারত।”

স্বর্ণশেখর বলল, “তুমি নিজেই একটা চিঠি পাঠালে তো পারতে।”

নীলাভ বলল, “ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছিলাম। যে জটায়ুর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম, সে চিঠিটা ফেরত এনেছে, ওদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছোতেই পারেনি।”

পর্বত বলল, “রাজা কিন্তু ওদের হাতের মুঠোয় পেয়েছেন এখন। মনে শুভ ইচ্ছা থাকলে তিনি অনায়াসেই ওদের ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু এখন ওরা দু’জনেই অসুস্থ, এবং রাজা পুনর্বসুকে খুব একটা ন্যায়পরায়ণ লোক বলে আমার কোনোদিনই মনে হয়নি।”

কক্ষের দ্বার বন্ধ ছিল। একটা টোকা দেওয়ার শব্দ শুনে চমকে উঠল ওরা।

নীলাভ বলল, “কে এল? অভী নাকি?”

স্বর্ণশেখর উঠে গিয়ে দরজা খুলতে যে ভেতরে এসে ঢুকল, তাকে দেখে ওরা সবাই কিছুক্ষণের জন্য হাঁ হয়ে গেল।

সৌজন্য!

ওদের মুখগুলো দেখে একটু হাসল সে। “সবাই খুব অবাক হয়েছেন দেখছি।”

রক্ষোবৈদ্য প্রশ্ন করলেন, “তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়, সৌজন্য?”

“পীতপত্রবনে।”

“ওখানে কী করছিলে?”

“সেই কথা বলতেই এসেছি। আমাকে বন্দি করেছিল শেষমুখ।”

“তোমাকে বন্দি? কেন?”

“কেন, তা আমি জানি না। আমার বাসগৃহে নাকি সে আটকে রেখেছে সঞ্জীবকে, আর তাই আমাকে নিয়ে এসেছিল বনে।”

“তারপর? তোমাকে ছেড়ে দিল সে?”

“না, ছাড়েনি,” সৌজন্য গম্ভীরমুখে বলল। “আমি তাকে হত্যা করে পালিয়ে এসেছি।”

সকলে চমকে উঠল। নীলাভ অবিশ্বাসের সুরে বলল, “শেষমুখকে হত্যা করেছ তুমি?”

“হ্যাঁ, বনে তার দেহ রেখে এসেছি। বিশ্বাস না হয়, সবাই একবার গিয়ে দেখে আসবেন চলুন।”

পর্বত বলল, “মুখোশটা খুলে দেখেছিলে?”

“দেখেছিলাম। কমবয়সি একটা ছেলে। আমি চিনি না।”

সবাই মিলে ওঁরা চললেন পীতপত্রবনের দিকে। যাওয়ার পথে নীলাভ্র জানতে চাইল, “শেষমুখ তো তুখোড় যোদ্ধা ছিল। তুমি তাকে মারলে কী করে?”

সৌজন্য হেসে বলল, “আমার পক্ষে যেভাবে কোনো তুখোড় যোদ্ধাকে মারা সম্ভব – অসতর্ক মুহূর্তে পেছন থেকে ছুরি বসিয়ে।”

কথাটা সে হাসিমুখে বললেও নীলাভ্রর মনে হল, সৌজন্য যেন একটা গুঢ় ইঙ্গিত করে রাখল। আর কিছু না বলে সে বাকিদের সঙ্গে পা মেলাল পীতপত্রবনের পথে।

বনের মধ্যে যে জায়গায় শেষমুখের দেহটা শোয়ানো ছিল, সেটা বজ্রধরের সমাধির থেকে খুব একটা দূরে নয়। মৃতদেহ দেখেই স্বর্ণশেখর আর পর্বত একসঙ্গে বলে উঠল, “আরে, একে তো দেখেছি রক্ষোপুরীতে!”

পর্বত বলল, “রাজকন্যা উর্মির কাছে কাজ করত এই ছেলেটা। কী যেন নাম...”

স্বর্ণশেখর বলল, “প্রফুল্ল। সবসময় আড়চোখে সবকিছু নজর করত এ, আমি দেখেছিলাম।”

নীলাভ্র বলল, “এ-ই যে শেষমুখ, তার কোনো প্রমাণ আছে কি?”

রক্ষোবৈদ্য হাঁটু গেড়ে বসলেন তার পাশে। একটু দেহটা পরীক্ষা করেই বললেন, “হ্যাঁ, আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে এই শেষমুখ। অন্তর্লীন বজ্রমাণিকের উপস্থিতি এর শরীরে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সৌজন্য, এবার তোমার অভিজ্ঞতা বলো শুনি।”

সৌজন্য বলল, “আমার তো কথা ছিল নিয়ামকের সঙ্গে ছায়াভবনের সভায় যাওয়ার। কিন্তু শরীরটা একটু খারাপ লাগায় আমি ওখানে যেতে পারিনি। তারপর তো শুনলাম, নিয়ামক ওখানে অনেক গুণ্ডগোল পাকিয়েছেন। সেই রাতে অভী আমাদের আক্রমণ করার পর আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়ে চলে গিয়েছিলাম বাসগৃহে। আমাকে আমার বাসগৃহ থেকে অজ্ঞান করে ধরে এনেছিল এ এখানে, যদিও কী উদ্দেশ্যে, তা আমাকে কখনও বলেনি। হয়তো বলত, কিন্তু তার আগেই আমার সুযোগ এসে গেল।

“আজ জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আমি বুঝতে দিইনি যে আমি জেগে উঠেছি। একসময় যখন খুনিটা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পেছন ঘুরে কী একটা করছিল, তখন আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুরিবিদ্ধ করেছি ওকে। এই হচ্ছে আমার গল্প।”

তার গল্পে খুঁত ধরার মতো কিছু পেল না কেউ, যদিও শেষমুখ কেন খুনগুলো করছিল, তার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আপাতত কেউই দিতে পারলেন না। রক্ষোবৈদ্য শুধু একবার বললেন, “এইটুকু নিশ্চিত করেই বলা যায়, এই খুনির পেছনে খুব শক্তিশালী কেউ আছে। হয়তো ঐশিকরা, হয়তো অন্য কেউ। কিন্তু একটা কোনো খুব বুদ্ধিমান মস্তিষ্ক আছেই এসব ঘটনার আড়ালে।”

দেহটাকে পুঁতে দেওয়া হল ওখানেই। নীলাভ ফেরার পথে একবার জিজ্ঞাসা করল, “সৌজন্য, আমাদের নিয়ামকের ঘাড়ের পেছনে বেশ কিছু সূচ ফোটানোর দাগ আছে। এ ব্যাপারে তোমার কী বক্তব্য?”

সৌজন্য বিস্মিতভাবে বলল, “তাই নাকি? আমি তো দেখিনি কখনও!”

“দেখোনি? তোমাকে তো অনেকবার দেখেছি নিয়ামকের ঠিক পেছনটিতে দাঁড়িয়ে থাকতে। চোখে পড়েনি কখনও?”

সৌজন্য একটু রাগত সুরে বলল, “সমরোত্তম নীলাভ, আমার সঙ্গে নিয়ামক মহোদয়ের রাজ্যশাসন বিষয়ে নানা রকমের আলাপ আলোচনা চলত। কখনও মনে হয়নি যে ওঁর ঘাড়ে সূচের দাগ আছে কিনা দেখতে হবে।”

নীলাভ বুঝতে পারছে, সৌজন্য কিছু একটা জানে, কিন্তু স্বীকার করছে না। না, এভাবে এ ব্যাটাকে ফাঁদে ফেলা যাবে না। সে অন্য রাস্তা ধরল।

“অভীর কাছে একটা ছবি দেখলাম – তুমি দাঁড়িয়ে আছ রাক্ষসদের রাজকন্যার সঙ্গে। ব্যাপারখানা কী বলো তো? রাক্ষস রাজপুরীতে তোমার যাতায়াত ছিল, আমাদের জানাওনি তো আগে?”

সে যে স্পষ্টতই একটু চমকে উঠল, নীলাভ খেয়াল করল। কিন্তু সামলে নিতেও তার বেশি সময় লাগল না। বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই সে বলল, “আমরা ছোটোবেলায় মাল্যপর্বতেই থাকতাম। তখনও মাল্যপর্বতে অল্প কিছু মানুষ বসবাস করত। তারপর একদিন রাক্ষসরা ঘোষণা করল, ‘এ দেশ রাক্ষসদের দেশ; এখানে মানুষদের জায়গা নেই’। ‘মানুষ তাড়াও অভিযান’ শুরু হল গোটা রাক্ষস রাজত্ব জুড়ে। এসব ইতিহাস আপনারা জানেন। আমিও সেই সময় আমার মায়ের সঙ্গে এখানে চলে আসি। যারা আসতে পারেনি, তাদের ঘরে ঢুকে কচুকাটা করেছিল রাক্ষসেরা। কিন্তু যে ছবিটার কথা আপনি বলছেন, সে ছবি আঁকার সময় মানুষ-রাক্ষস সম্পর্ক অতটা খারাপ হয়নি। আমার মা যেতেন রক্ষোপুরীতে জল আনতে, আমিও যেতাম তাঁর সঙ্গে। তখন রাজকন্যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।”

একটু থেমে সে বলল, “পরে বিশদে বলব আপনাকে গল্পটা।”

যেভাবে সে কথাটা থামিয়ে দিয়ে রক্ষোবৈদ্যের কাছে গিয়ে শেষমুখের বিষয়ে আলোচনা শুরু করল, তাতে নীলাভর বেশ সন্দেহ হতে লাগল। যদি ও সত্যি কথা বলেও থাকে, জল আনতে গিয়ে একজন গরিব মানুষের ছেলের সঙ্গে রক্ষোপুরীর রাজকন্যার এত হৃদয়তা হয়ে গেল যে দু’জনের একসঙ্গে ছবি আঁকানো হয়েছিল শিল্পীকে দিয়ে? হতেই পারে না; এ অত্যন্ত দুর্বল অজুহাত।

কিন্তু নীলাভ এই মুহূর্তে আর এ নিয়ে কথা বাড়াল না। সামনে এখন যুদ্ধ উপস্থিত; এ বিষয়ে পরে সে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করবে ওকে।

সম্মেলনকক্ষে ফিরে আবার আলোচনায় বসল সবাই। এতক্ষণে রাক্ষসসৈন্যদল নিশ্চয় রওনা হয়ে গেছে সমরগরিমার উদ্দেশে। হাতে সময় বেশি নেই। নিজেদের সেনাসজ্জা শুরু করে দিতে হবে অবিলম্বে; শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত হতে বলতে হবে।

পর্বত বলল, “ওরা কতটা এসেছে, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। নীলাভ, তোমার উপর সহঅধিনায়িকা শ্যামশ্রী দায়িত্ব দিয়ে গেছে। সে ফেরা

পর্যন্ত তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে।”

নীলাভ মনে মনে এতক্ষণ ভাবছিল, এই মুহূর্তের করণীয় কী হতে পারে। সে বলল, “ওরা সমরগরিমার দিকে কতখানি অগ্রসর হয়েছে, জটায়ুবাহিনীর পিঠে চেপে দেখে আসা যেতে পারে। তাহলে আমাদেরও প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হবে। অবশ্য খুব কাছে যাওয়া যাবে না; দূর থেকে দেখে চুপচাপ ফিরে আসতে হবে।”

স্বর্ণশেখর বলল, “আমি যাচ্ছি এখনি।”

নীলাভ বলল, “না, তুমি থাকো, আমি যাব। তোমাকে আর পর্বতকে আমাদের দরকার আয়তনে। সব ছাত্রছাত্রীকে জড়ো করো; চক্রবাককে বলো, সেনাদলকে তৈরি রাখতে। ওদের সবাইকে অনুশীলন মঞ্চের কাছে জমায়েত হতে বলে দাও।”

পর্বত বলল, “বেশ। তারপর?”

“ছেলেমেয়েগুলোর এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার মনের জোর। এমন কোনো কথা বোলো না যাতে ওরা নিজেদের দুর্বল ভাবে। দুর্বল ওরা নয়, কিন্তু এই হঠাৎ শুরু হওয়া যুদ্ধে আত্মবিশ্বাসটা খুব বড়ো ব্যাপার। আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তি নিয়ে ওদের বলো, সব রকমের উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলো। ওদের বলো, সমরগরিমাকে ঘিরে রেখেছে শ্যামশ্রীর দেওয়া মায়াসুরক্ষা আবরণ; নিজেরা ডেকে নিয়ে না এলে বহিঃশত্রুর পক্ষে সে আবরণ ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। ওদের বলো, আমরা একসঙ্গে লড়াই করে এর চেয়েও অনেক কঠিন যুদ্ধ এর আগেও জিতেছি, এবারও জিতব।”

স্বর্ণশেখর বলল, “ঠিক আছে, নীলাভ। তুমি যাও; এখানে আমি, পর্বত আর চক্রবাক দেখছি কত দ্রুত সবাইকে প্রস্তুত করতে পারি। কিন্তু আমার একটা ব্যাপারে চিন্তা হচ্ছে, আমি তোমাদের কাছে লুকোতে চাই না।”

“কী ব্যাপারে?”

“মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী এখনও ওদের বন্দি। রাক্ষসরা যদি ওদের বন্দি অবস্থায় আমাদের সামনে এনে হাজির করে? যদি বলে, এই দু’জনের জীবনের বিনিময়ে আমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হবে?”

পর্বত একটু হেসে বলল, “মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রীকে ব্যবহার করে আমাদের পরাজয় স্বীকার করাবে ওরা? ওই দু’জনকে আমি খুব ভালো করেই জানি। ওরা তোমার মতোই মহাবীর, স্বর্ণশেখর। নিজেদের টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে দেওয়ার মতো ঘৃণ্য কাজ রাক্ষসদের করতে দেওয়ার আগে দুই সমরোত্তমই নিজের জীবন বিসর্জন দেবে, এ আমি নিশ্চিত জানি। ওরা মরে যাবে, কিন্তু নিজেদের সমরগরিমা ছাড়বে না।”

নীলাভ বলল, “পর্বত, আমিও তোমার সঙ্গে সহমত। মেঘ বা শ্যামশ্রী কেউই সমরগরিমার ক্ষতি হবে, এমন কোনো কাজ প্রাণ থাকতে করতে পারবে না। ...আমি চললাম, তোমরা সবাইকে খবর দাও।”

জটায়ুবাহিনীর বিরাট গৃধ্রকে আহ্বান করে তার পিঠে উঠে পড়ল নীলাভ। আর দেরি করার মতো সময় হাতে একটুও নেই। রাক্ষসরা কতটা এসে পড়েছে, কে জানে?

পীতপত্রবন পেরিয়ে গেল সে। দিনের আলোয় নীচে ঝিলমিল করছে মৃত দেবতার নদীর হলদেটে জল। নদী পেরিয়ে উড়ে চলল নীলাভ। তার মনে একটা চিন্তা ঘুরছে, “অভী এখনও কোনো খবর দিল না কেন?”

নদীটা পেরিয়ে আর একটু যেতেই দূর থেকে শত্রুর সেনাবাহিনীকে দেখতে পেল সে। দ্রুত জটায়ুকে আরও উপরে ওঠার দিকে নির্দেশ দিল নীলাভ। ওদের নজরে পড়ে যাওয়া চলবে না কোনোমতেই।

আরও উঁচু, আরও উঁচুতে উঠছে মহাগৃধ্র। নীলাভ একটু অপেক্ষা করল। আরেকটু এগিয়ে আসুক ওরা।

বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আসছে রাক্ষসরা। তাদের পায়ের চাপে ধুলো উড়ছে রুম্ম পাথুরে পথে। অসিযোদ্ধারা তো আছেই; তাদের সঙ্গে আছে তিরন্দাজ বাহিনী, বর্শা ও ঢালধারী বাহিনী এবং কতগুলো বাচ্চা ছেলে মেয়ে। জ্রকুঞ্চন করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে সত্যটা উপলব্ধি করতে পারল নীলাভ।

ওরা ঘটোৎকচ বাহিনী নিয়ে আসছে! সর্বনাশ!

আরও কিছুটা নেমে এল সে। কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে আজকের যুদ্ধে, দেখতে হবে।

প্রজ্ঞা আর আলোকপর্ণ – দু’জনকেই সে চিনত অনেকদিন, এবং তার প্রত্যাশামতো এই দু’জনকেই দেখা গেল সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে। কিন্তু আর যাদের সে দেখল, তাদেরকে রাক্ষসবাহিনীর সঙ্গে দেখতে হবে, সে অতি বড়ো দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

মেঘবর্ণ! শ্যামশ্রী!

তাঁরা বন্দি নন। রাক্ষসদের তাঁরাই নিয়ে আসছেন বাহিনীর সম্মুখভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে! নীলাভ যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

ভয়ংকর কোনো গুণ্ণগোল হয়ে গেছে, সে খুব ভালো করে বুঝতে পারছে।

সমরগরিমার যে সুরক্ষামায়া তাকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে, সে তো শ্যামশ্রীরই সৃষ্টি। সে মায়া সরিয়ে নিতে তাঁর আর কতক্ষণ লাগবে?

নীলাভ অনুধাবন করল, মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে তাদের সামনে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আকাশপথে ফিরে চলল সে। বাকিদের এক্ষুণি জানাতে হবে অবস্থাটা।

জটায়ুর পিঠে উড়ে যেতে যেতে সে বুঝতে পারছিল, তার ভয় করছে, এবং ভয়ের যথেষ্ট কারণও আছে।

সমরগরিমার মাঠে নেমে সে দেখল, স্বর্ণশেখর আর পর্বত সবাইকে জড়ো করে নির্দেশ দিচ্ছে। তাকে জটায়ুর পিঠ থেকে নামতে দেখে শিক্ষার্থীরা কৌতূহলী ভাবে তাকাল।

নীলাভ তাড়াতাড়ি অনুশীলন মঞ্চে এসে নীচুগলায় পর্বত আর স্বর্ণশেখরকে সব জানিয়ে দিল। শুনে ওরা হাঁ হয়ে গেল।

“মেঘবর্ণ? শ্যামশ্রী?” পর্বত ঢৌক গিলল। “ওরা রাক্ষসদের দলে যোগ দিয়েছে?”

নীলাভ বলল, “যোগ দেয়নি, সম্ভবত কোনো মায়া দ্বারা ওদের এ কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে – হয়তো নিয়ামকের উপর যে ধরনের বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল, ওদের উপরেও তাই হয়েছে। দু’জনেরই মুখ-চোখ আমার খুব একটা প্রকৃতিস্থ লাগল না। কিন্তু তাতে বিপদ খুব একটা কমছে না। ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের পক্ষে কি আদৌ সম্ভব?”

সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল। ছাত্রছাত্রীরা অপেক্ষা করছে সমরোত্তম নীলাভ কী সংবাদ এনেছেন জানবার জন্য।

স্বর্ণশেখর বলল, “অভী কোথায়? তাকে দেখতে পেলেন?”

“না, সে নেই ওদের সঙ্গে। তাতে আমার আরও বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে। গেল কোথায় ছেলেটা?”

স্বর্ণশেখর বলল, “কিন্তু এবার আমরা শিক্ষার্থীদের কী বলব? এ যে ভয়ংকর সমস্যায় পড়া গেল! কী করে ওদের বলব, ওদের গুরু সমরোত্তমরাই আসছেন রাক্ষসদের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে?”

নীলাভ বলল, “এখন আমরা শুধু সত্যিকথা বলব – সেইটুকুই আমাদের কর্তব্য। যে সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে, তার কাছ থেকে পালিয়ে লাভ নেই। শিক্ষার্থীরাও যোদ্ধা; দুঃসংবাদ হজম করার শক্তি তাদেরও রাখতে হবে।”

মঞ্চের সামনে এসে সে জোরগলায় বলে উঠল, “সবাই মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমরা বিপদে পড়েছি, কিন্তু সে বিপদ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবেই।”

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুণগুণ থেমে গেল। সকলে আগ্রহভরে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

নীলাভ মনে মনে বলল, “অধিনায়ক বজ্রধর! এই মুহূর্তে আয়তনের সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল আপনাকে!”

মনে জোর এনে সে অল্পকথায় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলে দিল বর্তমান পরিস্থিতিটা। শুনে ছেলেমেয়েদের অনেকেই ভয় পেয়ে গেল। আতঙ্ক আর আশার মধ্যে দোলাচল শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে। উত্তেজিতভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল তারা।

একজন বলল, “সমরোত্তমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন? ব্যাস, হয়ে গেল! আর আমাদের কোনো আশা নেই!”

আরেকজন বলল, “সম্মোহন মায়া প্রয়োগ করা হোক বা না হোক, একজন সমরোত্তম সমরোত্তমই থাকেন। মায়াজগতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে লড়াইতে নামলে আমরা পারব কেন?”

আরেকটি শিক্ষার্থী বলে উঠল, “তা কেন? রাক্ষসদের দলে যদি দু’জন সমরোত্তম থাকেন, আমাদের দলেও দু’জন আছেন। আমাদের অবস্থা অতটাও খারাপ নয়। সমানে সমানে লড়াই হবে। তার উপর আমাদের দলে আছে মাল্যপর্বতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা – পর্বতদা। সেটা উপরি লাভ।”

নীলাভ স্বর্ণশেখরের কাছে এসে নীচুস্বরে বলল, “ওরা অঙ্ক কষা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু তুমি আর আমি – দু’জনেই তো সত্যিটা জানি। তুমি বলো তো, আমি মেঘবর্ণের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করব? ও যে আমার ভাইয়ের চেয়েও

বেশি! আর যে মেয়েটিকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি, সেই শ্যামশ্রীকে আমি আঘাত করব কী করে? বজ্রমাণিকের সম্মোহক মায়ায় ওরা থাকতে পারে, আমরা তো নেই।”

স্বর্ণশেখর বলল, “আর আমি? ওরা তো আমারও বন্ধু; এত সময় একসঙ্গে এই আয়তনে একটা পরিবার হয়ে কাটিয়েছি আমরা সবাই। কিন্তু যুদ্ধ তো বাধতে চলেছে, নীলাভ? ওরা দু’জন কী ভয়ংকর যোদ্ধা, তুমিও তো জানো। মেঘবর্ণের হাতে তরবারি থাকলে ওকে আটকায়, তুমি ছাড়া এমন কে আছে এ দুনিয়ায়? কী হবে যদি দেখি ওকে কিছুতেই থামাতে পারছি না, আর আমার ওই ফুলঝুরি থেকে ওর বুকের দিকে একটা মারণ স্কুলিঙ্গ পাঠানো ছাড়া নিজেকে আর শিক্ষার্থীদের বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই?”

নীলাভ শুষ্ককণ্ঠে বলল, “এই ভয় তো আমারও। কী হবে যদি ওদের কাউকে আমি এমন আঘাত করে বসি, যে আঘাত ওরা সহ্য করতে পারল না? হতে পারে, তেমন কোনো আঘাত আমিও ওদের থেকে পেতে পারি। আমি এখনও দুর্বল; আগের সেই তেজ এখনও পুরোপুরি ফিরে আসেনি। কিন্তু তাও... আমার অস্ত্রবিদ্যা তো আমি একটুও ভুলিনি। যুদ্ধে যদি ওদের কেউ আমার হাতেই মারা যায়? নিজের মৃত্যুর থেকেও এই ভয়টা আমার বেশি হচ্ছে। এতদিন তো সবাই আমাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ জেনে এসেছে; এবার কি ‘বন্ধুঘাতক’ নামে আমার পরিচয় হবে?”

পর্বত এগিয়ে এল; ওদের মুখ দেখে সেও বুঝতে পেরেছিল কী বিষয়ে আলোচনা চলছে। সে নীচুগলায় বলল, “তোমাদের মনের অবস্থা আর জিজ্ঞাসা করতে চাই না, কারণ আমার ধারণা, সে অবস্থা আমার মতোই। কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখো তোমরা, যুদ্ধ আমাদের দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছে; আমরা তো তাকে এড়িয়ে পালাতে পারি না। তাহলে যুদ্ধ যদি করতেই হয়, প্রকৃত যোদ্ধার মত করাই ভালো, বন্ধুগণ।”

নীলাভ ম্লান হাসল। “আমি জানি, পর্বত। তোমার এই সাহসটুকু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও বিতরণ করে দাও।”

পর্বত মঞ্চের সামনে এসে জোরগলায় বলে উঠল, “শিক্ষার্থীগণ! আমরা কোনোদিন আমাদের সমরগরিমা ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পালাইনি, আজও পালাব না। আমাদের বাসভূমিকে আমরা রক্ষা করব, আমাদের আপনজনদের রক্ষা করব। আমাদের উপর নির্ভর করে আছে সমরগরিমার সম্মান; আমরা তার মান রক্ষা করব। কারা আছ আমাদের সঙ্গে?”

তার কথার উত্তরে সারা মাঠ গর্জন করে উঠল, “আমরা আছি! আমরা আছি!”

পর্বত বলল, “মৃত্যুকে কিসের ভয়? শেষে তো সবার জন্য মৃত্যুই অপেক্ষা করে আছে, তাই না? ওদের জন্যও, আমাদের জন্যও। আমরা যোদ্ধা – আমরা মৃত্যু নিই, মৃত্যু দিই, কিন্তু তাকে আমরা ভয় পাইনি কোনোদিন, আজও পাব না। কী বলো তোমরা? ভয় পাব?”

সহস্র কণ্ঠে উত্তর এল, “পাব না! পাব না!”

নীলাভ্র এসে দাঁড়াল পর্বতের পাশে; বলল, “তাহলে তৈরি হও, অস্ত্র তুলে নাও হাতে। আজ আমরা মাল্যপর্বতকে দেখিয়ে দেব, সমরগরিমা কাউকে ভয় পায় না।”

সোৎসাহে যোদ্ধারা নিজেদের অস্ত্র সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নীলাভ্র পর্বতের পিঠ চাপড়ে বলল, “যথেষ্ট করেছ তুমি। এবার নিয়তির ইচ্ছা।”

অল্প সময়ের মধ্যেই সেনাসজ্জা সমাপ্ত করে ফেলল নীলাভ্র আর স্বর্ণশেখর। এবার অপেক্ষা শত্রুর আগমনের।

রক্ষীপ্রধান চক্রবাক জড়ো করেছে তার সেনাদল। আজ সে বুঝতে পারছে, সমরোত্তমরা ছাড়া এই যুদ্ধে জয়লাভের কোনো উপায় নেই।

পর্বত এক জটায়ুর পিঠে চেপে উড়তে লাগল আয়তনের আকাশে – ওদের আসতে দেখলেই সংবাদ দেবে। স্বর্ণশেখর তাকে বলে দিল, “আয়তনের সীমানার বাইরে যেও না।”

নীচে শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষায় রইল সমরগরিমার বাহিনী।

কিছুক্ষণ পরেই পর্বত চোঁচিয়ে উঠল, “আসছে ওরা! শ্যামশ্রী মায়াসুরক্ষাবলয় ভেঙে ফেলেছে।”

সমরগরিমার বিশাল প্রান্তরে ঢুকে পড়ল রাক্ষসবাহিনী; এদিকে সমরগরিমার বাহিনীও তৈরি হয়ে আছে অস্ত্র নিয়ে।

রাক্ষসবাহিনীর সামনে উদ্যতাস্ত্র মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রীকে দেখে গোটা সমরগরিমা স্তব্ধ হয়ে রইল। তাঁদের মুখগুলো যেন অনেক কালো হয়ে গেছে; সে মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই – যেন এই আয়তনকে তাঁরা আর চিনতে পারছেন না।

নীলাভ্রর মনে হল, এ দৃশ্য যতটা ভয়ংকর, তার চেয়ে অনেক বেশি করুণ।

তবু ভালো, তাঁরা কোনো কথা বলছেন না। সে ভাবল, “ওরাও কি বোবা হয়ে গেল?”

রাক্ষসদের পক্ষ থেকে প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলেন সেনানায়িকা প্রজ্ঞা। চিৎকার করে তিনি বললেন, “আমি সমরোত্তম নীলাভ্রর সঙ্গে কথা বলতে চাই। দয়া করে এগিয়ে আসুন, সমরোত্তম মহোদয়। আমি আমার তরবারি রেখে দিয়ে নিরস্ত্র হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। অনুগ্রহ করে আপনিও তাই করুন। দুই পক্ষের তিরন্দাজরাই আমাদের নিশানায় রাখতে পারেন।”

নিজের তরবারি আলোকপর্ণের হাতে দিয়ে প্রজ্ঞা এগিয়ে আসছেন দুই বাহিনীর মাঝের ফাঁকা জমিতে। নীলাভ্র একবার বাকিদের দিকে তাকাল। স্বর্ণশেখর মাথা নাড়ল। পর্বত বলল, “প্রজ্ঞা উত্তম যোদ্ধা, কিন্তু ছলনা করে শত্রুকে আঘাত করতে ওঁর আত্মসম্মানে লাগে। তুমি নিশ্চিন্তে যাও, নীলাভ্র, ভয় নেই।”

তরবারি নামিয়ে রেখে এগিয়ে গেল নীলাভ্র, ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে। প্রজ্ঞা এসে দাঁড়ালেন তার সামনে।

মেঘবর্ণ চুপ; শ্যামশ্রীও তাই। এইভাবে যেন তাঁদের আরও ভয়ংকর লাগছে। মুখদুটোতে করুণা বা অন্য কোনো কোমল প্রবৃত্তির আভাসটুকুও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যেন দুটি মূর্তিমান হত্যাযন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায়।

নীলাভ্রর বুকটা যেন দমে গেল তাঁদের দেখে।

প্রজ্ঞা নিচুগলায় বললেন, “অভী কোথায়, সমরোত্তম নীলাভ্র?”

নীলাভ্র অবাক হয়ে বলল, “মানে? সে তো আপনাদের দেশে গেছে। আপনারাই ভালো জানবেন সে কোথায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?”

“সে যে কোথায়, আমরাও জানি না। রাজকন্যা উর্মিকে নিয়ে সে একটা জায়গায় গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। যেখানে ওদের যাওয়ার কথা ছিল, সেই জায়গায় আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু ওদের একজনেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। আপনারা যদি রাজকন্যাকে লুকিয়ে রেখে থাকেন, তাহলে তাঁকে ফেরত দিন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার শিক্ষার্থীদের জীবনভিক্ষা দেবে রাক্ষসেরা।”

নীলাভ্র একটু হাসল। “আপনার প্রার্থনা পূরণ করতে পারলে আমি খুশিই হতাম। কিন্তু দুটো সমস্যা আছে। এক, আমি জানি না অভী বা রাজকন্যা বর্তমানে কোথায় আছেন। এবং দুই, সমরগরিমার শিক্ষার্থীরা কেউ জীবনভিক্ষা চায় না। তারা গর্বিত যোদ্ধা – সমরগরিমা তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। আপনাদের দেওয়া প্রাণভিক্ষাকে তারা ঘৃণা করে।”

প্রজ্ঞার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। “শিক্ষক হয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মৃত্যুই বেছে নিলেন তাহলে। অতি উত্তম। তাই হোক।”

চলে যাচ্ছিলেন তিনি, এমন সময় নীলাভ্র পেছন থেকে ডেকে বলল, “আমাদের দুই সমরোত্তমকে নিয়ে কী করেছেন আপনারা? কোন্ মায়া প্রয়োগ করে বশ করেছেন ওদের?”

প্রজ্ঞা ঘুরে দাঁড়ালেন; তাঁর দু'চোখে ক্রোধের ছাপ স্পষ্ট। “আমরা কেন মায়া প্রয়োগ করতে যাব ওঁদের উপরে? আপনাদের সহনিয়ামক সৌজন্য স্বয়ং দেখা করেছেন সেবাকক্ষে ওঁদের সঙ্গে, আর তারপর রাজসভায় এসে জানিয়েছেন, এই দুই সমরোত্তম সমরগরিমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন, এবং ওঁরা আমাদের পক্ষে যোগ দিয়ে সমরগরিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান। ওঁরা তো একবারও সে কথা অস্বীকার করেননি।”

তিনি ফিরে গেলেন নিজের বাহিনীর কাছে। নীলাভ্র কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওখানেই।

সৌজন্য! সব ওর খেলা!

নিজেকে সামলে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি ফিরে এল নিজেদের সেনাদলের কাছে; পর্বত আর স্বর্ণশেখরকে বলল সব কথা। স্বর্ণশেখর বলল, “ওই হতভাগাকে পরে দেখা যাবে। আপাতত এই যুদ্ধটা জিততে হবে।”

নীলাভ্র বলল, “তা ঠিক। কিন্তু এখন সৌজন্য কোথায় আছে, কেউ জানো?”

কেউই জানে না। অনেককেই জিজ্ঞাসা করা হল, কেউ কিছু বলতে পারল না।

প্রজ্ঞা তখন কথা বলছেন আলোকপর্ণের সঙ্গে। নীলাভ্র দেখল, পর্বত তাকিয়ে আছে তার ভাইয়ের দিকে, তার দু'চোখে শুধুই ঘৃণা।

সমরগরিমার সেনাদলের দিকে তাকিয়ে নীলাভ্র ভাবছিল – এরা কি পারবে রাক্ষসদের মহড়া নিতে? যথেষ্ট সময় পাওয়া গেলে সে এদের তৈরি করে নিতে

পারত, কিন্তু এত স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা সেনাদলকে প্রস্তুত করা সহজ নয়।
রাক্ষসরা যুদ্ধপাগল জাতি - যুদ্ধ ওদের রক্তে। কিন্তু মানুষ বা অর্ধরাক্ষসরা তো
আর তা নয়। তার উপর দু'জন সমরোত্তম আজ লড়বেন রাক্ষসদের হয়ে।

নীলাভ বুঝতে পারছিল, তার বাহিনী রাক্ষসদের তুলনায় বেশ কিছুটা
দুর্বল।

হঠাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা উল্লাসধ্বনি উঠল। নীলাভ অবাক হয়ে
এগিয়ে দেখতে গেল, কী হল এত আনন্দের।

সে দেখল, একটা অদ্ভুত আকৃতি এগিয়ে আসছে তাদের সেনাদলের
দিকে। ভগ্নিটা আক্রমণাত্মক নয় প্রাণীটার, কিন্তু তার চলনের মধ্যেই ফুটে
উঠছে তীব্র আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তা। তার সারা গায়ে আঁশ, মাথায় শিং, হাতে
ঝকঝকে ত্রিশূল।

নিধি!

নিধি এসে নমস্কার করে দাঁড়াল নীলাভর সামনে; অদ্ভুত স্বরে বলল, “আমি
নীরসেনা হতে পারি, কিন্তু সমরগরিমা এখনও আমার আয়তন, আমার দেশ।”

নীলাভ হাঁ করে দেখছে তাকে; দেখছে মানুষ-রাক্ষস-অর্ধরাক্ষস সবাই।
নিধি আবার বলল, “আমি দেবতার কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম আমার বন্ধুদের
পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।”

সমরগরিমার সেনাবাহিনী হর্ষধ্বনি করে উঠল। নীরসেনারা যুদ্ধে প্রায়
অপরাজেয়, সবাই জানে। রাক্ষসদের দেখে মনে হল, তারা একটু ভয় পেয়েছে।

প্রজ্ঞা আর দেরি করতে রাজি নন। তাঁর আদেশে রাক্ষসপক্ষে রণভেরী
বেজে উঠল। সমরগরিমায় বাজতে লাগল যুদ্ধের দামামা।

রাক্ষসসেনারা চোঁচিয়ে উঠল, “রক্ষোপুরীর জয়!”

এরা পালটা জয়ধ্বনি দিল, “সমরগরিমার জয়!”

নীলাভ যুদ্ধ শুরু আগে শেষ নির্দেশ দিল তার দুই সহযোগীকে। “আমরা
যতটা সম্ভব শিক্ষার্থীদের বাঁচিয়ে আক্রমণে যাব।”

রাক্ষসসেনারা ছুটে আসছে সমরগরিমার দিকে প্রবল হুংকারে। স্বর্ণশেখর
লাফ দিয়ে পড়ল সবার সামনে। তার হাতের বাঁশের লাঠি মুহূর্তমধ্যে পরিবর্তিত
হয়ে গেল দীর্ঘ লৌহদণ্ডে।

সেই লাঠি সে ঘোরাতে লাগল নিজের সামনে, আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি থেকে
অজস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তিরের মতো ছুটে যেতে লাগল শত্রুসৈন্যের দিকে।

যাদের যাদের গায়ে সেই আগুনের ফুলকি গিয়ে লাগছে, তারা পড়ে যাচ্ছে
মাটিতে, আর নড়ছে না। রাক্ষস ধনুর্ধারীরা তির ছুড়ছে স্বর্ণশেখরকে লক্ষ্য
করে, কিন্তু সেই প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান লৌহদণ্ডের বাধা পেরিয়ে একটা তিরও
এসে লাগছে না তার গায়ে, ঠিকরে পড়ে যাচ্ছে। এদিকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে
ভূমিশয্যা নিয়েছে শতখানেক রাক্ষস। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রজ্ঞা চিৎকার
করে আদেশ দিলেন, “রাক্ষসসেনা! পিছিয়ে এসো!”

ওরা দেখল, ছুটন্ত রাক্ষসবাহিনী পিছিয়ে যাচ্ছে। স্বর্ণশেখর হাসিমুখে উঠে
দাঁড়াল। সমরগরিমার সেনারা হর্ষধ্বনি করে উঠল। আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা
আটকে দেওয়া গেছে।

নীলাদ্র অবশ্য বুঝতে পারছিল, এখনই এত খুশি হওয়ার কিছু নেই। যুদ্ধ এই সবে শুরু।

বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। রাক্ষসসেনা পিছিয়ে যাচ্ছে এখনও, সমরগরিমার সেনারা বর্শা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শত্রুর পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায়।

যোদ্ধাযক মৃগেন্দ্র প্রশ্ন করল, “সমরোত্তম নীলাদ্র, ওরা তো বিপাকে পড়েছে মনে হচ্ছে। আমরা এগিয়ে গিয়ে ওদের আক্রমণ করব?”

নীলাদ্র দ্রুত পরিস্থিতি বিচার করছিল। সে বলল, “না, আমরা এই মুহূর্তে আক্রমণ করব না। এটা প্রজ্ঞার কৌশল। ওরা চাইছে আমাদেরকে ওদের কাছাকাছি পেতে। একবার যদি ওরা আমাদের ঘিরে ফেলতে পারে, বিপদ হবে। আমরা এখানেই থাকব – যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি, সেটাকে হাতছাড়া হতে দেব না।”

যুদ্ধভূমি কেমন যেন অস্বাভাবিক ভাবে নীরব হয়ে গেছে। রাক্ষসরা আর চিৎকার করছে না। সবাই উৎসুক হয়ে কী যেন দেখছে।

নীলাদ্র সভয়ে দেখল, একটা বছর সাতকের বাচ্চা মেয়ে একা হেঁটে আসছে তাদের দিকে। একটু খুঁড়িয়ে, একটা পা টেনে টেনে হাঁটছে সে। তার পায়ে আবার নূপুর পরা আছে, তার ঝিনিঝিনি শব্দ হচ্ছে।

সমরগরিমার শিক্ষার্থী আর সেনারা অবাক হয়ে দেখছে মেয়েটাকে। কিন্তু ব্যাপার বুঝে নিতে অভিজ্ঞ সমরোত্তমদের অসুবিধা হল না।

পর্বতও বুঝতে পেরেছে রহস্যটা। তখনও এদের বাহিনী থেকে বেশ কিছুটা দূরে আছে মেয়েটা। পর্বত চেষ্টা করে উঠল, “ধনুর্ধারী সেনা। এফুনি মেরে ফেলো ওকে।”

শিক্ষার্থীরা অবাক হয়ে তাকাল। “পাগল নাকি? এ তো একটা বাচ্চা মেয়ে!”

“না, না, ও ঘটোৎকচ বাহিনীর একজন! মারো ওকে, নয়তো আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব!”

তিরন্দাজরা তবু ইতস্তত করছে। মিষ্টি মতো দেখতে বাচ্চা মেয়েটা নিষ্পাপ চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

তারপর সে ফুলতে শুরু করল। আয়তনে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়ছে সে, বাড়তে বাড়তে ইতিমধ্যেই দুটো পূর্ণবয়স্ক মানুষের মতো আকার হয়ে গেছে তার। মুখটা ফুলে বিকৃত হয়ে গেছে, চোখটা কেমন বীভৎস দেখাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা বিস্ময়ে হাঁ করে রইল।

পর্বত সভয়ে বলে উঠল, “আমরা ওদের যা দিয়েছি, ওরা আমাদের তাই কয়েকগুণ বেশি দিতে চলেছে। দেরি হয়ে গেছে, এখন একে মারলেও মারাত্মক বিস্ফোরণ আটকানো যাবে না।”

সমরগরিমার সেনারা পর্বতের ইঙ্গিতে পিছু হটছে। স্বর্গশেখর ব্যগ্রভাবে বলল, “নীলাদ্র, কিছু করো।”

তাকে যে কী করতে বলা হচ্ছে, নীলাদ্র বুঝতে পারছিল। কিন্তু ব্যাপক আকারে হিমকুশলতা প্রয়োগ করার মতো শক্তি সে এখনও অর্জন করে উঠতে পারেনি। কিন্তু এখন আর ওসব ভাবলে চলবে না। নিধি সাহস করে এগিয়ে

এসেছিল, তাকে সরিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে সে পড়ল ফুলে ওঠা দানবিক মেয়েটার সামনে।

এখন যদি বিস্ফোরণটা হয়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, সে জানে।

নিজের শক্তিকে মনে মনে সংহত করে সে দু'হাত সামনে মেলে দিয়ে নিষ্ক্ষেপ করল বরফের স্রোত। তীব্র গতিতে সেই বরফধারা ছুটে গেল ঘটোৎকচ মেয়েটির দিকে, তাকে আর বাড়তে না দিয়ে জমিয়ে ফেলল। হাততালি দিয়ে উঠল শিক্ষার্থীরা; ধ্বনি দিল, “মহাবীর নীলাব্রের জয়!”

জমা বরফের মধ্যে বাচ্চাটার চেহারা সংকুচিত হতে হতে আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, দেখতে পেল সে। কিন্তু তার মাথা ঘুরছে, চোখের সামনে অন্ধকার নামছে। অসুস্থ শরীরে এতটা শক্তিশালী মায়াপ্রয়োগ করা উচিত হয়নি, সে জানে; কিন্তু না করেও উপায় ছিল না।

স্বর্ণশেখর তাকে আড়াল করে এসে দাঁড়াল সামনে; চিৎকার করে বলল, “বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিয়ে যুদ্ধে জেতার ইচ্ছা! ধিক্কার তোমাদের, ভীরুর দল!”

আলোকপর্ণ পালটা চেষ্টা, “আমরা নই, তোমরাই হলে আসল ভীরুর দল। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের যুদ্ধে এগিয়ে দিয়ে আমরা নয়, তোমরা আত্মগোপন করতে চাইছ। এরা ‘যোদ্ধা’? এরা রক্ষা করবে সমরগরিমাকে? এত ক্ষমতা এদের? দেখি তোমরা কেমন যুদ্ধ শিখেছ, শিক্ষার্থীরা? এসো, আমাদের সামনে এসে লড়ো।”

শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা ত্রুদ্র আলোড়ন শুরু হল। স্বর্ণশেখর বলল, “সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো। কেউ নড়বে না।”

উষসী আর তরুণ বলল, “ওরা আমাদের অপমান করছে! আমরা দাঁড়িয়ে থাকব?”

আলোকপর্ণ হা হা করে হেসে উঠল। “জানতাম তোমাদের দৌড়। তোমরা কেউ যোদ্ধা নও; তোমরা সব শিশু – হাতে খেলনা ঢাল-তলোয়ার আর তিরধনুক নিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতে এসেছ!”

স্বর্ণশেখর শিক্ষার্থীদের দিকে ফিরে বলল, “ও তোমাদের উত্তেজিত করে নিজেদের এলাকায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। এসব যুদ্ধের কৌশল; একদম ওর প্ররোচনায় পা দেবে না কেউ।”

আলোকপর্ণ যখন দেখল, শিক্ষার্থীরা কেউ আসছে না, তখন সে বুঝে ফেলল, সরাসরি আক্রমণ করা ছাড়া উপায় নেই। সে চিৎকার করে বলল, “সেনানায়িকা প্রজ্ঞা, এবার আদেশ দিন। এই মানুষ আর অর্ধরাক্ষসের বাচ্চাদের আজ দশটুকরো করে দেখিয়ে দিই, রাক্ষস জাতটা ওদের থেকে অনেক ভালো যুদ্ধ জানে।”

নীলাব্র ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেনাবাহিনীর সামনে। সে গর্জন করে উঠল, “এই আয়তনকে বাঁচানোর জন্য আমি নরকেও গিয়েছিলাম। আজ একই কাজ করতে আবার যদি সেখানে যেতে হয়, আমি দ্বিতীয়বার ভাবব না। যোদ্ধারা, সাহসী হও, সমরগরিমা অবলম্বন করো। আজ ওদের আমরা দেখাব, নরক কাকে বলে!”

প্রজ্ঞা সুউচ্চরবে আদেশ দিলেন, “মারো! মেরে ফেলো ওদের! এগিয়ে চলো!”

রাক্ষসসেনা আবার তেড়ে আসছে বাঁধভাঙা জলের মত। সেই দুর্নিবার জনস্রোতে সমরগরিমার বাহিনীর ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল।

জ্ঞান ফেরার পর বেশ কিছুক্ষণ অবশ হয়ে রইল অভীর সারা শরীর। চারপাশের হলদে-কমলা আগুনের আভা সে দেখতে পাচ্ছে, প্রচণ্ড তাপও অনুভব করতে পারছে। কিন্তু দেহে সাড়ি ফিরে আসতে অনেকটা সময় লাগল তার।

তারপর সে বুঝতে পারল, সে ভেসে আছে একখণ্ড কাগজের মতো। তার বহু নীচে কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে আগুনের নদী। নরকের দেয়ালগুলো প্রচণ্ড উত্তাপে লালভ হয়ে আছে। কিন্তু তার শরীর আবার ঠান্ডা হয়ে গেছে। হিমকুশলতা তাকে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছে পুড়ে ছাই হওয়ার হাত থেকে।

অভী একবার ভাবল, “শুধুই হিমকুশলতা? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?”

এখানে সে আগেও এসেছে, আগেও দেখেছে এইরকম লেলিহান অগ্নিশিখা আর খরস্রোতা অগ্নিনদী। কিন্তু এই জায়গাটা যেন গতবারের চেয়ে বেশ কিছুটা অন্যরকম লাগছে। সম্ভবত নরকের অন্য কোনো অংশে এসে পড়েছে সে। চারদিকে অসংখ্য গলিপথ চলে গেছে; তাদের প্রত্যেকটারই দেয়াল আগুনের তাপে সিঁদুরে লাল হয়ে আছে।

মাথার উপরে যে গহ্বর দিয়ে সে এসে পড়েছিল, সে গহ্বর অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। অভী ভাবতে লাগল, এতক্ষণে তো তার মরে যাওয়া উচিত ছিল। তাপটা তার হিমকুশলতার আবরণ ভেদ করেও এত অসহ্য লাগছে যে মনে হচ্ছে তার চারপাশটা যেন লালচে হলুদের পরিবর্তে নীল হয়ে আসছে। নাকি সত্যিই চারপাশে একটা নীলচে আভা দেখা যাচ্ছে? সে শুনতে পেল, নরকের প্রেতরা যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদছে।

মনে হল, আওয়াজটা আসছে নীচের দিক থেকে। তার অনেক অনেক নীচে বইছে সেই গলন্ত লাভার নদী; তাতে ফুটছে হলদে রঙের বুদবুদ, আবার পরক্ষণেই কিছুটা লাল তরল আগুন ছিটিয়ে ফেটে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে অভী শিউরে উঠল।

এই কি তার ভাগ্যে আছে? এইভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু?

নরকের মধ্যে বোধহয় কোনো হিংস্র জন্তুও আছে। তাদের বিকট গর্জন শোনা যাচ্ছে সামনের অজস্র গলিপথগুলোর কোনো একটার মধ্য থেকে।

তাপ এসে লাগছে চোখেমুখে। অভী বুঝতে পারছে, এই হিমকুশলতা তাকে আর বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। নদীটা টগবগ করে ফুটছে তার থেকে বহু নীচে; একটা উজ্জ্বল কমলা ফিতের মতো দেখাচ্ছে তাকে।

কী যেন বলেছিল সৌজন্য? এই জ্বলন্ত নদীর আগুন উঠে এসে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে পীতপত্রবনসহ সমরগরিমাকে? এই নদী নাকি বেরোচ্ছে পাহাড়ের গায়ের একটা ছোট্ট শাঁখ থেকে?

একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, “সত্যিই তাই, অভী। দেখতে চাও?”

মৃত দেবতা! অভী তাড়াতাড়ি নমস্কার করল তাঁর উদ্দেশে। “হ্যাঁ দেবতা, আমি দেখতে চাই।”

“ওই অগ্নিবিষ কিন্তু তার উৎসের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে নিখাদ। ওর কাছে গেলে তুমি অন্ধ হয়ে যেতে পারো। অথবা ওই বিষ তোমার গোটা শরীরটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। ওই জায়গায় পাপীরা শাস্তিভোগ করে। এবার বলো, এখনও যেতে চাও ওখানে?”

“চাই।”

মৃত দেবতা হেসে উঠলেন। “আমি জানি। বজ্রমাণিকের উপাদানের উৎস দেখার জন্য তোমার কৌতূহলের অন্ত নেই। তাছাড়া তুমি এই নরকের প্রেতদের কথা দিয়ে গিয়েছিলে যে আবার তুমি ফিরে আসবে এখানে। তোমার বামদিকে ভেসে যাও। নদী যদি কে বইছে, তার বিপরীতে ভেসে চলো।”

তাঁর কথামতই চলল অভী। কণ্ঠস্বরটা চলল তার সঙ্গে সঙ্গে। “এখনও মনের মধ্যে কী বিপুল ঘৃণা তোমার, অভী।”

অভী বলল, “রাজকন্যা উর্মি এই ঘৃণা দূর করতে চেয়েছিলেন, আমি রাজি হইনি। অন্যদের রক্ষা করার জন্য এটাকে অস্ত্র হিসাবে রেখে দিয়েছিলাম।”

মৃত দেবতা বললেন, “তোমার কথা শুনে আরেকজনের কথা মনে পড়ল আমার।”

“কার কথা?”

“তোমাদের অধিনায়ক বজ্রধর। সেও আমার কাছে অন্যদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য অস্ত্র চেয়েছিল।”

অভীর চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। “তার মানে আপনি...”

“আমি কী, তা নিয়ে ভেবো না, অভী। আমার অসংখ্য আকার, অসংখ্য রূপ। প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেকটি সভ্যতা আমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করে। আমিই একমাত্র পরিণাম। আমি তাই নিজেকে ‘মৃত’ বলি, কারণ আমি মৃত্যুর অধীশ্বর। কিন্তু আমি কী, সে ভাবনা ভাবার সময় এ নয়, অভী; তুমি কী, সেই কথা ভাবো; তুমি কী করবে, সেই কথা ভাবো। তোমার জীবন শেষ হয়ে আসছে, তুমি জানো?”

অভী বলল, “আমি শুনেছি কথাটা দ্রষ্টাদেবীর কাছে। আর এখন যেন ভেতরে ভেতরে অনুভব করতে পারি, আমার সময় কাছে এসে গেছে।”

ভাসতে ভাসতে নদীর উৎসমুখের কাছে এসে পড়েছিল ওরা। অভী এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছিল শাঁখটাকে। কালো রঙের পাহাড়ের পাদদেশে ছোট দক্ষিণাবর্ত শঙ্খটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে গাঢ় নীল রঙের তরল, আর সেই তরল গড়িয়ে নামছে নিচের খাতে। সেই খাত থেকেই যত এগিয়েছে, ততই বিরাট আকার ধারণ করেছে আগুনের নদী, আর ততই তার নীল রং কেটে গিয়ে সে কমলা আগুনের বর্ণ ধরেছে। কিন্তু উৎসের কাছে ধারাটি অত তীব্র নয়।

এখানে আসতেই তার কানে আরও স্পষ্টভাবে আসছে অজস্র মনুষ্যকণ্ঠের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ, কিন্তু কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। অভী এগিয়ে গেল

তুষারধবল শাঁখটার আরও কিছুটা কাছে। অগ্নিবিষ এখানে এত তীব্র তাপ বিকিরণ করছে যে সবকিছু তার চোখে নীল লাগছে। অভী বুঝতে পারছে, এত শক্তিশালী মায়াবস্তু সে আগে কখনও দেখেনি। এই তাহলে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গরল – নরকবিষ! নরকাগ্নির উপাদান!

অভী শুনেছিল, নরকের তপ্ত দেয়ালগুলোও নাকি এই বিষাক্ত পদার্থটা জমে জমে তৈরি হয়েছে।

সে জানতে চাইল, “ওই বিষের উৎসের এত কাছে দাঁড়িয়েও আমি এখনও মরিনি কেন?”

“কারণ তোমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে, যেটা তোমাকে সুরক্ষা দিচ্ছে।”

অবাক হয়ে অভী বলল, “কী?”

“সুতসোমের দেওয়া বজ্রমাণিক। ওই বস্তুটি সঙ্গে আছে বলে ও তোমাকে এই বিষের বাহ্যিক প্রভাব থেকে এখনও রক্ষা করছে। ধারক উপযুক্ত মায়া জানলে বজ্রমাণিক এই বিষকে আকর্ষণ করতেও পারে।”

অভী মাথা নাড়ল। সৌজন্য এই পরিকল্পনাই তো করেছে।

মৃত দেবতা বললেন, “এবার ওই বজ্রমাণিক নদীতে বিসর্জন দাও।”

“আঁ? কী?” অভী চমকে গেল।

“ভুল শোনোনি। তুমি ওই মায়ামণির ধারক ছিলে না। তুমি ওই নিয়তিপ্রদত্ত মণি নিয়ে জন্মাওনি। ওই বিষাক্ত বস্তুকে তুমি কখনও নিজের অন্তরে ধারণ করোনি, শুধু বাহ্যিকভাবে কয়েকদিন বহন করেছ। বিষকে যদি নিজের দেহে ধারণ করতে, তাহলে তার উপর তোমার প্রভুত্ব জন্মাত। কিন্তু এখন ওতে তোমার অধিকার নেই। পৃথিবীতে যত বজ্রমাণিক আছে, সব আসলে এই নরকবিষের নদীর সম্পদ। ওটা নদীকে ফেরত দাও।”

অভীর মনে হল, মণিটা নদীতে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো তার মৃত্যু হবে; তীব্র জ্বালাধরানো তাপ বিকিরণকারী শাঁখটার এত কাছে সে আছে যে এইটুকু সুরক্ষা না থাকলে হয়তো এক মুহূর্তের মধ্যেই সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। তারপর মনস্তির করে দেবতার আদেশ পালন করাই শ্রেয় বিবেচনা করে সে ওটাকে ছুড়ে ফেলে দিল নদীর মধ্যে।

নিতান্ত সাধারণভাবেই টুপ করে নদীতে ডুবে গেল জিনিসটা। অত শক্তিশালী মায়ামণি – অভী আশা করেছিল, ওটা ডোবার সময় সামান্য হলেও অদ্ভুত কিছু হয়তো ঘটবে, কিন্তু কিছুই হল না। নিতান্তই অনাড়ম্বরভাবে কমলা নদীর তরল আগুনে হারিয়ে গেল সুতসোমের বজ্রমাণিক।

“বজ্রমাণিকের মায়া আর তোমাকে ঘিরে নেই। এবার তুমি ওদের দেখতে পাবে।”

আগুনের নদীটার দিকে তাকাতেই অভী এবার দেখতে পেল কালো কালো মনুষ্য আকৃতিগুলোকে। এরাই এতক্ষণ চিৎকার করছিল অসহনীয় যন্ত্রণায়। লাভাস্রোত বয়ে যাচ্ছে এদের গায়ের উপর দিয়ে; ওই মারাত্মক উত্তাপে পুড়ে ধ্বংস হয়ে বিষাক্ত তরলটায় বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এদের, কিন্তু তার বদলে ওই আগুন এদের কেবল যন্ত্রণাই দিচ্ছে। অভী বুঝতে পারছে, এরাই

নরকের শাস্তিপ্রাপ্ত প্রেত। ভয় করতে লাগল তার, কিন্তু ভয়ের অনুভূতিকেও ছাপিয়ে উঠল তার অন্তরে বিপুল করুণা।

আহা রে! কী এমন করেছে এরা যে এত যন্ত্রণা পাবে! এখনও কি যন্ত্রণাভোগ শেষ হয়নি এদের?

উত্তপ্ত লাভা ডুবিয়ে দিচ্ছে ওদের, আবার ওরা ভেসে উঠছে একই জায়গায়। তারা কাঁদছে, চিৎকার করছে অসহায় ভাবে, “রক্ষা করো! আমাদের রক্ষা করো!”

অভী যেন এই করুণ দৃশ্য আর দেখতে পারছিল না। সে বলল, “ওরা উঠে আসছে না কেন? কেউ তো ওদের ধরে আটকে রাখছে না ওখানে। চাইলেই তো ওরা পাড়ে উঠে আসতে পারে!”

দেবতা উত্তর দিলেন, “পারে, কিন্তু ওরা আসবে না। কেউ ওদের অত্যাচার করছে না, কেউ ওদের নদীর মধ্যে থাকতে বাধ্য করছে না, তুমি দেখতেই পাচ্ছ। তবু ওরা আসবে না। এই ওদের নিয়তি। জীবনে ওরা অনেক খারাপ কাজ করেছে, তারপর প্রেত হয়েছে, তাও ওদের মধ্যে যে বিষকে ওরা বেঁচে থাকতে লালন করেছিল, সে বিষকে ত্যাগ করতে পারেনি। বিষ কি শুধু বাইরের হয়, অভী? মনের মধ্যে যে বিষ থাকে, তার যাতনা পৃথিবীর সব বিষের চেয়েও ভয়ংকর। ওই মনের বিষ ওদের পোড়াচ্ছে, নদী থেকে উঠতে দিচ্ছে না। ওরা মুক্তই আছে, কিন্তু ওরা সে-কথা জানে না। যতক্ষণ না মনের সব হিংসা, ঘৃণাকে ওরা বিসর্জন দিচ্ছে, ততক্ষণ ওরা সে-কথা বুঝতেও পারবে না।”

“ওদের কোনোভাবে বাঁচানো যায় না?”

দেবতা বললেন, “এই নরকবিষের নদীকে কি থামিয়ে দেওয়া যায়? তোমার কী মনে হয়?”

“আমার তো মনে হয় না। নদীর উৎসের প্রবাহ আবার বন্ধ করা যায় নাকি?”

“তাহলে ওদেরকেও বাঁচানো যায় না। আমরা যা করতে পারব ভাবি, আমরা তাই করতে পারি। যা আমরা পারব না ভাবি, তা করতেও পারি না। ঠিক যেমন ওই প্রেতেরা ভাবছে, তারা কোনোদিন উঠে আসতে পারবে না ওই নদী থেকে।”

অভীর মনে হল, কথাটার মধ্যে কী একটা গভীর অর্থ আছে। সে তাকিয়ে রইল অসহায় কালো কালো ছায়ামূর্তিগুলোর দিকে। করুণায় তার হৃদয় যেন গলে গেল।

এগিয়ে গেল সে পাহাড়ের তলদেশে রাখা শঙ্খের দিকে। সুতসোমের দেওয়া বজ্রমাণিক আর সঙ্গে নেই; প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে তার – মুখচোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে আসতে দেখে প্রেতের দল আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

“অভী, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমাদের জন্য সত্যিই ফিরে এসেছ!”

“তোমার মঙ্গল হোক, বালক। আমাদের কাছে থাকো। একটু উপশম করো আমাদের যন্ত্রণার।”

“যেও না, অভী। যেওনা, আমাদের উপর দয়া করো!”

মৃত দেবতা বললেন, “সৌজন্য যখনই একটা নরকগহ্বর উন্মুক্ত করে প্রফুল্লের শরীরের বজ্রমাণিক দিয়ে নরকবিষকে আকর্ষণ করবে, এই নদীর তরল বিষাক্তি সেই গহ্বর দিয়ে সমরগরিমায় বেরিয়ে এসে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে। এই মুহূর্তে উপরের পৃথিবীতে সমরগরিমায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে; কিন্তু এই বিষ যদি উন্মুক্ত হয়ে যায়, একে থামানোর সাধ্য ওখানের কারও নেই।”

অভী বলল, “আপনি বলুন আমি কীভাবে একে আটকাতে পারি?”

“এ কাজ করা সম্ভব, তাই তো তুমি মনে করো না। তাহলে কীকরে পারবে তুমি? ওই বিষকে থামাতে পারেন একমাত্র কোনো বিষনিয়ন্তা – যিনি সব বিষকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ধরেন, যিনি সব বজ্রমাণিকের প্রভু হয়ে উঠতে পারেন।”

“আমার কাছে যে একমাত্র বজ্রমাণিকটা ছিল, সেটাও তো আমি নদীতে ফেলে দিলাম!”

“হ্যাঁ, ওই বিষের স্পর্শযোগ্য অস্তিত্ব যেটুকু তোমার কাছে ছিল, তুমি ত্যাগ করেছ। আর কোনো কথা মাথায় আসছে?”

অভী ভাবছে, কী করে ওই শঙ্খ থেকে বেরিয়ে আসা বিষের ধারাকে রোধ করা যায়। সে বলল, “যদি চন্দ্রহাস দিয়ে আঘাত করে ওই শাঁখটাকে ভেঙে দেওয়া যায়? তাহলে কি নরকবিষের স্রোতটা বন্ধ হয়ে যাবে না?”

মৃত দেবতা হেসে উঠলেন। “চন্দ্রহাস এ কাজ করবেই না। নিয়তির ইচ্ছায় ওই শঙ্খের সৃষ্টি; চন্দ্রহাস তাকে আঘাত করতে দেবে না তোমাকে। ওই শঙ্খ তো আর শত্রুপক্ষ নয় কারও; ও সৃষ্টির অঙ্গ। আর তুমি কথা বলছ নরকবিষের মতো প্রচণ্ড শক্তিশালী পদার্থ নিয়ে। ও জিনিস ধ্বংস করা যায় না; বড়োজোর কিছু সময়ের জন্য ওর প্রবাহ রোধ করা যেতে পারে। অবশ্য যে পাত্রে ওকে ধারণ করার চেষ্টা করবে, তা ধ্বংস হয়ে যাবে, বলাই বাহুল্য।”

অভী অসহায়ের মতো বলল, “তাহলে এখন কী করব আমি?”

“সৌজন্য খুব শীঘ্র খুলতে চলেছে নরকগহ্বরের মুখ; তুমি এখান থেকেই দেখতে পাবে। আর ওই গহ্বর খুলে গেলে ওই নদীর স্রোত বজ্রমাণিকের আকর্ষণমায়ায় উর্ধগামী হয়ে চলে যাবে সমরগরিমায়। তুমি একটাই কাজ করতে পারো। যদি কোনোভাবে ওই শঙ্খের থেকে বেরিয়ে আসা বিষকে কোথাও আটকে রাখতে পারো, তাহলে সমরগরিমাকে বাঁচাতে পারবে।”

অভী ভাবতে লাগল। সৌজন্য এতক্ষণে নিশ্চয় পীতপত্রবনে পৌঁছে গেছে প্রফুল্লের দেহটা নিয়ে। এই ভয়ংকর আগুনের মতো দাহিকাশক্তিসম্পন্ন তরল বিষ যদি একবার প্রবাহিত হয়ে যায় সমরগরিমায়, তাহলে শুধু পীতপত্রবন কেন, গোটা রাজ্যে একটা প্রাণীও বাঁচবে না।

মাথার উপরে একটা শব্দ পেয়ে উপরে তাকাল অভী। উপরে খুলে যাচ্ছে নরকগহ্বরের মুখ। সৌজন্য তার কাজ শুরু করে দিয়েছে!

গহ্বরটা বড়ো হচ্ছে। অভী সভয়ে দেখল, নদীর তরল আগুনটা পাক খেতে শুরু করেছে। সে আগুনের লক্ষ্য ওই মাথার উপরে শূন্যস্থান। একটা আগুনের স্তম্ভ তৈরি হতে শুরু করল নদীর বুক থেকে। ঠিক যেন মরুময়ের মেঘনির্মাণশালার মেঘ – অগ্নিময় তরল নরকবিষটা পাক খাচ্ছে স্তম্ভের মধ্যে,

কলকল শব্দ করছে।

সুস্থটা আকারে বাড়ছে, উচ্চতায় বাড়ছে। সৌজন্য বজ্রমাণিকের সাহায্যে মায়াবলে আস্থান করছে তাকে। দেবতা বললেন, “অভী, ভাবো, নরকবিষের তৈরি ওই সামান্য বজ্রমাণিক শরীরে ধারণ করে সুতসোম কী অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল।”

অভী আর ভাবতে পারছে না। তার আতঙ্কিত চোখের সামনে ভাসছে একটা ভয়ংকর কল্পনা – আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সমরগরিমা। কোথায় সে আটকে রাখবে এই তীব্র বিষের ধারাকে? আর তখনই অসম্ভব চিন্তাটা খেলে গেল তার মাথায়।

দ্বিতীয়বার না ভেবে সব জ্বালা, সব যাতনা অগ্রাহ্য করে সে ছুটে গেল শঙ্খটার কাছে। পলকের মধ্যে সেটা দু’হাতে তুলে নিয়ে ধারার মতো বেরিয়ে আসা ঘন নীল বিষটা সে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিল।

যে মুহূর্তে সে বিষটা পান করা শুরু করল, সেই মুহূর্ত থেকেই বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

নদীতে যে অগ্নিস্রোত বইছিল, তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যে প্রেতরা এতক্ষণ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করছিল, তারা মুক্তি পেয়ে উঠে এল পাড়ে – এগিয়ে এল যেখানে অভী দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানে। দু’হাত তুলে তারা আশীর্বাদ করতে লাগল তাকে; বলতে লাগল, “এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমরা তোমার কাছে চিরকাল ঋণী হয়ে রইলাম। তোমার মঙ্গল হোক, অভী; তোমার মঙ্গল হোক।”

অভী বুঝতে পারছে, ওই মারাত্মক নীল তরলটা নামছে তার গলা দিয়ে। তার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে – তার মুখ, গলা, বুক, পেট সব ভেতর থেকে জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার গায়ে আগুন ধরে গেল – নীল হয়ে জ্বলতে লাগল তার সারা দেহ। সে কী অকল্পনীয় যন্ত্রণা! অভী চিৎকার করতে চাইছে, কাঁদতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। তার জিভ, তার মুখের ভেতরের অংশ, তার গলা, তার পাকস্থলী – সব যেন পুড়ে গেছে। ছটফট করছে সে যন্ত্রণায়; চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। সারা দেহ জ্বলছে তার; দেহ থেকে উড়ে উড়ে পড়ছে ছাই।

শরীরের প্রত্যেকটি রোমকূপ থেকে এবার বেরোতে লাগল নীল ধোঁয়া। ভেতর থেকে বিষটা পোড়াচ্ছে তাকে।

মাংস পুড়েছে, এবার চামড়া পুড়েছে। নিজের শরীর পোড়ার গন্ধ নিজেরই নাকে আসছে তার। পুড়তে পুড়তেই শেষ হয়ে গেল সে। নীলচে ধূসর একটা মনুষ্য আকৃতি হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল নরকের নদীর পাড়ে – পুরোটাই তার ছাই দিয়ে তৈরি।

অভীর ধারণা, সে মরে গেছে। আর তার কোনো যন্ত্রণা নেই।

কিন্তু তারপর সে অনুভব করতে লাগল, তার একটা নতুন দেহ তৈরি হয়েছে। সর্বাস্থে ছাই লেগে আছে বটে, কিন্তু ছাইয়ের তলায় তার নতুন হাড়-মাংস-চামড়া গজিয়ে কীভাবে যেন একটা নতুন শরীর গড়ে উঠেছে। আর তার কোনো কষ্ট নেই, দহনজ্বালা নেই।

অভী এক অপার শান্তি অনুভব করল তার সর্বসত্তায়। পুরোনো শরীরের যে ছাই এখন তার সারা শরীরে আটকে আছে, তা যেন এই নতুন চামড়ার উপরে চন্দন লেপনের মতো আরাম দিচ্ছে। বিষটা শরীরের মধ্যে আছে বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার আর কোনো যাতনা নেই – স্থির হয়ে সে ধারণ করে আছে নরকবিষকে তার শরীরে।

মাথার উপরে নরকগহ্বরটা বড়ো হয়ে গেছে অনেকটা। কিন্তু বিষের উৎসকে রোধ করার পর থেকেই নদীর সেই তরল আগুনসুস্থ অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে শুনতে পেল সৌজন্যের অধৈর্য কণ্ঠস্বর, “উফ! এখনও আসছে না কেন?”

একটু হাসল অভী আপনমনে। মুক্তিপ্রাপ্ত প্রেতের দল তখন তার সামনে বসেছে হাঁটু গেড়ে।

এগিয়ে গেল সে গহ্বরটার দিকে। মৃত দেবতার কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেল সে। “অসাধারণ কাজ করেছ, অভী। এবার খুব শীঘ্রই দেখা হবে তোমার সঙ্গে আমার।”

অভী মাথা নিচু করে নমস্কার করল তাঁর উদ্দেশে। “কবে দেখা হবে, দেবতা?”

“হবে, শীঘ্রই। কিন্তু তুমি এখনও তার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নও। এখনও তোমার হৃদয়ে ঘৃণা রয়ে গেছে; তুমি তাকে সম্পূর্ণ ছাড়তে পারোনি।”

“এখনও পারিনি?”

“না, তবে অনেকটা পেরেছ। ওই ঘৃণার অনেকখানিকে তুমি ভালোবাসায় পরিণত করতে পেরেছিলে, তাই ওই বিষপান করেও তুমি মৃত্যুবরণ করোনি। কিন্তু ঘৃণা এখনও তোমার মধ্যে আছে; যেদিন তার সবটুকু ত্যাগ করতে পারবে, সেদিন তুমি আমার দেখা পাবে। আর সে দেখা হবে তোমার মৃত্যুর পরে।”

“আমার মৃত্যুর পরে?”

“হ্যাঁ, তার আর খুব বেশি দেরি নেই। সব বিষের মধ্যে তীব্রতম যে নরকবিষ, তাকে তুমি ধারণ করেছ নিজের শরীরে; তুমি বিষনিয়ন্ত্রা হয়েছ, অভী। পৃথিবীর যেকোনো বিষ তুমি নিজের ইচ্ছাবলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু নরকবিষকে নিজের দেহে আশ্রয় দেওয়ার মূল্যও দিতে হবে তোমাকে – কেউ, এমনকি বিষনিয়ন্ত্রাও এই বিষকে শরীরে ধারণ করে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারেন না। তোমার এই শরীরকে ওই বিষই ধ্বংস করে দেবে। তাই দেখা হবে খুব শীঘ্রই।”

অভী দীর্ঘশ্বাস ফেলল; মনে মনে ভাবল, “নিয়তির ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।”

দেবতা আবার বললেন, “আজ তুমি যে সাহস দেখিয়েছ, সব জীবের প্রতি যে করুণার পরিচয় দিয়েছ, তাতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি সত্য সত্যই বজ্রধরের উপযুক্ত শিষ্য হয়ে উঠতে পেরেছ।”

অভী হাসল। দেবতা বললেন, “আরেকটা কথা। রাজকন্যা উর্মি তোমাকে রক্তপদ্মরাগ দিয়েছেন, না?”

“হ্যাঁ।”

“ওই মহামূল্য মণি নিয়ে কী করবে, এখনও ভাবোনি নিশ্চয়?”

অভী বলল, “ভাবার আর সময় পাইনি। তবে লীনার মৃতদেহ তো এখনও রক্ষোপুরীতে আছে, তাই এখান থেকে ফিরে...”

দেবতা বললেন, “সমরোত্তম শ্যামশ্রীকে বজ্রমাণিকের বিষ দেওয়া হয়েছিল। তুমি তাঁকে বিষমুক্ত করতে পারলেও তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে দেরি আছে; তাই এখনই তাঁর রক্ত ব্যবহার করা ঠিক হবে না। তুমি কুকুরটাকে নিয়ে যেও।”

“কুকুর?” অভী অবাক হয়ে গেল।

দেবতা হাসছেন, শুনতে পেল সে। “রক্ষোবৈদ্য আর কুকুরটাকে নিয়ে বনে যেও। রক্ষোবৈদ্য জানেন, ওটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। এবার যাও। তোমার বন্ধুদের তোমাকে প্রয়োজন।”

সব কথা বুঝতে না পারলেও অভী আরেকবার নমস্কার করল দেবতার উদ্দেশে। তারপর সে এসে দাঁড়াল মাথার উপরে উন্মুক্ত হওয়া নরকগহ্বরের ঠিক তলায়।

তার শরীরের মধ্যে স্থিত নরকবিষকে সবলে আকর্ষণ করছে সৌজন্যের প্রযুক্ত বজ্রমাণিকের মায়া। অভীর দেহটা হু হু করে উপরের দিকে উঠতে লাগল নরকের কমলা-হলুদ তপ্ত দেওয়াল ছাড়িয়ে।

সৌজন্য গহ্বরের বাইরে প্রতীক্ষা করছে সেই তীব্র বিষাক্ত নরকবিষ উঠে আসার জন্য; সে বুঝতে পারছে, এতক্ষণে গর্ত দিয়ে কিছু একটা উঠে আসছে। তার মুখে ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার শয়তানি হাসি।

নরকগহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা তরল আগুনের জন্য সৌজন্য সাগ্রহে তৈরি হয়ে ছিল; কিন্তু গর্তের মধ্য থেকে যা বেরিয়ে এল, তার জন্য সে আদৌ তৈরি ছিল না।



॥ বিংশ অধ্যায় ॥ রক্তপদ্মরাগ

রাক্ষসদের প্রবল প্রাথমিক আঘাতটা কাটিয়ে উঠে সমরগরিমার বাহিনী ভালোই যুদ্ধ করছিল। শিক্ষার্থীরা যে এতটা দক্ষতার সঙ্গে এই আক্রমণ সামাল দেবে, নীলাভ্র ভাবতে পারেনি।

তার ভেতরে ভেতরে কিছুটা দুর্বল লাগছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের একটা নেশা আছে। সেই প্রবল কোলাহল, অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রের সংঘাত, আহতদের চিৎকার, রক্ত আর ঘামের গন্ধ – সব মিলিয়ে জাতযোদ্ধাকে ওই পরিবেশটা উৎসাহিতই করে। দু'হাতে দু'খানা তরবারি ঘোরাচ্ছিল নীলাভ্র। তার সামনে যে-ই আসছিল, সেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুবরণ করছিল।

যুদ্ধ করতে করতেই যতটা সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্রের সামগ্রিক অবস্থার উপর কড়া নজর রাখছিল সে। প্রজ্ঞা বা আলোকপর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি; তাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন শুধু, যদিও অবস্থা বেগতিক বুঝলে তাঁরাও হয়তো নেমে পড়বেন। উদ্যত অস্ত্র হাতে দু'জনেই প্রস্তুত হয়ে আছেন।

স্বর্ণশেখর তার লৌহদণ্ড ফুলঝুরি ঘুরিয়ে চলেছে অক্লান্তভাবে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন একটা আলোকময় চাকা প্রচণ্ডগতিতে ঘুরছে তার মুখের সামনে। সেই দণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আগুনের গোলা; সেগুলো গিয়ে পড়ছে রাক্ষসদের মধ্যে আর বিক্ষোভিত হচ্ছে প্রচণ্ড শব্দে। তাকে দু'পাশে ঘিরে রেখেছে ঢাল আর তরবারি হাতে চক্রবাক আর তরুণ, যাতে পাশ থেকে বা পেছন থেকে কেউ এসে হঠাৎ আক্রমণ করতে না পারে। নিভীকভাবে এগিয়ে চলেছে সে রাক্ষসসেনা ভেদ করে; তাকে আসতে দেখলেই ওই জায়গায় প্রতিপক্ষ ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

অরিত্র, দেবদত্তরাও তরবারি হাতে ভালোই লড়াই করছে। মৃগেন্দ্র, সন্দীপ, উষসী - এরা যোগ দিয়েছে ধনুর্ধর সেনায়। ক্ষণে ক্ষণে রাক্ষসদের উপর তির বর্ষণ করছে এরা।

সামনে আসা তিনটে রাক্ষসকে মুহূর্তের মধ্যে ভূমিশয্যায় শুইয়ে দিয়ে নীলাভ্র আবার চোখ তুলল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। সবাই মারাত্মক যুদ্ধ করছে বটে, কিন্তু স্বর্ণশেখর ছাড়া আর যে দু'জন শত্রুর মনে সত্যিকারের ভয়ের সৃষ্টি করতে পেরেছে, তারা নিধি আর পর্বত। নীরসেনা হয়ে ওঠার পর থেকে নিধিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং মৃত্যুদূত এসে অবতীর্ণ হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। তার ত্রিশূলের আঘাতে ক্ষণে ক্ষণে বিদীর্ণ হচ্ছে শত্রুসৈন্যের দেহ; তার দেহে আঘাত করতে পারছে না কোনো অস্ত্র। সে যে ভয়ংকর ক্ষিপ্ততার সঙ্গে ত্রিশূল চালনা করছে, দেখে অবাক হয়ে গেল নীলাভ্র। কোনো নীরসেনাকে যুদ্ধ করতে সে আগে কখনও দেখেনি। দেখতে দেখতে সে বুঝতে পারছিল, কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এইভাবে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

আর পর্বত! তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন সত্যিই একটা পাহাড় ছুটে বেড়াচ্ছে সেনাদলের মধ্য দিয়ে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া বিরাট পাথর যেমন তার গতিপথে যা পায়, তার সবই ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যায়, তেমনই আজ পর্বতকে আটকানোও দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিল। তার সামনে পড়া রাক্ষস সেনাদের পিষে, চেপে মেরে সে দুর্বীরগতিতে এগিয়ে চলেছিল। নীলাভ্র বুঝতে পারছিল, রাক্ষসরা যত সহজে সমরগরিমা দখল করবে ভেবেছিল, কাজটা তাদের অত সহজ আর নেই।

একটা কৌশল নিয়েছে সমরগরিমা। ঘটোৎকচ সেনাকে তারা কিছুতেই সামনে আসতে দেবে না। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের আঘাত করতে যোদ্ধাদের সকলে সম্মত নয়। তাই ঠিক করা হয়েছে, বাকি রাক্ষসদের কোনোমতেই নিরাপদ দূরত্বে পিছিয়ে যাওয়ার জায়গা দেওয়া যাবে না। ঘটোৎকচ ব্যবহার করে যদি ওরা বিস্ফোরণ করাতেই চায়, ওদের নিজেদেরও যেন বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। সে-জন্য রাক্ষসসেনাকে একটুও ফাঁকা জমি ছাড়ছে না সমরগরিমা।

কিন্তু আরেকটা কথাও নীলাভ্রর মাথায় ঘুরছে। সমরগরিমার বীররা যতই দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করুক, রাক্ষসদের সেনাবল অনেক বেশি। এই ধরনের যুদ্ধে একসময় ক্লান্তি আসবেই; তখন রাক্ষসরা বাজিমাত করতে পারে স্রেফ বেশি সেনাসংখ্যা দিয়েই।

ওদিকে আলোকপর্ণ প্রজ্ঞাকে বলছিল, “সেনানায়িকা, এই সমরোত্তমরা ওদের বেশ সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। এবার অনুমতি দিন।”

প্রজ্ঞা বললেন, “সমরোত্তম নীলাভ্রর কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, এই দু'জন সমরোত্তম হয়তো স্বেচ্ছায় আমাদের দলে যোগ দেননি, কোনো মায়াপ্রভাবে এঁদের বাধ্য করা হয়েছে। ন্যায়ত তাই আমি এঁদের যুদ্ধে নামাতে চাইনি। কিন্তু যা অবস্থা দেখছি, ওদের সমরোত্তমদের আটকানোর জন্যই এঁদের দিয়ে যুদ্ধ করাতে হবে। ওঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লে আমাদের সেনাদের পক্ষে বাকিদের দমন করা সহজ হবে।”

নীলাভ তরবারি চালনা করতে করতে দেখছিল, মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন প্রজ্ঞা। সে মনে মনে এই ভয়টাই পাচ্ছিল। সরাসরি যুদ্ধে না পেরে এবার তাহলে ওদেরকে নামাচ্ছে রাক্ষসরা!

তরবারি উদ্যত করে ছুটে আসছে মেঘবর্ণ; নীলাভ জানে, তাকে থামানোর মতো অস্ত্রবিদ্যা এখানে সে ছাড়া আর কারও নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে মেঘবর্ণের মতো অস্ত্রকুশলীকে রুখে দেওয়ার জন্য যতখানি দৈহিক সপ্রতিভতা দরকার, ততখানি কি সে আদৌ ফিরে পেয়েছে?

শ্যামশ্রী আসছেন ছুটে। নীলাভ চিৎকার করে বলল, “স্বর্ণশেখর, এদিকে এসো।”

স্বর্ণশেখর মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েই বুঝে নিল ব্যাপারটা। কয়েক লাফে সে এসে পড়ল শ্যামশ্রীর সামনে; তাঁর তরবারির আঘাতটা সে আটকে দিল তার লৌহদণ্ড দিয়ে। চিৎকার করে স্বর্ণশেখর বলল, “নীলাভ, এরা ভুলে গেছে এরা কারা। একবার মনে করানোর চেষ্টা করে দেখো কোনো লাভ হয় কিনা।”

মেঘবর্ণের সঙ্গে তখন তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেছে নীলাভর। তার অসম্ভব ক্ষিপ্ত পদক্ষেপ আর প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন আঘাতগুলোকে নীলাভ এখনও পর্যন্ত এড়িয়ে চলতে পারছে ঠিকই, কিন্তু কতক্ষণ পারবে, সে জানে না। নীলাভ তার দেহে প্রাণঘাতী আঘাত করার সুযোগও পেয়েছিল একবার, কিন্তু নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। তরবারি তরবারির আঘাতে স্ফুলিঙ্গ উড়ছে আকাশে, ঠন ঠন শব্দ হচ্ছে। নীলাভ চোঁচিয়ে বলে উঠল, “আরে মেঘ, তাকিয়ে দেখ ভালো করে, আমি নীল। আমাকে মারতে চাস তুই?”

মেঘবর্ণ কোনো উত্তর দিল না, শুধু একবার এক মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়ে তাকাল তার প্রিয়বন্ধুর দিকে। কিন্তু বজ্রমাণিকের বিষ তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে পরক্ষণেই সব ভুলে সে আবার যুদ্ধ শুরু করল প্রবল বেগে।

ওদিকে স্বর্ণশেখরও আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে যুদ্ধরতা শ্যামশ্রীকে শান্ত করার। “শ্যামশ্রী, তুমি চিনতে পারছ না আমাকে? আমি স্বর্ণশেখর। আমি আমার সমরোত্তমত্ব ত্যাগ করেছিলাম তোমার ছেলে অভীকে মানুষ করার জন্য। হে ভগবান! অভীকে মনে নেই তোমার? অভী আমাকে ‘রবিকাকা’ বলে ডাকে! সব ভুলে গেছ তুমি?”

অভীর নাম শুনেই হয়তো একবারের জন্য অশ্রুসজল হয়ে উঠল শ্যামশ্রীর চোখ, কিন্তু বিষটা তাঁর মস্তিষ্কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে; তিনি যন্ত্রের মতো অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

ওদিকে সমরোত্তমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ায় রাক্ষসসেনাদের খুব সুবিধা হয়েছে। তারা এগিয়ে আসছে, দখল করছে ওদের জমি। পর্বত, নিধি আর বাকিরা প্রচণ্ড লড়াই করছে ঠিকই, কিন্তু দু’জন মহাযোদ্ধা ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় অত বড়ো যুদ্ধক্ষেত্র তারা পুরোপুরি সামলাতে পারছে না।

নীলাভ স্বর্ণশেখরকে বলল, “আমরা এদের না মারা পর্যন্ত এরা একই ভাবে লড়াই করে যাবে।”

স্বর্ণশেখর বলল, “তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।”

“হ্যাঁ, আমিও জানি তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমি যে আর পারছি না।”

ওপাশ থেকে পর্বত চোঁচিয়ে উঠল, “নীলাভ্র, স্বর্ণশেখর, তোমরা এদিকে আসতে পারবে? তোমাদের বাদ দিয়ে আমরা পেরে উঠছি না।”

নীলাভ্র বলল, “পরে। আমরা অন্য যুদ্ধে ব্যস্ত।”

পর্বত বলল, “দেখতেই পাচ্ছি। ও যুদ্ধ শেষ হওয়ার নয়।”

সমরগরিমার সেনারা পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে; জমি হারাচ্ছে তারা। রাক্ষসরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। ক্লান্তি গ্রাস করছে সমরগরিমার যোদ্ধাদের। অগণিত রাক্ষসসৈন্য সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে তাদের উপর। প্রতিরোধ করার শেষ চেষ্টা চালাচ্ছে বটে যোদ্ধারা, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, আর বেশিক্ষণ তারা পারবে না।

ওদিক থেকে মৃগেন্দ্র চোঁচিয়ে বলল, “সমরোত্তমগণ, আমাদের তির ফুরিয়ে আসছে। কী করব?”

মেঘবর্ণের একটা আঘাত প্রতিরোধ করতে করতে নীলাভ্র উত্তর দিল, “যতক্ষণ আছে, চালিয়ে যাও।”

উষসী বলে উঠল, “চিন্তা করবেন না, আমরা আমৃত্যু লড়াই করব।”

রাক্ষসদের দিক থেকে আলোকপর্ণ তার তিরন্দাজ সেনাদের নির্দেশ দিল, “সমরোত্তমরা ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে লড়তে। এই সুযোগে তির ছুড়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দাও ওদের।”

রাক্ষস তিরন্দাজরা প্রথমে নিশানা করল স্বর্ণশেখরকে, কিন্তু তার ফুলঝুরি ভেদ করে ওদের তির তাকে ছুঁতে পারছে না। বিপদ বুঝে স্বর্ণশেখর চোঁচিয়ে উঠল, “চক্রবাক! তরুণ! নীলাভ্রকে আড়াল করো। ওরা এবার ওকে লক্ষ্য করে বাণবর্ষণ করবে।”

চক্রবাক সেই মুহূর্তেই সরে গেল তার থেকে দূরে, যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য দিকে – হয়তো ইচ্ছা করেই। নীলাভ্র তখন মেঘবর্ণের আঘাত ঠেকাতে এতটাই ব্যস্ত যে এদিকে তাকানোর সুযোগই নেই তার। উপায়ান্তর না দেখে তরুণ তার ঢাল দিয়ে নীলাভ্রর শরীর আড়াল করে দাঁড়াল, আর সেই মুহূর্তেই উড়ে এল এক ঝাঁক তির।

নীলাভ্রর শরীরে সেগুলো লাগল না বটে, কিন্তু তরুণের দেহ ভেদ করে চলে গেল চারখানা মূর্তিমান মৃত্যুদূত। বুকে আর পেটে তিরবিদ্ধ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ল নীলাভ্রর পায়ের কাছে।

চমকে উঠে সেদিকে তাকাল নীলাভ্র। কিন্তু তখনই আবার মাথার উপর এসে পড়ছে মেঘবর্ণের তরবারি। শোক করারও সময় নেই – যুদ্ধক্ষেত্র এমনই অকরণ স্থান।

প্রতিপক্ষের আঘাতটা সামলে আরেকবার তরুণের মৃতদেহের দিকে তাকাল নীলাভ্র। নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে সে – চোখ স্থির হয়ে গেছে, বুকের ক্ষতস্থান থেকে চুইয়ে বেরিয়ে আসছে রক্তের ধারা। দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে নিধি, সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে এদিকে আসতে, কিন্তু বিপক্ষের সেনাস্রোত ঠেলে আসতে পারছে না কিছুতেই।

রাক্ষসসৈন্যরা হারিয়ে দিচ্ছে সমরগরিমার বাহিনীকে। আলোকপর্ণ গলা খুলে চিৎকার করে উঠল, “এগিয়ে চলো, সেনারা। ওদের দম শেষ হয়ে গেছে। আজ সমরগরিমার প্রত্যেকটি মানুষ আর অর্ধরাক্ষসকে দু’টুকরো করে তবে আমরা থামব।”

অতি উৎসাহে গর্জন করে উঠল সুবিশাল রাক্ষস সৈন্যদল। আর তখনই ঘটনাটা ঘটল।

বিকেল হয়ে এসেছে; সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে; ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে লেগে রয়েছে হালকা বেগুনি আভা। সেই মেঘের সামনে দিয়ে উড়ে এল এক মহানীলগৃধ্র। তার বিরাট ডানার ঝাপটে স্নান হয়ে গেল যুদ্ধের কোলাহল। আর সেই বিশালকায় পাখির পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল অভী।

স্বর্ণশেখর দেখতে পেয়েছে তাকে সবার আগে। সে চিৎকার করে উঠল, “অভী এসেছে! অভী এসেছে!”

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েছিল যুযুধান দু’পক্ষই। অভী এসে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে, বিকেলের রোদ পড়েছে তার মুখে। তার সারা শরীর ভস্মে ঢাকা, হাতে ঝিলিক দিচ্ছে বাঁকা চাঁদের মতো উজ্জ্বল চন্দ্রহাস, আর তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য কালো কালো ছায়ামূর্তি।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে বক্ষিম তরবারি হাতে – ভস্মাঙ্গভূষিত, উন্নতমস্তক। তার পেছনে কালো কালো ভূতপ্রেতের দল বিকট গর্জন করছে, হাসছে।

হাত তুলে রাক্ষসদের দিকে নির্দেশ করল সে, আর তৎক্ষণাৎ সেই প্রেতবাহিনী উচ্চরোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর।

রাক্ষসরা প্রথমটা এতটাই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল যে পালটা আক্রমণ করার আগেই তাদের অর্ধেক মারা পড়ল। তারপর তারা কিছুটা সামলে উঠে যুদ্ধ করার চেষ্টা করতে চাইছিল বটে, কিন্তু তরবারি, গদা, তির কোনোকিছু দিয়েই এই প্রেতদের শরীরে আঘাত করতে পারল না তারা।

নীলাব্রভয় হতে লাগল, এরা না হত্যার আনন্দে শত্রুপক্ষ-মিত্রপক্ষ গুলিয়ে ফেলে। সে চিৎকার করে আদেশ দিল, “সমরগরিমার বাহিনী। পিছিয়ে এসো। যুদ্ধ বন্ধ করো।”

তার কথা শুনল সেনারা। প্রেতবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে তারা পিছিয়ে এসে অবাক চোখে দেখতে লাগল এই অদ্ভুত ঘটনা।

প্রচণ্ড হুংকারে শত্রুনিধন করছে কৃষ্ণবর্ণ ছায়ামূর্তিগুলো; দু’হাতে ছিঁড়ে ফেলছে রাক্ষসদের; তাদের আর্তনাদে ভরে উঠেছে সমরগরিমার যুদ্ধপ্রান্তর। রাক্ষস সেনারা পালাতে শুরু করল।

প্রজ্ঞাও বুঝতে পেরেছেন, এ লড়াই আর চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তিনি উচ্চরবে আদেশ দিলেন, “রাক্ষসরা, পিছিয়ে যাও, পিছিয়ে যাও। ফিরে চলো, ফিরে চলো এক্ষুণি।”

তার আদেশের অপেক্ষা না করেই রাক্ষসরা পালাচ্ছিল। সমরগরিমার মাঠ ভরে উঠেছিল মৃত রাক্ষসের দেহাংশে আর রক্তমেশা কাদায়। প্রেতের দল তাদের তাড়িয়ে দিয়ে এল মৃত দেবতার নদী পর্যন্ত। অভী চিৎকার করে

বলল, “যারা পালাচ্ছে, যারা অস্ত্রহীন, যারা যুদ্ধ করছে না, তাদের কেউ আঘাত করবে না।”

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মাল্যপর্বতের সেনা আর কেউ রইল না। শুধু তরবারি হাতে বুদ্ধিহীনের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণ।

প্রেতের দল এসে হাঁটু গেড়ে বসল অভীর সামনে। অবাক দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইল সকলে।

অভী বলল, “না চাইতেই যে সাহায্য আপনারা করেছেন, তার ঋণ আমি এ জন্মে শোধ করতে পারব না।”

মিশকালো প্রেতের দল শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করল। “না, তোমার কাছেই আমরা চিরকালের জন্য ঋণী রইলাম, অভী। তুমি ওই বিষপান করে আমাদের অনন্ত যন্ত্রণাভোগের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছ, তুমি আমাদের শান্তি দিয়েছ। আমরা আশীর্বাদ করছি, তুমিও যেন তোমার জীবনে শান্তি পাও। এবার আমাদের বিদায় দাও।”

অভী মাথা নাড়ল। “বিদায়। আপনাদের মঙ্গল হোক।”

ঝড়ের হাওয়ার মতো মাঠের উপর বয়ে গেল প্রেতের বাহিনী; আর তাদের চিহ্নমাত্র রইল না সমরগরিমার প্রান্তরে।

সমরগরিমার সেনারা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। ক্লান্ত নীলাভ কপালের ঘাম মুছে হাসল অভীর দিকে তাকিয়ে। পর্বত আর স্বর্ণশেখর এগিয়ে এল। অভীর বন্ধুরা ছুটে এল তার কাছে।

“কোথায় ছিলে তুমি?”

“এত ছাই কেন তোমার গায়ে?”

“ওই জিনিসগুলো কী ছিল? কোথায় পেলে ওদের?”

সবার প্রশ্নকে আপাতত সরিয়ে রেখে অভী এগিয়ে গেল মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রীর দিকে। তাঁদের ঘাড়ে যেখানে সূচ বিদ্ধ করে বিষটা ঢোকানো হয়েছিল, সেখানে হাত রাখল সে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের মুখের নীলচে কালো ভাবটা উধাও হয়ে গিয়ে ফুটে উঠল স্বাস্থ্যকর আভা, চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জল, আর তাঁরা অজ্ঞানের মতো লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

রক্ষোবৈদ্য এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, “অভী, তুমি বিষহরণ করলে ওদের?”

অভী মাথা নাড়ল। রক্ষোবৈদ্য বিস্ময়িত চোখে বললেন, “আমার এতদিনের চিকিৎসক জীবনে এই ঘটনা প্রথম দেখছি। তার মানে তুমি বিষনিয়ন্ত্রণ মহাবিদ্যা আয়ত্ত্ব করেছ?”

অভী সংক্ষেপে বলল, “হ্যাঁ, কিন্তু মা আর মেঘবর্ণ অজ্ঞান হয়ে গেছে কেন?”

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “এই বিষটা ওদের মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার কুপ্রভাব কেটে গেছে, কিন্তু শরীরকে তার পুরোনো ছন্দে ফিরতে দিতে একটু সময় দিতে হবে। ভয় নেই, ওরা সেরে উঠবে।”

রক্ষোবৈদ্যের নির্দেশে শিক্ষার্থীদের কয়েকজন এসে দুই অচেতন সমরোত্তমকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল সেবাকক্ষে। অভী এগিয়ে গেল নিধির দিকে।

হাতে ত্রিশূল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে একদিকে। অভী বলল, “নিধি, তোমার ক্ষতটা কোথায় ছিল, দেখাও আমাকে।”

উষসী পাশ থেকে বলল, “অভী, একটু দাঁড়াও।”

ছুটে গিয়ে কোথা থেকে একটা চাদর এনে সে নিধির গায়ে ঢাকা দিয়ে দিল। নিধির কাঁধে যেখানে শেষমুখের তিরটা বিদ্ধ হয়েছিল, সেখানে আঁশের তলায় এখনও ক্ষতচিহ্নটা দগদগ করছে। অভী তার উপর আঙুল ছুঁয়ে সেই বিষকে আকর্ষণ করে নিল।

তারপরেই অদ্ভুত ব্যাপার – নিধির মাথার শিংগুলো ছোটো হতে হতে মিলিয়ে গেল, মিলিয়ে যেতে লাগল তার সারা গা-ভর্তি আঁশ; চোখের অস্বাভাবিক শীতলতা বদলে গেল পুরোনো নিধির অতিপরিচিত উজ্জ্বল দৃষ্টিতে। তার মুখ, হাত, পা ইত্যাদি দৃশ্যমান অংশগুলোতে আঁশগুলো মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল চামড়া।

অভী আর বাকি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। উষসী তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল বুকে।

মৃগেন্দ্র হঠাৎ একটু অবাক হয়ে বলল, “উনি আসছেন কেন এখানে?”

ওরা দেখল, একজন নীরসেনা হাতে ত্রিশূল নিয়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। তাকে দেখে সমরোত্তমরাও সসম্মুখে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন।

প্রতিনমস্কার করে নীরসেনা তাকাল নিধির দিকে। “তুমি বিষ থেকে মুক্ত হয়েছ, তাই দেবতা তোমাকে তাঁর সেবা করার দায়িত্ব থেকেও মুক্তি দিয়েছেন।”

নিধি মাথা নীচু করে বলল, “দেবতাকে আমার প্রণাম।”

নীলাভ্র এসে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে ফিরে নীরসেনা বলল, “দেবতা বলেছেন, সমরোত্তমরা যেন প্রস্তুত থাকেন, কারণ মৃত্যু তাঁদের কাছে আসবে খুব শীঘ্র।”

নীলাভ্র বলল, “আমরা তাঁর জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকি, ভবিষ্যতেও থাকব।”

নীরসেনা এবার ফিরল অভীর দিকে। “অভী, দেবতা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছেন, তোমার হাতে আর বেশি সময় নেই।”

অভী কিছু না বলে মাথা নাড়ল। আর কোনো কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল নীরসেনা।

নিধি বলল, “অভী, ও কী বলে গেল? মানে কী কথাটার?”

অভী ইচ্ছা করেই বলল, “আমি জানি না।”

নিধি হাসল; অভী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে পড়ল যুদ্ধপ্রান্তরেই। সকলেই প্রায় বসে পড়েছে – সকলেই ক্লান্ত। তার উপরে যোগ হয়েছে যুদ্ধজয়ের পরবর্তী অবসাদ।

তরুণের নিখর দেহের কাছে এসে দাঁড়াল নিধি, আলতো হাতে বন্ধ করে দিল তার খোলা চোখ। ফিশফিশ করে বলল, “নীপাকে আজ সামলানো মুশকিল হবে, অভী।”

অভী মাথা নাড়ল। নীপার মতো আবেগপ্রবণ মেয়ের কাছে এ যে কত বড়ো আঘাত, সে আর তাকে বলে দিতে হবে না। তরুণের মায়ের কথাও

মনে পড়ছে তার; একবার দেখেছিল সে তাঁকে প্রথমবার মানবমন্দির যাওয়ার সময়। যখন তিনি জানবেন তাঁর ছেলে আর নেই, তাঁর মনের অবস্থা কেমন হবে? তরুণের সঙ্গে ভালো-মন্দ মিশিয়ে তার নিজেরও তো অনেক স্মৃতি। অতীত মনে হল, অদ্ভুত একটা কষ্ট যেন তাকে ভেতরটাকে অস্থির করে রাখছে, কিছুতেই শান্ত হতে দিচ্ছে না।

তবু পুরোনো বন্ধুকে পাশে পেয়ে তার একটু নিশ্চিত লাগছে। ভরসা করার মতো একটা কেউ অন্তত এখনও আছে। তরুণকে পেছনে রেখে ওরা কিছুটা দূরে গিয়ে বসল।

অভী বলল, “তোমার শরীরে এখন আর কোনো কষ্ট নেই তো?”

নিধি বলল, “না, কিন্তু তোমার এ কী অবস্থা! দেখে মনে হচ্ছে যেন শ্মশানে গিয়ে ছাইয়ের উপর গড়াগড়ি দিয়ে এসেছ। কী নোংরা ছেলে রে বাবা!”

হাসল অভী। এত যুদ্ধের পরেও নিধি হালকা সুরে কথা বলতে পারছে দেখে ভালো লাগছে তার। যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষকে মরতে দেখার পর হয়তো যোদ্ধাদের এমনই হয় – মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও মজা করতে পারার ক্ষমতা আসে। সে বলল, “আর তুমি? তোমার গোটা গায়ে তো মাছের গন্ধ!”

“হুঁঃ! তবু তোমার বগলের চেয়ে ভালো গন্ধ।”

এবার দু'জনে মিলে হাসতে গিয়েও থেমে গেল অদ্ভুতভাবে। এইধরনের হাসির কথাগুলো যখনই হয়েছে, তখন আর একজন সবসময় উপস্থিত থেকেছে ওদের সঙ্গে।

নীলাদ্র উঠে এসে বসল অভীর পাশে, হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখল তার কাঁধ। শিক্ষার্থীরা ততক্ষণে আবার উঠে পড়েছে, কেউ কেউ মেতেছে জয়োদ্ভাসে। নীলাদ্র বাধা দিল না তাদের। করুক ওরা, আনন্দ করুক। এ আনন্দ ওরা অর্জন করেছে।

কিন্তু তার মাথায় আছে, তাদের পক্ষে আজ তরুণসহ যে সেনারা প্রাণবিসর্জন দিল, তাদের সবার উপযুক্ত সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে এবার।

পর্বত আর স্বর্ণশেখর এসে বসেছে ওদের পাশে। অভী শুনতে পেল, পর্বত বলছে, “স্বর্ণশেখর, এতদিন পরে তোমাকে ফুলঝুরি ছোটাতে দেখে কী ভালো যে লাগল, কী বলব!”

স্বর্ণশেখরও হাসল, “আমিও অনেক দিন পরে দেখলাম পাগলা হাতি পর্বতকে ছুটতে।”

সবাই হেসে উঠল। পর্বত বলল, “আজ আলোকপর্ণটা ভয় পেয়ে যুদ্ধ করতেই নামল না, তাই বেঁচে গেল। নয়তো ওর কপালে দুঃখ ছিল।”

স্বর্ণশেখর পিঠ চাপড়ে দিল অভীর। “আজ তুই না থাকলে বিপদ হত রে।”

নীলাদ্রও মাথা নেড়ে সায় দিল। “আমি সবসময় ভাবি, তুই বোধহয় খুব একটা বেশি কিছু করতে পারবি না। কিন্তু দেখেছি, যেভাবেই হোক, শেষ পর্যন্ত তুই চমকে দেওয়ার মতো কিছু করিস। মেঘ আমাকে বরাবর বলে এসেছে, তোর মধ্যে এই ব্যাপারটা আছে। তোর উপর খুব ভরসা ওর।”

অভী কিছু না বলে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে অভী আর নিধি উঠে পড়ল – একবার সেবাকক্ষে শ্যামশ্রী আর মেঘবর্ণকে দেখতে যাবে তারা।

সৌজন্যকে পাওয়া গেল পীতপত্রবনে। অভীই সকলকে নিয়ে গেল তার কাছে; গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে এসেছিল সে।

অভীর মারে বেশ আহত হয়েছে সে। বিষনিয়ন্তার সামনে তার বজ্রমাণিকের ক্ষমতা আর কাজ করেনি।

অভী বলল, “চন্দ্রহাস দিয়ে ওকে শেষ করে দিতে ইচ্ছা হয়েছিল আমার। কিন্তু ও নিরস্ত্র ছিল, তাই আর প্রাণে মেরে ফেলতে পারিনি।”

নীলাভ্র বলল, “বোঝাই যাচ্ছে, ওই সময় যুদ্ধ করতে হবে, শেষমুখ এমন আশা করেননি।”

সৌজন্যকে আপাতত বন্দি করা হয়েছে। নিয়ামকের সঙ্গেই তার বিচার হবে। বজ্রমাণিকের ব্যাপারটা জেনে যাওয়ার পর থেকে নিয়ামক বিনীতেশ অবশ্য এখন বলছেন, তিনি যা কিছু করেছেন এবং বলেছেন, সবই তাঁকে দিয়ে করিয়েছে সৌজন্য, যদিও নীলাভ্রসহ সকলেরই সন্দেহ, স্রেফ নিজের পিঠ বাঁচাতে সৌজন্যের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে তিনি বাঁচতে চাইছেন।

নীলাভ্র আর স্বর্ণশেখর ঠিক করেছে, মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত বিচারপ্রক্রিয়া তারা স্থগিত রাখবে। রক্ষোবৈদ্য বুদ্ধি দিয়েছেন, সৌজন্যের বিচারসভায় রাজা পুনর্বসুকেও উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করতে। যদি তিনি আসতে রাজি না হন, তাহলে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে মাল্যপর্বতে। সেখানে তার অপরাধের বোঝা আরও বেশি – রাজদ্রোহ, রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র, রাজকর্মচারীকে হত্যা করা, রাজকন্যাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া।

ভালো খবর হল, অভী বিষটাকে তাঁদের শরীর থেকে পরিষ্কার করে দেওয়ার পর মেঘবর্ণ আর শ্যামশ্রী দু’জনেই দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন। এখন সবাইকে চিনতেও পারছেন তাঁরা, কথাও বলছেন পরিষ্কার। মেঘবর্ণ তো এরই মধ্যে অনুশীলন মঞ্চে গিয়ে তরবারি চালনা অভ্যাস করতে চাইছিল, রক্ষোবৈদ্যের কড়া নিষেধে সে শান্ত হয়েছে। নিয়ামকের শরীর থেকেও বিষ নিষ্কাশন করা হয়েছে। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা হবে, অর্ধরাক্ষসদের উপর আক্রমণের পেছনে তাঁর সচেতন অবদান কতখানি ছিল।

কিছুক্ষণ শয্যাশায়ী শ্যামশ্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল নীলাভ্র। তিনি ফিশফিশ করে বললেন, “অভী কই?”

“সে এসেছিল একটু আগে। তুমি ঘুমোচ্ছ দেখে তোমাকে আর ডাকেনি।”

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর নীলাভ্রর হাতটা ধরে বললেন, “আমি যে এই সময়টাতে কী করেছি, আমার কিছু মনে নেই। কিন্তু নীলাভ্র, আমার হাতে যদি তোমাদের কারও কিছু হয়ে যেত, তাহলে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া গতি থাকত না।”

নীলাভ্র তাঁর ঠোঁটের উপর আঙুল ছোঁয়াল। “চুপ করো। ওসব বোলো না। আমি তোমাকে একবার হারিয়েছি, শ্যামা; আর কোনোদিন হারাতে দেব না। এবার থেকে যা করব আমরা, দু’জনে একসঙ্গে করব।”

শ্যামশ্রীর শয্যার পাশে একটা ভারি পর্দা টাঙানো ছিল, সেই পর্দার ওপারে মেঘবর্ণের শয্যা। সে বলে উঠল, “ওঃ নীল, তোদের প্রেমের জ্বালায় আমার যে ঘুমোনো দায় হল!”

লজ্জা পেয়ে জিহ্বা দংশন করলেন শ্যামশ্রী। হাসতে হাসতে নীলাভ গিয়ে শয্যাশায়ী মেঘবর্ণের মাথায় এক চাঁটি মারল। “হতভাগা, স্বামী-স্ত্রীর কথায় আড়ি পাতছিস?”

মেঘবর্ণ বলল, “আড়ি পাততে হবে কেন? তোর যা ষাঁড়ের মতো গলা!”

নীলাভ হাসতে লাগল। মেঘবর্ণ বলল, “অভী এসে আমাকে বলে গেল, রক্ষোপুরীতে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে নাকি ওর ভয় করছিল। যাই বলিস নীল, তোর ছেলে তোকে ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু। কোনো যুদ্ধে ও সঙ্গে থাকলে আমি একটু নিশ্চিন্ত বোধ করি।”

নীলাভ বলল, “জানি। তোকে ওই অবস্থায় দেখে আমাদের সবারই ভয় করছিল। হ্যাঁ রে, লতা আসেনি?”

মেঘবর্ণের মুখ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। “এসেছিল। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল পাশে।”

“কী বলল?”

“বলল... থাক রে, নীল। সে কথা আর ভাবতেও ভালো লাগছে না।”

নীলাভ বুঝতে পারল, লতা আর লীনার প্রসঙ্গ এখন মেঘবর্ণকে বিচলিতই করবে। ইতিমধ্যে রক্ষোপুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে লীনার মৃতদেহ আনা হয়েছে আয়তনে। সৌভাগ্যের বিষয়, রাজা পুনর্বসু সৌজন্যকে অবিলম্বে হাতে পাওয়া যাবে, এই শর্তের বিনিময়ে লীনার দেহ পাঠিয়ে দিতে আপত্তি করেননি। রক্ষোবৈদ্য দেহটাতে আরও কিছু ওষুধ মাখিয়ে আপাতত সংরক্ষণ করে রেখেছেন। অভী তাঁকে অনুরোধ করেছে, যদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আর কয়েকটা দিন পিছিয়ে দেওয়া যায়।

নীলাভ বলল, “আচ্ছা, থাক সে কথা। এখন বিশ্রাম কর। আমি পরে আবার আসব।”

সেবাক্ষের বাইরে বেরিয়ে এল সে। সেখানে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল স্বর্ণশেখর আর পর্বত। নীলাভ যোগ দিল সেই আলোচনায়।

স্বর্ণশেখর বলছিল, “এত বড়ো রাক্ষসবাহিনীকে হারানো কিন্তু মুখের কথা নয়। এর কৃতিত্ব আমাদের শিক্ষার্থীদের দিতেই হবে। অবশ্য অভী শেষ মুহূর্তে ওর ওই ভূতপ্রেতের বাহিনী নিয়ে না এলে বিপদ হতে পারত।”

নীলাভ বলল, “আমাদের কিন্তু খুব খুশি হওয়ার কিছু নেই। একটা মাত্র যুদ্ধে জিতেছি আমরা। সামনে আরও যুদ্ধ আসছে, আমি বলে রাখছি। তবে আশা করি, রাক্ষসদের এটা বোঝানো যাবে যে, এই যুদ্ধের পেছনে যে ভুল-বোঝাবুঝি, তার পুরোটাই সৌজন্যের অবদান। কিছুটা হয়তো ওরাও বুঝেছে। কিন্তু তাতে কি মানুষ-রাক্ষসদের এতদিনের চাপা শত্রুতা শেষ হয়ে যাবে ভাবছ?”

পর্বত মাথা নাড়ল। “নাঃ, তার কোনো সম্ভাবনাই নেই।”

স্বর্ণশেখর বলল, “শুধু নিরাশার দিকটা দেখছ কেন? ভালো দিকটাও

ভাবো। দু'জন সমরোত্তমকে তো আমরা ফিরে পেয়েছি।”

নীলাভ বলল, “তাতেও আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছি কই? শ্যামশ্রী আর মেঘবর্গ দু'জনেই দু'জনকে মারাত্মক সব আঘাত করেছে। অনেকটা সেরে উঠেছে বটে ওরা, কিন্তু এখনও পুরোপুরি আগের ক্ষমতা ফিরে পেতে ওদের সময় লাগবে। আমি নিজে সম্পূর্ণ সুস্থ নই এখনও – পনেরো বছর নরকবাসের ধকল এখনও আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। স্বর্গশেখর, তুমি ফিরে এসেছ, আর পর্বত, তুমি আছ – এই দুটি হচ্ছে ভালো দিক। কিন্তু যদি সামগ্রিকভাবে বিচার করো, সমরগরিমা কিছুটা হলেও দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রজ্ঞার মতো ধুরন্ধর যুদ্ধবিদের সেটা অনুমান করতে ভুল হওয়ার কথা নয়।”

পর্বত বলল, “হ্যাঁ, আমি তাঁকে ভালো করেই চিনি। তিনি সবকিছুর হিসাব রাখেন – ভালো এবং মন্দ, দুটোরই। আজকের অপমান তিনি ভুলবেন না – প্রত্যাঘাত করবেনই।”

স্বর্গশেখর বলল, “তাহলে তুমি এখন কী পরামর্শ দিচ্ছ, নীলাভ?”

নীলাভ বলল, “আমরা যে আগের থেকে একটু হলেও দুর্বল হয়েছি, এই সত্যটা মাথায় রাখাই ভালো। নিজেদের রক্ষণ আরও শক্তপোক্ত করতে হবে। আমার ভয়, যদি আরেকটা আক্রমণ অল্পদিনের মধ্যেই হয়, তাহলে তাকে ঠেকানোর মতো সমরক্ষমতা আমাদের এই মুহূর্তে নেই।”

মিত্রভবনে বসেছিল অভী আর নিধি। হাতে মুখ ঢেকে মিত্রমাসি কাঁদছেন নীরবে, তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল।

অভী আর নিধি ইচ্ছা করেই যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও পুরো দু'দিন এ-মুখো হয়নি, আয়তনেই কাটিয়েছে। মিত্রমাসির মুখোমুখি কীভাবে হবে, ভেবে পাচ্ছিল না ওরা। তারপর আজ অনেক সাহস সঞ্চয় করে এসেছে এখানে।

“লীনা...! এইটুকু মেয়েটা! কেন তোমরা ওকে নিয়ে গেলে রাক্ষসদের দেশে?”

নিধি সাস্থনা দিচ্ছিল তাঁকে, অভী বসেছিল চুপ করে। তিনি বললেন, “নিধি, তবু তুমি যে ফিরে এসেছ, তার জন্যই আমি মৃত দেবতাকে নমস্কার করি।”

তাকে বুকে টেনে নিয়ে আবার কাঁদতে লাগলেন তিনি। নিধিরও চোখে জল চলে এসেছিল।

অভীর কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল এসব দেখতে দেখতে। সে কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ উঠে গেল নিজের কক্ষে, শুয়ে রইল শয্যায় স্থির হয়ে।

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমরগরিমার বিরাট মাঠের একটা অংশ। অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অভী। পর্বতকে দেখা যাচ্ছে – তার কুকুর বক্রপুচ্ছকে নিয়ে খেলছে সে।

হঠাৎ মনে পড়ল, “মৃত দেবতা কুকুর নিয়ে কী একটা বলেছিলেন না?”

দরজার সামনে থেকে নিধি ডাকল, “অভী, আসব?”

অভী উঠে বসল। “এসো।”

ঘরের মধ্যে এসে বসল নিধি। অভী বলল, “মিত্রমাসি একটু শান্ত হয়েছেন?”

“হুঁ। সহজে হননি, অনেক কিছু বলে শান্ত করতে হল ওঁকে।”

অভী আর বিস্তারিত জানতে চাইল না, নিধিও এ বিষয়ে কিছু না বলে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। “দেবতা তোমাকে বলেছেন, তোমার হাতে আর বেশি সময় নেই? এবার খুলে বলো তো ব্যাপারটা। লুকিও না কিছু।”

অভী স্বীকার করল, দেবতা তাকে বলেছেন, তার মৃত্যুর সময় এগিয়ে এসেছে। শুনে নিধি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর সে বলল, “রাজকন্যা উর্মির ঠিক কী হয়েছিল?”

তাঁর ঘটনাটাও নিধিকে বলল অভী – কীভাবে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্য উর্মি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, সবই জানাল তাকে, শুধু তার হাত ধরে তাকে বলা উর্মির কথাগুলো সে বাদ দিয়ে গেল। ওইটুকু বড়োই ব্যক্তিগত খুব কাছের বন্ধুকেও বলা যায় না।

বলতে বলতেই অভীর গলার স্বর ভারী হয়ে আসছিল। সে বলল, “নিধি, লীনা মারা গেল আমার জন্য। উর্মি মারা গেলেন আমার জন্য। ওদের দু’জনকেই বাঁচানো উচিত ছিল, কিন্তু আমি কিছু করতে পারিনি। এই যন্ত্রণাটা আমাকে যেন স্থির থাকতে দিচ্ছে না।”

নিধি বলল, “অভী, দু’জনের কারও ক্ষেত্রেই তোমার কিছু করার ছিল কি? নিয়তি যার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তা তো ঘটবেই। আর উর্মি... তাঁর কথা ভাবলে আমারও যেন কেমন অপরাধবোধ হচ্ছে। সত্যিই মহৎ হৃদয়ের মেয়ে ছিলেন তিনি। একসময় যে আমি তাঁকে নিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছি, তার জন্য এখন লজ্জা লাগছে।”

অভীর বুকের মধ্যে কষ্টটা অনেকক্ষণ ধরে পাক খাচ্ছিল। সে এবার কেঁদে ফেলল। “দু’জনেই আমার চোখের সামনে মারা গেল! আমি উর্মিকে বাঁচাতে পারলাম না, লীনাকেও পারলাম না – এত অপদার্থ বন্ধু আমি। নিধি, আমি সত্যি বলছি, এত মৃত্যু আমি আর নিতে পারছি না।”

নিধি তাকে সামলাতে সময় দিল। তার কাঁধে মাথা রেখে অভী ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তারপর আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত রেখে নিধি বলল, “অভী, নিজের উপর অন্তত অবিচার কোরো না। কে বলেছে তুমি অপদার্থ বন্ধু? তুমি আমাদের সবাইকে বাঁচিয়েছ। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। গোটা সমরগরিমার অস্তিত্ব রক্ষা পেয়েছে তোমার জন্য। ওই প্রেতদের নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছ তুমি। তোমার জন্যই জীবনরক্ষা হয়েছে পীতপত্রবনের হাজার হাজার গাছ আর বুনো জন্তুর। তুমি মহাবীর, অভী। তোমাকে বন্ধু হিসাবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।”

অভী চোখ মুছে তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে। সেখানে পর্বত ছোটোছুটি করে খেলছে বক্রপুচ্ছের সঙ্গে। হঠাৎ তার মনে হল, তার দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। একবার চোখ ঘষে নিল সে। না, চোখের জলের জন্য তো নয়। হঠাৎ করেই যেন চোখে কম দেখতে শুরু করেছে সে।

চোখের চিন্তাটা সরিয়ে রেখে সে ধরাগলায় বলল, “আমি তো কোনোদিন

‘মহাবীর’ হতে চাইনি। আমি প্রলয়যোদ্ধাও হতে চাইনি। যে বন্ধুদের আমি পেয়েছি, তাদের সঙ্গে আনন্দে থাকতে চেয়েছিলাম শুধু। আমি কখনও চাইনি, কেউ আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিক। তরুণেরও কোনো ক্ষতি হোক, তাও আমি চাইনি। তবু...”

নিধি স্নান হাসল। “আমরা যা চাই, তা কি সবসময় পাই? এটাই তো জীবন, তাই না? এটাই তো আমাদের নিয়তি। তুমি যাকিছু হারিয়েছ, তা নিয়ে যন্ত্রণা পাচ্ছ। এবার আমার কথা একবার ভাবো। না, শুধু লীনাকে হারানোর যন্ত্রণার কথা বলছি না। নীপার কথা ভাবো, আমার পরিবারের কথা ভাবো একবার।”

“তোমার পরিবার?”

“তরুণের মৃত্যুর পর নীপা যে কত কেঁদেছে, সে আর কী বলব তোমাকে? কিন্তু ও কথাও বলছি না। আমি ওর কাছে সেই রাতটার ঘটনা সব শুনেছি। তুমি আর আমার বাকি বন্ধুরা যখন আমাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছ, তখন আমার বাবা আমার মৃতদেহ ঘরে ঢুকতে দেয়নি; বলেছে, সে নাকি আমাকে চেনে না, আমি নাকি তার মেয়ে নই।”

অভী বলল, “উনি ভয় পেয়েছিলেন, নিধি। ওঁকে দোষ দিও না।”

নিধি মাথা নেড়ে বলল, “না, অভী। ওকে ভয় বলে না; ওকে বলে স্বার্থপরতা। নিজের জাতের সব ভালো, আর অন্যের জাতের সব খারাপ – এই ভাবনাটাই একটা ভয়ংকর পাপ। মানুষদের মধ্যেও যে ভালো থাকে, আর অর্ধরাক্ষসদের মধ্যেও যে খারাপ থাকে, এই সত্যটা স্বীকার করার মতো সৎসাহস ওই লোকটার নেই। ...এটা ভেবো না যে নিজের বাবার সমালোচনা করতে আমার খুব ভালো লাগছে। কিন্তু আমি যে কথাগুলো বললাম, সেগুলো খাঁটি সত্য।”

এ নিয়ে আর কিছু বলা উচিত মনে করল না অভী। একটা কথা তার হঠাৎ মনে পড়ল। সে বলল, “আচ্ছা, তুমি যখন নীরসেনা হয়ে নেমে যাচ্ছিলে জলে, তখনকার কথা তোমার মনে আছে?”

“আছে। কেন?”

“তখন তুমি একটা কথা বলেছিলে আমাকে। ‘ঘৃণার চেয়ে বড়ো বিষ পৃথিবীতে আর কিছু নেই’। কেন বলেছিলে ও কথা?”

নিধি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “যখন আমি দেবতার আনুগত্য স্বীকার করে নীরসেনা হিসাবে জেগে উঠলাম, তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য মৃত দেবতার যে বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার, তা যেন আমার সামনে খুলে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলাম আমি। দেখলাম, তুমি ডুবে যাচ্ছ – প্রাণপণে সাঁতার কেটে বাঁচতে চেষ্টা করছ। কীসে ডুবছ জানো? তোমার অন্তরে যে ভয়ংকর বিষ আছে – তোমার যে ঘৃণা দিয়ে তুমি হিমকুশলতা প্রয়োগ করো – সেই অমানুষিক ঘৃণার প্রবল স্রোতে। তোমাকে অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম তখন, কিন্তু বলতে পেরেছিলাম ওইটুকুই।”

একটু থেমে নিধি আবার বলল, “আমি নীরসেনাদের জীবনও দেখে এলাম। সে কী অদ্ভুত জীবন! ওদের অনেকেই আগে মানুষ ছিল; জীবনের নানা কষ্ট

সহ্য করতে না পেরে মরতে চেয়েছিল। দেবতা ওদের দয়া করেছেন, ওদের জীবনকে একটা উদ্দেশ্য দিয়েছেন। বাইরে থেকে দেখলে ভয়ংকর লাগে বটে, এবং ওরা ভয়ংকর – এ কথাও ঠিক – কিন্তু ওদের বেশিরভাগই মানুষজীবনে খুব দুঃখী ছিল, এখন বরং অনেক শান্তিতে আছে।”

মিত্রমাসি দরজা থেকে ডাকলেন, “অভী। নিধি।”

ওরা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তিনি বললেন, “একজন দেখা করতে এসেছেন তোমাদের সঙ্গে।”

“কে?”

রক্ষোবৈদ্য মুখ বাড়ালেন দরজা দিয়ে। “আমি। ভেতরে আসব?”

ওরা সসম্বন্ধে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। অভী বলল, “আসুন, আসুন।”

তিনি নমস্কার করে ভেতরে এসে বসলেন; বললেন, “এমনিই এলাম তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। মনটা ভালো লাগছে না। তাই একটু কথা বলতে এলাম। বিরক্ত করলাম না তো?”

অভী বলল, “না, একেবারেই নয়।” – সে জানে, রক্ষোবৈদ্য উর্মির কথা ভাবছেন। এই দূর সম্পর্কের নাতনিটিকে তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। সে বুঝতে পারছিল, উনি উর্মির কথাই বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না।

নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা তুলল সে, “রক্ষোবৈদ্য, উর্মি মৃত্যুর আগে আপনাকে প্রণাম জানিয়েছিল।”

সজল চোখে তিনি একটু হাসলেন; বললেন, “যাঁরা ভালোবেসে অন্যের চিকিৎসা করেন, তাঁরা খুব বিরল প্রজাতির লোক হন, জানো তোমরা? কারও যন্ত্রণা সারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা পাওয়া, এ নিয়তির আশীর্বাদ ছাড়া হয় না। দেখো না চারপাশে তাকিয়ে – সবাই যন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ খুঁজছে। ক’জন আছে যারা অন্যের যন্ত্রণা নিরাময় করার বিদ্যা ভালোবেসে চর্চা করে? একজন উত্তম বৈদ্যকে হারানোটা গোটা জগতের কাছেই একটা বড়ো ক্ষতি। আমার দুর্ভাগ্য, আমি এই মেয়েটির ছোটোবেলা কাছ থেকে দেখতে পাইনি, আর তার বড়োবেলা দেখার কোনো সম্ভাবনাও আর আমার রইল না।”

অভী বুঝতে পারছে তাঁর কষ্টটা। তার চোখের সামনে ফিরে ফিরে আসছে নানা দৃশ্য – হৃদয়শর নিক্ষেপ করেই লীনার লুটিয়ে পড়া, নিধির চেতনাহীন শরীরটাকে গুইয়ে রাখা নদীর তীরে, দ্রষ্টাদেবীর মন্দিরের সেই ভয়ংকর জীবন্ত আঁধারের সামনে উর্মির শেষ আলো। তার মনে হতে লাগল, আর ভাবলে সে বোধহয় পাগল হয়ে যাবে।

আচ্ছা, রক্ষোবৈদ্য আর নিধি – দু’জনের মুখই ঝাপসা লাগছে কেন? চোখটাতে কী হল তার?

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল নরক থেকে ফিরে আসার আগে দেবতার কথাগুলো। রক্তপদ্মরাগ আর লীনার মৃতদেহের কথা বলতে দেবতা ওকে বলেছিলেন, রক্ষোবৈদ্য আর একটা কুকুরকে নিয়ে পীতপত্রবনে যেতে। মানে কী কথাটার?

সে কথাটা বলল রক্ষোবৈদ্যকে। শুনে তিনি অবাক হয়ে বললেন, “দেবতা আমার কথা বলেছেন? আর একটা কুকুর? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।”

অভী উর্মির দেওয়া রক্তপদ্মরাগটা তুলে দিল তাঁর হাতে। তার মনে একটা ক্ষীণ আশা এখনও আছে, লীনাকে হয়তো এটা দিয়ে বাঁচানো গেলেও যেতে পারে। সেজন্যই সে অনুরোধ করেছিল, আর কয়েকটা দিন অন্তত লীনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেন পিছিয়ে দেওয়া যায়।

মণিটা নিয়ে শ্রদ্ধাভরে কপালে ঠেকালেন রক্ষোবৈদ্য। “আহা! সবচেয়ে ক্ষমতাবান শুভমণি এই রক্তপদ্মরাগ।”

নিধি বলল, “তাহলে এটা দিয়ে আপনি লীনাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন?”
রক্ষোবৈদ্য মাথা নাড়লেন। “না, নিধি। লীনা হৃদয়শর নিক্ষেপ করেছিল। তার মানে, তার হৃৎস্পন্দন চলে গেছে সেই তিরের সঙ্গে। মায়াশাস্ত্রে শেষ নিঃশ্বাস একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, জানো কি?”

ওরা মাথা নাড়ল। তিনি বললেন, “শেষ নিঃশ্বাস দিয়ে মৃত্যুর সময় যে কাজ করা হয়, সে কাজে অকল্পনীয় শক্তি আসে। হৃদয়শর ওই জন্য এত শক্তিশালী – ওই তিরের সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষেপকারীর শেষ নিঃশ্বাসও জুড়ে থাকে। সুতসোম তোমাকে শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওই বজ্রমাণিক দিয়েছিল, তাই ওর এত ক্ষমতা ছিল। আর উর্মিও তোমাকে এই রক্তপদ্মরাগ দিয়েছিল তার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে। তাই না?”

অভী বলল, “হ্যাঁ।”

“এই রক্তপদ্মরাগ নিজের মধ্যে নিয়ে জন্মেছিল ও। সেজন্যই চিকিৎসাবিদ্যায় এত দ্রুত উন্নতি করতে পেরেছিল মেয়েটা। এই মণি খুব শক্তিশালী; মৃত ব্যক্তির একটুখানি রক্ত যদি পাওয়া যায়, তাহলে এর দ্বারা ক্ষেত্রবিশেষে সঞ্জীবনী মায়া প্রয়োগ করা যায়, তা ঠিক। কিন্তু যোদ্ধা যখন হৃদয়শরের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, সেই ক্ষেত্রে এই মণি কাজ করবে কিনা, আমার সন্দেহ আছে।”

অভী ভাবতে ভাবতে বলল, “কিন্তু মৃত দেবতা আমাকে এই মণি আর কুকুর নিয়ে জঙ্গলে যেতে বলেছিলেন। কুকুরের ব্যাপারটা আমি ধরতে পারছি না।”

নিধি বলল, “আমিও পারছি না। দেবতা এমন অদ্ভুত নির্দেশ দিলেন কেন তোমাকে?”

পর্বত তখনও খেলছে বক্রপুচ্ছের সঙ্গে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অভী হঠাৎ চমকে উঠল। “না, এ অসম্ভব!”

নিধি অবাক হয়ে বলল, “কী হল? কী অসম্ভব?”

অভী উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করল। “রক্ষোবৈদ্য! নিধি! আজ রাতে আমরা একবার পীতপত্রবনে যাব। শুধু আমরা তিনজন। আর পর্বতদার বক্রপুচ্ছকে নিয়ে যাব।”

“কেন? কেন?”

“ওখানে গিয়ে বলব। দেবতা কী বলতে চেয়েছিলেন, আমি বোধহয় বুঝতে পারছি। ওখানে গেলেই আপনারাও বুঝতে পারবেন। রক্ষোবৈদ্য, আমাকে কথা দিন, আজ রাতে ওখানে যাওয়ার এই পরিকল্পনাটা আপনি কাউকে বলবেন না। আমি সেবাকক্ষে গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব। কথা দিন আগে।”

রক্ষোবৈদ্য অবাক হয়েই বললেন, “কথা দিলাম।”

রাত নেমেছে। অভী হাঁটছে সবার আগে বক্রপুচ্ছকে সঙ্গে নিয়ে। নিধি আর রক্ষোবৈদ্য আসছেন তার পেছনে।

সুদক্ষিণসারিকে ডানদিকে রেখে ওরা বামদিকে বনে যাওয়ার রাস্তাটা ধরল। রক্ষোবৈদ্য নিধিকে জিজ্ঞাসা করলেন, “বনের কোথায় যাচ্ছি আমরা? কেনই বা যাচ্ছি?”

নিধি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “আমি জানি না। ও আমাকেও বলেনি।”

নৈশ অরণ্য নিস্তব্ধ হয়ে আছে, শুধু পায়ের তলায় ঝরা পাতার মচমচ শব্দ হচ্ছে, আর রি-রি শব্দে ডাকছে ঝাঁঝি। অভী এসে দাঁড়াল পুকুরটার পাশে।

নিধি বুঝতে পেরে গেছে, অভী কী করতে চাইছে। বিস্ময়ে সে শব্দ করে একটা সুদীর্ঘ শ্বাস টানল।

রক্ষোবৈদ্য খসখসে গলায় বললেন, “কী ভেবেছ, খুলে বলো তো, অভী।”

“বক্রপুচ্ছের সঞ্জীবন বন্ধনীতে রক্ত দিয়েছিলেন উনি। এই কুকুরটাকে আপনিই তো বাঁচিয়েছিলেন তখন। ওঁর রক্ত আছে এর শরীরে, আর আমাদের সঙ্গে আছে রক্তপদ্মরাগ। আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, দেবতা আমাকে লীনার কথা বলছিলেন না। তিনি বলছিলেন ওঁর কথা।”

রক্ষোবৈদ্য যখন সূচ ফুটিয়ে এক ফোঁটা রক্ত বার করে আনলেন বক্রপুচ্ছের গায়ের সঞ্জীবন বন্ধনীর তলা থেকে, তখন তাঁর হাত কাঁপছে। কুকুরটা একবার মৃদু ‘কেঁউ’ শব্দ করে আপত্তি জানাল।

অভীর হাতের রক্তপদ্মরাগ থেকে সাদা আলো বেরোচ্ছে। তার মনে হল, ঠিক এইরকম আলো সে বেরোতে দেখেছিল উর্মির শরীর থেকে। রক্ষোবৈদ্য রক্তের ফোঁটাটা ফেললেন মণির উপরে; সঙ্গে সঙ্গে সাদা আলোটা লাল হয়ে জ্বলতে লাগল। নিধি হাঁ করে দেখতে লাগল।

তারপর রক্ষোবৈদ্যের হাতে মণিটা দিয়ে অভী আর নিধি মিলে খুঁড়ে বার করল দেহটা। একটুও পচন ধরেনি তাতে। দেখলে মনে হচ্ছে, তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন।

রক্ষোবৈদ্য বললেন, “অভী, তুমি নাও এটা। তুমিই করো কাজটা। মণির যে অংশে রক্তের ফোঁটাটা পড়েছে, সেই অংশটা স্পর্শ করতে হবে ওঁর দেহের মধ্যে। আমি একটুখানি চামড়া কেটে দিচ্ছি ওঁর গায়ে, তুমি ওই জায়গায় মণিটা ঠেকাবে।”

অভীর মনে হল, এ অনেকটা সেই মহাসর্পিণীকে শাপমুক্ত করার মতো পদ্ধতি। সে বলল, “কিন্তু আমি যে এর আগে অনেক প্রাণ নিয়েছি যুদ্ধে। আমি তো এ মণি ব্যবহার করার যোগ্য নই।”

রক্ষোবৈদ্য মাথা নাড়লেন। “না, তুমি যোগ্য। নরকবিষে তোমার পুরোনো শরীরের সব পাপ পুড়ে গেছে। এই মুহূর্তে তুমিই এই মণির সঞ্জীবনমায়া ব্যবহার করার যোগ্যতম ব্যক্তি।”

ছুরি দিয়ে মৃতের বাম বাহুর উপরের ত্বক অল্প একটু কেটে দিলেন তিনি,

তারপর মাথা নেড়ে অতীকে ইশারা করলেন। অতী রক্তমাখা রক্তপদ্মরাগ মণি ছোঁয়াল সেই ক্ষতস্থানে, ধরে থাকল কয়েক মুহূর্ত।

কই, কিছু হচ্ছে না তো!

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। বুকটা কি একটু উঠছে নামছে? চোখের পাতাগুলো কি একবার কেঁপে উঠল? বিবর্ণ মুখটাতে কি একটু লালচে আভা ফিরে আসছে? অতীর হাতের মধ্যে উর্মির পাথরটার আলো নিভে গেল।

ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

সারা অরণ্য জুড়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হল। গাছগুলো হঠাৎ আলো দিতে লাগল - খুব মৃদু, পীতাম্ব আলো, আর অল্প অল্প করে দোলাতে লাগল মাথা, যেন তারা খুব খুশি হয়েছে। নৈশ অরণ্যে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! প্রত্যেকটি পাতা থেকে বেরিয়ে আসছে স্নিগ্ধ হলদে আলো, যেন একেকটি পাতা একেকটি প্রদীপ হয়ে গেছে। ঝাঁঝের ডাক থেমে গেল।

অন্ধকার জঙ্গল ভরে উঠেছে গাছদের আলায়। সেই আলো পড়েছে ওঁর মুখে। সেখানে কোনো চঞ্চলতার আভাস নেই; প্রশান্ত, স্থির মুখমণ্ডল।

অতী ভাবতে লাগল, “তাহলে কি সব ব্যর্থ হয়ে গেল?” আর তখনই এক ঝটকায় সোজা হয়ে উঠে বসলেন অধিনায়ক বজ্রধর; বললেন, “স্বপ্নে মৃত দেবতা আমাকে বলছিলেন, সমরগরিমার আমাকে দরকার; আমি ফিরে যেতে চাই কিনা, জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, চাই।’ তখন...”

একটানা কথাগুলো বলতে বলতেই তাঁর খেয়াল হল, তিনি বসে আছেন রাতের জঙ্গলের মাটিতে, আর তিনটে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখ চরম অবিশ্বাস চোখে নিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে; যেন নিশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে তারা। গম্ভীরভাবে তিনি বলে উঠলেন, “হুম, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না।”

রক্ষোবৈদ্য আর চোখের পলক ফেলতে পারছেন না; একদৃষ্টে দেখছেন তিনি মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে আসা এই অদ্ভুত মানুষটাকে।

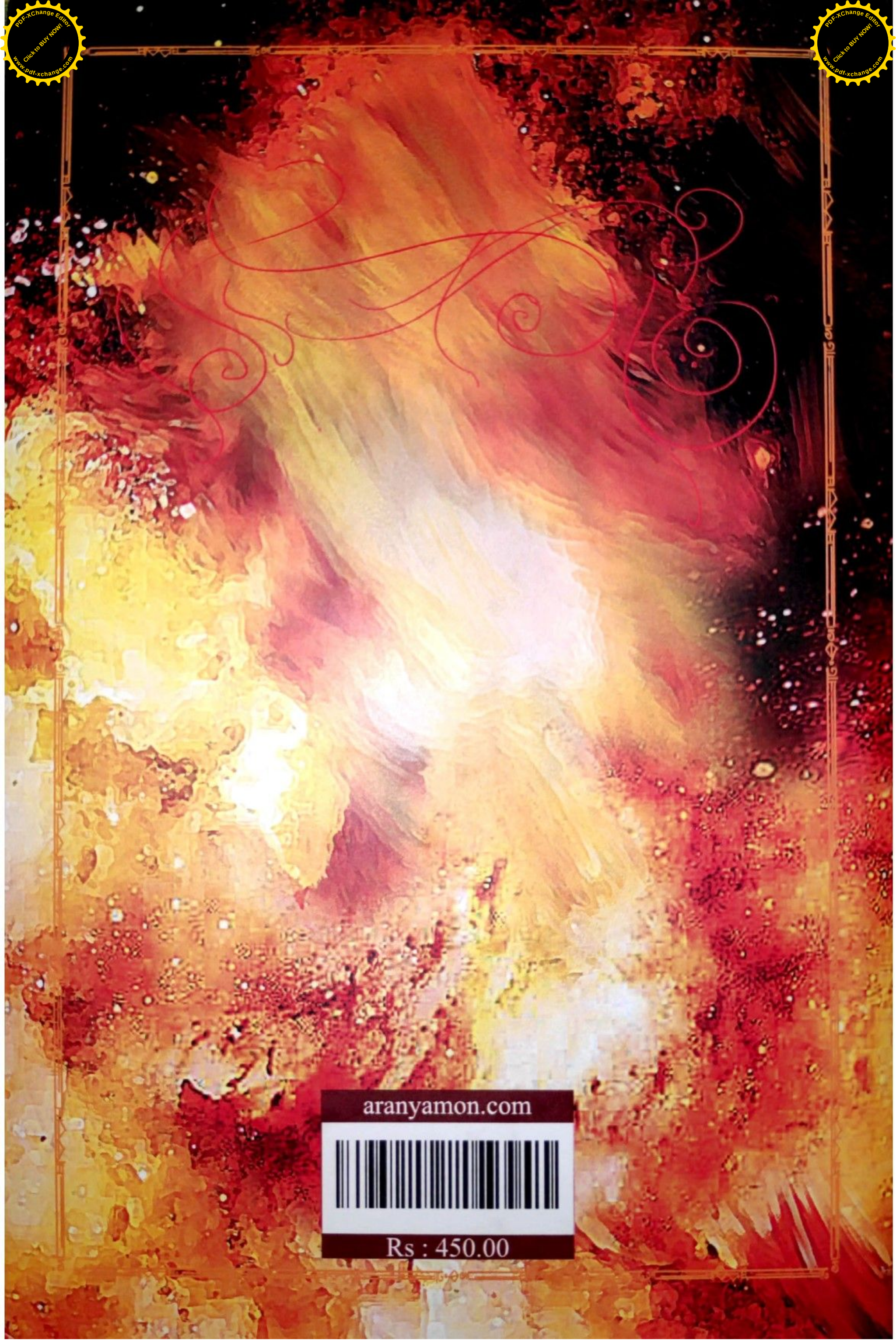
বজ্রধর ফিরে তাকালেন বাকি দু'জনের দিকে; বললেন, “কী হল তোমাদের? মুখে কথা নেই কেন?”

কথা কী বলবে, অতী আর নিধি আনন্দে কেঁদে ফেলল।

সমাপ্ত



জন্ম মেদিনীপুর শহরে ১৯৮৫
সালে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র।
পেশায় স্কুলশিক্ষক। নেশায় পাঠক।
দুঃসাহসে লেখক। লেখেন মূলতঃ
কল্পবিজ্ঞান ও ফ্যান্টাসি। বাংলা ও
ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখালিখি
করছেন দেশ ও দেশের বাইরের
বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও গল্প-
সংকলনে। অস্ট্রেলিয়া এবং
আমেরিকার একাধিক স্পেকুলেটিভ
সংকলন ও পত্রিকায় প্রকাশিত
হয়েছে বেশ কিছু গল্প। হলিউডে
অনুষ্ঠিত কল্পসাহিত্য প্রতিযোগিতা
এল. রন হারবার্ডের নামাঙ্কিত
'রাইটার্স অফ দ্য ফিউচার'-এ
একমাত্র ভারতীয় হিসাবে পরপর
দু'বছর পেয়েছেন 'অনারেবল
মেনশন'-এর সম্মান। ভালোবাসেন
বেড়াল, ব্যাটম্যান, সুকুমার রায়
এবং নলেন গুডের সন্দেশ।



aranyamon.com



Rs : 450.00